শিশু-ভারতী

[ছেলেদের বিশ্বকোষ]

সম্পাদক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিষয়-বিভাগ

———

নবম খণ্ড ৪১ হইতে ৪৫ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৩২০১ হইতে ৩৬০০

এখানে সংক্ষিপ্তভাবে নবম খণ্ডের বিষয়-বিন্যাস ও সূচীপত্র দেওয়া হইল। সমুদয় খণ্ড সম্পূর্ণ হইলে স্বতন্ত্ররূপে বিস্তারিত সূচীপত্র (Index) দেওয়া হইবে।

নবম খণ্ডের সূচীপত্র

হেন্‌রি হাড্‌সন্‌ ও তাঁহার পুত্রকে বিদ্রোহী নাবিকেরা জাহাজ হইতে নামাইয়া দিল

হেন্‌রি হাড্‌সন্

[illegible] পৃষ্ঠার পর

যাহারা অজ্ঞাতের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন তাহাদের কাহারও জীবন-ই আনন্দে অতিবাহিত হইতে পারে নাই। কত বড় বিপদের ভিতর দিয়া যে তাহাদের আসিতে হইয়াছে সে-সব কথা স্মরণ করিলেও আমাদের শিহরিয়া উঠিতে হয়।

হেনরী হাড্‌সনের নাম সকলেই জানেন। উত্তর মেরু প্রদেশে যাইয়া তিনি সামুদ্রিক পথ আবিষ্কার করিতে কিরূপে জীবনকে বিপন্ন করিয়াছিলেন সে করুণ-কাহিনী স্মরণ করিলে এখনও চক্ষুতে জল আসে। হেনরী হাড্‌সনের কথা আমরা কিছুই জানিনা। যতটুকু জানি তাহাও প্রচুর নহে। ১৬৫৫ খৃঃ অব্দে হেনরী হাড্‌সনের মৃত্যু হয়। তাঁহার অনেক ছেলেপিলে ছিল। হাড্‌সন-পরিবার বংশের দিক্ দিয়া বেশ পুরাণো বনিয়াদী ঘর। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীতে মাস্কোভি কোম্পানী (Muscovy Company) নামে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্বন্ধে বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

হাড্‌সনের বাল্যজীবন কি ভাবে কেমন করিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল সে-বিষয়ে আমরা বিশেষ কিছুই জানিনা না জানিলেও কোন ক্ষতি নাই। তবে এরূপ মনে হয় যে তাঁহার বাল্যজীবন নানারূপ ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়াই কাটিয়া গিয়াছিল।

হাড্‌সন বাল্য ও যৌবনে ছিলেন একটু কল্পনাপ্রবণ লোক। যখন দেখিতেন টেমস্ নদীর তীরে বড় বড় জাহাজগুলি নোঙ্গর করিয়া মালপত্র খালাস করিত, আবার যখন দেখিতেন টেমসের ঘোলাটে জলে ঢেউ তুলিয়া বাণিজ্য জাহাজগুলি কোন্ সুদূর দেশের উদ্দেশ্যে ভাসিয়া যাইতেছে তখন তাহার মনেও ঐরূপ সুদূর অভিযানের জন্য শত শত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত! অনেক যুবকের আশার স্বপ্ন সফল হইবার সম্ভাবনা থাকে না, সৌভাগ্যক্রমে হাড্‌সনের

সেইরূপ নিরাশার কোনরূপ কারণ ঘটে নাই। তাহার এক আত্মীয় বিদেশে বাণিজ্য করিতেন। তাঁহার কাছে হাড্‌সন তাঁহার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলে, তিনি এই তরুণ উৎসাহীকে উৎসাহ দিতে কোনরূপ ইতস্ততঃ করেন নাই। মনে হয় যে চারিবার সমুদ্র যাত্রা করিয়া হাড্‌সন্ পৃথিবীতে অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন—

হেন্‌রি হাড্‌সন্ এবং তাঁহার পুত্র বিপদের মুখে

তাহার পূর্ব্বেও তিনি অনেকবার সামুদ্রিক অভিযান করিয়াছিলেন।

সেকালে মাস্কোভি কোম্পানী যে সকল যুবককে তাহাদের কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করিতেন, তাহার পূর্ব্বে তাহাদিগকে কিছু-কালের জন্য শিক্ষানবিসী রূপে কাজ করিতে হইত। এ সময়ে ঐ শিক্ষানবিসী যুবকদের কোম্পানী নানা দেশে পাঠাইতেন। ঐসময়ে যুবকদের অনেক কিছু শিখিতে হইত, যেমন জিনিষপত্রের দরদস্তুর, হিসাব রাখা, কেনা-বেচা, আর সঙ্গে সঙ্গে কি ভাবে জাহাজ চালাইতে হয় অর্থাৎ নৌ-বিদ্যা সম্বন্ধেও তাহাদের শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। এ-সকল যুবকেরা যে একেবারে এ-সব বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিত তাহা সহজেই বুঝিতে পার, কিন্তু তাহাদের এই সামুদ্রিক-জীবন ছিল অতি প্রিয়। এই ভাবে প্রতি-বৎসর প্রায় ৭০।৮০ জন যুবক শিক্ষানবিসী ব্যবসায়বাণিজ্যে দক্ষতা লাভ করিত। সম্ভবতঃ ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে এই কোম্পানী স্থাপিত হয়। হেনরী হাড্‌সনও মাস্কোভি কোম্পানীর এইরূপ কোন জাহাজে শিক্ষা-নবিসী করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। হেনরী হাড্‌সনের পূর্ব্বে অনেক দুঃসাহসী অভিযানকারী যে নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া দেশ-বিদেশে নূতন নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সে-কথা আমরা সকলকেই জানি। এই সকল অভিযান-কারীদের মধ্যে নানা দেশের নানা জাতীয় লোকই ছিল যেমন ওলন্দাজ, স্পেনের অধিবাসী, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি। ইহাদের অনেকের কথাই তোমাদের কাছে, 'শিশু-ভারতী'তে বলা হইয়াছে।

১৫৫৫ খৃঃ অব্দে রাণী মেরী একদল উৎসাহী এবং নব নব দেশের সন্ধানী বণিকগণকে একটী সনদ প্রদান করেন। ক্যাবট্ (Cabot) ছিলেন ইহার উদ্যোক্তা। এই সনদের মধ্যে আমরা যে সকল বণিক ও অভিযানকারীর নাম পাই হাড্‌সন ছিলেন তাঁহাদেরই মধ্যে একজন। এই বৎসর অর্থাৎ ঠিক ১৫৫৬ সালে রুশ সম্রাট এই বণিক-সম্প্রদায়কে তাঁহার সাম্রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। মাস্কোভি কোম্পানী রুশ দেশের সহিত বাণিজ্য করিয়া বেশ লাভবান

হইতেছিলেন। এই সময়ে হাড্‌সনের ইচ্ছা হইল যে, যদি উত্তর পশ্চিম দিক দিয়া একটা পথের সন্ধান পাওয়া যায় তাহা হইলে বাণিজ্যের পথের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। এই পথের সন্ধানে অনেকেই উদ্যোগী ছিলেন। হাড্‌সন্ উহার ভার লইলেন। তিনি 'হোপওয়েল' (Hopewell) নামক একখানা ছোট জাহাজে মাত্র ১২ জন নাবিক লইয়া এই গুরুতর অসমসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। এই দলে তাহার ছেলে জন হাড্‌সনও ছিল। হাড্‌সন জানিতেন না এই অভিযানের ফল কিরূপ দাঁড়াইবে। মে মাসের প্রথম ভাগে তাহারা যাত্রা করিয়া ১৩ই জন তারিখে জমির সন্ধান পাইলেন। হাড্‌সন লিখিয়াছেন "আমরা জাহাজ হইতে দেখিতে পাইলাম সমুদ্রের পাড় অত্যন্ত উঁচু এবং বরফে ঢাকা। সেই বরফের উপর একটা লাল আভা দেখা যাইতেছিল এবং তাহার নীচে কালো রঙের কাদা, ছিল তাহার আশে-পাশে অনেক বরফ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়াছিল।" হাড্‌সন্ এই উচ্চ ভূমির নাম রাখিলেন "Mount of God's mercy"। তাঁহার এই যাত্রা শেষ হইতে তিন মাস পনেরো দিন লাগিয়াছিল। তাঁহার এই অভিযানে কোন সুফল হয় নাই। তিনি মাস্কোভি কোম্পানীর কর্ম্ম-কর্ত্তাদের তিমি মাছের ব্যবসা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন কেন-না তাহার এই অভিযানে তিনি পথে বহু তিমি মাছ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই অভিযানের পর মাস্কোভি কোম্পানী পুনরায় তাঁহাকে ঐ পথেই উত্তর মেরুর সন্ধানে পাঠাইয়া-ছিলেন। কিন্তু ভাসমান বরফ-শিলা ইত্যাদির জন্য তাঁহার এই যাত্রাও তেমন সফল হয় নাই। হাড্‌সন ভাবিলেন যে খামখেয়ালী করিয়া এইরূপ পথে অগ্রসর হওয়া অপেক্ষা ফিরিয়া যাওয়াই ভাল। এইবার ফিরিয়া আসিলে পরে মাস্কোভি কোম্পানী তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিলেন না, কেন-না তিনি এই যাত্রাও নূতন কোন ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিক দিয়া কোম্পানী লাভবান হয় এমন কিছু আবিষ্কার করিয়া আসিতে পারেন নাই। এইজন্য তাঁহাকে তৃতীয় অভিযান করিবার জন্য উক্ত কোম্পানী আর্থিক সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইলেন। এই সময়ে হাড্‌সনের কীর্ত্তিকথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এক ওলন্দাজ কোম্পানী (Dutch East-India Company) তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিয়া নূতন অভিযানে পাঠাইবার জন্য তাঁহার কাছে প্রস্তাব করিলেন। এ-কথা না বলিলেও চলে যে হাড্‌সন্ বিশেষ উৎ-সাহের সহিত তাঁহাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, এবং নূতন অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। দু'খানি জাহাজ নানারূপ প্রয়ো-জনীয় দ্রব্যাদি দ্বারা সজ্জিত হইল—এক-খানার নাম Good-Hope বা 'উত্তম আশা', আর একখানার নাম Half-Moon। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ্চ তারিখ এমার্স্টারডাম বন্দর হইতে জাহাজ দু'খানা সুদূরের অভি-যানে অগ্রসর হইল। হাড্‌সন্ নিজে 'Half-Moon' জাহাজের যাত্রী ছিলেন। যাত্রার প্রথম হইতেই একটা অশান্তির ভাব দেখা গিয়াছিল—জাহাজের নাবিকেরা বিদ্রোহের ভাব দেখাইতেছিল। হাড্‌সন্ যে কথা বলিতেন তাহারা সেই সব কথা কিংবা তাহার আদেশ মান্য করিয়া চলিতে চাহিত না। হাড্‌সন্ পূর্ব্বে যে পথে সামুদ্রিক অভিযান করিয়াছিলেন এইবারও সেইদিকে জাহাজ পরিচালনার কথা বলিলে

নাবিকেরা বলিল তাহারা বরফাবৃত সামুদ্রিক পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। অনাবশ্যক ভাবে এতটা কষ্ট সহিবার ইচ্ছা তাহাদের নাই। ফলে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের কাছাকাছি জাহাজ নোঙ্গর করা হইল। 'Good Hope' জাহাজের নাবিকেরা তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া হল্যাণ্ডের দিকে ফিরিয়া গেল।

১৬০৯ খৃষ্টাব্দে হাড্‌সনের তৃতীয় অভিযানের সময় উত্তর আমেরিকার পূর্ব্ব উপকূলে দেশীয় আদিম অধিবাসী ইণ্ডিয়ানেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল।

হাড্‌সন যে জাহাজে ছিলেন অর্থাৎ 'Half-Moon' জাহাজের নাবিকেরাও তাহার কথা না শুনিয়া নিজেদের ইচ্ছামত জাহাজ চালাইবার জন্য জেদ করিতেছিল। হাড্‌সন্ কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন যে ভাবেই হউক কোন নূতন দেশের সন্ধান না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। উত্তর-মেরু প্রদেশের দিকে অর্থাৎ উত্তর মহাসাগরের পথ ছাড়িয়া, তিনি আটলান্টিক মহাসাগর উত্তীর্ণ হইলেন এবং নিরাপদে Novascotiaতে আসিয়া পৌঁছিলেন। নোভাস্কোটিয়া উত্তর আমেরিকাতে অবস্থিত। তিনি এখানকার আদিম অধিবাসীদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিকে কোন সুব্যবস্থা হয় কিনা তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার এই উদ্যমে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন কিন্তু জাহাজের নাবিকগণের কলহ ও অশান্তির জন্য তাঁহাকে তাঁহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া অন্য দিকে যাত্রা করিতে হইল। এইবার তিনি যে বৃহৎ নদীর বুক দিয়া চলিতে লাগিলেন, সেই নদীর নাম তোমরা সকলেই ভূগোলে পড়িয়া থাকিবে—উহা তাঁহার নামানুযায়ী হাড্‌সন্ নদী নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। হাড্‌সন্ এই নদীর তীরে বা যাত্রাপথে কোন সাদা মানুষ দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার মনে হইল শ্বেতাঙ্গ অভিযানকারীদের মধ্যে তিনিই

সর্ব্বপ্রথম। একথা ঠিক কিনা সে-বিষয়ে
ন্যরূপও অনুমান করেন কেন-না
র্ব্বেও মানচিত্রে এই নদীর
ল। হাড্‌সন্ এইরূপ একটা
অভিযানে অর্থের দিক দিয়া
লাভবান হইতে পারেন নাই - কেন-না ওলন্দাজ কোম্পানী ইহার পরের বার তিনি যে অভিযান করেন তাহাতে অতি সামান্য পারিশ্রমিক তাঁহাকে দিতে রাজী হইয়াছিলেন। কাজেই এই যাত্রায় তাঁহার দিক দিয়া লাভের কোনরূপ আশা না থাকায় তিনি আর অগ্রসর হন নাই। পরের বার বা শেষ বার তিনি যে যাত্রা করেন সেই করুণ-যাত্রার কথাই এইবার বলিতেছি। তাঁহার এই বারের অভিযানে ঠিক কোন কোম্পানী অর্থ সাহায্য করিয়াছিল সে-বিষয়ে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন যে মাস্কোভি কোম্পানীই তাঁহাকে এ-অভিযানে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। জানা যায় যে তিনজন ভদ্রলোক Sir Thomas Smythe, Sir Dudley Diggs, এবং John Wolstenholme নামে তিনজন ভদ্রলোক তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করেন। এইবার তিনি যে জাহাজে যাত্রা করেন তাহার নাম ছিল "Discovery।" জাহাজখানি ছিল পঞ্চান্ন টনের। আর দীর্ঘকাল যাত্রার উপযোগী খাদ্যদ্রব্যের ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জামের ব্যবস্থা করিয়া জাহাজখানা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এই যাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মেরু প্রান্তের মধ্য দিয়া এমন কোন পথ আবিষ্কার করা যে-পথে অতি সহজে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাতায়াত করা যাইতে পারে।

প্রথম হইতেই এই যাত্রার মধ্যে কে যেন বিদ্রোহ ও অশান্তির আগুন ছড়াইয়া দিয়াছিল। এই জাহাজের নাবিকদলের মধ্যে Henry Greene নামে একজন যুবক নাবিক ছিলেন। একান্ত দুর্ভাগ্যের কথা এই যে প্রথম হইতেই হেনরীর সহিত হাড্‌সনের মতভেদ ঘটিয়াছিল। হাড্‌সনের সহিত কোথায় কি ভাবে এই যুবকের প্রথম পরিচয় হইয়াছিল সে-কথা ঠিক ভাবে কিছুই বলা যায় না। গ্রীনের বাড়ী ছিল কেন্টে। এই যুবকের পিতামাতা বেশ ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন কিন্তু গ্রীন্ বাল্যকাল হইতেই অসহিষ্ণু, অপব্যয়ী এবং নানারূপ কু-অভ্যাসের বশীভূত হইয়া অতিশয় দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। সময়ে তাঁহার আহারও জুটিত না। এইরূপ স্থলে হাড্‌সন তাঁহাকে আপনার বাড়ী আনিয়া খাদ্য ও বাসস্থান দিয়া পিতার ন্যায় পালন করিয়াছিলেন।

হাড্‌সনের মন প্রথম হইতেই এই অভিযান কালে তেমন প্রসন্ন ছিল না। যাঁহারা তাঁহাকে এই অভিযানে প্রেরণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় হাড্‌সনের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। তাই তাঁহারা (কোলবার্ণ) Coleburne নামক অন্য একজন নাবিককে হাড্‌সনের সহায়তা করিবার জন্য দিয়াছিলেন। হাড্‌সনের ন্যায় দক্ষ নাবিকের কাছে এইরূপ একজন সহায়ক নিযুক্ত করার দরুন তাঁহার মনে হইতেছিল বোধ হয় ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। শেষ মুহূর্ত্তে তিনি ডিরেক্টারদের কাছে একখানা চিঠি লিখিলেন যে আমার সহিত Coleburne এর যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। এই চিঠিখানাও তিনি কোলবার্ণকে দিয়াই পাঠাইয়াছিলেন। কোলবার্ণ যেমন চিঠিখানি লইয়া

তীরে নাবিলেন, তাহার একটু পরেই হাড্‌সন জাহাজখানি ছাড়িয়া দিলেন

১৬১০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল Discovery জাহাজখানা লণ্ডন ছাড়িয়া চলিল। গ্রীণল্যাণ্ড পৌঁছিবার পরেই নানা বিপদ আসিয়া দেখা দিল। জাহাজখানা অতি বেগে আসিয়া বরফের চাপে আটকাইয়া গেল। হাড্‌সন কোনরূপেই জাহাজখানিকে বরফ হইতে মুক্ত করিতে পারিলেন না। হাড্‌সন্ দেখিলেন তাঁহার নাবিকদের মধ্যেও এই ঘটনায় একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা দিল—তাহারা বেশ বুঝিতে পারিল যে হাড্‌সন্ বিপদে পড়িয়াছেন। কোথায় তাহারা এই রূপ বিপদে ম্রিয়মাণ হইবে এবং সকলে মিলিতভাবে সহযোগিতা করিবে বরং তাহার পরিবর্ত্তে তাহারা সকলে তাঁহাকে বিপন্ন করিবার জন্য আরোও উল্লসিত হইয়া উঠিল। তিনি নাবিকদের ডাকিয়া মানচিত্র খুলিয়া দেখাইলেন তাঁহার পূর্ব্বে কোন ইংরাজের জাহাজ এতদূর উত্তর দিকে আসে নাই। এইরূপ স্থলে তাহাদের সকলের উৎসাহের সহিত জাহাজখানিকে বরফের হাত হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া আরোও দূরে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। তিনি অতি করুণ ভাবে সঙ্গীয় নাবিকদের কাছে আবেদন করিলেন কিন্তু তাহারা কেহই হাডসনের কথায় বড় একটা কর্ণপাত করিল না। এই সময়ে জাহাজের লোকেরা কে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল সে সম্বন্ধে হাড্‌সনের জীবনী-লেখক বলেন—তাঁহার নাবিকদলের মধ্যে কেহই একমত ছিলেন না—সকলেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ মত প্রকাশ করিয়াছিল, অনেকেই ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ততা দেখাইতেছিল —অনেকে হাড্‌সনকে নানারূপ অকথ্য—
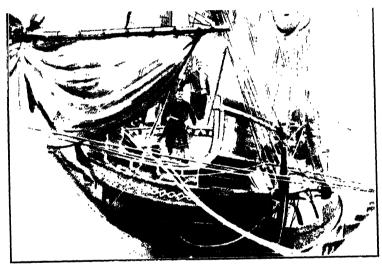
হাড্‌সনের হাফ্ মুন (Half Moon) জাহাজ। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে এই জাহাজখানি পুনর্গঠন করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছিল, ইহা সেই চিত্র।

ভাষায় গালাগালি দিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। হাড্‌সন এই সময়ে এতটুকু বিচলিত হইলেন না। তিনি বিশেষ ধৈর্য্য ও সাহসিকতার সহিত এই বিপদের সম্মুখীন হইলেন। কোন কোন কর্ম্মচারীকে কার্য্য হইতে বরখাস্ত করিয়া অপরকে সে স্থানে নিযুক্ত করিলেন এবং বিশেষভাবে কি করিয়া বিপদ হইতে মুক্তি পাইতে পারেন তাহা ভাবিতে লাগিলেন। জাহাজখানা এমন ভাবে বরফ দ্বারা ঘেরাও হইয়া গিয়াছিল, যে তাহা হইতে মুক্তি পাওয়া বড় সহজ ছিল না!

সুদীর্ঘ শীতকালের উপযুক্ত সঞ্চিত খাদ্য হাড্‌সনের সঙ্গে ছিল না। সুতরাং তিনি তাঁহার সঙ্গীদের পশুপক্ষী এবং মৎস্য শিকারের জন্য উৎসাহ দিতে লাগিলেন। এই সময় তাহার অনুচরদের মধ্যে অসন্তোষ আসিয়া দেখা দিল। নবেম্বর মাসে জন উইলিয়মস্ নামে তাহার দলের একজন সঙ্গী মারা গেলেন। হাডসন সম্ভবতঃ ইহার সহিত তেমন ভাল ব্যবহার করেন নাই, কেন-না আবাকাক্ প্রিকেট (Abacuk Prickelt) লিখিয়াছেন—"হাড্‌সন যে এই হতভাগ্যের প্রতি মন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ভগবান তাঁহাকে এই জন্য ক্ষমা করুন।"

এই সময় হেনরী গ্রীনের অন্যায় ব্যবহারে দলের লোকেরা ক্রমশঃই বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু হাড্‌সন্ সকল সময়ই গ্রীনের দোষ ঢাকিয়া চলিতেন। জন উইলিয়মস্ যখন মারা গেলেন, তখন তাহার ব্যবহৃত পোষাকগুলি কে গ্রহণ করিবে, তাহা লইয়া হাডসনের সঙ্গীদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য হাড্‌সন্ সকলের দাবী উপেক্ষা করিয়া হেনরী গ্রীনকেই পোষাকগুলি দিলেন।

কিছুদিন পরে কিন্তু গ্রীনের সহিতই হাডসনের বিবাদ বাঁধিল। হাডসন্ তাহার দলের সূত্রধরকে আদেশ দিয়াছিলেন সমুদ্রতীরে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিতে। কিন্তু সেই ব্যক্তি উহা করিতে অসম্মত হয়। ইহাতে হাড্‌সন্ খুব অসন্তুষ্ট হইলেন। বিশেষ যখন গ্রীন ঐ সূত্রধরের পক্ষ অবলম্বন করিলেন তখন তিনি এমন চটিয়া গেলেন যে, গ্রীনকে যে জন উইলিয়মস্‌এর পোষাকগুলি দিয়াছিলেন, তাহাও কাড়িয়া লইলেন। ফল কিন্তু বিশেষ সুবিধাজনক হইল না। এই অকৃতজ্ঞ যুবক তখন হইতে হাড্‌সনের অনিষ্ট করিবার সুযোগ খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিলেন এবং হাড্‌সনের শোচনীয় পরিণামের জন্য বিশেষ রূপে দায়ী ছিল এই গ্রীনই।

ক্রমে হাড্‌সন এবং তাহার সঙ্গীদের দুর্দ্দশা বাড়িয়া চলিল। বাহিরের দুরন্ত শীতের প্রখরতা হইতে আত্মরক্ষা করিতে এবং উহার উপর ভিতরের নানারূপ কলহ ও আত্ম-বিবাদের মধ্যে তাহারা সমস্ত কর্ম্ম-শক্তি এবং উৎসাহ হারাইয়া ফেলিতেছিল। এই সমস্ত গৃহবিবাদ ও অশান্তির মূলে ছিল গ্রীন। সেই হাড্‌সনের বিরুদ্ধে সঙ্গীদের নানা রকম উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছিল।

কথায় বলে বিপদ একাকী আসে না। হাড্‌সনের অদৃষ্টে হইল তাহাই। এই সময় এমন অবস্থা হইল যে চতুর্দ্দিক তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তাহারা কোথাও একটি মৎস্য বা পশু শিকার করিতে পারিলেন না। একমাত্র শ্যাওলা খাইয়া তখন তাঁহাদের জীবন ধারণ করিতে হইত। সমস্ত শীতকালটা এইরূপ দুর্দ্দশার ভিতর দিয়া কাটিল। ক্রমে যখন বরফ গলিতে সুরু হইল, তখন মৎস্য শিকারের কিছু সুবিধা হইতে লাগিল এবং তাঁহাদের খাদ্য কষ্টেরও কিছু অবসান

হইল। কিন্তু এই সঙ্গে হাড্‌সনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রটাও বেশ পাকিয়া উঠিল।

একদিন গ্রীন ও উইলসন নামে অপর একজন সঙ্গী মৎস্য-শিকারে যাইবেন ঠিক করিলেন। তাঁহারা যখন প্রস্তুত হইতেছিল, এমন সময় হাড্‌সন আসিয়া তাহাদের বাধা দিয়া নিজেই নৌকা লইয়া চলিয়া গেলেন। তিনি কিছুক্ষণ আগে দূরে আলোর মত একটা কিছু দেখিতে পাইয়াছিলেন। নিশ্চয়ই এখানে লোকালয় আছে, স্থির করিয়া তিনি লোকালয় খুঁজিতে গিয়াছিলেন। ফল কিন্তু বিষময় হইল। হাড্‌সনের অনুপস্থিতিতে গ্রীন্ সকল লোককে তাঁহার বিরুদ্ধে বিশেষরূপে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন।

যাহা হোক বহু অনুসন্ধানের পর হাড্‌সন নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং নিরুদ্যম হইয়া দেশে ফিরিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

১৮ই জুন তাহাদের 'ডিসকভারী' নামক জাহাজ দেশের দিকে ফিরিয়া চলিল। কিন্তু বিধাতা হাড্‌সনের ভাগ্যে অন্যরূপ লিখিয়াছিলেন, তাই প্রতিকূল বাতাসে জাহাজ খানি বরফের মধ্যে আটকাইয়া গেল। শুনা যায় যে, এই ঘটনায় হাড্‌সন একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন—তিনি স্পষ্টই তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন নহে।

২১শে জুন বিপদ ঘনীভূত হইল। আবাকুক প্রিকেট তাঁহার নিজের কামরায় একটি খঞ্জ কুকুরের পরিচর্য্যা করিতেছিলেন এমন সময় গ্রীন ও উইলসন সেখানে আসিলেন। তাঁহারা প্রিকেটকে বলিলেন যে তাঁহারা সকলে মিলিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে হাড্‌সন ও অন্যান্য অসুস্থ সঙ্গীদের একটা ছোট নৌকায় ভাসাইয়া দিয়া নিজেরা দেশে ফিরিয়া যাই।

প্রিকেট এই ভয়ানক শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গে হাড্‌সনকে এই নিশ্চিত মৃত্যুর হ রক্ষা করিবার জন্য গ্রীনকে অনেক বিনয় করিলেন। কিন্তু গ্রীন অটল রহিলেন প্রিকেটকে বলা হইল যে তাহাকে হয় এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে হইবে, নতুবা হাড্‌সনের সঙ্গে তাহাকেও নৌকায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হইবে। প্রিকেটকে অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিতে হইল। স্থির হইল যে রাত্রি প্রভাত হইলে এই ভীষণ কার্য্য করা হইবে। ক্রমে সেকালরাত্রি প্রভাত হইল। হাড্‌সন যখন তাঁহার কামরার বাহিরে আসিলেন তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া আনিল। হাড্‌সন দেখিলেন সকলেই তাঁহার বিপক্ষে কেবলমাত্র তাঁহার দলের সূত্রধরটি শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে ছিল।

হাড্‌সনের নিষ্ঠুর সহচরগণ তখন সাতজন সঙ্গী সহ হাড্‌সন ও তাঁহার পুত্রকে জোর করিয়া একটি ক্ষুদ্র নৌকায় উঠাইয়া দিল এবং নিজেরা জাহাজ ছাড়িয়া দেশের দিকে রওনা হইল।

ইহার পর কি হইয়াছিল, তাহা আর কেহ জানিতে পারে নাই। তবে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। তাঁহাদের সঙ্গে কোন খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হইয়াছিল না এবং সেই বরফের সমুদ্রে নৌকা চালাইবার ও তাহাদের কোন উপায় ছিল না। সুতরাং সেই দুর্গম জনমানব-হীন দেশে অতি শোচনীয় ভাবেই যে তাঁহার ও তাঁহার হতভাগ্য পুত্রের প্রাণ হারাইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

হজরৎ ইব্রাহিম

উত্তরে এশিয়ামাইনর, দক্ষিণে সুয়েজ প্রদেশ, পূর্ব্বে লেবানন পর্ব্বতশ্রেণী, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে অর্থাৎ লেবানন পর্ব্বত ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্ত্তী সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের সমগ্র উপকূলবর্ত্তী স্থানকে **কেনান** বলা হইত। পরবর্ত্তী কালে কেনানের উত্তর ভাগ অর্থাৎ সিরিয়ার পশ্চিম উপকূলকে ফিনিসিয়া নামে অভিহিত করা হইয়াছে। হজরত নূহের পুত্র হাম ও শামের বংশধরগণই এই কেনানের অধিবাসী। এই দেশের ভৌগলিক অবস্থান অতীব চমৎকার। পূর্ব্বে লেবানন পর্ব্বতশ্রেণী ; উহার পর পারে সিরিয়া ও আরবের মরুভূমি। সুতরাং লেবান পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে জীবিকার কোন উপায় নাই। সুতরাং সমুদ্রই তাহাদের জীবিকার একমাত্র উপায়। প্রকৃতির বিচিত্রতাই তাহাদিগকে এক বাণিজ্য-প্রিয় জাতিতে পরিণত করিল। তাহারা ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী এশিয়া মাইনর গ্রীস, ইটালী, স্পেন, প্যালেষ্টাইন, মিশর প্রভৃতি নানা স্থানে বাণিজ্য করিত। এই বাণিজ্য ব্যবসায়ই ইহাদিগকে পৃথিবীর মধ্যে সমধিক সাহসী, কৌশলী, ঐশ্বর্য্যশালী এবং সভ্য করিয়া তুলিয়াছিল। লেখা-পড়ায়ও ইহারা সকল জাতির অগ্রণী ছিল বলিতে হয়। ইহাদের নিকট হইতেই গ্রীকেরা লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিল। সুতরাং ইহারাই ইউরোপের গুরু। নৌ-বিদ্যায় যে ইহারা পারদর্শী ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। ছাগল, দুম্বা, গরু, উট প্রভৃতি ইহাদের গৃহপালিত পশু ছিল। এই গুলিই উহাদের সম্পত্তি ছিল। এখনকার মত তখন টাকা পয়সা ছিল না। সুতরাং এক দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া ক্রয়-বিক্রয় কার্য্য চলিত। ইহাদের উত্তর শাখা ফিনিসিয়ার অধিবাসীরা টায়ার, সীডন, বৈরুৎ প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত বন্দরগুলির সৃষ্টি করেন। ইহারা কৃষিকার্য্য, স্থাপত্যবিদ্যা ও ভাস্কর্য্যবিদ্যাতেও বেশ পারদর্শী ছিলেন। ইহারা বিভিন্ন রাজার অধীন ছিলেন। এই সকল রাজারা আবার কখন মিশরের কখন বাবিলনের কখন বা হিটাইট, আসিরিয়া প্রভৃতির রাজাদের করদরাজ্য রূপে অবস্থান করিতেন। এই সময় টায়ারে আবিমেলেক নামক

এক বাজা রাজত্ব করিতেন। দেশে পৌত্তলিকতার প্রচলনই বেশী ছিল। ইহারা বালাৎ (Baalat) অস্তার্ত্ত (Astarte) মেলকার্ট (Melkart) প্রভৃতি বহু দেব-দেবীর পূজা করিত। বাবিলনের তাই-গ্রিস ও ইউফ্রেতিস্ নদীর ন্যায় ইহারাও এখানে জর্ডান নদী হইতে প্রভূত উপকার পাইত। এই জন্য ইহারাও বাবিলনীয়দের ন্যায় জর্ডান নদীতে পূজা দিত। সময় সময় উহাতে নরবলি পর্য্যন্ত দেওয়া হইত। এখনও খৃষ্টানগণের নিকট জর্ডান নদীর জল পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়।

কেনান সমুদ্রতীববর্ত্তী স্থান বলিয়া এই স্থানের অধিবাসীরা সাধারণতঃ সমুদ্রগামী ও বাণিজ্যপটু। সুতরাং সমুদ্রই তাহাদের জীবিকার প্রধানতম উপায়। কিন্তু এখনকাব মত তখন বাষ্পীয় জাহাজ ছিল না। সুতরাং তাহাদিগকে শুধু মৌসুমী বায়ুব উপরই নিভর করিতে হইত। কিন্তু সমুদ্র বিক্ষোভিত হইয়া যখন উত্তাল তরঙ্গে ভীষণ গর্জ্জন করিতে থাকিত তখন তাহাদের জীবন সত্য সত্যই বিভিন্ন হইয়া উঠিত। তাহারা মনে করিত সমুদ্রের দেবতা রুষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং এই সমুদ্র-দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তাহারা নানা প্রকার স্তবস্তুতি করিত। এইরূপে তাহাদেব মধ্যে নৌকা পূজারও উদ্ভব হইয়াছিল। এখনকাব মত তখন দিক্-দর্শন যন্ত্রাদি ছিল না। দিক্ নির্ণয়ের জন্য তাহাদিগকে রাত্রিকালে আকাশের নক্ষত্রের উপরই নির্ভর করিতে হইত। সুতরাং নক্ষত্রকেও তাহারা তাহাদের ভাগ্যবিধাতা দেবতা মনে করিত। এবং তজ্জন্য বিদেশে যাত্রার সময় অথবা বিদেশাগমনের পর তাহারা যেমন নৌকার পূজা করিত তেমনি নক্ষত্রেরও পূজা করিত। ক্রীট দ্বীপ এই সময় বাণিজ্য-সম্ভারে বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। এখানকার অধিবাসীরাও একই কারণে এই সমস্তের পূজা অর্চ্চনা করিত।

"জোর যার মুল্লুক তার" এই নীতিই ছিল তখন প্রবল। তাহারা সুযোগ পাইলেই দস্যুবৃত্তি করিতে ছাড়িত না। যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। চামড়ার ঢাল প্রস্তুত কবিয়া বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ কার্য্য চলিত।

বহুদিন নদীমাতৃক বাবিলনের উর্ব্বর ক্ষেত্রে বাস করিয়া নদীকেই তাহারা তাহাদের ধন-সম্পদ্ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধাতা মনে করিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল নদী রুষ্ট হইলে রোষে ফুলিয়া দেশকে প্লাবিত করিয়া মানুষের সর্ব্বনাশ সাধন করে।

সুতরাং তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তাহারা নানা রকম স্তবস্তুতি করিত; এমন কি তাহাতে নরবলি পর্য্যন্ত দিত। এইরূপে শস্যক্ষেত্রেকেও তাহারা তাঁহাদের অন্যতম ভাগ্য বিধাতা মনে করিয়া শস্যক্ষেত্রেরও ঐরূপ পূজা অর্চ্চনা করিত, এবং সেখানেও নরবলি দিত। তাহারা মনে করিত পৃথিবী একটা দৈত্যেব মাথার উপর স্থাপিত আছে। দৈত্য রুষ্ট হইলে সেই মাথা নাড়া দেয়, অমনি পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। সুতরাং এই দৈত্যকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য মহাড়ম্বরে তাহার নিকট পূজা দিত। এই আনন্দ, অধিকতর মধুর করিবার জন্য তাহারা এক প্রকার মদ্য পান কবিত।

এই সকল জাতির মধ্যে ইসলাম প্রচাব কবিবার জন্য দৈবাদেশ প্রাপ্ত হইয়া ইব্রাহিম প্রথমে কেনানে গিয়া হাই ও বেথেলহেমের মধ্যবর্ত্তী স্থানে নিজের বসতি স্থাপন করিলেন। এখানেও তিনি পূর্ব্ববৎ আল্লার ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

কেনানে ইব্রাহিমের এক পিতৃব্য বাস করিতেন। ছারা নাম্নী তাঁহার এক কন্যা ছিল। স্বধর্ম্মের প্রতি ইব্রাহিমেব এরূপ অনাস্থা দেখিয়া প্রলোভনে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য তাঁহাব পিতৃব্য স্বীয় কন্যার সহিত ইব্রাহিমের বিবাহ দিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হইল না। ইব্রাহিম পূর্ব্ববৎ এখানেও দেশবাসীদিগকে তাহাদের কল্পিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইস্লামের সুশীতল ছায়ায় আহ্বান করিতে লাগিলেন।

বাবিলনের সমসাময়িক ভাবে মিশরেও সভ্যতা গড়িয়া উঠিতেছিল। শামের বংশধরগণ ক্রমে আরো বিস্তৃত হইয়া ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া) মিশর প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়েন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মিশরে তাহারা নীল নদের উর্ব্বর উপত্যকায় বাস করিতেন।

মিশর ও বাবিলনের ন্যায় উর্ব্বব কৃষি-প্রধান দেশ। তাহারাও কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য জলসেচনাদির সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিল।

নীল নদের ভিতর দিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের'ও প্রসার হইয়াছিল। ক্রমে এই বাণিজ্য ভূমধ্য-সাগর ও কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী স্থান সমূহে বিস্তার লাভ করে। নীল নদের তীরবর্ত্তী বড় বড় বৃক্ষ আনয়ন করিয়া হজরৎ নূহের জাহাজ তৈয়ারী হইয়াছিল তাহা তোমরা জান। বড় বড় নৌকায় যে সমস্ত গাছ আনীত হইয়াছিল তাহা বেশ অনুমান করা যায়। বাবিলনের ন্যায় এখানেও চিত্র-লেখার সাহায্যেই রাজার আদেশ চুক্তি ইত্যাদি লিখিত থাকিত।

পার্থিব সম্পদে তাহারা বেশ উন্নতি করিয়াছিল। ক্রীট দ্বীপের রাজাকে যেমন 'মাইনস্‌, এবং বাবিলনের রাজাকে 'প্যাটেসি' বলা হইত, তেমনি মিশরের রাজাদিগকে 'ফেরাউন' বলা হইত। তাহারা শিল্প-কার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল। ভাস্কর্য্য-বিদ্যাতেও বিশেষ পারদর্শী ছিল। কিন্তু নৈতিক সভ্যতা তাহাদের মধ্যে আদৌ ছিল না বলিলেই হয়। রাজা অত্যাচারী ও যথেচ্ছাচারী ছিলেন। গরীবদিগের অবস্থা শোচনীয় ছিল। ইহারাও নানা দেবদেবীর উপাসনা করিত। নদী নৌকা, নক্ষত্র প্রভৃতির পূজাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অনাবৃষ্টি বা প্লাবনের সময় নদীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য উহাতে সন্তান বলি দিত। দেবতাদের নিকটেও নরবলি দেওয়া হইত। ধন—সম্পত্তি কাহারও নিরাপদ ছিল না। ফিনিসিয়া ইথিওপিয়া প্রভৃতি দেশের ন্যায় এখানেও গরীব-দিগকে বা যুদ্ধের বন্দীদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করা অথবা নিজ গৃহে আজীবন খাটাইয়া লওয়া হইত। মিশরের এই বিবিধ অন্যায়ের স্রোত যখন উদ্দাম গতিতে ছুটিয়াছে—তখন শ্বশুরের অনুমতি লইয়া পত্নীসহ ইব্রাহিম মিশরে গমন করিলেন। মিশর রাজ ফেরাউন অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি তাঁহাদের উপর নানারূপে অত্যা-চার করিতে লাগিলেন। এই সময় দেশে মহামারী উপস্থিত হইল।

বিপদ দেখিয়া মিশর-রাজ মনে করিলেন—ইব্রাহিম সহজ ব্যক্তি নহেন। সুতরাং তিনি তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া হাজেরা নাম্নী তাঁহার জনৈক আত্মীয়াকে ছায়ার পরিচারিকা স্বরূপ ইব্রাহিমের সহিত দিলেন। ইব্রাহিম ছারা ও হাজেরাকে লইয়া পুনরায় কেনানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইব্রাহিম ব্যতীত দেশে মহারাজ নমরুদের আর দ্বিতীয় শত্রু কেহ ছিল না। তিনি আর বাবিলনে নাই। সুতরাং নমরুদ এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। তোষামোদকারী সভাসদবর্গ রাজানুগ্রহ লাভের আশায় তাঁহাকে একেবারে আকাশে তুলিয়াছেন। কেহ বলিতেছেন—"মহারাজ! আপনি অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী নরপতি। আমরা আপনারই অনুগ্রহে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছি। আপনি আমাদের সুখ-দুঃখের বিধাতা। আপনিই জন্ম-মৃত্যুর কর্ত্তা। সুতরাং আমরা আপনাকেই ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিব। আপনি অনুমতি করুন দেশ মধ্যে আপনার সর্ব্বশক্তিমানত্ব প্রচার করিয়া দিই। লোকে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করুক।"

এই সময় অজ্ঞতা দেশের মধ্যে এমন ভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে—প্রকৃতির যে কোন শক্তিকে লোকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিত। সূর্য্যের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ, মেঘের অযাচিত দান, নদীর উর্ব্বরতাদায়িনী শক্তি, ভূমির শস্যোৎপাদিকা শক্তি, অগ্নির দাহিকাশক্তি, রোগের অনিষ্ট, ঝড়ের প্রকোপ প্রভৃতি দেখিয়া উহাদিগকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিত। ক্রমে এই অজ্ঞতা চরম সীমায় উপনীত হইল। এখন মহারাজ নমরুদের অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহাকেই মূর্ত্তিমান ঈশ্বর মনে করিতে তাঁহাদের আর দ্বিধা বোধ হইল না। সুতরাং রাজানুগৃহীত সভাসদবর্গের পরামর্শে রাজ্য মধ্যে প্রচার করিয়া দেওয়া হইল—নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজ্যের সমস্ত প্রজা রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, মহারাজ নমরুদকে ঈশ্বর বলিয়া অভিষিক্ত করিবে।

হজরৎ ইব্রাহিম শাম, কেনান প্রভৃতি দেশে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। একদিন দৈবাদেশ হইল, "ইব্রাহিম বাবিলন পাপের স্রোতে ডুবিয়া যাইতেছে তুমি সত্বর তথায় গিয়া আবার সত্যধর্ম্মে দেশবাসীদিগকে আহ্বান কর।" আদেশানুযায়ী তিনি আর কাল বিলম্ব করিলেন না।

নমরুদের অভিষেকের দিন সমাগত। কেহ অনুরোধের খাতিরে কেহ রাজ-ভয়ে, কেহ কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য, কেহ বা আমোদ উপ-ভোগের জন্য, রাজধানীতে সমবেত হইয়াছে। কিন্তু নমরুদের সেই পূর্ব্বপরিচিত শত্রু ইব্রাহিম তাঁহার কতিপয় অনুগামীসহ এই সমারোহে যোগ দেন নাই ববং ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। সুতরাং চাটুকারের দল ইব্রাহিমের নানা কুৎসা রটনা করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধতার কথা ষোলকলায় অতিরঞ্জিত করিয়া রাজ-সমীপে জ্ঞাপন করিল। শ্রবণমাত্র মহারাজ নমরুদ রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। সকলেই এই শুভ কার্য্যে উৎসাহ প্রদর্শন করি-তেছে আর ইব্রাহিমের ন্যায় একজন অর্ব্বাচীন যুবক তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, ইহা কি মহারাজের সহ্য হয়? সুতরাং তিনি বল-প্রয়োগে তাহাকে রাজধানীতে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। আদেশ অনুযায়ী ইব্রাহিমকে বন্দী-বেশে রাজধানীতে আনয়ন করা হইল। অমাত্য-গণের ইঙ্গিতে নমরুদ স্থির করিয়াছিলেন দুষ্টমতি ইব্রাহিম রাজসভায় উপস্থিত হইলেই সাধারণের সমক্ষে তাঁহাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করিবার আদেশ দিবেন। কিন্তু ইব্রাহিমের মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার উগ্র-চাহনি নম্রভাব ধারণ করিল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে বিষধর সর্প ইব্রাহিমের প্রাণনাশের জন্য ফণা উত্তোলন করিয়াছিল—কি যেন এক অলৌকিক শক্তি প্রভাবে সে এখন নম্র শির হইয়া মৃদুভাবে ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করিল—ইব্রাহিম! আজ সকলেই সাগ্রহে মহাসমারোহে আমাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতে প্রস্তুত; তুমি কেন তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ?" তুমি আমার অতুলনীয় ক্ষমতার কথা অবগত নহ? আমি এখন সকলের ভাগ্য-বিধাতা। যদি ভাল চাও আমাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার কর।"

"মহারাজ আপনি ত জন্ম-মৃত্যুব অধীন মানব অন্ত কিছুই নহেন। আপনার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আপনি বৃথা ঈশ্বরত্বের দাবী করিয়া পাপী হইতেছেন। এখনও ভ্রান্তি পরিহার করুন; সমগ্র বিশ্বজগতের সৃষ্টি কর্ত্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"

"ইব্রাহিম! তোমার ধ্বংস নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তাই তোমার মস্তিস্ক ক্রমশঃ বিকৃত হইতেছে। তুমি কি আমার সর্ব্বশক্তিমানত্বে বিশ্বাস কর না? আমি এখনই তোমাব প্রাণনাশ করিতে পারি—আবার রক্ষা করিতে পারি।"

"মহারাজ! আপনি ত পূর্ব্ব বারেও আমার প্রাণনাশে উদ্যত হইয়াছিলেন। যাহা হউক মহারাজ আপনি ত সর্ব্বশক্তিমানত্বের দাবী করি-তেছেন; একই স্থানের রস গ্রহণ করিয়া আল্লার আদেশে বিভিন্ন তরু, বিভিন্ন প্রকার স্বাদযুক্ত ফল প্রদান করিতেছে, বিভিন্ন রকম ফুল, পাতার বিভিন্ন রকম বর্ণ গন্ধ হইতেছে; আপনি কি ইহার ব্যতি-ক্রম করিতে পারেন? আল্লার আদেশে সূর্য্য পূর্ব্ব দিক হইতে উদিত হইতেছে, আপনি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে উদিত হইবার ব্যবস্থা করুন।"

"মহারাজ! আমরা আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলি আগুনে সিদ্ধ করিয়া নানা প্রকারে রন্ধন করিয়া তবে তাহা ভক্ষণ করি; অথচ এই প্রাণহীন পদার্থ হইতে সজীব রক্ত-মাংস মেদ-মজ্জা প্রস্তুত হইয়া উহা হইতে জীবাণুর সৃষ্টি হইতেছে। মহারাজা! আপনি এরূপ নির্জীব পদার্থের জীবন দান করিতে পারেন? আপনি কেন ঈশ্বরত্বের দাবী করিয়া বৃথা পাপী হইতেছেন? একমাত্র আল্লাই জীবন মৃত্যুর অধিকারী। তিনিই সর্ব্বশক্তিমান। তিনিই সমস্ত বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও পালনকর্ত্তা। তিনিই সকলের ভাগ্যবিধাতা। আপনি তাঁহারই উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হউন, তাঁহারই উপাসনা করুন এবং তাঁহারই আদেশানুযায়ী সৎকার্য্য করুন। ইহাই ইস্‌লাম—ইহাই সত্য সনাতন ধর্ম্ম।"

নমরুদ অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু স্বীয় মতের পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। লোকলজ্জা ভয়, অন্ধ গোঁড়ামি প্রভৃতি সত্যের পথের পরম অন্তরায়। আত্মা যাহাদের দুর্ব্বল—এই সমস্ত অন্তরায় তাহা-দের মনের উপর একচ্ছত্র রাজত্ব করিয়া থাকে। সুতরাং সত্যকে চিনিয়াও, তাহাদের দুর্ব্বল অন্তঃ-করণ এই সমস্ত অন্তরায়ের অনুশাসন অবহেলা করিতে পারে না। নমরুদ সত্যকে চিনিলেন বটে, কিন্তু আত্মার দুর্ব্বলতার জন্য উহা গ্রহণ করিতে

পারিলেন না। দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় ইহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। তিনি ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"ইব্রাহিম! তোমার ধর্ম্মের ঢোল ত তুমি খুব জোরেই বাজাইতেছ; কিন্তু তোমার ধর্ম্ম যদি সত্য—সনাতনই হইবে; ইহা যদি তোমার আল্লার বাঞ্ছিতই হইবে, তোমার আল্লাই যদি বাস্তবিকই সর্ব্বশক্তিমানই হইবে, তবে তোমার ধর্ম্ম দিন দিন ক্রমশ: ক্ষীণ হইতেছে কেন? তোমার আল্লাই সর্ব্বশক্তিমান হইলে এবং তোমার ধর্ম্ম তাহার বাঞ্ছিত হইলে তিনি সকলকে একদিন সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে পারিতেন। ইব্রাহিম! তুমি বিকৃত মস্তিষ্ক! অর্ব্বাচীন যুবক! যাহা স্বভাবজ তাহাই সনাতন ধর্ম্ম।"

"মহারাজ! লোকে অতি যত্ন করিয়াই ক্ষেতে ফসল উৎপন্ন করে; আগাছার জন্য কেহ যত্ন করে না বরং উহা নির্ম্মূল করিবার জন্য তাহারা প্রাণ-পণ চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু মহারাজ! ক্ষেত্র-স্বামীর অযত্ন অনাদর এমন কি ধ্বংসের চেষ্টা সত্বেও আগাছার বৃদ্ধি কেমন সতেজ! পক্ষান্তরে আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও ফসলের বৃদ্ধি কত ধীর, কত ক্ষীণ। মহারাজ! ফসল ও আগাছার এই বৃদ্ধির তারতম্য দেখিয়া কি ক্ষেত্রস্বামী উহাদের প্রয়োজনীয়তা বা বাঞ্ছনীয়তার বিচার করিবেন। ক্ষীণ হইলেও পরিণামে ক্ষেত্রস্বামী ফসলকেই সাদরে গ্রহণ করিবেন; আগাছাগুলি উপেক্ষিত হইয়া ক্ষেত্রেই শুকাইয়া মরিবে।"

নমরুদ আরো অধিকতর অপ্রতিভ হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন তাঁহার এই একমাত্র শত্রুর নিধন সাধন করিতে না পারিলে জনসমাজে তাঁহার আর মর্য্যাদা থাকে না। এতদিন নমরুদ এই অমঙ্গলের ধূমকেতু দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে-ছিল। তাহাতে নমরুদ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া-ছিলেন। সেই ধূমকেতুর পুনরুদয় হওয়ায় নমরুদের মনে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। কিন্তু এ-ধূমকেতু সহজে তিরোহিত হইবার নহে। অনন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াও যাহার কিছু হয় নাই—কি প্রকারে তাঁহার নিধন সাধন করিবেন তাহা ভাবিতে নমরুদের মাথা ঘুরিয়া গেল। অবশেষে স্থির হইল—প্রকাশ্য ময়দানে সম্মুখ যুদ্ধে তাঁহাকে ধ্বংস করা হইবে।

এই সময় প্রস্তরের পরিবর্ত্তে তামা কাঁসার প্রচলন হইয়াছে। দেশের সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্ব্বতে, নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে লোহের সন্ধান পাইয়া তদ্দারা অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা-দের নিকট হইতে স্থায়ী অধিবাসীরাও উহার অল্প বিস্তর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু তৈয়ারীর নিয়ম তখনও উত্তমরূপে আয়ত্ত হয় নাই। সুতরাং লৌহের ন্যায় কঠিন ধাতুর ব্যবহার ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয় নাই। শিকারই ছিল তখনকার প্রধানতম জীবিকা। এই কার্য্যে তীর, বর্শা প্রভৃতিই বেশী ব্যবহৃত হইত। সুতরাং যুদ্ধের সময়ও তাহারা ঐ সকল অস্ত্রের দ্বারাই যুদ্ধ করিত।

যাযাবর জাতিরা অধিকাংশ সময় এক প্রকার ছাউনীর নীচে থাকিত। পশুর চর্ম্ম দিয়া এই সকল ছাউনী প্রস্তুত হইত। স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা মুক্ত ময়দানে বাস করিত তাহাদেরও কেহ কেহ এই ছাউনীর নীচেই থাকিত। ক্রমে লোকে শিকার করিতে করিতে বন্য পশুকে বশীভূত করিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে তাহাদের লালনপালন করিতে লাগিল। কাল ক্রমে ইহারাই গৃহপালিত জীবে পরিণত হইল। এই সমস্ত গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছাগ, দুম্বা, গাধা প্রভৃতিই প্রধান। ঘোড়ার প্রচলন তখনও হয় নাই। উটকে বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই গৃহপালিত পশুতে পরিণত করা হইয়াছে। গরু আরও বহু প্রাচীনকাল—হজরৎ আদমের সময় হইতে গৃহপালিত জীবে পরিণত হইয়াছে। গরুর দ্বারা কৃষিকার্য্য এবং এক প্রকার গাড়ী বা রথ টানার কার্য্য সম্পন্ন হইত। এই রথ যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হইত।

নমরুদের অগণিত সৈন্য। এই সকল সৈন্য এখানকার মত বেতনভোগী ছিল না। রাজা মহা-রাজারা দেশের গরীবদিগকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া বিনা পারিশ্রমিকে বা নাম মাত্র পারিশ্রমিকে খাটাইতেন। দেশের এই সমস্ত গরীব লোক এবং অগণিত গোলাম ও বন্দীরাই নমরুদের সৈন্য। ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য রাজার আদেশে

ইহারা বিরাট ময়দানে ছাউনী ফেলিয়াছে। মহারাজ নমরুদ একজন খ্যাতনামা যোদ্ধা। শিকারে তাঁহার অতুলনীয় খ্যাতি। সুতরাং তাঁহার সৈন্যগণও প্রভুর আদর্শে দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা। তাহারা তীর বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত। ইব্রাহিমের কোনই আয়োজন নাই। তিনি তাঁহার মুষ্টিমেয় অনুচরগণ সহ সিংহযূথের সম্মুখে মেষ-পালকের ন্যায় ময়দানের এক কোণে সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া আছেন। যুদ্ধের সময় সমাগত। নমরুদের সৈন্যেরা মহা আস্ফালন করিতেছে। ইব্রাহিমের সৈন্যের কোন সাড়া শব্দই নাই। দর্শকগণ চতুর্দ্দিকে উৎসুক নয়নে যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতেছে। দেখিতে দেখিতে বিরাট মেঘের ন্যায় পশ্চিমাকাশ অন্ধকার করিয়া শন্ শন্ শব্দে প্রকাণ্ড এক ঝাঁক মশক কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া নমরুদের সৈন্য দলের উপর নিপতিত হইল। মশার কামড়ে সৈন্যদল ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া পড়িল। অবশেষে ভীষণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। ইহাতেই তাহারা নিস্তার পাইল না। যে যেখানে পলাইল—সেই থানেই তাহার শরীরের উপর উহার বিষ-ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। স্বয়ং মহারাজ নমরুদ কঠিন শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কোনরূপে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি সেই পীড়াতেই অচিরকাল মধ্যেই ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। দর্শকবৃন্দের অনেকেই ইব্রাহিমের অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহাকে সত্য নবী বলিয়া স্বীকার করতঃ তাঁহার ধর্ম্ম মত গ্রহণ করিল। ব্যাবিলনে আবার ইস্লাম—রাজ্য স্থাপিত হইল। ইব্রাহিম নিশ্চিন্ত হইয়া পুনরায় কেনানে গমন করিলেন।

ইব্রাহিমের বয়স তখন ৮০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। অথচ তাঁহার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিল না। ছারা ও ইব্রাহিম উভয়েই দুঃখিত অবশেষে স্থিরীকৃত হইল ইব্রাহিম হাজেরাকে বিবাহ করিবেন। ছারাই এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া হাজেরার সহিত স্বামীর বিবাহ দিলেন। উদ্দেশ্য সফল হইল। ইব্রাহিমের ৮৬ বৎসর বয়সে হাজেরার গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। এই পুত্রের নাম রাখিলেন ইস্মাইল। ছারা পুত্র রত্নে বঞ্চিত ছিলেন বলিয়া সাধ করিয়া হাজেরার সহিত স্বামীর বিবাহ দিয়াছিলেন। এবং হাজেরাকে কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিতেন। কিন্তু হাজেরার গর্ভে যখন এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল তখন ছারার সরল হৃদয়ে ঈর্ষার ঝড় বহিতে লাগিল। ক্রমে এই ঈর্ষা ভীষণাকার ধারণ করিলে সপত্নীর কণ্টক সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য, তিনি ইস্মাইল সহ হাজেরাকে নির্ব্বাসন দিতে স্বামীকে জেদ করিতে লাগিলেন। ইব্রাহিম প্রথমে ইহাতে কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু একদিন দৈবাদেশ হইল, "ইব্রাহিম! তুমি ছারার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত কর." ভক্ত শ্রেষ্ঠ ইব্রাহিম আর দ্বিরুক্তি না করিয়া শিশু পুত্র ইস্মাইল সহ হাজেরাকে সুদূর দক্ষিণে সাপা ও মারওয়া নামক পর্ব্বতের নিকট নির্জ্জন বনে নির্ব্বাসন দিয়া আসিলেন। ইব্রাহিম এমনি ছিলেন ভক্ত ও বিশ্বাসী সাধু ব্যক্তি।

বিবি হাজেরা শিশুপুত্র ইসমাইলকে লইয়া একাকিনী কাল যাপন করিতেছেন। একে ত বিজন বন, তাহাতে আবার জলাভাব, সুতরাং সেখানে কোন মানুষের আবাস সম্ভব হয় নাই। কিন্তু আল্লার অনুগ্রহে এবং ইঙ্গিতে যখন তথায় হজরৎ ইসমাইলের কল্যাণে জম্‌জম্ কূপের উদ্ভব হইল তখন ক্রমে তথায় জনপদের স্থাপনা হইতে লাগিল। হজরৎ ইব্রাহিমও ইছমাইলের জন্য তথায় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

হজরৎ ইছমাইলের বয়স যখন দশ বৎসর তখন হজরৎ ইব্রাহিমের নিকট এত দৈবাদেশ হইল "ইব্রাহিম, তুমি কোরবাণী কর।" এই সময় উট দুম্বা, গরু প্রভৃতিই গৃহপালিত পশু ছিল। ইব্রাহিম, সকালে উঠিয়া ১০০ উট কোরবাণী করিলেন। পরবর্ত্তী রাত্রিতে স্বপ্ন যোগে আবার আদেশ হইল "ইব্রাহিম, কোরবাণী কর।" আল্লাহ তাঁহার কোরবাণী কবুল করেন নাই ভাবিয়া তাঁহার ভক্তি-প্রবণ হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে দিন আবার ১০০ উট কোরবাণী করিলেন। কিন্তু তৃতীয় রাত্রিতে আবার স্বপ্নাদেশ হইল, "ইব্রাহিম! তোমার প্রিয় বস্তুকে কোরবাণী কর।" ইব্রাহিম এই আদেশ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন,—ভাবিলেন, কি করিবেন?

মিশরের ন্যায় বাবিলন, মেসোপটেমিয়া, আসিরিয়া, কেনান প্রভৃতি স্থানেও দেবতাদের নিকট নরবলি দেওয়া হইত। পূর্ব্ব দুই দিনের কোরবাণী কবুল না হওয়ায় হজরৎ ইব্রাহিমও হয়ত ভাবিয়াছিলেন আল্লাহ বুঝি নরবলির জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন। সুতরাং তৃতীয় দিনে তিনি তাঁহার একমাত্র প্রিয়তম পুত্রকে কোরবাণী দিবার জন্য উদ্যত হইলেন। কিন্তু ইসলাম শান্তির ধর্ম্ম। জগতের যত কুসংস্কার, নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা, বর্ব্বরতা সব গুলিকে বিলীন করিয়া ধরার বুকে পূর্ণ শান্তি স্থাপনই ইস্‌লামের উদ্দেশ্য। তাই আল্লার ইচ্ছায় ইব্রাহিমের এই নরবলি সফল হইল না। বরং মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় মানুষের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মানুষের পরিবর্ত্তে পশু বলির ব্যবস্থা হইল। এখন হইতে ক্রমে নরবলির প্রথা তিরোহিত হইয়া পশু-বলির প্রথা প্রচলিত হইল। ফলতঃ হজরৎ ইব্রাহিমের কোরবাণী যুগপৎ অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ এবং নৃশংসতা পরিহারের মহা শিক্ষা। আল্লাহ ইব্রাহিমের অন্তরের অতুলনীয় ভক্তি দেখিয়া তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। একদিন দৈবাদেশ হইল, "ইব্রাহিম। আমি তোমাকে মানবজাতির অধিনায়ক করিব। যাহারা আমার গৃহ দর্শন করিতে আসিবে এবং যাহারা উপাসনার জন্য ইহার মধ্যে অবস্থান করিবে, যাহারা 'রুকু' এবং 'সেজদা' দিবে, তাহাদের জন্য তুমি ও ইছমাইল আমার ঘরকে পবিত্র কর।"

আদেশানুযায়ী যে-স্থানে হজরৎ আদম প্রথম কাবার ঘরের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। সেই পুরাতন ভিত্তির উপর নূতন করিয়া পিতাপুত্র কাবার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করিলেন।

হজরৎ ইব্রাহিমের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইছমাইল জননী হাজেরা সহ মক্কায় বাস করিতেন। তাঁহার বংশধরগণকে বনি-ইছমাইল বংশ বলা হয়। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র এছহাক্ জননী ছারা সহ কেনানে বাস করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র। কনিষ্ঠ পুত্র ইয়াকুবের অন্য নাম এছরাইল। এই এছরাইলের বংশে হজরৎ দাউদ, ছোলেমান, মুছা, ইছা প্রভৃতি পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করেন। হজরৎ মুছার অনুসৃত ধর্ম্মকে ইহুদী ধর্ম্ম এবং ইছার ধর্ম্মকে খৃষ্টান ধর্ম্ম বলা হয়। এতদ্ব্যতীত হজরৎ ইব্রাহিমের কতুরা নাম্নী আর এক স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণকে বনি কতুরা বা কতুরা বংশ বলা হয়। কতুরা বংশে কোন নবী জন্মগ্রহণ করেন নাই। এই কতুরা বংশীয়গণ হেজাজ হইতে পারস্যোপসাগর পর্য্যন্ত ভূভাগে বাস করিত।

হজরৎ ইব্রাহিম অত্যন্ত খোদা ভক্ত ছিলেন। এইজন্য তাঁহার অন্য নাম ছিল খলিলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লার বন্ধু। তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন বলিয়া তাঁহার অন্য নাম হানিফ (Hanif)। এই জন্য তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অন্য নাম হানাফী (Hanafi) ধর্ম্ম। তৎপ্রবর্ত্তিত হানাফী বা ইছলাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে হানাফী বা মোছলেম বা মোছলমান বলা হয়।

ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন ইছলামই জগতের আদি একেশ্বরবাদের অন্যতম ধর্ম্ম। তবে হজরৎ ইব্রাহিমের পূর্ব্বে সমাজের বা জাতির ধর্ম্মগত অবস্থা সমধিক উন্নত হয় নাই; হজরৎ ইব্রাহিমের সময় এই উন্নতি প্রণিধানযোগ্য হইয়াছে। এই নিমিত্ত তৎপ্রবর্ত্তিত আচার-ব্যবহার রীতি-পদ্ধতি আজিও ইস্‌লাম ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। ইস্‌লাম সৌধের পাঁচটী স্তম্ভ—কালেমা, নমাজ, রোজা, (Roza) হজ্জ ও জাকাৎ (Zakat)। এই পঞ্চবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে নমাজ, রোজা ও হজের প্রত্যেকটি বিধানের সহিত হজরৎ ইব্রাহিমের পুণ্য-স্মৃতি অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত রহিয়াছে। হজরৎ আদমের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ইস্‌লামের মূল নীতি অভিন্ন রহিয়াছে। হজরৎ ইব্রাহিমের সময় যুগোপযোগীভাবে উহার সংস্কার হইয়াছিল। তারপর অন্যান্য পয়গম্বরগণের সময় ও ইহার যুগোপযোগী সংস্কার হইয়াছে মাত্র। সর্ব্বশেষে বিশ্বনবী হজরৎ মোহাম্মদের সময় সমগ্র বিশ্বের উপযোগী করিয়া উহার পুনঃ সংস্কার হইয়াছে। মূলনীতি পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বস্তুতঃ **ইব্রাহিমই ইস্‌লামের প্রবর্ত্তক—আদি গুরু।** ইব্রাহিম সম্বন্ধে কোরান বলিতেছে—"যে ব্যক্তি ইব্রাহিমের ধর্ম্ম ত্যাগ করে সে নিতান্ত অজ্ঞ। নিশ্চয় আমরা ইহজগতে এবং পরজগতে তাহাকে

মনোনীত করিয়াছি। সে বাস্তবিক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত।"

"যখন আল্লাহ্ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আমার প্রতি নির্ভর কর—তখন তিনি বলিয়াছিলেন "আমি বিশ্বজগতের মালিকের উপর নির্ভর করিলাম।" "তিনিও তৎপৌত্র ইয়াকুব তাঁহাদের সন্তানদিগকে বলিয়াছিলেন, 'হে আমার পুত্রগণ! যে পর্য্যন্ত তোমরা মোছলমান না হও সে পর্য্যন্ত মরিও না।'' "তোমরা বল আমরা সাধু ইব্রাহিমের ধর্ম্ম পালন করি। তিনি নিশ্চয় বহুত্ববাদী (পৌত্তলিক) ছিলেন না। হে মোছলমানগণ বল "আমরা এক আল্লার প্রতি এবং যাহা আমাদের কাছে নাজেল (Nazel) হইয়াছে এবং যাহা ইব্রাহিমের কাছে নাজেল হইয়াছিল তাহার প্রতি বিশ্বাস করি।'' "তোমরা কি মনে করিয়াছ, ইব্রাহিম, ইছমাইল ইছহাক্ (Ishaque) ইয়াকুব ও তাঁহাদের বংশধরগণ ইহুদী অথবা খৃষ্টান ছিলেন? তোমরাই ভাল জান, না, আল্লাই ভাল জানেন? ইব্রাহিম, ইহুদীও ছিলেন না খৃষ্টানও ছিলেন না; বরং তিনি একজন ন্যায়বান মোছলমান ছিলেন।''

হজরৎ ইব্রাহিম এইরূপে ইস্‌লামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৭৫ বৎসর বয়সে স্বর্গবাসী হন। তাঁহার দেহ বেথেলহেমের বারো মাইল পূর্ব্বদিকে খলিলুর-রহমান নামক স্থানে সমাহিত করা হয়। খলিলুর-রহমানের অন্য নাম হিব্রন। আজিও হিব্রন বিশ্বের ধর্ম্মগুরু পুণ্যাত্মা ইব্রাহিমের স্মৃতি সগৌরবে বক্ষে ধারণ করিতেছে।

হজরৎ মূছা

হজরৎ নূহের পুত্র হাম ও শামের বংশধরগণ বহুযুগ ধরিয়া মিশরে বাস করিয়া আসিতেছিল। ইহাদিগকে 'কিবতী' বলা হইত। তারপর বহুদিন অতীত হইলে হজরৎ ইউছুফ আলৌকিক ভাবে তথায় গিয়া প্রাধান্য লাভ করেন। এবং ক্রমে তাঁহার পিতাও ভাইগণ তথায় বাস করিতে থাকেন। ইহাদের বংশধরগণকেই বনি ইছরাইল বলা হয় এই বনি এছরাইল বংশ মিশরে ৫০০ বৎসর ধরিয়া বাস করিয়াছিল।

কিবতীরা হজরৎ নূহের শিক্ষা ভুলিয়া আবার পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। তখন মিশরের পার্থিব উন্নতি যথেষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু নৈতিক চরিত্রে তাহারা একেবারে হীন হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় হজরৎ ইউছুফ মিশরে গিয়া কিবতীদের মধ্যে ইছলাম প্রচার করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হয় নাই বলিয়া মনে হয়; তবে তাঁহার কল্যাণে ইছরাইল বংশীয়-গণ তথায় স্থান লাভ করিয়াছিল। ইছরাইল বংশীয়গণ ছিল ইছলামের অনুগামী; আর কিবতীরা ছিল তাহার বিপরীত। সুতরাং দুই জাতির মধ্যে আদৌ মিল ছিল না। হজরৎ ইউছুফ যতদিন মিশরে ছিলেন ততদিন ইছরাইল বংশীয়গণের উপর কিবতীরা কোন অত্যাচার করিতে পারে নাই। তাঁহার ন্যায়ের ছত্রতলে উভয় জাতিই সমান অধিকার লাভ করিত; সমান সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিবার সুযোগ পাইত। কিন্তু ইউছুফের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যখন ইছলামের ন্যায়দণ্ড ধূলায় লুটিয়া পড়িল তখন কিবতীরা ইছরাইল বংশীয়গণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল। ইছরাইল বংশীয়গণ একে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় তাঁহার উপর রাজসহায়তায় বঞ্চিত; সুতরাং তখনকার অরাজকতার দিনে তাহাদের অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

কিবতীরা জেদ করিয়াই ইছরাইল বংশীয়গণের বিরুদ্ধাচরণ করিত। তাহারা এক আল্লার উপাসনাত করিতই না বরং এক আল্লার উপাসনা করার জন্য ইছরাইল বংশীয়গণকে নানা প্রকার তিরস্কার, লাঞ্ছনা এমন কি উৎপীড়ন পর্য্যন্ত করিত। ফেরাউন দ্বিতীয় র‍্যামেসিস তখন মিশরের সম্রাট। কিবতীরা তাঁহাকেই ঈশ্বর বলিয়া মানিত। ফেরাউনও নমরুদের ন্যায় নিজে ঈশ্বরত্বের দাবী করিতেন। বনি ইছরাইলগণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিত না বলিয়া তিনি তাহাদিগকে রাজদ্রোহী মনে করিতেন এবং তজ্জন্য এই সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের উপর কোন প্রকার অত্যাচার অবিচারের ক্রটী করিতেন না। এমন কি তিনি আদেশ প্রচার করিলেন, যাহাতে বনি ইছরাইলগণের বংশবৃদ্ধি হইতে না পারে তজ্জন্য তাহাদের সমস্ত পুত্র সন্তানকে হত্যা করিয়া ফেলিতে হইবে।

স্বর্ণমান

প্রত্যেক সভ্য সমাজেই নানারকম মূল্যের নানারকম মুদ্রার চলন দেখা যায়। এই সব বিবিধ মুদ্রার পরস্পরের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আইনতঃ স্থির করিয়া দেওয়া হয়। সরকার নিয়ন্ত্রিত কোন দেশের মুদ্রার পরস্পরের মধ্যে এই যে সম্বন্ধ, ইহাকে সেই দেশের "সিক্কা ব্যবস্থা" বা "কারেন্সী সিষ্টেম্" বলে। দেশ অনুসারে সিক্কা-ব্যবস্থা বিভিন্ন হইয়া থাকে। প্রধানতঃ "স্বর্ণ-মান"ই চলিয়া থাকে। সুতরাং স্বর্ণমান বলিলে কি বোঝায় তাহাই দেখা যাক্।

কোন দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত আছে বলিলে বুঝিতে হইবে যে, দাবী করিবামাত্রই আইনতঃ স্থিরীকৃত একটা নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে দেশের চলতি টাকা কড়িকে সোণায় বা স্বর্ণ-সত্বে পরিণত করা যায়; অধিকন্তু, দেশের মধ্যে সোণাকে অবাধে আমদানী-রপ্তানী হইতে দেওয়া হইয়া থাকে। তিন প্রকারের স্বর্ণ-মানের প্রচলন দেখা যায়—

(ক) **পূর্ণ স্বর্ণমান**—কোন দেশে 'পূর্ণ' স্বর্ণমান প্রচলিত বলিলে বুঝিতে হইবে যে—

(১) আইনতঃ নির্দ্দিষ্ট ওজন ও বিশুদ্ধি বিশিষ্ট (of a standard weight and fineness) স্বর্ণমুদ্রা অবাধে দেশের মধ্যে চলিয়া থাকে এবং সেই মুদ্রাগুলি 'অপরিমিত চলৎ-সিক্কা' হইয়া থাকে অর্থাৎ ঐ মুদ্রা দ্বারা যদি ঋণ পরিশোধ করা যায়—সে ঋণ যত অধিক পরিমাণেরই হউক না কেন—তাহা গ্রহণ করিতে ঋণদাতা অস্বীকার করিতে পারেন না এবং করিলে দেশের আইন অনুযায়ী তিনি দণ্ডনীয় হইবেন (ইহাকেই অপরিমিত 'চলৎ-সিক্কা' বা 'লিগ্যাল টেণ্ডার' বলে)। এই মুদ্রাগুলি যথেচ্ছা পরিমাণে রপ্তানী করিবারও কোন বাধা নাই।

(২) ঐ দেশের টাঁকশাল দাবী অনুযায়ী আইনতঃ নির্দ্দিষ্ট দরে সোণা কেনা-বেচা করিয়া থাকেন।

(৩) দাবী করিবামাত্র ব্যাঙ্ক-নোটের বদলে সোণা দেওয়া হয়।

(৪) কোনরূপ প্রতিভূ জমা না রাখিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের নোট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছাড়িতে পারে—ইহাকে 'ফিডুসিয়ারী ইস্যু' বলে। এই ফিডুসিয়ারী ইস্যুর অধিক নোট ছাড়িবার দরকার হইলে পূরা মাত্রায় সোণা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে জমা রাখিতে হয়। ইংলণ্ডে এই ব্যবস্থা আছে। আবার ফ্রান্স ও অন্যান্য ইউরোপীয় অনেক দেশে যে-পরিমাণ নোট ব্যাঙ্ক ছাড়িতে চায়, তাহার একটা শতকরা অংশের অনুরূপ সোণা জমা রাখিতে হয়।

ইউরোপীয় মহা-সমরের পূর্ব্বে গ্রেটবৃটেনে পূর্ণ স্বর্ণমান (Full Gold Standard) প্রচলিত ছিল। এখন কোন দেশেই নাই।

(খ) **স্বর্ণ-তাল মান**—কোন দেশে স্বর্ণতালমান (Gold Bullion Standard) প্রচলিত বলিলে বুঝিতে হইবে যে—

(১) দেশের আভ্যন্তরিক সিক্কা হইল কাগজী মুদ্রা এবং এই কাগজী মুদ্রাকে সোণায় পরিণত করা যায়, যদি নাকি তাহার পরিমাণ একটা নির্দ্দিষ্ট ন্যূনতম মাত্রায় অধিক হয় (convertible into gold only amounts over a stated minimum.)

(২) নির্দ্দিষ্ট ন্যূনতম পরিমাণের অধিক দাবী করিলেই টাঁকশাল, আইনতঃ নির্দ্দিষ্ট দরে, স্বর্ণতাল বিক্রয় করিয়া থাকে। সাধারণতঃ যে-কোন পরিমাণ সোণা বিক্রয়ার্থ টাঁকশালে উপস্থিত করা হয়, সেই সমস্তটাই আইনতঃ নির্দ্দিষ্ট দরে ক্রয় করিতে টাঁকশাল বাধ্য হয়। ইংল্যাণ্ডে ১৯২৫-শের গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড অ্যাক্টের বলে, ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ড ন্যূনপক্ষে ৪০০ আউন্স সোণার তাল আউন্স প্রতি ৪ পাঃ ৪ শিঃ ১১½ পেঃ দরে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ দেখা যাইতেছে যে অন্ততঃ মোটামুটি ১৭০০ পাউণ্ড জমা না দিলে ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডকে সোণা বিক্রয় করিতে বাধ্য করা যায় না।

(৩) উপরোক্ত দাবী মিটানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে 'গোল্ড-রিজার্ভ বা "স্বর্ণ-তহবিল" রাখা আবশ্যক।

(৪) যতটা পরিমাণ কাগজী মুদ্রা ছাড়া হয়, তাহার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পূরা মাত্রায় সোণা জমা রাখে।

'গোল্ড বুলিয়ান্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা 'স্বর্ণতাল মান' এর সুবিধা এই যে আভ্যন্তরীণ লেন-দেনে সোণা ব্যবহার না হওয়ায় সোনার চাহিদা কিছু কমে। ১৯২৫ থেকে ১৯৩১ পর্য্যন্ত গ্রেটবৃটেনের ছিল 'স্বর্ণতাল মান।'

স্বর্ণ বিনিময় মানঃ—যে-দেশে স্বর্ণবিনিময় মান প্রচলিত সে-দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সোণা পাইবার স্বত্ব অর্থাৎ রিজার্ভটা রাখে সেই সব দেশে যেখানে স্বর্ণমান প্রচলিত। সোণার তৈরী টাকা বাজারে চলে না ; চলিলেও পরিমাণ হিসাবে ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়—দেশের আভ্যন্তরিক লেন-দেনের জন্য ধাতু বা কাগজী মুদ্রা চলে। যে টাকাটা বাজারে চলে তাহা ভাঙ্গাইয়া তাহার বদলে একটা নির্দ্দিষ্ট দরে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সোণার তাল দিতে বাধ্য। বিদেশে টাকা পাঠাইতে হইলে লোকে দেশী টাকাটা সোণার টাকায় ভাঙ্গাইয়া লয়—বিনিময়ের হারটা নির্দ্দিষ্ট থাকে। এই নির্দ্দিষ্ট হারে টাকা ভাঙ্গাইবার কাজ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক করিয়া থাকে। ভারতে যে মুদ্রা-নীতি চলিতেছে তাহা এই পর্য্যায়ভুক্ত। এই মুদ্রানীতিকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যায়—বহির্বাণিজ্যের দেনা শুধিবার জন্য সোণার রেওয়াজ ; আর ঘরোয়া কাজে সোণার সঙ্গে অসহযোগ।

মিণ্ট্ পার :—চল্‌তি মুদ্রার খাঁটি ধাতুর পরিমাণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হইয়া থাকে। বিদেশের সহিত কারবার চালাইতে হইলে ঐ দেশের আদর্শ মুদ্রা ও এদেশের আদর্শ-মুদ্রার খাঁটি ধাতুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এক দেশের মুদ্রাকে অন্যদেশের মুদ্রায় ব্যক্ত করিতে হয়। ইহাকেই 'মিণ্টপার অফ্ এক্সচেঞ্জ' কহে। লণ্ডন-প্যারিসের 'মিণ্টপার অফ্ এক্সচেঞ্জ' হইল ২৫·২২১৫ ফ্রাঁ ; ইহার অর্থ এই যে, একটা পাউণ্ডে যে-পরিমাণ সোণা আছে, ২৫·২২১৫ ফ্রাঁতেও সেই পরিমাণ সোণা আছে। $\frac{9}{10}$ অংশ বিশুদ্ধতা বিশুদ্ধ ($\frac{9}{10}$ ফাইন্) এক কিলোগ্রাম পরিমাণ সোণা হইতে পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে ২৭৯০ রিশ্‌মার্ক তৈয়ারী হইত, আর একটা ব্রিটিশ সভারিণে থাকিত ৭৯·৮৮০৫ গ্রাম সোণা $\frac{11}{12}$ অংশ বিশুদ্ধ বা $\frac{11}{12}$ th. fine)। এখন চেনরুলের সাহায্যে জার্ম্মাণী ও গ্রেটবৃটেনের 'মিণ্টপার' সহজেই বাহির করা যায় এবং তাহা হইল ২০·৪২৯। ইহার অর্থ ১টা রিশ্‌মার্কে যতটা পরিমাণ খাঁটি সোণা আছে, ১ পাউণ্ডে তাহার ২০·৪২৯ গুণ বেশী খাঁটী সোণা আছে। দুইটী দেশের আদর্শ-মুদ্রা যদি বিভিন্ন ধাতু নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে 'মিণ্টপার অফ্ এক্সচেঞ্জ' স্থির করা যায় না—যেমন ইংল্যাণ্ড ও চীন। ইংল্যাণ্ডের আদর্শ-মুদ্রা স্বর্ণ-নির্ম্মিত আর চীনদেশের আদর্শ-

মুদ্রা রৌপ্য-নির্ম্মিত। সোণার তুলনায় রূপার দর বড় বেশী ওঠা নামা করে। তাই এই দুইটী ধাতুর মধ্যে আনুপাতিক সম্বন্ধ স্থির করা দুরূহ।

স্বর্ণ বিন্দু :—ধরা যাক্ একজন বার্লিনবাসী, একজন লণ্ডনবাসীর কাছে ১০০০ পাউণ্ড ধারে; এখন এই দেনা মিটাইবার সবচেয়ে সোজা উপায় কি? যদি সোণা পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে তাহার বহনী খরচাও (ফ্রেট) দিতে হইবে এবং সেজন্য কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যদি সে এমন্ একজনকে পায় যে লণ্ডনবাসী কোন ব্যক্তির নিকট ১০০০ পাউণ্ড পাইবে, তবে তাহার সহিত দেনা-পাওনা হাত-ফের করিয়াই সে সহজেই স্বীয় দেনা মিটাইতে পারে। আর একটা উদাহরণ লওয়া যাক্। ধরা যাক্ জন লকে লণ্ডনে বসিয়া প্যারিসের পিয়ারে রশারের কাছ হইতে ১০০ পাউণ্ড মূল্যের সিল্ক খরিদ করিয়াছে; রশার তার পাওনা ফ্রাঁ ও সঁ্যাতিম-এ মিটাইয়া লইতে চাহিবে, পাঃ-শিঃ-পে-এ নয়। জন লকে জানে যে, ফ্রান্সে আইনতঃ ১পাউণ্ড=২৫·২২১৫ ফ্রাঁ। সুতরাং সে যদি (২৫·২২১৫×১০০) দর দিয়া একটা বিল কিনিয়া রশারকে পাঠায় তাহা হইলেই দেনা মিটিয়া যায়। গোটা দেশে কে কোথায় মাল রপ্তানী করিতেছে, আমদানী কারকের পক্ষে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব নয়। রপ্তানীকারকও জানে না যে, দেশে কোথায় কোন্ আমদানীকারক অন্যত্র টাকা পাঠাইবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে। এই অসুবিধা মিটাইতেছে ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের খবর ও ঠিকানা উভয়েই জানে। ব্যাঙ্ক রপ্তানীকারের কাছ হইতে বিল্ কিনিয়া আমদানীকারককে বিক্রয় করে। ব্যাঙ্ক বিল বা হুণ্ডী ভাঙ্গাইবার সুবিধা করিয়া দিয়া ক্রেডিটের চলাচল বাড়াইয়া দেয়। ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিল্ বা হুণ্ডী এত অধিক চলে যে, সে বিষয়ে কিছু জানা আবশ্যক। **হুণ্ডী বা বিল্ অফ্ এক্সচেঞ্জ** একটা আদেশ পত্র মাত্র। কোন ঋণ বা ঋণ স্বীকারকে আশ্রয় করিয়াই হুণ্ডী দেওয়া হয়। প্রত্যেক আদেশ পত্রে তিন পক্ষ বর্ত্তমান—আদিষ্টা, আদেষ্টা ও প্রাপক। পত্রের মোসাবিদায় আদেষ্টা, আদিষ্টকে এই সূত্রে আদেশ দিয়া থাকে যে আদেশপত্র দেখাইবার পর নির্দ্দিষ্ট তারিখে আদেষ্টার উল্লিখিত প্রাপককে নির্দ্দেশ অনুযায়ী নির্দ্ধারিত পরিমাণ টাকা দিয়া দেয়। আইনের চোখে ইহার অর্থ এই যে, মহাজন তাঁহার পাওনা টাকা তৃতীয় এক ব্যক্তিকে হস্তান্তরিত করিতেছেন। এই বিল বা হুণ্ডীর পশ্চাৎদিকে খাতক দস্তখত করিয়া দিলেই তাহা সম্পূর্ণ হইয়া গেল। সাধারণতঃ প্রাপকের স্থানে তৃতীয় ব্যক্তির নাম লিখিয়া আদেষ্টা নিজের নামই লিখিয়া থাকেন। ইংরাজী বিল্ অফ্ এক্সচেঞ্জের বাংলা অনুবাদ নীচে দিলাম :—

১,০০০ পাউণ্ড লণ্ডন
[টিকিট] ১লা মার্চ্চ, ১৯৩৭

অদ্য তারিখ হইতে তিনমাস কাল পরে আমাকে (বা আমার আদেশ অনুযায়ী অপর কাহাকেও) এক হাজার পাউণ্ড অর্পণ করিবে।

(স্বাক্ষর) সি, বেল্

ই, এম, জনসন্ সমীপেষু।

এখন যদি মিঃ বেল্ (আদেষ্টা) ব্যাঙ্কে এই বিলটী ভাঙ্গাইতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাকে ঐ বিলটীর পশ্চাৎদেশে দস্তখত করিয়া দিতে হইবে।

রেট অফ্ এক্সচেঞ্জ বা বিনিময়ের বাজার চলতি হার বলিলে এবং-বিধ বিলের দর বুঝায় এবং বিলের দর অন্যান্য পণ্যের মত টান-যোগানের উপর নির্ভর করে। চাহিদার তুলনায় যোগান অধিক হইলে বিশেষ দর পড়িয়া যায়, আর বিল যদি অপ্রতুল হয় তবে দর চড়িয়া যায়। বিলের দর চড়া বা সস্তা হইলেও একটা সীমা আছে যাহার অধিক চড়া বা সস্তা হইতে পারে না। বিলের দর যদি এই সীমা লঙ্ঘন করে তবে মুদ্রা প্রেরণ করাই সুবিধা ও লাভজনক হইয়া পড়ে। এই সীমাকে 'স্বর্ণ বিন্দু' বা "গোল্ড্ পয়েন্ট" বলে। মনে করা যাক্ যে ফ্রান্সের এক বণিককে লণ্ডনে ১০০০ পাউণ্ড পাঠাইতে হইবে; সেই বণিককে নগদ টাকাকড়ি জাহাজ বোঝাই করিয়া পাঠাইতে হইলে একটা প্রেরণ খরচা (মাশুল, বীমা ইত্যাদি) দিতে হইবে; এখন যদি সে, লণ্ডনে উশুলী দেয় একটা ১০০০ পাউণ্ডের বিল্ পায়, এবং ঐ বিলটী

কিনিতে ১০০০ পাউণ্ডের অধিক সে সামান্য টাকা বেশী দিতে হইতেছে, তাহা সহস্র পাউণ্ডের প্রেরণ খরচা অপেক্ষা অল্প হয়, তবে সেই বণিক বিল কিনিয়াই দেনা উশুল দিবে। মিণ্ট পার অফ্ এক্সচেঞ্জের সহিত প্রেরণ খরচা যোগ বা বাদ দিয়া 'স্বর্ণবিন্দু' নির্ণয় করিতে হয়। লণ্ডন-প্যারিস প্রেরণ খরচা হইতেছে ১০ সঁ্যাতিম্; অতএব—

মিণ্ট পার প্রেরণ খরচা
ফ্রাঁ ২৫·২২—১০ সঁ্যাতিম=২৫·১২ ফ্রাঁ—স্বর্ণবিন্দু
ফ্রাঁ ২৫·২২+১০ সঁ্যাতিম=২৫·৩২ ফ্রাঁ—স্বর্ণবিন্দু

অর্থাৎ লণ্ডন প্যারিসের বিনিময়ের বাজার চলতি হার সাধারণতঃ ২৫·১২ ফ্রাঁ অপেক্ষা নামিতে পারে না ২৫·৩২ ফ্রাঁ অপেক্ষা বাড়িতে পারে না। কেন না যদি বিলের দর ২৫·১২ ফ্রাঁ অপেক্ষা নীচে নামিয়া যায় তাহা হইলে বিল না পাঠাইয়া ২৫·২২ ফ্রাঁ মুদ্রা রপ্তানী করাই লাভজনক হইবে। দেখা যাইতেছে যে দুইটী দেশের মধ্যে দুইটী স্বর্ণবিন্দু পাওয়া যায়—ইহার একটীকে রপ্তানী স্বর্ণ-বিন্দু (Gold Export Point) এবং আর একটীকে আমদানী স্বর্ণবিন্দু (Gold Import Point) কহে। একটা দেশের 'আমদানী বিন্দু' দ্বিতীয় দেশটীর 'রপ্তানী বিন্দু'।

বিনিময়হার দুইভাবে ব্যক্ত করা হয়—স্বদেশী সিক্কায়, নয় বিদেশের সিক্কায় অর্থাৎ বিদেশের চলতি টাকার বদলে কত স্বদেশের মুদ্রা পাওয়া যায় বা স্বদেশের আদর্শ মুদ্রার বদলে কত বিদেশী টাকা পাওয়া যায়। যদি বিনিময়-হার, বিদেশী টাকায় ব্যক্ত করা হয় এবং বিনিময়-হার চড়িয়া যায়, তাহা হইলে ঐ হার স্বদেশের পক্ষে অনুকূল আর পড়িয়া গেলে স্বদেশের পক্ষে প্রতিকূল। ধরা যাক্ এক ব্যক্তিকে লণ্ডন হইতে ১০০ পাউণ্ড ফ্রান্সে পাঠা-ইতে হইবে। এক পাউণ্ডের মিন্টপার মূল্য ২৫·২২; সুতরাং ১০০ পাউণ্ড ফ্রান্সে পাঠানর অর্থ ২৫·২২ ফ্রাঁ (২৫·২২×১০০) পাঠান। ধর বিনিময় হার দাঁড়াইয়াছে ২৫·১৫ অর্থাৎ ১ পাউণ্ডের বদলে ২৫·১৫ ফ্রাঁ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং ১০০ পাউণ্ডের বদলে ২৫·১৫ ফ্রাঁ (২৫·১৫×১০০) পাওয়া যাইবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে ত' ২৫·২২ ফ্রাঁ মোট পাঠাইতে হইবে। সুতরাং ঐ ২৫·২২ ফ্রাঁ (১০০ পাউণ্ড) পাঠাইতে হইলে, চলতি হার হিসাবে তাহাকে ১০০ পাউণ্ড অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দিতে হইবে, যেহেতু চলতি হার হিসাবে ১০০ পাউণ্ড=২৫·১৫ ফ্রাঁ। সুতরাং এই পড়তি হারটা দেনাদার হিসাবে তাহার প্রতিকূল।

দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে দেখিতে হইবে যে স্বর্ণ তহবিল যেন পুরাপুরি থাকে। তহবিলে কতটা পরিমাণ সোণা মজুত থাকিলে আশঙ্কার কোন কারণ নাই তাহা অভিজ্ঞতা হইতেই বোঝা যায়। আবার অত্যধিক পরিমাণে সোণা তহবিলে জমিলে দেশের মধ্যে অর্থের অনটন দেখা দেয়। ফলে জিনিষ পত্রের দর পড়িয়া যায়; কিছুটা সুদও মারা যায়। এবং এক দেশের তহ-বিলে অনুৎপাদক ভাবে বেশী সোণা পড়িয়া থাকিলে অপর যে-সব দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত, তাহাদেরও সোণার টান ধরে এবং একটা সার্ব্বভৌমিক মন্দা দেখা দেয়।

বিভিন্ন দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকার সময় যদি সাধারণ দরের মাত্রা (General Level of Prices) কোন একটী দেশে চড়িয়া যায়, তাহা হইলে প্রথমচোটে সেই দেশের আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। এবং এই আমদানী পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য বিভিন্ন দেশের সিক্কার চাহিদা বাড়িয়া যাইবে। বিদেশে টাকা পাঠাইবার এই ঝোঁকের ফলে যদি বিনিময় হার স্বর্ণ রপ্তানী বিন্দু (Export Gold Point) পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠে, তাহা হইলে দেশ হইতে স্বর্ণ রপ্তানী হইয়া যাইবে। টাকার পরিমাণ বাদের কথা এখন যদি স্মরণ কর তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, স্বর্ণ এইভাবে দেশ হইতে রপ্তানী হইয়া গেলে পণ্যের দর পড়িয়া যাইবে। এবং পণ্যের দর পড়িয়া গেলে আম-দানীর পরিমাণ কম হইবে ও রপ্তানী বাড়িবার সম্ভাবনা দেখা যাইবে। ফলে বিনিময়-হার আবার সমতায় ফিরিয়া আসিবে। সুতরাং বুঝিতেছ যে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে, অন্য কোন বিষয়ে বিপর্য্যয় না ঘটিলে (Other things being equal) স্বর্ণমান-প্রচলিত দেশ-সমূহে দরের মাত্রা একই রূপ থাকিবার সম্ভাবনা (tends to equi-librium। ইহাকেই ধনবিজ্ঞানের পারিভাষিকে

বলে—Equalising Effect of the Gold Standard.

উপরের আলোচনা হইতে বুঝিবে যে কোন দেশ তাহার স্বর্ণ তহবিল সংরক্ষণ করিতে চাহিলে বিনিময় হারকে স্বর্ণ বিন্দুর উপরে রাখিতে হইবে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের কালে কি ভাবে বিনিময় হার ওঠা-নামা করে তাহা দেখিয়াছি। বিনিময় হারের উপর ব্যাঙ্কের ক্রেডিট্ পত্র, আর্বিট্রেজ অপারেশন, ষ্টক এক্সচেঞ্জ, বৈদেশিক ঋণ ও চলং সিক্কা প্রভৃতির ও প্রভাব আছে। এই সব নানা কারণে অনেক সময়ে Equalising Effect of the Gold Standard খুব কার্য্যকরী হয় না; তখন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

এই কৃত্রিম উপায় হইতেছে বিল ভাঙ্গানর হার বা "ব্যাঙ্ক রেট্" নিয়ন্ত্রিত করা। বহির্বাণিজ্যের নানা কাজ চালাইবার জন্য বিশেষ এক প্রকার ব্যাঙ্ক আছে। বিদেশে মাল পাঠাইবার কয়েকমাস পরে রপ্তানীকার টাকা পায়। কিন্তু রপ্তানীকার ততদিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে না, ফ্যাক্টরী আড়ত বা বন্দর হইতে মাল ছাড়িবামাত্রই হাতে হাতে টাকা চায়, যেহেতু তাহা না হইলে তাহাদের পক্ষে ফ্যাক্টরী চালান সুকঠিন। ব্যাঙ্ক, বেপারীদের নিকট 'বাণিজ্য কাগজ' লইয়া মালের বন্ধকীতে টাকা আগাম দেয়। ব্যাঙ্কের এই সকল 'বাণিজ্য কাগজ' কেনাকে **বিল ভাঙ্গান** বা "ডিস্কাউন্টিং" বলে। মালের রসিদ পত্র দেখিয়া টাকা আগাম দিবার সময় ব্যাঙ্ক রপ্তানীকারের নিকট হইতে বাট্টা আদায় করিয়া লয়। বিল বেচিতে গেলে ব্যাঙ্ককে যে বাট্টা দিতে হয় তাহাকে 'ব্যাঙ্ক রেট' বলে।

বাট্টার হারের ওঠা-নামার উপর একদেশ হইতে আর একদেশে সোণা রূপা যাতায়াত করে। বার্লিনে বসিয়া যদি দেখা যায় যে লণ্ডন কি নিউ-ইয়র্কে বাট্টার হার ৬% পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, অথচ বার্লিনে বাট্টার হার ৪% রহিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, হাতে সোণা থাকিলে লণ্ডন বা নিউইয়র্কে খাটাইয়া বেশী মুনাফা করা যায়। অর্থাৎ বুঝিতে হইবে যে চাহিদার তুলনায় বার্লিনে অপর দুইটী সহর অপেক্ষা অধিক সোণা আছে। যোগানের অপ্রতুলতার জন্যই লণ্ডন বা নিউইয়র্কে সোণার দর বাড়িয়াছে। তাই বার্লিন হইতে সোণা রপ্তানী হইয়া আসিয়া যোগানের এই অপ্রতুলতা দূর করিবে। টান-যোগানের এই নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া ব্যাঙ্ক বাট্টার হার বাড়াইয়া তহবিলের সোণার পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রাখে। কোন একস্থান বায়ু শূন্য হইলে যেমন চতুর্দ্দিকের বাতাস ছুটিয়া আসিয়া সেই স্থান পূর্ণ করে—তেমনি যেদেশে বাট্টার হার চড়া হয় সেই দেশে অন্যান্য দেশ হইতে সোণা আমদানী হইয়া সোণার টান-যোগানের মধ্যে সমতা দেখা দেয়। তেমনি যদি দেখা যায় যে অত্যধিক পরিমাণে সোণা দেশের মধ্যে মজুত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইলে বাট্টার হার কমাইয়া দিলে সোণা রপ্তানী হইয়া গিয়া সমতা ফিরিয়া আসিবে।

লণ্ডনের টাকার বাজারের একটু বিশেষত্ব আছে। ইউরোপীয় মহাদেশের ব্যাঙ্ক পরিচালকরা লণ্ডন বিলে টাকা খাটাইতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। ব্যাঙ্করেট বা বাট্টার সামান্য ওঠা-নামার উপর এইসব বিদেশী ব্যাঙ্কারদের লণ্ডন বিলের কেনা-বেচা নির্ভর করে এবং তার ফলে বিনিময়হার ও বাড়ে-কমে, তথা, সোণার তহবিলও শূন্য হয় বা ভরিয়া ওঠে।

সাধারণ ক্ষেত্রে ঠিক এই রকমই হইয়া থাকে কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাদেশিকতা (ইকনমিক্ ন্যাশনালিজম্), যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, স্বর্ণ সঞ্চয় প্রভৃতি কারণে ঠিক্ এরূপটী হয় নাই।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ব্যাঙ্ক চার্টার অ্যাক্ট অনুসারে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ডকে আউন্স প্রতি ৩ পাঃ ১৭ শিঃ ৯ পেঃ দরে ষ্ট্যাণ্ডার্ড সোণা ক্রয় করিতে বাধ্য করা হয় এবং সোণা বিক্রয় করে আউন্স প্রতি ৩ পাঃ ১৭ শিঃ ১০½ পেঃ হারে। ব্যাঙ্ক যে নোট ছাড়িত তাহার বদলে দাবী করিলেই নগদ মুদ্রা দিতে ব্যাঙ্ক বাধ্য ছিল; এই নোটগুলি চলৎ-সিক্কা মুদ্রা বা লিগ্যাল্ টেণ্ডার। সুতরাং গ্রেটবৃটেনে পূর্ণ স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল বলা যায়।

বহুকাল ধরিয়া সারা পৃথিবীতে একমাত্র লণ্ডনই ছিল সোণার অবাধ বাজার (Free gold market); অধিকন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যেও

গ্রেটবৃটেনে ছিল সর্ব্ব প্রধান। তাই চতুর্দ্দিক হইতে বাড়তি সোনা লণ্ডন বুলিয়ান্ বাজারে আসিয়া জমা হইত। ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ড বাট্টার হারের ওঠা-নামা করিয়া সোণার আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত করিতেন; এইভাবে স্বর্ণমান আপনা হইতেই নিয়ন্ত্রিত হইত।

স্বর্ণমান সুষ্ঠুভাবে চলিলেও, স্বর্ণমান প্রচলিত থাকার জন্যই ব্যবসায়-বাণিজ্যে কিছু গণ্ডগোল দেখা দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে উৎপাদন বিপর্য্যয় ভাবে বাড়িয়া যায়, কিন্তু চাহিদানুযায়ী সোণার উৎপাদন সব সময় বাড়ে নাই। ইহা বেশ ভাল ভাবেই লক্ষ্য করা যায় ১৮৫০-১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে, যখন স্বর্ণখনি আবিষ্কারের ফলে বাণিজ্য বিপুলভাবে ফুলিয়া ওঠে। তাহার পরের কয়েকটী বৎসর (১৮৯৬ পর্য্যন্ত) সোণার যোগানের তুলনায় পণ্যউৎপাদন অধিক হয়; অধিকন্তু নূতন কয়েকটা দেশ স্বর্ণমান গ্রহণ করায় সোণার চাহিদা আরও বাড়িয়া যায়; ফলে পণ্যের দর ভয়ানক নামিয়া যায় এবং বাণিজ্যের বহরও কমে। আবার ১৮৯৬ খৃঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় সোণারখনি আবিষ্কৃত হয়, টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায় ও পণ্যের দর চড়িয়া গিয়া সমৃদ্ধির সূচনা করে।

স্বর্ণমান প্রচলিত থাকার ফলে, টাকার পরিমাণ নির্ভর করিয়াছে সোণার যোগানের উপর; বাণিজ্যিক টান অনুসারে টাকার যোগান নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। সোণার যোগান বাড়িয়া যাওয়ার ফলে উৎপাদন বাড়িতে থাকে এবং 'বুম' (boom) দেখা দেয়। কিন্তু তাহা বলিয়া সাধারণের পক্ষে তাহা বিশেষ মঙ্গলজনক হয় নাই, কেননা সাধারণ দরের মাত্রা বাড়িয়া যায় (general price level increased)। যখন সাধারণ দরের মাত্রা কম ছিল, তখন অপ্রতুল সোণার যোগান হেতু, লোকের বিশেষ সুবিধা হয় নাই, কারণ কাজ ছিল কম, মজুরী ছিল অল্প, মুনাফাও যৎসামান্য, তাই, ক্রয় শক্তি নিম্ন পর্য্যায়ের।

গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেকার এই হইল স্বর্ণমানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। যুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ড স্বর্ণমান ত্যাগ করে, কিন্তু বিদেশ হইতে যে-সব মাল ক্রয় করে, তাহার পাওনা মিটাইতে হয় সোণা দিয়া। যুদ্ধে ইংরাজরা জয়লাভ করায় একটা সাড়া পড়িয়া যায় ও 'বুম্' দেখা দেয়; তারপরই আসিল মন্দা। তখন অর্থনৈতিক সংস্কারের চেষ্টা চলিতে থাকে; ফলে ক্রেডিট্ সঙ্কুচিত হইয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য চালান দুরূহ হইয়া পড়ে, কিন্তু বিনিময় হারের পক্ষে তাহা মঙ্গলকর হয়; ১৯১৯ সালের পর যুক্তরাষ্ট্রের বিনিময়হার ৩·২০ পর্য্যন্ত নামিয়া যায়, কিন্তু এই সিক্কা নিয়ন্ত্রণের ফলে ১৯২৩ খৃঃ অঃ তাহা ৪·৭০ পর্য্যন্ত উঠে। ১৯২৫শে ইংল্যাণ্ড আবার স্বর্ণমান গ্রহণ করে—যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বিনিময়হার তখন ৪·৮৬৬৫ করা হয়; যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহাই ছিল হার।

১৯২৫শের গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড অ্যাক্ট অনুসারে গ্রেটবৃটেন সোণার রপ্তানীর সকল বাধা উঠাইয়া দেন। ঐ অ্যাক্টে বলা হয় যে টাঁকশালে সোণা জমা দিয়া মুদ্রায় রূপান্তরিত একমাত্র ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ডই করাইয়া লইতে পারিবে; তবে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ড আউন্স প্রতি ৩ পাঃ ১৭ শিঃ ৯ পেঃ দরে সোণা খরিদ করিতে বাধ্য থাকিবে। ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ডের নোট ও ট্রেজরী নোটের বদলে দাবী করিলেই সোণা দেওয়া হইবে এবং অন্যূন ৪০০ আউন্স পরিমাণ সোণা এক সঙ্গে দাবী করিলে ব্যাঙ্ক ৩ পাঃ ১৭ শিঃ ১০½ পেঃ হারে বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবে। সুতরাং কমপক্ষে ১৭০০ পাউণ্ড মূল্যের সোণা কিনিলে তবেই লোকে সোণা কিনিতে পারে। অর্থাৎ দেখা যাইতেছে যে গ্রেট্‌বৃটেনে প্রচলিত ছিল স্বর্ণতাল মান (Gold Bullion Standard)।

ফল দাঁড়াইয়াছিল এই যে রপ্তানী সম্পর্কে গ্রেট্‌বৃটেনে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলেও আভ্যন্তরিক কাজে সোণার সম্পর্ক ছিল না। ১৯২৮শে কারেন্সী ও ব্যাঙ্কনোট অ্যাক্ট পাশ করিয়া অল্প টাকার (smaller denomination) নোট ছাড়িবার ক্ষমতা ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ডকে দেওয়া হয়; অধিকন্তু নোটগুলিকে করা হয় চলৎ-সিক্কা (Legal Tender)। এইরূপে বিনিময়হারকে অচঞ্চল রাখিবার কাজে ব্যাঙ্কের স্বর্ণ-তহবিল হাতের কাছে পাওয়া গেল এবং দেশও স্বর্ণমান প্রচলিত থাকার সমস্ত সুবিধাই পাইল।

পরবর্ত্তীকালের ইতিহাস দেখিয়া নিঃসন্দেহে বলা যায় যে অত তাড়াতাড়ি স্বর্ণমান গ্রহণ করা গ্রেট্‌বৃটেনের পক্ষে যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই এবং ১৯২৫ এর অ্যাক্ট অনুসারে সিক্কার মূল্যও ঠিকভাবে নিরূপিত হয় নাই। ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিক্ দিয়া গ্রেট্‌বৃটেনের পক্ষে তাহা ক্ষতিকরই হইয়াছিল, কারণ রপ্তানীর পরিমাণ যেমন কমিতেছিল, তেমনি অন্যদিকে আমদানীর পরিমাণ বাড়িতেছিল, অর্থাৎ যত মাল ইংরাজ বিক্রয় করিয়াছিল, তার চেয়ে বেশী টাকার মাল কিনিয়াছিল ; সুতরাং টাকা মিটানোর সময় গণ্ডগোল দেখা দিল। এইভাবে বেশী দিন চলিতে পারে না—তাই শেষ পর্য্যন্ত আবার ১৯৩১ শের সেপ্টেম্বরে গ্রেট্‌বৃটেন স্বর্ণমান ত্যাগ করে।

দুনিয়াব্যাপী যে পরিস্থিতির ফলে গ্রেট্‌বৃটেনকে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে হয় তাহা সংক্ষেপে এই—

(১) **সবদেশেই পণ্যদ্রব্যের দর পড়িয়া যায়** :—তাহার ফলে যে-সব দেশ প্রধানতঃ কাঁচা মাল উৎপাদন করে তাহারা পণ্য বিক্রয় করিয়া সামান্যই পায় এবং সেই জন্য তৈরী মাল কিনিবার ক্ষমতাও তাহাদের কমিয়া যায় , তাই গ্রেট্‌বৃটেনের মত যে-সব দেশ কারখানাজাত শিল্পের উপর নির্ভর করে তাহাদের রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়া যায়।

(২) **অর্থনৈতিক স্বাদেশিকতা বা ইকনমিক ন্যাশান্যালিজমের উদ্ভব** :—শুল্ক, 'বাউন্টি' 'কোটা' প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। স্বদেশী শিল্প বাঁচাইয়া তুলিবার জন্য বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলি শুল্কপ্রাচীর তুলিয়াছিলেন। ফলে যে-সব পণ্য যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে গ্রেট্‌বৃটেন যোগান দিয়া আসিয়াছে তাহা আর সম্ভব হয় না ; স্বদেশজাত পণ্যের সহিত প্রতিযোগীতায় এইভাবে ব্রিটিশ পণ্যকে ক্রমশঃ হটিয়া যাইতে হয়।

(৩) **যুদ্ধ ঋণ ও ক্ষতিপূরণ** :—এই দুই কারণে যে টাকা দিতে হয় তাহা অনুৎপাদক থাকিয়া যায়। মহাজন—দেশগুলি সুউচ্চ শুল্কপ্রাচীর তুলিয়াছিল বলিয়া খাতক দেশসমূহ পণ্য দিয়া পাওনা মিটাইতে পারে নাই। তাই যতক্ষণ পারিয়াছিল খাতক দেশগুলি, সোণা দিয়াই ঋণ পরিশোধ করিয়াছিল। সোণার যোগান পরিমিত ; ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের মত প্রধান দুইটি মহাজন দেশ সোণা যখের মত আঁকড়াইয়া বসিয়াছিল বলিয়া দুনিয়াব্যাপী টাকায় টান ধরে (Deflation)।

(৪) **অনুর্ব্বর সোণা** (Sterilization of Gold)—স্বর্ণমান স্পষ্টভাবে প্রচলিত থাকিতে গেলে, যে সব দেশের তহবিলে সোণা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাদের কর্ত্তব্য সেই সোণা বিদেশকে ঋণ দেওয়া। গত মহাযুদ্ধের পর, যুদ্ধের ঋণ ও ক্ষতিপূরণস্বরূপ ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র যে টাকা পায় তাহার ফলে ঐ দুটী দেশের তহবিলে বহু সোণা মজুত হয়, কিন্তু সোণা হাতফের না করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কোষখানায় অনুর্ব্বরভাবে জমিতে থাকে। পৃথিবীতে সোণার যোগান পরিমিত বলিয়া টাকার পরিমাণবাদ অনুযায়ী একটা সার্ব্বভৌমিক দর পতন লক্ষ্য করা যায়।

(৫) **আন্তর্জাতিক অনাস্থা**—ফলে বিদেশে যে সব পুঁজি খাটিতেছিল, তাহা দেশে টানিয়া আনিবার ঝোঁক দেখা যায়। বিদেশীরা বহু টাকা ব্রিটীশ সিকিওরিটী ও লণ্ডন মানি মার্কেটে খাটাইত ; তাহারা সে-সব তুলিয়া লইতে থাকে।

এইগুলি ছাড়া আরও ২।১টী কারণে গ্রেট্‌বৃটেনকে স্বর্ণমান ত্যাগ করিতে হয়। গ্রেট্‌বৃটেন বহু টাকা দীর্ঘ মিয়াদে কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় শক্তিগুলিকে (Central European Powers) কর্জ্জ দিয়াছিল। পক্ষান্তরে বহু বিদেশী টাকা স্বল্প মিয়াদে লণ্ডনের বাজারে খাটিতেছিল। নানা কারণে যখন বিদেশীরা লণ্ডন বাজারের উপর আস্থা হারাইল তখন গ্রেট্‌বৃটেনের সোণার তহবিলে টান ধরিল। এই নির্গমন (drain) রোধ করিবার জন্য গ্রেট্‌বৃটেনকে স্বল্প মিয়াদে যুক্তরাষ্ট্র ও ও ফ্রান্সের নিকট টাকা ধার করিতে হয়। স্বল্পমিয়াদে কর্জ্জ গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ মিয়াদে কর্জ্জ দেওয়ার কুফল হাতে হাতে ফলিল এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৩১শে গ্রেটবৃটেন স্বর্ণমান ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

কি কি কারণে বিদেশীরা গ্রেট বৃটেনের

উপর আস্থা হারাইয়াছিল, তাহাও সংক্ষেপে লক্ষ্য করা যাক্—

(ক) ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন্দাহেতু গ্রেট্‌বৃটেনের বেকার সংখ্যা অভাবনীয়রূপে বাড়িয়াছিল।

(খ) গ্রেট্‌বৃটেন বাজেটেও ছিল ঘাট্‌তি। (May Report) যে রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ায় তাহা বেশী করিয়া নজরে পড়ে।

(গ) মজুর সমস্যাও ছিল ভয়ানক—ইউরোপের কাগজগুলায় এই সবের বিকৃত বিবরণ প্রকাশিত হওয়ায় লোকের মনে ধারণা জন্মাইয়াছিল যে গ্রেট্‌বৃটেনে বিপ্লব আবশ্যম্ভাবী।

এই সব নানা কারণে গ্রেট্‌বৃটেন ১৯৩১শে Gold Standard (Amendment) Act পাশ করিয়া স্বর্ণমান ত্যাগ করে।

স্বর্ণমান আবার প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা অর্থনৈতিক পণ্ডিতগণের মধ্যে এখনো বিশেষ মতভেদ আছে; কিন্তু তবু ইহার বদলে যে আর কোন প্রকৃষ্টতর মুদ্রানীতি কেহ ব্যাখ্যা করিতে পারিয়াছেন তাহাও নয়। সুতরাং আবার পৃথিবীতে স্বর্ণমান পুরাদমে চলা কিছু বিচিত্র নয়। সুতরাং কোন্ অবস্থায় সুষ্ঠুভাবে স্বর্ণমান চলিতে পারে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিতে গেলে এই সর্ত্তগুলি পূরণ হওয়া চাই—

(১) নিরূপদ্রবতা ও বিশ্বাস থাকা চাই। ইহার অর্থ এই যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্থায়ী শান্তি আবশ্যক এবং মজুর ও মালিকগণের মধ্যে সদ্ভাব থাকা চাই।

(২) পুঁজি পণ্য অবাধে দেশ বিদেশে যাতায়াত করিতে পারে। অর্থাৎ শুল্ক, "এক্সচেঞ্জ রেষ্ট্রীক্‌শান্" প্রভৃতি হ্রাসকরে আনা দরকার।

(৩) ক্ষতিপূরণের মত একদেশী অনুর্ব্বর দায় থাকা অবাঞ্ছনীয়।

(৪) লগ্নীর জন্য পুঁজি অবাধে হাতফের করা চাই। এবং সেজন্য চাই—

(ক) আইনগত স্বাধীনতা। পুঁজি রপ্তানীর কোন বাধা থাকিবেনা, আপতঃ জার্ম্মানীতে যেমন আছে।

(খ) সাহসী বিচক্ষণ একদল ব্যবসায়ী, যাঁহারা সুযোগ বুঝিলেই বিদেশে টাকা খাটাইবেন।

(৩) খাতকের উপর বিশ্বাস (Bona-fide of borrowers); এবং খাতকগণও এ প্রতি-শ্রুতি দিতে সক্ষম হওয়া চাই যে তাহারা উৎপাদনশীল (Productive) শিল্পেই টাকা নিয়োজিত করিবেন।

(৫) যে সব দেশের তহবিলে সোণা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহারা সেই উদ্বৃত্ত অংশ কর্জ্জ দিতে প্রস্তুত থাকা চাই।

সমগ্রভাবে পৃথিবীতে স্বর্ণমান প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে চাই :—

(১) দুনিয়াব্যাপী সহযোগ। সার্ব্বভৌমিক সহযোগ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে স্বর্ণমান পুনঃ প্রবর্ত্তন করিলে তাহা কিছুতেই স্থায়ী হইবে না, ব্যর্থ হইতে বাধ্য (Doomed to failure); গত ইউরোপীয় মহাসমরের পরের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট-ভাবে বোঝা যায়।

(২) বিভিন্নদেশের সিক্কার মধ্যে যে অসাম্য রহিয়াছে তাহা দৃঢ় করিয়া সমান করিতে হইবে। যে-সব দেশের সিক্কা চড়া বলিয়া প্রতীয়মান হয় তখন (i. e. over-valued) তাহাদের মূল্য কমাইয়া (de-valued) আন্তর্জ্জাতিক দরের মাত্রার সমপর্য্যায় ভুক্ত করিতে হইবে।

(৩) টাকাকড়ির পলিসি সম্বন্ধে একটা আন্তর্জ্জাতিক সহযোগ চাই এবং স্বর্ণমান অবাধ ভাবে চলিতে পারা চাই (operate with freedom)।

(৪) বাণিজ্য ও বিনিময়-সংক্রান্ত যে সব বিধি নিষেধ (restriction) প্রচলিত আছে তাহার উৎখাত।

(৫) যুদ্ধঋণ, ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি সম্পূর্ণ বা একটা মোটা অংশ নাকচ।

(৬) মহাজন দেশগুলি উদ্বৃত্ত টাকা দেশ-বিদেশে কর্জ্জ দিতে প্রস্তুত থাকা চাই।

স্বর্ণমান কি, এবং কি ভাবে ইহার প্রচলন হইয়া আসিতেছে, এখানে সেই কথাই পরিষ্কার ভাবে বুঝান হইয়াছে।

আফ্রিকা

১০৭ পৃষ্ঠার পর

আফ্রিকার কথা বলিতে গেলেই আফ্রিকার জীবজন্তুর কথা মনে আসে। তোমরা জান যে আফ্রিকার জল-বায়ু সর্ব্বত্র সমান নহে। জল-বায়ু ও উত্তাপের বেশ বিভিন্নতা আছে। এই জন্য বিভিন্ন মণ্ডলের প্রাণী এবং তরুলতাও বিভিন্ন প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। আফ্রিকার এই মানচিত্রখানিতে, আফ্রিকার বিভিন্ন মণ্ডলে কোন্ কোন্ প্রাণী বাস করে তাহা দেখানো হইয়াছে।

আফ্রিকার বিষুবমণ্ডলের গভীর অরণ্যে—যেমন ভীষণ বর্ষা, তেমনি সেখানে ভীষণ গরম। ঐ গভীর অরণ্যে এক ফুট হইতে পাঁচ ফুট ব্যাসের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ২০০ শত ফুট অবধি উচ্চ হইয়া থাকে। আফ্রিকার অরণ্যের বিরাট বৃক্ষ সমূহের ঘন পত্র-পল্লব, লতার বেষ্টনী দেখিলে ভীত ও চমকিত হইতে হয়। এই সব বনে, পশু-পক্ষী, বানর, সর্প, সরীসৃপ, পঙ্গপাল, পিপীলিকা, বিষাক্ত মক্ষিকা—স্যাৎসি (tse-tse) আবার নদ-নদীর মধ্যে অসংখ্য কুম্ভীর ইত্যাদিতে পূর্ণ। তারপর আফ্রিকার হস্তী, গরিলা, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতির ত কথাই নাই। আফ্রিকার বেবুনের কথা তোমরা শুনিয়াছ। চলতি কথায় ইহাদিগকে "কুকুর মুখো" বানর বলে। এই সব গভীর বনে মানুষ বাস করিতে পারে না। কোথাও কোথাও বুনো আদিম অধিবাসীরা গাছের উপরে কিংবা জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বাস করে। এই বনের পূর্ব্বদিকে এক প্রকার বামন জাতির বাস।

আফ্রিকার গভীর বনে এবং কোথায় কোন্ প্রদেশে কোন্ কোন্ জন্তুর বাস তাহা চিত্র হইতে দেখিতে পাইবে। মানচিত্র দেখিয়া দেশগুলির নাম জানিলেই প্রত্যেকটি জীবজন্তু কোন্ কোন্ প্রদেশের অধিবাসী তাহা চিনিয়া লইতে পারিবে।

আফ্রিকায় নানা জাতীয় মানুষ বাস করে। তাহাদের অনেক কথাই তোমরা 'শিশু-ভারতী'তে পড়িয়াছ। ইহারা সাধারণতঃ ঘর-বাড়ী তৈয়ার করিতে জানে না। ডাল, পাতা, দিয়া কোনরূপে কুঁড়ে ঘর কিংবা গাছের উপর মাচান বাঁধিয়া বাস করিয়া থাকে। কাপড় পরিতেও অনেকে জানে না। গাছের বাকল বা পাতা দিয়া কোনরূপে লজ্জা-নিবারণ করে।

এখন তোমাদের কাছে আর একটি কৌতূহল-জনক বিষয় বলিতেছি। আফ্রিকার বামনাকৃতি অসভ্যেরা আজ পর্য্যন্তও রাঁধিয়া খাইতে শিখে

নাই। তাহারা বনে বনে পশু শিকার করিয়া তাহার কাঁচা মাংস খায়। কলা ইহাদের প্রিয় খাদ্য। বনের মধ্যে আপনা হইতেই কলাগাছ জন্মে। এই অসভ্যেরা সেই কলা খাইয়া বাঁচে। যদি বাগানের মালিকের জন্য বিনিময়ে কাঁচামাংস ঝুলাইয়া রাখিয়া যায়। আমরা পূর্ব্বে তোমাদের কাছে আফ্রিকার কয়েকটি দেশের কথা বলিয়াছি। এইবার অন্যান্য দেশের পরিচয় দিতেছি।

আফ্রিকার এই মানচিত্রে কোন্ দেশে কোন্ জন্তু বাস করে তাহা দেখান হইয়াছে

কলা না পায় তাহা হইলে নিকটবর্ত্তী গ্রামে গ্রামে কলা গাছ খুঁজিয়া বেড়ায়। যদি কলা গাছ চোখে পড়ে, তাহা হইলে আর তাহাদের আনন্দের অবধি থাকে না। সেই কলা সংগ্রহ করে এবং

মিশর

মিশরের কথা পূর্ব্বেও তোমাদের কাছে কিছু বলিয়াছি। মিশর তাহার পিরামিডের জন্য জগ-দ্বিখ্যাত। এখানকার প্রধান শস্য হইতেছে তুলা।

এই তুলা পৃথিবীর নানাদেশে রপ্তানী হয় এবং ভারতবর্ষেও আসে। তুলা ছাড়া ভুট্টা, গম, ইক্ষু এবং খেজুর মিশরের প্রধান শস্য-সম্পদ।

প্রধান সহর—মিশরের রাজধানীর নাম কাইরো (Cairo)। কাইরো আফ্রিকার মধ্যে

আফ্রিকার কমলা

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নগরী। এই সহরের দক্ষিণ দিকেই গীজার বিখ্যাত পিরামিড্ অবস্থিত। কাইরো নগরে মুসলমানদের অনেক কিছু প্রাচীন কীর্ত্তি আছে। আলেকজেন্দ্রিয়া (Alexandria) মিশরের প্রধান বন্দর। এখানে তুলার বীজ হইতে তেল তৈরী করিবার কল আছে। **রোসেটা** (Rosetta) এবং **ড্যামিয়েটা** (Damietta) নামক দুইটি সহর নীলনদের মোহনার মুখে অবস্থিত।

সিআউট্ (Siout) হইতেছে উপর মিশরের প্রধান সহর। আসোয়ান্ (Assuan), ওয়াদি (Wady) হালফা (Halfa) এবং কর্ণাক (Karnak) থিব্‌স (Thibes) প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন মিশরের অনেক কিছু ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সমুদয় দেখিবার জন্য পৃথিবীর নানা দেশ হইতে পর্য্যটকগণ আসিয়া থাকেন।

সুদান্

সুদানের উত্তরভাগে মরুভূমি। নীল উপত্যকার দিকেই শুধু মানুষের বস্তী রহিয়াছে। ভূমি বেশ উর্ব্বরা। বৃষ্টিপাত প্রচুর। নদীর তীরে তীরে বন-জঙ্গল। মিশরের ঠিক দক্ষিণে যে সুদান তাহার নাম **মিশরীয় সুদান** (The Egyptian Sudan)। খার্টুম (Khartoum) ইহার প্রধান সহর। এই সহরটীর অবস্থান বড় সুন্দর, নীল নদ (Blue Nile) শ্বেত নীলনদ, এই দুই নদের (White Nile) সঙ্গমস্থলে ইহা অবস্থিত। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জেনারেল গর্ডন (General Gordon) এই স্থানেই নিহত হইয়াছিলেন। সাকিন্ (Sawkin) হইতেছে এক মাত্র বন্দর। উহা ব্রিটীশ অধিকারভুক্ত। সুদানের জনসংখ্যা প্রায় তিন কোটি হইবে।

সাহারা

সাহারা মরুভূমির পরিমাণফল হইবে প্রায় ২,৫০০,০০০ বর্গমাইল। পৃথিবীর এই সুবৃহৎ মরুভূমির বেশীর ভাগই মালভূমি। কোথাও কোথাও বা পর্ব্বতময়। সাহারা বালুকাকীর্ণ মরুভূমি। ইহার কোথাও বালিয়াড়ি আছে। সেই সব বালিয়াড়ি ঠিক্ যেন পর্ব্বতের মত। এজন্য পণ্ডিতেরা মনে করেন যে এক সময়ে সাহারা

আফ্রিকার জলপাই

মরুভূমির স্থানে সাগর ছিল। সেই সাগর শুকাইয়াই এই মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সাহারা মরুভূমিতে মানুষের বসতি নাই। কিন্তু যেখানে যেখানে মরুদ্যান রহিয়াছে, সেখানে মানুষের বাস আছে। মরুভূমির বালুকারাশি হইতে শীতল প্রস্রবণ-ধারা বেগে উৎসারিত হইতে

থাকে। আর সেইখানে খেজুর গাছ এবং এক প্রকার বুনো ঘাস প্রচুর পরিমাণে জন্মে। সুদানের প্রধান রপ্তানীর জিনিষ হইতেছে লবণ। এখান-

নিগ্রো জাতির প্রকৃত বাসভূমিই হইতেছে **সুদান**। নিগ্রোদের ছাড়া এখনে ফুল্‌বি (Fulbeh) বা ফুলা নামে একজাতীয় লোক বাস করে,

আফ্রিকার বিভিন্ন চিত্র

কার হ্রদের জল হইতে প্রচুর পরিমাণে লবণ পাওয়া যায়। ঐ লবণই নানাদেশে যায়।

তাহারা সুদানের বিশেষ বুদ্ধিমান এবং ক্ষমতাশালী জাতি। নাইজার নদীর কাছাকাছি ইহারা ছোট

ছোট রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। উহার মধ্যে **সোকোতু** (Sokotu) হইতেছে প্রধান। চাদ (Chad) হ্রদের পশ্চিমে **বর্ন্নু** (Bornu) রাজ্য নিগ্রোদের প্রধান রাজ্য। মুসলমানধর্ম্ম এখন সুদানের সর্ব্বত্র প্রচলিত।

এইদেশে চলাচলের পক্ষে নাইজার নদী এবং তাহার শাখা-প্রশাখা গুলিই হইতেছে প্রধান। কিংবা উটের সাহায্য ব্যতীত চলা ফেরা সম্ভবপর নহে। সুদানের সর্ব্বত্র নানা সহর রহিয়াছে। ঐ সকল সহরের মধ্যে দুই একটির জনসংখ্যা অত্যন্ত বেশী। কুকা (Kuka) সহরটি হইতেছে বর্ন্নুর রাজধানী। কানো (Kano) এবং তিম্বাক্তু (Timbuktu) এই দুইটিও প্রধান সহর। উত্তর আফ্রিকায় যাতায়াত করিতে হইলে এই দুই স্থান হইতেই যান-বাহন সংগ্রহ করিতে হয়।

পশ্চিম আফ্রিকা

সিনিগেল (Senegal) নদী হইতে ওরেঞ্জ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশই পশ্চিম আফ্রিকা নামে অভিহিত। বর্ত্তমান সময়ে পশ্চিম আফ্রিকার বেশীর ভাগই ইউরোপীয় জাতির অধিকারভুক্ত। একমাত্র দেশীয় রাজ্য হইতেছে দাহোসি (Dahossey) এবং অশান্তি (Ashanti)। এই দুইটি দেশীয় রাজ্য গিনি উপকূলে অবস্থিত। লাইবেরিয়া (Liberia) হইতেছে নিগ্রো গণতন্ত্র রাজ্য।

এই দেশের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। দেশটি বিশেষ অস্বাস্থ্যকর। কোঙ্গোর দক্ষিণ দিকে বৃষ্টিপাত তত বেশী হয় না। দক্ষিণ দিকের ভূভাগ ক্রমশঃই বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে। ঐ অঞ্চলেই কালাহারি মরুভূমি লিমপোপো (Limpopo) নদী পর্য্যন্ত তাহার বালুকাময় বিরাট দেহ লইয়া বিরাজমান।

নাইজিরিয়ার অধিবাসী—আফ্রিকা

দেশ সমূহ

এ অঞ্চলে উত্তর নাইজিরিয়া (Northern Nigeria), পরিমাণ ফল হইবে প্রায় ২৫৬,০০০ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা আনুমানিক ১০,০০০,০০০, ইহাদের বেশীর ভাগই হইতেছে নিগ্রো।

এখানকার কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে তুলা হইতেছে প্রধান। তা ছাড়া রাবার, হাতীর দাঁত, চামড়া অষ্টিচ্ পাখীর পালক, লবণ, লৌহ প্রভৃতি প্রধান। **আসাবা** (Asaba), **রাব্বা** (Rabba) এবং রাজধানী **জুনজার্ণ** (Zungern) জনপূর্ণ নগরী।

দক্ষিণ নাইজিরিয়া—৭৭,০০০ বর্গ মাইল পরিমিত ভূখণ্ড লইয়া এই দেশটি অবস্থিত। জনসংখ্যা হইবে প্রায় ৭,০০০,০০০। ইহার মধ্যে হাজার দুইয়ের বেশী শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী নাই। এই স্থানের প্রধান সহরের নাম—ল্যাগোস্ (Lagos)।

গোল্ড কোষ্ট (Gold Coast)—অশান্তি ইহারও অন্তর্ভূক্ত। ইহার পরিমাণফলও হইবে প্রায় ৮০,০০০ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা প্রায় ১,৫০০,০০০। ইহার মধ্যে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী এক হাজারও হইবে না। তৈল, (Palm oil), রাবার, কোকোয়া এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানে সোণা প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যায়। প্রধান সহর হইতেছে ক্যাপকোষ্ট ক্যাসল (Cape-coast castle) এবং এ্যাক্রা। আমাদের দেশে যেমন গ্রামে গ্রামে হাট-বাজার বসে, উগাণ্ডার গ্রামেও তেমনি হাট মিলে, এইখানে একটি গ্রামের বাজারের ছবি দেওয়া হইল।

উগাণ্ডার একটি বাজার

ফরাসীদের অধিকৃত আফ্রিকা

ফরাসীরা ব্ল্যাঙ্কো অন্তরীপ (Cape Blanco) হইতে কোঙ্গো পর্য্যন্ত সমুদয় পশ্চিম আফ্রিকাই আপনাদের অধিকারভুক্ত বলিয়া দাবী করেন। ব্রিটিশ ও জার্ম্মেণ অধিকার ব্যতীত প্রায় সমুদয় পশ্চিম আফ্রিকাই,—ফরাসীদের। পশ্চিম সাহারা ও ফরাসীদেরই অধিকারভুক্ত। সেনিগ্যালেই হইতেছে ফরাসীদের প্রধান কেন্দ্র। রাজধানীর নাম ফোর্ট লুই। (Fort Louis) বর্ত্তমান সময়ে ড্যাহোমি একটি প্রোটেক্টোরেট (Protectorate) রাজ্য। উহার রাজধানীর নাম **এ্যাবোমি** (Abomey)।

পর্টুগীজ পশ্চিম আফ্রিকা

পর্টুগীজ পশ্চিম আফ্রিকা কোঙ্গো হইতে ক্যাম্প্ ফ্রিও পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পরিমাণফল হইবে প্রায় ৫০০,০০০ বর্গ মাইল। কাফি, রাবার, তেল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাজধানীর নাম **লোয়ানডা**। লোয়ানডা রাজধানী ও বন্দর। বেন্গেলা (Benguela) এবং মোশ্যামিদেশ হইতেছে আর দুইটি প্রধান সহর।

বেলজিয়ান্ কোঙ্গো

বিস্তৃত প্রদেশ। প্রায় এককোটি বর্গ মাইল ভূ-ভাগ লইয়া এই প্রদেশটি গঠিত। পূর্ব্বে ইহা কোঙ্গো ফ্রিষ্টেট্ নামে অভিহিত হইত, বর্ত্তমানে কোঙ্গো ফ্রিষ্টেট্, বেল্জিয়ান্ রাজ-শাসনে আসিয়াছে। মুটাদি (Mutudi) পর্য্যন্ত কোঙ্গো নদী দিয়া নৌকা চলাচল করিয়া থাকে। সম্প্রতি রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। মুটাদি হইতে লিয়োপোলদ্ভিল্

এলজিয়ার্স বন্দর

(Leopoldville) পর্য্যন্ত এই রেলপথ গিয়াছে। কোঙ্গো নদী স্থানে স্থানে দশ মাইল প্রশস্ত।

দেশীয় রাজ্য

দেশীয় রাজ্যের মধ্যে লাইবিরিয়া নিগ্রো গণতন্ত্র রাজ্য। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। মুক্ত ক্রীতদাসেরা এই রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। **মোন্‌রোভিয়া** হইতেছে রাজধানী। গিনি অঞ্চলের পূর্ব্বদিকে ক্রুমেন্ (Kroomen) নামে এক আদিম জাতীয় লোকের বাস। ইহারা নৌ-চালন-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী।

মরোক্কো

মরোক্কো আফ্রিকার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এলজিরিয়া (Algeria), টিউনিস্ (Tunis) ট্রিপলি—এই চারিটি রাজ্যের সম্মিলিত নাম হইতেছে বারবারি ষ্টেট্‌স্ (Barbary states)। পূর্ব্বে এই সব স্থানে বারবার জাতি নামে এক আদিম জাতির বাস ছিল। আরবগণ বারবারদের তাড়াইয়া দিয়া এই দেশ অধিকার করেন। মরোক্কোর সুলতান ফরাসীদের কর্ত্তৃত্বাধীনে রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন।

মরোক্কোর পূর্ব্ব সীমা এলজিরিয়া, দক্ষিণে সাহারা মরুভূমি। এ্যাটলাস্ পর্ব্বত, ক্যাপ ঘির (Cape Ghir) হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর পূর্ব্ব দিক পর্য্যন্ত বিরাজমান। এ্যাটলাস্ পর্ব্বতের উচ্চ চূড়া—১১,৪০০ ফুট হইবে।

মরোক্কোর জলবায়ু উষ্ণ এবং স্বাস্থ্যকর, এ্যাটলাস পর্ব্বতের পাদদেশ বেশ উর্ব্বর, নানা-জাতীয় ফসল ও ফল জন্মে। ত্যাফিলেট্ (Tafilet) নামক স্থানের খেজুর বিশেষ প্রসিদ্ধ। উট—হইতেছে যান-বাহনের একমাত্র অবলম্বন। ভুট্টা, পশম, কমলা, তেল, ডালিম এবং চামড়া হইতেছে প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। তোমরা মরোক্কোর চামড়ার (Morcco-leather) নাম শুনিয়াছ। এই চামড়ার বাঁধান পুস্তকের দাম খুব বেশী হয়। এই চামড়ার দ্বারা বাক্স, ব্যাগ ইত্যাদি ও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আদিম অধিবাসীদের কুটির

মৎস্য-ব্যবসায়ের জন্যও মরোক্কো বিশেষ বিখ্যাত। মরোক্কোর স্যালমোন্ (Morocco Salmon) মাছ দেশ বিদেশে রপ্তানী হয়।

মরোক্কোর অধিবাসীদের মধ্যে বেশীর ভাগই কৃষিকার্য্য করিয়া জীবন ধারণ করে। অনেক যাযাবরজাতি ও আছে। আরবীয়েরা, ইউরোপীয়েরা এবং ইহুদীরাই মরোক্কোর ব্যবসায়-বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে। ফেজ (Fez) হইতেছে—মরোক্কোর রাজধানী। তোমরা মুসলমানদের মাথায় যে ফেজ টুপি দেখিতে পাও, এই টুপি ফেজ সহরেই তৈরী হয়। মরোক্কো এবং মেকিনি (Mekinee) সহর দুইটি প্রধান। বন্দরের মধ্যে—ট্যানজিয়ার (Tangier) জিব্রেলটার প্রণালীর উপরে অবস্থিত। মোগাডোর (Mogador) একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর। র‍্যাবাট্‌স্যাল্লি (Rabitsallee) বন্দরটি বিশেষ বিখ্যাত।

মরোক্কোর পরিমাণ ফল ২২০,০০০ বর্গ মাইল লোকসংখ্যাও হইবে—৩,৬০০,০০০।

আফ্রিকার মেয়েরা নলগাছের বোঝা লইয়া যাইতেছে

সেই প্রথম শতাব্দীতে মরোক্কোর পূর্ব্বাংশ রোমের অধিকারে ছিল। এবং তাহার নাম ছিল —ম্যারটেনিয়া (Martania)। ক্রমে ভাণ্ডাল, গল, আরব প্রভৃতিরা নানাস্থান অধিকার করিতে থাকে। অষ্টম শতাব্দীতে বারবারিয়া স্বাধীন হয় এবং চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত বেশ প্রভাবশালী থাকে এমন কি স্পেনেও তাহাদের রাজ্য বিস্তৃত হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মরোক্কো ছাড়া আর সব রাজ্যই তাহাদের হাতছাড়া হইয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মরোক্কোর সুলতান আবদেল আজিজ (চতুর্থ) রাজ্য মধ্যে ইউরোপীয় সংস্কার প্রবর্ত্তনের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হইতে পারিল না, রায়সুলি (Raisuli) নামক বারবারদের একজন সর্দ্দার বিদ্রোহী হন। তাহার এই বিদ্রোহ-দমনের জন্য আবদেল আজিজের ফরাসী ও স্পেনীয়-দের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ১৯০৬ ও ১৯১২ খৃষ্টাব্দে গ্রেটব্রিটেন, ফরাসী, স্পেন এবং জার্ম্মেণীর সম্মিলিত বৈঠকে কি শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে কি অর্থ-নৈতিক ব্যাপারে সব বিষয়েই ইউরোপীয় জাতি সমূহের প্রভুত্ব মানিয়া লইতে হইয়াছিল।

মরোক্কোর সুলতান মরোক্কোর একচ্ছত্র অধি-পতি হইলেও তাঁহাকে ফরাসী মণ্ডল (অধিকৃত অংশ)—ফরাসী রেসিডেন্ট জেনারেল (French Resident general) স্পেনীয় মণ্ডলে (Spanish zone) স্পেনীয় হাই কমিশনারের শাসনাধীনে শাসিত হইয়া থাকে। ট্যান্‌জিয়ার ভূভাগ (Tan-

ক্ষেতের পাহারা

gier-zone) চারিজন বিভিন্ন জাতীয় শাসক কর্তৃক শাসিত হইয়া থাকে।

এলজিয়র্স

এলজিরিয়া রাজ্য হইতেছে ফরাসীদের অধীনে। রাজধানীর নাম **এলজিয়র্স**। ইহা একটি বৃহৎ নগর এবং বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্র। ভূমধ্যসাগরের তীরে

এই সহরটির অবস্থান অতি সুন্দর। এখান হইতে নানাদিকে রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। ওরান্ (Oran) এবং বোনা (Bona) দুইটি প্রধান বন্দর। কন্‌ষ্টেন্টাইন হইতেছে একটি মধ্যবর্ত্তী নগর। ঐ স্থানে একটি দুর্গ আছে। উত্তর আফ্রিকার এই এলজিরিয়া গণতন্ত্র রাজ্য। এই জন্যই অতি দ্রুত ইহার উন্নতি হইতেছে। আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে ইহা একটী শ্রীবৃদ্ধিশালী সুসভ্য দেশ। ফরাসী রাজধানীর (National Assembly বা জাতীয় সভাতে প্রতিবৎসর একজন সিনেটার (Senator) এবং তিনজন ডেপুটি,—ওরান্, কন্‌ষ্টেন্টাইন এবং এলজিয়ার্স হইতে প্রেরিত হইয়া থাকে।

ত্রিপোলি

১৯১১ খৃষ্টাব্দে ত্রিপোলি ইটালির অধিকারে আসিয়াছে। ভূমধ্যসাগরের প্রান্ত পর্য্যন্ত মরুভূমি বিস্তৃত রহিয়াছে। সমুদ্রের কাছাকছি সামান্য ভূখণ্ডই এখানকার একমাত্র উর্ব্বর ভূমি, ত্রিপোলিটানিয়া রাজধানীর নাম (Tripolitunia)। ত্রিপোলিটানিয়াকে মূরদের আদর্শ নগরী বলা যাইতে পারে। এখানকার প্রাচীন বৃহৎ ও সুন্দর মস্‌জিদ, ফুল ফলাদি পরিপূর্ণ মনোরম উদ্যান পর্য্যটকের মন মুগ্ধ করে। এখান হইতে বণিকেরা টিম্‌বাকতু, চাদ হ্রদ, দার্ফুর প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করে। এই সকল স্থান হইতে কার্পেট, অষ্ট্রিচ পক্ষীর পালক এবং তামাক রপ্তানী হয়।

আদিম অধিবাসীদের ঘরের অভ্যন্তরভাগ

অতি প্রাচীন কালে ত্রিপোলী—রোমক, ভ্যাণ্ডাল এবং আরবদের অধিকারে ছিল। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে স্পেনের ফার্দিনান্দ (Ferdinand) রাজা ত্রিপোলি জয় করেন। সেণ্টজনের নাইট সেরা (The knights of St. John) ১৫৩০-১৫৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ত্রিপোলি আপনাদের অধিকারে রাখেন। ১৫৬১-১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ত্রিপোলি ছিল তুর্কীর অধিকারে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা ইটালির অধীনে আসিয়াছে।

ত্রিপোলি (রাজধানী), তা ছাড়া মিসুরাটা এবং হোস্ হইতেছে প্রধান সহর ও বন্দর।

সিন্ধাবাদ নাবিকের সাতবার বাণিজ্য-যাত্রা

[৩১৩২ পৃষ্ঠার পর]

খলিফা হারুণ-অল-রসিদ যখন বোগ্‌দাদে রাজত্ব করিতেন 'সে সময়ে বোগদাদ সহরে হিন্দাবাদ নামে একজন দরিদ্র ব্যক্তি বাস করিত। সে মোট বহিয়া জীবিকা-অর্জ্জন করিত। এক-গ্রীষ্মকালে সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—তাহার সারা শরীর দিয়া ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছিল এইরূপ সময়ে সে মাথায় একটা মস্ত বোঝা লইয়া পথ চলিতেছিল। পথ চলিতে চলিতে

তাহার মনে হইতেছিল যে পথ যেন আর ফুরাই-তেছে না। এইরূপ ভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে সে এমন একটী রাস্তায় আসিয়া পড়িল যেখানে আসা মাত্রই তাহার সারা দেহ শীতল হইয়া গেল। পথের দুইদিকে অনেক বড় বড় গাছ ছায়া বিস্তার করিয়া পথটিকে শীতল করিয়াছে, আর গোলাপ জল দ্বারা পথটি সিক্ত হওয়ায় মধুর-সৌরভে পথটী সুরভিত হইয়াছে। হিন্দাবাদ্ এইরূপ একটি বড় মনোরম স্থানে আসিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইল এবং সে তাহার মাথার বোঝাটা রাস্তার পাশে একটি বড় বাড়ীর রকের উপর রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

বল ত? তোমার বাড়ী কি বোগদাদ সহরে নয়? যদি তোমার বাড়ী বোগদাদ হইত তাহা হইলে কখনই তুমি এইরূপ অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে না। এই বাড়ীটি সিন্ধাবাদ নাবিকের। পৃথিবীর এমন কোন দেশ নাই যে দেশ না তিনি পর্য্যটন করিয়াছেন—ইহার ন্যায় ধনবান বণিক বোগদাদ সহরে আর একজন ও নাই। তিনি পৃথিবীর নানাস্থান হইতে যেরূপ ধন-রত্ন সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন সেইরূপ ধন-রত্ন অনেক সম্রাটের ধনাগারে আছে কিনা তাহাই সন্দেহ। ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহার যেমন কোন অভাব নাই, তেমনি তাঁহার ন্যায় অতিথি-বৎসল এবং গরীব-দুঃখীর

মানুষের অদৃষ্টে এমন প্রভেদ হয় কেন?

অভাব দূর করিবার মত সদাশয় ব্যক্তি বোগদাদ সহরে ও অত্যন্ত দুর্লভ।

সে যে বাড়ীর পাশে বসিয়াছিল, তাহার জানালার ভিতর দিয়া অতি সুমধুর সঙ্গীতের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল, আর অতি মনোরম বাজনা বাজিতেছিল। হিন্দবাদ শুনিতে পাইল গান ও বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নানা পাখীর মধুর সুর। তাহার কৌতূহল হইল এমন বৃহৎ ও সুন্দর বাড়ীর মালিক কে? সে দেখিতে পাইল সদর দরজার পাশে এক জন ভৃত্য দাঁড়াইয়া আছে—তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত মূল্যবান্। হিন্দাবাদ তাহাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয়, আপনি বলতে পারেন এই বাড়ীটি কাহার? ভৃত্য চমকিত হইয়া উঠিল সে কহিল,—"তোমার বাড়ী কোথায়

তাহারা এইরূপে কথা বলিতেছে এমন সময় একজন অনুচর বাড়ীর ভিতর হইতে তাহাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হিন্দাবাদকে সম্বোধন করিয়া কহিল—'আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বাড়ীর ভিতরে চলুন, আমার মনিব সিন্ধাবাদ আপনার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।'

হিন্দাবাদ আশ্চর্য্য হইল, তাহার মত একজন দীন ও দরিদ্র ব্যক্তিকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী সিন্ধাবাদ ডাকিয়া কথা বলিবেন এইরূপ কল্পনা সে করিতে পারে নাই। সে সিন্ধাবাদের বিরাট

তুমি আমার সঙ্গে এস!

অট্টালিকা এবং ধনসম্পদ দেখিয়া অস্ফুট স্বরে বলিয়াছিল—"মানুষের অদৃষ্টে এরূপ প্রভেদ কেন হয়? আমি সারা জীবন মোট বহিয়া কত ক্লেশ সহ্য করিতেছি, তবু আমার অভাব দূর হইতেছে না আর এই সিন্ধাবাদ কিরূপ বৃহৎ বাড়ীতে অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করিতেছে। তাহার মনে হইল না জানি সিন্ধাবাদ তাহার বাড়ীর কাছে আমার মোট রাখিয়াছি বলিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছেন কিংবা এইখানে প্রথমে আসিয়াই যে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ঐ যে কথাগুলি বলিয়াছি আমার ঐ উক্তি শুনিয়াছেন। তাই সে কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা করিয়া বলিল—না মহাশয় আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হইবে না কেননা আমি রাস্তার মধ্যে মোট ফেলিয়া রাখিয়া যাইতে পারিব না কে জানে কেহ হয়ত মোট তুলিয়া লইয়া যাইবে।"

সিন্ধাবাদের অনুচর হাসিয়া বলিল—"মোটের ভাবনা করিও না, তোমার মোটের কিছুই হইবে না তুমি আমার সঙ্গে এস।'

সে বারবার এমনভাবে অনুরোধ করিল যে, হিন্দাবাদ আর মানা করিতে পারিল না। সে অনুচরের সহিত বণিক সিন্ধাবাদের নিকট চলিল।

হিন্দাবাদ অনুচরের সহিত একটী অতি বৃহৎ ও সুন্দর ঘরের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহের মণিমুক্তাখচিত সুন্দর সাজসজ্জা, লোকজনের সাজ-পোষাক, দাস-দাসী ও কর্মচারীগণের ব্যস্ততা দেখিয়া তাহার কাছে সবই যেন স্বপ্নের মত মনে হইল। উপস্থিত সকলেই সিন্ধাবাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল, সকলের পশ্চাতে একটি বহু মূল্যবান উচ্চ-আসনে যিনি বসিয়াছিলেন তাঁহারই নাম সিন্ধাবাদ। বেচারা হিন্দাবাদ চারিদিকের জাঁকজমক দেখিয়া কি যে করিবে তাহা যেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতে-ছিল না—সে ভয়ে কাঁপিতেছিল।

এমন সময় সিন্ধাবাদ তাহাকে অতি মধুর স্বরে কাছে ডাকিয়া লইয়া আপনার বসিবার আসনের কাছে বসিতে দিলেন এবং বিবিধ সুখাদ্য দ্বারা তাহাকে পরিতৃপ্ত করিয়া বলিলেন—"বন্ধু, তোমার পরিচয় জানিতে পারি কি?" হিন্দাবাদ করজোড়ে অতি বিনীতভাবে কহিল—'মহাশয় আমার নাম হিন্দাবাদ আমি এই সহরে মোট বহিয়া জীবিকা-অর্জ্জন করি।' সিন্ধাবাদ বলিলেন—"আমি আপনার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আপনাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি রাস্তার উপরে বসিয়া যখন বিশ্রাম করিতেছিলে তখন কি কথা বলিয়াছিলে তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলিবে কি?—হিন্দাবাদ নতজানু হইয়া করুণ-স্বরে কহিল,—"মহাশয়, আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি অত্যন্ত গরীব তাই মনের দুঃখে কয়েকটি অপ্রিয় কথা মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল, আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

সিন্ধাবাদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আমি তোমার প্রতি বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট হই নাই, বরং তুমি যে-ভাবে তোমার দুঃখের কথা বর্ণনা করিয়াছ তোমার সেই সরলতায় মুগ্ধ হইয়াছি। বন্ধু, তুমি হয়ত মনে করিতেছ যে, আমি বিনা ক্লেশে একদিনেই এইরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছি যদি এইরূপ মনে করিয়া থাক তাহা হইলে তুমি আমাকে ভুল বুঝিয়াছ। আমি বৎসরের পর বৎসর শারীরিক ও মানসিক যে ক্লেশ সহ্য করিয়াছি তাহা তুমি আমার বর্ত্তমান ঐশ্বর্য্য-সম্পদ দেখিয়া অনুভব করিতে পারিবে না। তুমি আমার বাণিজ্য-যাত্রা সম্বন্ধে হয়ত বা লোকের কাছে অনেক কিছু শুনিয়াছ তাহারা সব কথা তোমার কাছে বলিতে পারিয়াছে কিনা জানিনা, তুমি যদি—আমি সাতবার নানা সাগরের বুকে যেরূপ ক্লেশ সহ্য করিয়া বাণিজ্য যাত্রা করিয়াছিলাম সে-কথা আমার মুখে শুনিতে তাহা হইলে বুঝিতে পারিতে যে আমি জীবনে তোমার অপেক্ষা অনেক বেশী ক্লেশ সহ্য করিয়াছি। আশা করি, তোমার কাছে আমার জীবনের সেই সব গল্প শুনিতে ভালই লাগিবে—এইরূপ বলিয়া সিন্ধাবাদ তাহার বাণিজ্য-যাত্রার বিষয়ের গল্প তাহাকে শুনাইলেন। এখানে তাহাই বলা হইল।

সিন্ধাবাদের জীবনী

সিন্ধাবাদ বাগদাদ সহরের একজন ধনবান বণিকের একমাত্র পুত্র ছিলেন কিন্তু অতি অল্প

বয়সেই পিতার মৃত্যু হওয়াতে সিন্ধাবাদ নানারূপ বিলাসিতার দ্বারা পিতার সঞ্চিত বিশাল ধনরাশির অপব্যয় করিয়া সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইলেন।

অতি শৈশবেই নিঃস্ব হইয়া সিন্ধাবাদ কি .ভাবে পুনরায় ধনসম্পত্তি লাভ করিতে পারেন সেজন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইল—জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু ভাল, মৃত সিংহ অপেক্ষা জীবিত কুকুরও ভাল; দারিদ্র্য অপেক্ষা মৃত্যু ভাল! এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া তাহার মনে বাণিজ্য করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল।

সমুদ্র-যাত্রা কালে সিন্ধাবাদ অতি ভীষণ বিপদে পতিত হন, কিন্তু তিনি নিজ অলৌকিক বীরত্বের ও নির্ভীকতার গুণে প্রত্যেকবার নিরাপদে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন ও স্বদেশবাসীর নিকট অশেষ সম্মান অর্জ্জন করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার মানসে সিন্ধাবাদ লোক ও বাণিজ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া একটী প্রকাণ্ড জাহাজ লইয়া বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন।

সিন্ধাবাদ তাঁহার জীবনে সাতবার সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক বারই তিনি ভয়াবহ দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াও বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। আমরা তাঁহার সেই দুঃসাহসিক ও বিবিধ আশ্চর্য্য ঘটনাপূর্ণ ভ্রমণ-কাহিনীগুলির বিষয় তোমাদের শুনাইব।

সিন্ধাবাদের প্রথমবার বাণিজ্য-যাত্রা

সিন্ধাবাদ বহুকষ্টে-সৃষ্টে অর্থ ও লোকজন সংগ্রহ করিয়া সমুদ্রবক্ষে বাহির হইয়া পড়িলেন।

অনেকদিন অনুচরবর্গের সহিত সমুদ্রের বিশাল জলরাশির মধ্যে দিন কাটাইবার কিছুদিন পরে জাহাজের অধ্যক্ষ দূরে একটি অদ্ভুত দ্বীপ দেখিতে পাইলেন। অনেকদিন পর মাটি ও সবুজ গাছপালা দেখিয়া নাবিকদের মনে খুব আনন্দ হইল এবং তাহারা সত্বর সেই শস্য-শ্যামল দ্বীপের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ক্রমে তাহারা সেই দ্বীপের নিকট উপস্থিত হইলে অধ্যক্ষ উহার তীরে নঙ্গর ফেলিতে আদেশ দিলেন। জাহাজ থামিলে তিনি ও তাহার অনুচরগণ নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ সমূহ হইতে ফলমূলাদি সংগ্রহ করিয়া তৃপ্তির সহিত আহার করিল।

এইরূপে কোনও উপায়ে তাহাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইলে শীতনিবারণ করিবার জন্য এক জায়গায় আগুন জ্বালাইয়া উহার চারিধারে সকলে ঘিরিয়া বসিলেন ও ক্রমে অগ্নির তাপে উহাদের শরীর সতেজ ও সবল হইল।

এইরূপ ভাবে কিয়ৎক্ষন অতিবাহিত হইবার পর হঠাৎ অধ্যক্ষ মহাশয় এক বিকট চীৎকার করিয়া বলিয়া উটিলেন—"এখানে বেশীক্ষণ বাসকরা নিরাপদ নহে, শীঘ্র প্রাণ লইয়া পলায়ন করা যাক্"! তাহার কথা শুনিয়া নাবিকেরা ভয়ে বিহ্বল হইয়া সেই মূহুর্ত্তেই জাহাজের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সকলে চলিয়া গেলে পরে জানা গেল যে ঐ দ্বীপটি আসলে একটি বৃহৎ মৎস্যের পৃষ্ঠদেশ মাত্র। এই চমৎকার মৎস্যটি বহুকাল একরূপ স্থবির ও নিশ্চলভাবে এক জায়গায় নিদ্রা যাওয়াতে উহার শরীরের উপর মাটি জমিয়াছে ও ফলে তাহাতে ঘাস ও বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইয়া ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় বোধ হইতেছিল।

আগুনের তাপ লাগিয়া সেই নিদ্রিত বৃহৎ মৎস্যটি নড়িয়া উঠিতেই অধ্যক্ষ ভয় পাইয়া ছিলেন এবং এই কারণে তিনি নাবিকদিগকে শীঘ্রই সেখান হইতে পলায়ন করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

অধ্যক্ষ তাঁহার অনুচরবৃন্দ সহ জাহাজে উঠিয়াই জাহাজের নঙ্গর খুলিয়া দিলেন ও অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা দলবল সহ সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

সকলেই প্রাণভয়ে পলায়ন করিল বটে কিন্তু কেহই সিন্ধাবাদের কথা স্মরণ করিল না, সুতরাং সে সেই নির্জ্জন দ্বীপে একা পড়িয়া রহিল।

এরূপ অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়াও সিন্ধাবাদ অধীর না হইয়া স্বীয় প্রাণরক্ষা করিবার এক উপায় বাহির করিলেন।

সিন্ধাবাদ অতি কষ্টে একটী গাম্‌লা জোগাড় করিলেন ও তাহার উপর ভর দিয়া সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। বহুদূর এইভাবে সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গের মধ্যে দিয়া ভাসিয়া চলিবার পর

নিকটে আর একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখিতে পাইলেন। এবং সেই দ্বীপে উপস্থিত হইলে সিন্ধাবাদ দেখিলেন যে সেখানে একটী অশ্ব মাটিতে বিশ্রাম করিতেছে ও নিকটেই তাহার প্রভু অঘোর নিদ্রা যাইতেছে। অকস্মাৎ একটী অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া অশ্বটি কর্কশ-স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল ও উহার শব্দ শুনিয়া সেই লোকটির ও নিদ্রাভঙ্গ হইল। অশ্বচালক নির্জ্জন দ্বীপে এক জন নূতন লোককে দেখিয়া স্তম্ভিত হইল ও সিন্ধাবাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

গামলায় চড়িয়া সমুদ্রে ভাসিতে লাগিল

সিন্ধাবাদ নিজ ভ্রমণ-কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ শুনাইলেন, লোকটী তাঁহার অসাধারণ সাহসিকতায় মুগ্ধ হইল।

সিন্ধাবাদ অল্প সময়ের মধ্যেই সেই লোকটীর সহিত বন্ধুত্ব করিয়া লইলেন। অশ্বচালক তাহার বন্ধুকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া এক নিকটবর্ত্তী গুহার মধ্যে লইয়া গেল এবং সেখানে গিয়া খাদ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া সিন্ধাবাদকে ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করিল। সিন্ধাবাদ অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত ছিলেন, সুতরাং অকুণ্ঠিত-চিত্তে সকল সামগ্রী নিমিষের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন।

সিন্ধাবাদ বিশ্রাম করিতে যাইয়া দেখিতে পাইলেন যে সেই গুহার ভিতর আরো অনেক জন লোক রহিয়াছে। তিনি কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হইলেন ও তাহাদের ঐ নির্জ্জন দ্বীপে বাস করিবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে অশ্বচালকটি বলিল যে তাহারা সকলেই উক্ত দ্বীপের যিনি রাজা তাঁহারই ভৃত্য, প্রতি বৎসর ঠিক এই সময় তাহারা ঐ গুহায় বাস করে।

পরদিন ভোর বেলায় রাজ-ভৃত্যগণ অশ্বগুলিকে সঙ্গে লইয়া রাজপ্রসাদে উপস্থিত হইল ও সিন্ধাবাদকে রাজার সম্মুখীন করিল।

রাজা সিন্ধাবাদকে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন ও পরে সে কি উপায়ে সেই নির্জ্জন দুর্গম দ্বীপে উপস্থিত হইয়াছে তাহাব সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইলে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন। সিন্ধাবাদের দুর্ভাগ্যের কথা শুনিয়া রাজার অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হইল ও তিনি ভৃত্যকে আজ্ঞা দিলেন যে সিন্ধাবাদকে যেন বিশ্রামাগারে লইয়া যাওয়া হয় ও অতি সমাদরে যেন তাহার পরিচর্য্যা করা হয়।

রাজার আদেশে রাজার-ভৃত্যেরা সিন্ধাবাদকে অতিথিশালায় লইয়া গেল ও তাহার যথোচিত সেবা ও সম্বর্দ্ধনা করিল।

সিন্ধাবাদ নিজে বণিক সুতরাং সেই দ্বীপের সকল বণিকগণের সহিত অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার খুব বন্ধুত্ব হইল।

প্রতিদিন সিন্ধাবাদ বণিকদিগকে নানান দেশ-বিদেশের কাহিনী শুনাইতেন ও নিজে শুনিতেন।

কয়েকদিন এইভাবে অতিবাহিত হইলে পর সিন্ধাবাদ একদিন নিকটবর্ত্তী এক বন্দরে যাইয়া তাঁহার নিজের জাহাজটী দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া তাহার আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। তিনি অবিলম্বে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ও পর্য্যবেক্ষণ

করিয়া জানিতে পারিলেন যে জাহাজটী তাঁহার সম্পত্তি।

তিনি জাহাজের অধ্যক্ষের সহিত বাক্যালাপ করিয়া জানিতে পারিলেন যে ঐ মালবাহী জাহাজটী কোন এক ধনী বণিকের। বণিকের নাম জিজ্ঞাসা করাতে অধ্যক্ষ বলিল—"এই জাহাজটী বাগদাদ সহরবাসী বিখ্যাত ধনী-ব্যবসায়ীর সম্পত্তি তাহার নাম সিন্ধাবাদ।" অধ্যক্ষ বহুকাল পরে সিন্ধাবাদকে দেখিয়া চিনিতে পারে নাই কিন্তু সিন্ধাবাদ তাহাকে চিনিয়াছিলেন।

সিন্ধাবাদ ক্যাপ্টেনকে নিজের পরিচয় দিলেন ও কি উপায়ে তিনি উক্ত জাহাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন সে সকল বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিলেন।

তখন অধ্যক্ষ বুঝিতে পারিল যে ইনি সত্য সত্যই বণিক সিন্ধাবাদ। ইহা বুঝিতে পারিয়া সে যার পর নাই আনন্দিত হইল ও সিন্ধাবাদকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিল।

তিনিও আর অধিক বিলম্ব না করিয়া সেই দ্বীপের রাজাকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া তাঁহার নিজের সেই বাণিজ্য জাহাজে স্ব-দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দেশে ফিরিয়া সিন্ধাবাদ বহুকাল পরে স্ত্রী পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া মহানন্দে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

সিন্ধাবাদ নাবিকের দ্বিতীয় বার বাণিজ্য-যাত্রা

কিছুদিন পরে সিন্ধাবাদ পুনরায় সমুদ্রপথে বাহির হইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সিন্ধাবাদ বহুকাল পরে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া সুখে ও শান্তিতে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ-প্রিয় সিন্ধাবাদ কিন্তু সাধারণ লোকের ন্যায় শান্তিতে সংসার করিবার লোক ছিলেন না। সুতরাং কয়েক বৎসর এই ভাবে দিন যাপন করিবার পরে পুনরায় তাঁহার মনে সমুদ্র-যাত্রার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল।

পুনরায় নানা রূপ বাণিজ্য-সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লোক জন সঙ্গে সিন্ধাবাদ তাঁহার বার সমুদ্রযাত্রার আয়োজন করিলেন।

আয়োজন সমাপ্ত হইলে যথা সময়ে সিন্ধাবাদ যাত্রা করিলেন।

এবার সিন্ধাবাদ একা যাত্রী হন নাই তাহার সহিত কয়েকজন বণিক ও ছিলেন। সমুদ্র-পথে বাহির হইয়া মাঝ সমুদ্রে উপস্থিত হইলে তিনি অদূরে একটি তরুলতা দ্বারা আবৃত দ্বীপ দেখিতে পাইলেন।

সেই দ্বীপে জাহাজ পৌঁছিলে বণিক ও সিন্ধাবাদের অনুচরগণ দ্বীপে অবতরণ করিলেন ও আহারাদির আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সিন্ধাবাদ অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তিনি অল্প সময়ের মধ্যে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের ছায়ায় নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন।

বহুক্ষণ এইভাবে নিদ্রিত থাকিবার পর যখন জাগরিত হইলেন তখন দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার জাহাজ লোকজন সহিত কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

তিনি জনশূন্য অরণ্যে নিঃসহায় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। পূর্ব্বের ন্যায় সিন্ধাবাদ এবারেও বিন্দুমাত্র অধৈর্য্য হইলেন না ও উপায়ন্তর না দেখিয়া নিকটস্থ এক বৃক্ষে আরোহণ করিলেন ও চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া বহুদূরে সমুদ্র বক্ষে তাহার জাহাজটিকে দেখিতে পাইলেন। জাহাজটি মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইল ও সিন্ধাবাদ তাহার সকল আশা ত্যাগ করিলেন।

বৃক্ষের উপর হইতে সিন্ধাবাদ হঠাৎ একটি শাদা রং এর অতি বৃহদাকার গোলাকার বস্তু দেখিতে পাইলেন। দূর হইতে উহা এক গোলাকার অট্টালিকার ন্যায় বোধ হইতেছিল। উক্ত বস্তু কি ও উহার ভিতরেই বা কি রহিয়াছে ইত্যাদি সবিশেষ জানিবার জন্য সিন্ধাবাদ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া অতি দ্রুতপদে সেই বস্তুটীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন উহাতে একটীও জানালা বা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার একটিও দরজা নাই। কিয়ৎক্ষণ

পরে হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল। সিন্ধাবাদ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে একটী বিশালাকার পক্ষী আকাশ হইতে নিম্নে নাবিয়া আসিতেছে। সিন্ধাবাদ থাকিয়া পক্ষীটির কার্য্য-কলাপ অবলোকন করিতে লাগিলেন।

এই সুবৃহৎ পক্ষীটির নাম রক্ পক্ষী ও বিশাল গোলাকার অট্টালিকার ন্যায় বস্তুটি ঐ পক্ষীর ডিম।

সিন্ধাবাদ ঝুলিতে ঝুলিতে আকাশে উঠিতে লাগিলেন

পক্ষীটি অতি সাবধানে নামিয়া আসিল ও ডিমের উপর বসিল। সিন্ধাবাদ এতক্ষণে সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন ও কি উপায়ে জনশূন্য দ্বীপ হইতে প্রাণ-রক্ষা করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

অনতিবিলম্বেই এক নূতন ফন্দি বাহির করিলেন।

তিনি স্বীয় মাথার পাগড়ীটী খুলিয়া 'রক' পক্ষীর পায়ের সহিত নিজেকে সজোরে আটীয়া বাঁধিয়া ফেলিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই পক্ষীটি উড়িতে আরম্ভ করিল ও উহার সহিত বণিক সিন্ধাবাদ ও ঝুলিতে ঝুলিতে আকাশে উঠিতে লাগিলেন।

এই ভাবে শূন্যদেশে বিচরণ করিবার কয়েক ঘণ্টার পর তিনি অনুভব করিলেন যে তাঁহার বাহনটী কোনও নূতন দেশে অবতরণ করিবার উপক্রম করিতেছে। ইহা ভাবিতে ভাবিতেই সিন্ধাবাদ এক অদৃশ্যপূর্ব্ব নূতন দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পূর্ব্বে নানা অজ্ঞাত দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছেন বটে কিন্তু এইরূপ সুবৃহৎ পক্ষী তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই। বিস্ময়ে ও ভয়ে আড়ষ্ট ও নিরুপায় হইয়া সিন্ধাবাদ এক ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া

নূতন দেশে অবতীর্ণ হইলে তিনি কোনও

মতে শরীরের বাঁধন খুলিয়া ফলমূল আহরণ করিবার জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আহারাদি সংগ্রহ করিয়া উদর পূর্ত্তি করিবার পর সিন্ধাবাদ এক নিরালা জায়গায় নিদ্রামগ্ন হইলেন।

সিন্ধাবাদ অনেকক্ষণ নিদ্রায় বিভোর হইয়াছিলেন। হঠাৎ এক বিকট শব্দ শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন ও পরমুহূর্ত্তেই দেখিলেন যে নিকটে এক বৃহৎ মাংসখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। প্রথমে সিন্ধাবাদ উহার কিছুই অর্থ বুঝিলেন না কিন্তু পরে অতি সহজেই উহার রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন। কারণ বহুকাল আগে সিন্ধাবাদ লোকমুখে শুনিয়াছিলেন যে অনেক দূরে মাঝ সমুদ্রে একটি অতি আশ্চর্য্য দ্বীপ আছে। সেখানে প্রচুর পরিমাণে মহামূল্য হীরক পাওয়া যায়। হীরার খনিতে নহে অমনি অজস্র হীরকখণ্ড মাটিতে ছড়ান থাকে। কিন্তু মানুষের সাধ্য নাই সে স্থানে যায়। কারণ উহা অতি বিষাক্ত সর্পের বাসস্থান।

এই কারণ বশতঃ লোভী বণিকগণ নিকটবর্ত্তী এক উচ্চ পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিয়া সেখান হইতে নীচে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ করে, যাহাতে হীরক খণ্ডগুলি তাহার গায়ে জড়াইয়া যায় এবং পরে ঈগলপক্ষিগণ সেই মাংস খণ্ডগুলি মুখে করিয়া আহার করিবার নিমিত্ত কোনও নিরাপদ স্থানে চলিয়া যায় ও বণিকগণ নানান কৌশলে সেই মাংস খণ্ড সংগ্রহ করিয়া হীরকগুলি বাহির করিয়া লয়। এই বিনা মূল্যে হীরক লাভ করিয়া নানান দেশে বাণিজ্য করিয়া অনেক বণিক লক্ষপতি হইয়া গিয়াছে।

সিন্ধাবাদ এই সকল কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন ও সে সকল গল্প যে অতি সত্য তাহা সহজেই বিশ্বাস করিলেন।

এই সকল বিষয় মনে মনে আলোচনা করিতেছেন এমন সময় একটি বৃহৎ ঈগল পক্ষী আসিয়া সিন্ধাবাদকে মুখে করিয়া তুলিয়া এক পর্ব্বত শিখরে আনিয়া ফেলিল। সেখানে সে অনেক বণিককে দেখিতে পাইলেন।

তাহারা সিন্ধাবাদকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল ও তাহার হাতে হীরকখণ্ড দেখিয়া বলিল—"তুমি কে এবং কাহার আদেশে আমাদের হীরক অপহরণ করিতেছ? সিন্ধাবাদ তাহাদের কথায় অবাক হইলেন। ও অতি বিনয়ের সহিত স্বীয় পরিচয় দিলেন।

বণিকগণ সিন্ধাবাদের ভ্রমণ-কাহিনী শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন ও তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া লইলেন।

সিন্ধাবাদ আপন ভদ্র-ব্যবহারে তাহাদের চমৎকৃত করিলেন ও পরে সেই বণিকগণের সহিত তাহাদের জাহাজে করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

সিন্ধাবাদ বাগদাদ সহরে ফিরিয়া আসিলে গরীব-দুঃখীদের বিস্তর মূল্যবান দ্রব্যাদি বিতরণ করিলেন ও পুনরায় সুখে শান্তিতে সংসারে বাস করিতে লাগিলেন।

সিন্ধাবাদ নাবিকের তৃতীয়বার বাণিজ্য যাত্রা

বাগদাদ সহরে পরম নিশ্চিন্ত মনে কিছুদিন কাটিয়া গেলে পর সিন্ধাবাদ পুনরায় বাণিজ্য-যাত্রার জন্য ব্যাকুল হইলেন। এবং শীঘ্রই বাণিজ্য-যাত্রার জন্য পণ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলেন এবং এক শুভদিন দেখিয়া যাত্রা করিলেন।

কয়েকদিন জাহাজ নিরাপদে সমুদ্রের বুক দিয়া চলিতে লাগিল। সকলেই বেশ আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন, কিন্তু বিধাতা সিন্ধাবাদের অদৃষ্টে কোনদিনই শান্তি ও সুখ লেখেন নাই, এবং পূর্ব্বে দুইবার যেমন বাণিজ্য-যাত্রা সহজ হয় নাই, এইবারও তাহা হইল না।

একদিন ভয়ানক দুর্য্যোগ দেখা দিল, সমুদ্রের বুকে ভীষণ ঢেউ উঠিয়া জাহাজ তোলপার করিতে লাগিল। এবং জাহাজের অধ্যক্ষ অন্ধকারের মধ্যে দিক নির্ণয় করিতে পারিলেন না, জাহাজ একটা নিমজ্জমান পর্ব্বতের বুকে আঘাত পাইয়া ডুব নামে একটি পর্ব্বতের গায়ে আসিয়া ঠেকিল।

এই স্থানে একজাতীয় অদ্ভুতাকৃতি হনুমান বাস করিত। এই বানরগুলি দল বাঁধিয়া জাহাজে আসিল এবং জাহাদের ভিতরকার সমুদয় পণ্যদ্রব্যাদি নষ্ট করিয়া ফেলিল, কিন্তু মানুষের উপর কোনও অত্যাচার করিল না। সিন্ধাবাদ ও তাহার দলের লোকেরা তীরে নামিয়া একটি বাড়ী দেখিতে পাইয়া তাহাতে যাইয়া আশ্রয় লইল।

বাঙ্গলার তিনটি প্রাচীন রাজধানী

বন্দর সপ্তগ্রাম

৩১২৮ পৃষ্ঠার পর

তোমরা তাম্রলিপ্ত বন্দরের কথা শুনিয়াছ। এক্ষণে তোমাদিগকে বাঙ্গলার আর একটী প্রসিদ্ধ বন্দরের কথা বলিতেছি। ইহার নাম বন্দর সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ। তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতন হইলে সপ্তগ্রাম বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। সাতটি গ্রাম মিলিয়া ইহার সপ্তগ্রাম নাম হয়। এইরূপ শুনা যাইত যে, এই সাতটি গ্রামে সাতজন ঋষি তপস্যা করিতেন। তাঁহাদের তপস্যার জন্য ইহা একটি পুণ্যতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

"তীর্থমধ্যে পুণ্যতীর্থ অতি অনুপম
সপ্তঋষি শাসনে বসয়ে সপ্তগ্রাম।"

এই সপ্তগ্রাম কোথায় অবস্থিত ছিল এক্ষণে সে কথা তোমাদিগকে বলিতেছি। যুক্তবেণী ও মুক্তবেণীর কথা তোমরা জান কিনা বলিতে পারি না। যেখানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদী মিলিত হইয়াছিল, তাহার নাম যুক্তবেণী। প্রাগ বা এলাহাবাদই সেই যুক্তবেণী। এখানে গঙ্গা, যমুনা ও স্বরস্বতী মিলিত হইয়াছিল। আর যেখানে তাহারা ছাড়াছাড়ি হইয়া তিন দিকে গিয়াছেন, তাহাকে মুক্তবেণী বলে। বাঙ্গালীর হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীতে এইরূপ হইয়াছে। এই মুক্তবেণী বা ত্রিবেণী হইতে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী তিন দিকে গিয়াছে। ত্রিবেণীর নিকট সরস্বতীর তীরে সপ্তগ্রাম অবস্থিত ছিল। ক্রমে তাহা ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া একটি প্রসিদ্ধ বন্দর হইয়া উঠে।

যেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্তঋষি স্থান।
জগতে বিদিত সে ত্রিবেণী ঘাট নাম॥
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতী সঙ্গম॥

হিন্দুরাজগণের সময় হইতেই সপ্তগ্রাম বন্দরের সমৃদ্ধির কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। মুসলমান রাজত্বকালেও ইহার গৌরব উচ্চ সীমায় উঠিয়াছিল। এখানে নানাদেশের নৌকা ও জাহাজ আসিয়া নানাবিধ পণ্যদ্রব্য দেশবিদেশে লইয়া যাইত। ইউরোপীয় বণিকগণও এখানে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। প্রত্যেক বৎসর চাউল, কার্পাস বস্ত্র, লাক্ষা, চিনি কাগজ, তৈল প্রভৃতি দ্রব্য বাণিজ্য তরীসমূহে বোঝাই হইয়া নানাদেশে চলিয়া যাইত। এখনকার বণিকেরা নানা ধনরত্নের অধিকারী ছিলেন। তাহারা বিদেশে যাইতেন না। ঘরে বসিয়াই বহু ধন উপার্জ্জন করিতেন। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :

"সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও নাহি যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥

এখানকার লোকসকল সমৃদ্ধশালী ছিল। পুরুষেরা সুন্দরকান্তি ও রমণীরা পতিব্রতা ছিলেন। তাঁহারা নানা স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া থাকিতেন :

"পুরুষ-মদন যেন রমণী সাবিত্রী হেন,
আভরণ সব স্বর্ণময়।"

বাঙ্গলার এই সুপ্রসিদ্ধ বন্দর নানা অট্টালিকায় সুশোভিত হইয়া এককালে আপনার গৌরব-শ্রী বিস্তার করিয়াছিল। সরস্বতী মজিয়া যাওয়ায় ইহার ধ্বংস হয়। পরে অন্যান্য স্থান বন্দর হইয়া উঠে। সে কথা তোমাদিগকে পরে বলিব। সপ্তগ্রাম এক্ষণে ধ্বংসাবশেষে পূর্ণ একটী সামান্য গ্রাম মাত্র। ইহা হুগলীর নিকট অবস্থিত।

সপ্তগ্রাম অধিকার

আমরা বলিয়াছি যে সপ্তগ্রাম হিন্দু-রাজাদিগের অধীন ছিল কিন্তু মুসলমানেরা পরে ইহা অধিকার করিয়া লন। বগড়াখাঁর পুত্র কৈকায়ুস্ শাহের রাজত্ব সময়ে জাফরখাঁ নামে একজন সেনাপতি হিন্দুদিগকে পরাজিত করিয়া সপ্তগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে সপ্তগ্রাম মুসলমানদিগের অধীন হয়। জাফরখাঁ সপ্তগ্রামে একটি মস্‌জীদ্ নির্ম্মাণ করেন ও একটী বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছিলেন। গঙ্গা ও সরস্বতী সঙ্গম স্থলে একটী পাথরের দেব-মন্দিরের-মধ্যে জাফরখাঁর সমাধি আছে। সমাধির নিকট অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ গঠিত একটি মস্‌জীদ্ও দেখিতে পাওয়া যায়। এই মস্‌জীদ্‌টী বোধহয় জাফরখাঁর নির্ম্মিত মস্‌জীদের স্থানে পরে গঠিত হইয়া থাকিবে। মুসলমান অধিকারে আসিয়াও সপ্তগ্রামের গৌরব দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে তোমরা সে কথা শুনিতে পাইবে।

জাফরখাঁকে সাধারণ লোক বলিত দরাফখাঁ। দরাফখাঁ কর্ত্তৃক অতি সহজ সংস্কৃতে রচিত একটি গঙ্গাস্তব বাঙ্গালা দেশে প্রসিদ্ধ আছে। যথা:—

সুরধুনি মুনিকন্যে! তারয়েঃ পুণ্যবন্তং।
স তরতি নিজ পুণ্যৈ স্তত্র কিংতে মহত্বম্॥
যদিচ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং।
তদিহ তব মহত্বং তন্মহত্বং মহত্বম্ ইত্যাদি।

জাফর খাঁর রচিত এই গঙ্গাস্তবটি বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

সুবর্ণ-গ্রাম বিজয়

এই সময় হইতে পূর্ব্ববঙ্গও মুসলমান-গণ অধিকার করিয়া লন। যে সময়ে বগড়া খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শমসুউদ্দীন শাহ লক্ষ্মণাবতীতে রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে অনুমান হয় তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ সুবর্ণগ্রাম অধিকার করেন। দনুজরায় সে সময়ে জীবিত ছিলেন কিনা

বলা যায় না। জীবিত থাকিলে তিনি যে তখন হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ বলবন বাদ্‌শাহের বাঙ্গলায় আগমনের সময় তাঁহার যেরূপ প্রতাপ ছিল বলিয়া জানা যায়, সেরূপ প্রতাপ থাকিলে, মুসলমানেরা তাঁহার হস্ত হইতে সুবর্ণগ্রাম অধিকার করিতে পারিতেন না। তাই মনে হয়, হয় তিনি হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন, না হয় সে সময়ে জীবিত ছিলেন না। সে যাহা হউক একই সময় হইতে সুবর্ণগ্রাম মুসলমানদিগের অধিকারে আইসে।

বাঙ্গলার তিনটী বিভাগ

দিল্লীতে বল্‌বন বংশীয়েরা সিংহাসনচ্যুত হইলে তোগলক বংশীয়েরা বাদ্‌শাহ হন। লক্ষ্মণাবতীর বল্‌বন-বংশীয়েরা আপনাদের মধ্যে বিবাদ করিয়া ক্রমে ক্রমে রাজ্যচ্যুত হন। তোগলক বাদশাহেরাও তাঁহাদিগকে দমন করিতে বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন। এই সময়ে বাঙ্গলা রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া তিনজন শাসনকর্ত্তার অধীন হয়। শমসুউদ্দীন ফিরোজ শাহের তৃতীয় পুত্র নাসিরুউদ্দীন ইব্রাহিম তোগলক বাদশাহের অনুগ্রহে **লক্ষ্মণাবতীর** শাসনভার পাইয়াছিলেন। যিনি **সুবর্ণগ্রামের** শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন, তাঁহার নাম **তাতার খাঁ**। আর সপ্তগ্রামেরও একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নাম জানিতে পারা যায় না। জাফরখাঁর পর বোধ হয় তিনি নিযুক্ত হইয়া থাকিবেন। এইরূপে **লক্ষ্মণাবতী, সুবর্ণগ্রাম** ও **সপ্তগ্রামকে** এক একটী রাজধানী করিয়া বাঙ্গলা রাজ্য উত্তর **বঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ,** এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়। পরে এই তিন ভাগ এক হইয়া গেলেও অনেকদিন পর্য্যন্ত ইহাদিগকে বেশ স্বতন্ত্রভাবে বুঝা যাইত।

বাঙ্গলার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন

দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহ তোগলকের রাজত্বকালে দিল্লী সাম্রাজ্যে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তারা এই সুযোগে ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা ফখরউদ্দীন স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে প্রবল হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরেই আলি খাঁ নামে লক্ষ্মণাবতীর সেনাপতি লক্ষ্মণাবতী হস্তগত করিয়া আলাউদ্দীন আলিশাহ উপাধি ধারণ করেন। তিনিও আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া প্রচার করেন। আলিশাহ গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীর নিকট পাণ্ডুয়ায় আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। আলিশাহ পশ্চিম বঙ্গেরই অধিপতি হইয়াছিলেন। ফখরউদ্দীন কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ নিজ অধিকারে রাখিয়াছিলেন। উহাদের দুই জনের মধ্যে অনেকদিন ধরিয়া বিবাদ চলিয়াছিল। তাহার পর আলিশাহের ধাত্রীপুত্র হাজী ইলিয়াস্ তাঁহাকে নিহত করিয়া পশ্চিম বঙ্গের অধীশ্বর হন। তিনি ফখরউদ্দীনের পুত্র গাজী শাহকে নিহত করিয়া, পূর্ব্ববঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গও অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি সমগ্র বাঙ্গলারই স্বাধীন নরপতি হইয়াছিলেন। এবং শমসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। ইলিয়াস শাহ পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থাপন করেন।

মিশরদেশীয় ভ্রমণকারী

ফখরউদ্দীনের রাজত্বকালে মিশরদেশীয় ভ্রমণকারী **ইবন বতুতা** চট্টগ্রামে আসিয়া-

ছিলেন। চট্টগ্রামের বাণিজ্য-গৌরব তখন সকলকেই আকর্ষণ করিত। চট্টগ্রাম চাটিগ্রাম ইহার কিছুকাল পরেই ইয়ুরোপীয় বণিকগণের নিকট পোর্টোগ্রাণ্ডি বা বড় বন্দর নাম লাভ করিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠে। সপ্তগ্রামকে ইয়ুরোপীয় বণিকগণ পোর্টো-পিকোয়োলো বা ছোট বন্দর বলিত। ইবন বতুতার বিবরণ হইতে সেকালের বাঙ্গলার দ্রব্য মূল্যের কথা জানিতে পারা যায়। ইবন বতুতা রতল্ নামে এক ওজনের উল্লেখ করিয়াছেন। উহা বর্ত্তমান কালের প্রায় ১৪ সেরের সমান। এদেশে প্রচলিত রজত মুদ্রার নাম ছিল দীনার। তখন একটী দীনারে পঁচিশ রতল চাউল এবং আশী রতল ধান পাওয়া যাইত। দুই দীরহম বা এক দুয়ানতে এক রতল তিলের তৈল ও চারি দীরহমে এক রতল গব্য ঘৃত অথবা মাখন মিলিত। তিন দীনারে একটী দুগ্ধবতী গাভী কেনা যাইত। এক দীরহামে আটটি হৃষ্টপুষ্ট কুক্কুট এবং তাহাতে পনেরটি সেইরূপ পারাবত পাওয়া যাইত। একটী বৃহদাকার মেষের মূল্য ছিল দুই দীরহাম্। আট দীর-হামে এক রতল গুড় মিলিত, চার দারহামে এক রতল চিনি পাওয়া যাইত। দুই দীনার দিলে ত্রিশ হাত একখানি সূক্ষ্ম মস্‌লিন বা কার্পাস বস্ত্র কিনিতে পারা যাইত। একটী স্বর্ণ দানারে একটী সুন্দরী যুবতী ক্রীতদাসী ও দুইটী স্বর্ণ দীনারে একটী সুন্দর কিশোর বয়স্ক ক্রীতদাস মিলিত। ইহা হইতে বুঝা যায়, তখন এদেশে কত সুলভ মূল্যে জিনিষ-পত্র পাওয়া যাইত। এখনকার দ্রব্য মূল্যের সহিত তখনকার যে তুলনা হয় না, তাহা অবশ্য তোমরা বুঝিতে পারিতেছ।

সুলতানে-সুলতানে

ইলিয়াস্ শাহ সমস্ত বাঙ্গলার অধিপতি হইয়া, জাজনগর আক্রমণ করিতে গিয়া-ছিলেন। তিনি তথা হইতে অনেক ধন-রত্ন লুণ্ঠন করিয়া আনেন। ইলিয়াস্ শাহ ক্রমে ক্রমে বারাণসী পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিযাছিলেন। এই সময়ে ফিরোজশাহ তোগলক্ দিল্লীর সুলতান ছিলেন। দিল্লী সাম্রাজ্যের কতকস্থান হস্তচ্যুত হওয়ায় ফিরোজশাহ ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে বাঙ্গ-লায় আসিয়া উপস্থিত হন। তখন সুলতানে-সুলতানে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। বাঙ্গলা প্রবেশের পূর্ব্বে ইলিয়াস শাহ ফিরোজ-শাহকে বাধা দিবার জন্য গঙ্গা ও কুশী নদীর সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ফিরোজ কুশী পার হইলে ইলিয়াস বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসেন। তিনি পাণ্ডুয়া পরিত্যাগ করিয়া একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইলিয়াস ফিরিয়া আসিলে ফিরোজ তাহার পশ্চাতে বাঙ্গলায় চলিয়া আসেন। তিনি একডালা দুর্গ অবরোধ করিয়া অনেক-দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গ অধিকার করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যান। ইলিয়াস তখন একডালা দুর্গ হইতে বাহির হইয়া ফিরোজের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করেন। তখন উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইলিয়াস শাহ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আবার একডালা দুর্গে আশ্রয় লন। ফিরোজ আবার তাহা অবরোধ করেন। তিনি এবারও একডালা দুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই। কাজেই বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ইলিয়াস্ ও ফিরোজ শাহের যুদ্ধের সময় হিন্দু জমীদারগণ দুই দিকেই যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয় সুলতানের নিকট হইতেই অনেক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, **সহদেব** নামে একজন বাঙ্গালী বীর ইলিয়াসের পক্ষে

যুদ্ধ করিয়া অনেক সৈন্যের সহিত জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।

ইলিয়াস্ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সেকেন্দার শাহ বাঙ্গলার বাদশাহ হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়েও দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহ আবার বাঙ্গলা আক্রমণ করেন। সেকেন্দরও পিতার ন্যায় একডালা দুর্গে আশ্রয় লন। ফিরোজ শাহ আবার তাহা অবরোধ করেন। কিন্তু দুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই। পরে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। ফিরোজ শাহ সেকেন্দরশাহকে বাঙ্গলার স্বাধীন নরপতি বলিয়া স্বীকার করেন এবং উভয়েব সীমা স্থির করিয়া লওয়া হয়।

আদিনা মস্জীদ

ফিরোজশাহের সহিত সন্ধি করিয়া সেকেন্দর শাহ নির্ব্বিবাদে বাঙ্গলায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি পাণ্ডুয়ায় আদিনা মসজীদ নামে এক প্রকাণ্ড মস্জীদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার ন্যায় সুবৃহৎ মস্জীদ ভারতবর্ষের আর কোন স্থানে এখনও নির্ম্মিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন যে একটি বৌদ্ধ স্তুপ ধ্বংস করিয়া এই মসজীদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু অনেক হিন্দু দেবমন্দিরের উপকরণ লইয়া ইহা যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা ইহার ধ্বংসাবশেষ হইতেই জানিতে পারা যায়। মসজীদের মধ্যে অনেক হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখা গিয়া থাকে। তাহাতেই ইহা অনুমান হয়।

কাজী ও বাদশাহ

সেকেন্দরশাহের পুত্র গিয়াসুউদ্দীন বিমাতার ষড়যন্ত্রে পিতার বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সেকেন্দর তাঁহাকে দমন করিতে গিয়া আহত হন। যদিও গিয়াসুউদ্দীন সৈন্যদিগকে পিতার অঙ্গে আঘাত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং সৈন্যেরাও যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করিযাছিলেন তথাপি সেকেন্দর আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন। গিয়াসুদ্দীন পিতার মস্তক নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সেকেন্দর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া এ জগৎ হইতে বিদায় লন। গিয়াসুউদ্দীন তাহার পর বাঙ্গলার বাদশাহ হন। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ নরপতি ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে :

গিয়াসুদ্দীন শরক্ষেপ অভ্যাস করিবার সময় এক বিধবার পুত্রকে বাণবিদ্ধ করেন। বিধবা কাজী সিরাজউদ্দীনের নিকট বাদশাহের নামে অভিযোগ করিলে, কাজী বাদশাহকে তাঁহার বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠান। বাদশাহ কাজীর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বিধবাকে অর্থ দিয়া শান্ত করিতে বলেন, নতুবা তাঁহাকে মুসলমান শাস্ত্রানুসারে দণ্ডভোগ করিতে হইবে বলিয়া জানান। বাদশাহ বিধবাকে যথোচিত অর্থ দিয়া শান্ত করিলে, কাজী তাঁহার আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া বাদশাহকে অভিবাদন করেন। বাদশাহ তাঁহার পোষাকের নিম্নে লুক্কায়িত একখানি ক্ষুদ্র তরবারি দেখাইয়া কাজীকে বলেন যে যদি আপনি ন্যায় বিচার না করিতেন, তাহা হইলে এই তরবারি দ্বারা আপনার মস্তক ছেদন করিতাম। কাজীও তাঁহার আসনের নিম্ন হইতে চাবুক বাহির করিয়া বাদশাহকে দেখাইয়া বলিলেন যে, যদি আপনি আমার আদেশ পালন না করিতেন, তাহা হইলে এই চাবুকের আঘাতে

আপনার পিঠের চামড়া ছিঁড়িয়া ফেলিতাম। বাদশাহ কাজীর কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনেক পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা হইতে তোমরা অবশ্য কাজী ও সুলতান উভয়েই ন্যায়পরতার পরিচয় পাইয়াছ।

গিয়াসউদ্দীন এক সময়ে একটী কবিতার এক চরণ লিখিয়া তাহার পূরণ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলায় বা ভারতবর্ষে কাহারও দ্বারা তাহার পূরণ হইয়া উঠিল না। তখন তিনি পারস্যের সিরাজনগরের সুপ্রসিদ্ধ কবি হাফেজের নিকট কবিতাটি পূরণ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন ও তাঁহাকে তাঁহার দরবারে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান। হাফেজ কবিতাটি পূরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অর্থলালসা না থাকায় তিনি গিয়াসউদ্দীনের দরবারে আসেন নাই।

চীন দেশীয় ভ্রমণকারীর বিবরণ

গিয়াসউদ্দীনের পুত্র সৈফ্‌উদ্দীন হমজা শাহের রাজত্বকালে মাহুয়ান নামে একজন ভ্রমণকারী চীন সম্রাটের দূতের সহিত বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন। তিনি সুমাত্রা দ্বীপ হইয়া চট্টগ্রাম ও সুবর্ণগ্রামে উপস্থিত হন এবং বাঙ্গলা রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। মাহুয়ান তাঁহার বিবরণে লিখিয়াছেন যে,—"এই দেশের নগর সমূহ প্রাচীর-বেষ্টিত। অধিবাসিগণ মুসলমান এবং কৃষ্ণবর্ণ, তাহারা মস্তক-মুণ্ডন করে। রাজা ও রাজকর্ম্মচারিগণ মুসলমানের পোষাক পরিয়া থাকেন। এই দেশের ভাষার নাম বাঙ্গলা. তবে পার্শীভাষার ব্যবহারও হয়। এদেশের মুদ্রার নাম টঙ্কা অল্প মূল্যের জন্য কড়িও প্রচলন আছে। এদেশ গ্রীষ্মপ্রধান। এখানে অনেক প্রকার ধান্য, যব, গম, সরিষা, প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। নারিকেল, ধান্য, তাল প্রভৃতি হইতে মদ প্রস্তুত হয়। কলা, কাঁঠাল, আম, দাড়িম প্রভৃতি ফল ও ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। এদেশে ছয় প্রকার কার্পাস নির্ম্মিত সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈয়ার হয়। এই সকল বস্ত্র ঊনিশ হাত লম্বা ও দুই হাত চওড়া। এদেশে রেশমের কীট পালিত হয় এবং রেশমী কাপড়ও হইয়া থাকে। চিকিৎসক, জ্যোতিষী, শিল্পী ও পণ্ডিতগণের বাস আছে। রাজা বাণিজ্যের জন্য বিদেশে জাহাজ পাঠাইয়া থাকেন। মুক্তা ও বহুমূল্য মণি সকল চীনদেশে পাঠান হয়।"

বাঙ্গলার সিংহাসনে হিন্দু রাজা

মুসলমানগণ বাঙ্গলায় রাজত্ব করিতে থাকিলেও হিন্দুরা একেবারে রাজ্যশাসনের সম্বন্ধ ছাড়িয়া দেন নাই। তাঁহারা সময়ে সময়ে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন ও প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীর পদলাভ করিতেন। রাজা গণেশ নামে ভাতুড়িয়া পরগণার হিন্দু জমীদার সুলতান গিয়াসউদ্দীনের সময়ে রাজস্ব ও শাসনবিভাগের কর্ত্তা হইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। মুসলমান সুলতানগণ হিন্দু প্রজাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। গণেশ রাজা হইয়া আবার হিন্দুদিগের ক্ষমতা বিস্তারের ও ইচ্ছা করিতেছিলেন। এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে; গণেশেরই ষড়যন্ত্র বাদশাহ গিয়াসউদ্দীন নিহত হইয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র-পৌত্রেরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, গণেশ গিয়াসউদ্দীনের পৌত্র সুলতান শিহাবউদ্দীনকে নিহত করিয়া পাণ্ডুয়ার সিংহাসন অধিকার করেন। নরসিংহ নাড়িয়াল নামে একজন ব্রাহ্মণের পরামর্শে তিনি শিহাব-

উদ্দীনকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় :

"যেই নরসিংহ যশ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥
যাহার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়িয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হইল রাজা॥"

গণেশ রাজা হওয়ার পর মুসলমানেরা তাঁহাকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করে। তখন গনেশের পুত্র যদুকে মুসলমান করিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দেওয়া হয়। গণেশ কিন্তু আবার তাঁহার হস্ত হইতে রাজ্য-ভার গ্রহণ করেন। গণেশ দনুজমর্দ্দনদেব নাম ধারণ করিয়া বাঙ্গলার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বাঙ্গালা অক্ষরে পাণ্ডুয়া, সুবর্ণগ্রাম ও চাটিগ্রাম হইতে টাকা প্রচার করেন। তিনি গৌড় রাজ্যের যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গনেশ, যদুর প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া আবার তাঁহাকে হিন্দু করাইয়া লইয়াছিলেন। যদুকে কতিপয় সুবর্ণ-নির্ম্মিত গাভীর উদর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বাহির করান হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। গণেশের সময়ে হিন্দুধর্ম্ম এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। হিন্দুরা তাঁহাকে রাজা পাইয়া যারপর নাই আনন্দলাভ করিয়াছিল। ফলতঃ গণেশ যে দীর্ঘকাল মুসলমান রাজত্বের পর বাঙ্গলা দেশে একটী নূতন যুগ আনিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজা গণেশ কি জাতি ছিলেন তাহা আজও ঠিক হয় নাই। গণেশের সময় পাণ্ডুয়া বা পাণ্ডুনগর অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এবং তাহাতে অনেক হিন্দু-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। গণেশ বিশ্বস্ত মুসলমান প্রজা, কর্ম্মচারী, সাধু ও বিদ্বানদিগগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেন। তাহারা তাঁহাকে এরূপ ভালবাসিত যে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শব লইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছিল বলিয়া কথা প্রচলিত আছে। হিন্দুরা তাহা দাহ করিতে আর মুসলমানেরা কবর দিতে উদ্যত হইয়াছিল।

গণেশের পর যদু মহেন্দ্র নাম ধারণ করিয়া বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং বাঙ্গলা অক্ষরে ছাপিয়া ঐ নামে টাকা প্রচার করিলেন। অল্প দিন পরেই কিন্তু তিনি আবার মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

সংস্কৃত চর্চ্চার সূত্রপাত

আমরা বলিয়াছি যে রাজা গণেশের সময় হইতে সংস্কৃত-চর্চ্চা আরম্ভ হয়। মুসলমান-বিজয়ের পর হিন্দুরা গ্রন্থ রচনার বড় অবসর পান নাই। এক্ষণে হিন্দু অভ্যুত্থানের সময় তাঁহারা ইহাতে মনোনিবেশ করেন। বৃহস্পতি নামে একজন রাঢ়ীয়-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই সময়ে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রন্থ, অনেকগুলি কাব্যের টীকা ও প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অভিধান, অমর কোষের একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন এবং "রাজ-মুকুট" উপাধি লাভ করেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত উদয়নাচার্য্য তাঁহার 'কুসুমাঞ্জলি' নামে ন্যায় শাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাঁহারা উভয়েই বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। সংস্কৃত-চর্চ্চার এই সূত্রপাত হইতে ক্রমে ক্রমে তাহার উন্নতি হইয়াছিল।

সেকালে যেমন রাজা ও বাদশাহদের দরবারে পণ্ডিতগণের সম্মান ছিল, তেমনি জনসাধারণের নিকটও পণ্ডিতগণ সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করিতেন।

সমুদ্রের শৈবাল

শৈবাল বলিলেই পুকুর ঘাটের সবুজ শেওলার কথা তোমাদের মনে পড়িবে। সমুদ্রেও যে শৈবাল জন্মে এবং তাহারাও যে সত্য সত্যই পুকুরের শেওলার জ্ঞাতি ভাই তাহা তোমরা নাও জানিতে পার, কারণ তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো সমুদ্র দেখো নাই; আবার বাংলা কিংবা পুরীর কিনারা ঘেঁসিয়া বঙ্গোপসাগরের যে অংশ অবস্থিত তাহাতে সামুদ্রিক শৈবাল বড় একটা পাওয়া যায় না।

ভগবানের সৃষ্ট মানব হিসাবে পৃথিবীর সমস্ত মানুষই জ্ঞাতি ভাই হইলেও বাসের স্থান ও প্রতিবেশ (environment) হিসাবে কেহ বেঁটে, কেহ লম্বা, কাহারও দেহের বর্ণ সাদা, কাহারও বা কাল আবার কাহারও বা পীত হওয়া যেমন স্বাভাবিক তেমনিই সমুদ্রের বিরাট বিস্তৃতি ও লবণাক্ত জলের জন্য সামুদ্রিক শৈবাল পুকুর বা খাল বিল ডোবার শৈবাল হইতে পৃথক। পুকুর প্রভৃতির শেওলা ছোট, সমুদ্রের শেওলা অতিকায়, পুকুরের শেওলার দেহের বর্ণ সবুজ (green), আর না হয় নীল হরিৎ (blue green), সমুদ্রের শেওলার দেহের বর্ণ পিঙ্গল (olive-green), আর না হয় লাল (red), সবুজ সামুদ্রিক শৈবালেরও অভাব নাই। আকারে অবয়বের গঠন পারিপাট্যে, দেহের বর্ণ বৈচিত্র্যে পৃথক হইলেও ইহারা সকলেই একই শৈবাল শ্রেণীর (Algae) অন্তর্গত এবং ইহাদের কেহ সত্যিকারের পাতা, কাণ্ড ও মূলে বিভক্ত নয়; ইহারা ফুল ফল ধারণ করে না এবং বীজ (seed) দ্বারা বংশ রক্ষা কিংবা বিস্তার করে না। সমুদ্রের কিনারায় পাহাড়-পর্ব্বতের গায়ে ইহাদের অনেককেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের দেহের নানাবর্ণের ছটা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়াই পারে না। ইহারা নানা অবস্থায় সমুদ্রের মধ্যে অবস্থান করে। মেক্সিকোর কাছে সারগোসো উপসাগরে (gulf of Sargasso) বহু যোজন জুড়িয়া ভাসমান অবস্থায় সারগেসা (Sargassum) নামক সামুদ্রিক শৈবাল বহু শতাব্দী ধরিয়া একই স্থানে একই অবস্থায় দেখা যাইতেছে।

দেহের বর্ণ হিসাবে সামুদ্রিক শৈবালকে দুইটী প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। যাহাদের দেহের বর্ণ পিঙ্গল তাহাদিগকে **পিঙ্গল সামুদ্রিক শৈবাল** (Olive-green Sea-weeds, Phaeophy-

ceae) এবং যাহারা লাল তাহাদিগকে **রক্ত সামুদ্রিক শৈবাল** (Red Sea-weeds, Rhodo-

ম্যাক্রোসিস্‌টিস

phyceae) বলা হয়। ইহাদের মধ্যে তৃণ হরিৎ grass green) এবং বেগুনী (purple) সামুদ্রিক শৈবালও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে দেহের প্রসার ও সংখ্যাগরিষ্ঠে **ফিওফাইসী** বেশী এবং সমুদ্রের উপকূলেই সাধারণতঃ ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কেহ কেহ আবার গভীর সমুদ্রেরও অধিবাসী, তখন আকারে ইহারা খুব বড় হইয়া থাকে। সমুদ্রের উপকূলে যেথানে ইহারা জন্মে সেখানে সমুদ্রের কিনারা দিয়া মাইলের পর মাইল ধরিয়া এবং সমুদ্রের মধ্যে প্রায় এক মাইল বিস্তৃত অবস্থায় ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে।

রোডোফাইসীর (রক্ত শৈবাল) দেহ সাধারণতঃ কোমল। গভীর সমুদ্রে যেথানে ঢেউএর বালাই নাই, অথবা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে ইহারা জন্মিয়া থাকে। জলের নীচে বাস করিতেই ইহারা ভালবাসে। সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে ইহাদের দেহের বর্ণ সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। একখানা তিন কোণা কাচের ভিতর দিয়া সূর্য্যের আলোক দেখিলে যেমন তাহারা নানা প্রকার বর্ণচ্ছটা দেখা যায় সূর্য্যের কিরণ সামুদ্রিক শৈবালের উপর পতিত হইলে উহাদের দেহ হইতে নানা প্রকার বর্ণের আভা বাহির হয়।

ম্যাক্রোসিস্‌টিস (Macrocystis) পিঙ্গল সামুদ্রিক শৈবাল। ইহাদের কাহারও কাহারও
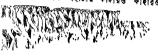
দেহের বিস্তৃতির সহিত তুলনায় ডাঙ্গার অতিকায় মহীরুহ নাবালক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাদিগের দুইজনকে পাশাপাশি দাঁড় করাইলে সেকালের রাক্ষস ও বামনের কথা কিংবা একালের লরেল হার্ডির কথা মনে পড়া অসম্ভব না। ক্যাপ্টেন কুক দক্ষিণ মহাসাগরে ভ্রমণ করিবার সময় ম্যাক্রোসিসটিস বংশের এক জনের দেহের ১২০´ ফুট লম্বা কাণ্ড মাপিয়াছিলেন। হুকার (Hooker) তাঁহার

পসটেলসিয়া

Botany of the Antarctic Voyage of the Erebus and Terror নামক ভ্রমণ কাহিনীতে ইহাদের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার মতে ১০০´ ফুট হইতে ২০০´ ফুট লম্বা কাণ্ড ইহাদের পক্ষে অতি সাধারণ কথা। D' Urville রও ইহাই অভিমত। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে অনেকে ইহাদের হাজার ফুট কিংবা তাহারও বেশী লম্বা কাণ্ড দেখিয়াছেন বলিয়া গিয়াছেন। হাজার ফুটের উপর দেহ অবশ্য এককালে টানিয়া উঠাইয়া দেখা অসম্ভব। কিন্তু ছিঁড়িয়া টানিয়া দুই তিন শত ফুট লম্বা অংশ অনেকেই তুলিয়াছেন। Falkland Islands, Cape Horn এবং Keguelen's Land এর বন্দর সমূহে ম্যাক্রোসিষ্টিস্ এত অধিক সংখ্যায় জন্মে যে উহাদিগকে ভেদ করিয়া বন্দরে প্রবেশ করা বড় বড় জাহাজের পক্ষেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, ছোট ছোট নৌকার পক্ষে তো কা: কথা! তোমাদেব মধ্যে আমারই মত যাহাদের বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে তাহারা এ কথার সত্যতা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবে। বর্ষার প্রথম অবস্থায় পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে ছোট ছোট নদী নালা কচুরী পানায় এমন ভাবে 'জাম' বা রুদ্ধ (jam) হইয়া যায় যে তখন নৌকায় চলাফেরা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে। Falkland Islands এর বেলাভূমিতে ম্যাক্রোসিস্টিস এর মানুষের দেহেব সমান মোটা মোটা দেহ মাইলের পর মাইল জুড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় গ্রীষ্ম মণ্ডল (Tropics), এবং পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

পস্‌টেল্‌সিয়া নামে ইহাদেরই আর এক জ্ঞাতি ভাই আছে যাহাদিগকে দূর হইতে দেখিলে তোমাদিগের সামুদ্রিক কলাগাছ কিংবা পামগাছ বলিয়া ভুল হইবে। ইহাদের কাণ্ড ৫´ ফুট হইতে ১০´ ফুট লম্বা এবং প্রায় ১´ হইতে ২ ফুট মোটা হইতে পারে। ১´ হইতে ৩´ ফুট লম্বা পাতাগুলি কলা কিংবা নাবিকেলের পাতার মতই ঝুলিয়া থাকে। ইহারা যেখানে জন্মে সেখানে একা একা জন্মে না, তাহার ফলে ইহারা সকলে 'মিলিয়া অনেকখানি সমুদ্রতল জুড়িয়া একটি ছোট 'কলা বন' সৃষ্টি করে। জোয়ারের সময় ইহারা একেবারে ডুবিয়া গেলেও ভাটার সময় সর্ব্বোচ্চ শাখাগুলি জলের উপর উচু হইয়া থাকে। স্বচ্ছ নীল জলের নীচে পসেটল্‌সিয়া ও ইহাদেরই নিকটতম জ্ঞাতি লেসোনিয়ার বন, সে একটী অভিনব দৃশ্য।

ফিউকস (Fucus) বলিয়া আর একজাতীয় পিঙ্গল শৈবাল আছে যাহাদের ফিতার মত দেহ দুই ফুটেরও অধিক লম্বা হয়। সমুদ্রের কিনারায় পাথরের গায়ে ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে। ইহারা সমুদ্রের জোয়ারের সময় ডুবিয়া যায়, ভাটার সময় শুখনায় পড়ে। ইহাদের চামড়ার

ফিউকস্
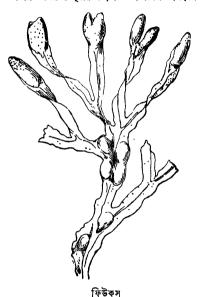
মত দেহ এই অবস্থার উপযোগী করিয়া গঠিত। গ্রীকগণ সামুদ্রিক শৈবালকে Phycos বলিত, সেই হইতেই ইহাদের নাম Fucus হইয়াছে। উত্তর অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগবের দুই পারেই ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পূর্ব্বকালে গোরুর খাদ্য, জমির সার এবং অন্যান্য সমধর্ম্মী সামুদ্রিক শৈবালের সহিত আইওডিন (iodine), কার্বনেট অব সোডা Carbonate of Soda), কাচ এবং সাবান প্রস্তুতের উপকরণ হিসাবে ইহাদের ব্যবহার

বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। তখন ইহাদের জন্মস্থান সমুদ্রোপকূল একটী সম্পত্তির সামিল বলিয়া গণ্য হইত।

ল্যামিনেরিয়ার (Laminaria) সমস্ত দেহখানি একটী বড় স-বৃন্ত পাতার মত দেখিতে। ল্যাটিন lamina (thin plate) হইতে ইহাদের নাম হইয়াছে ল্যামিনেরিয়া। ইহারা গভীর জলে জন্মিয়া থাকে। ইহাদের দেহ লম্বায় ২০´ হইতে ২৫´ ফুট হইতে পারে। বুড়ো আঙ্গুলের মত মোটা বোঁটা দুই ফুট আন্দাজ লম্বা, তাহার উপরে ফলকের মত অংশ প্রায় একফুট চওড়া, এবং শক্ত চামড়ার মত। পূর্ব্বকালে ল্যামিনেরিয়া হইতেই আইওডিন সংগ্রহ করা হইত, এখনও অল্পবিস্তর হয়। যাহারা এইজন্য ল্যামিনেরিয়া সংগ্রহ করে তাহাদিগকে **কেল্প-সংগ্রাহক** (Kelp gatherers) বলে। Hebrides, Aran Isles এবং Brittanyর উপকূলে কেল্প-সংগ্রাহকরা এখনও তাহাদের ব্যবসায় বজায় রাখিয়াছে।

ল্যামিনেরিয়া

আমেরিকার পশ্চিম উপকূল **নিরওসিস্‌টিস্‌** (Nereocystis) নামে আর এক প্রকার অতিকায় পিঙ্গল শৈবাল জন্মে। ইহাদের প্রায় ২০০´ ফুট লম্বা নমনীয় কাণ্ডের মাথায় এক ফুট ব্যাসের বেলুনাকার অঙ্গ হইতে ১০´ ফুট আন্দাজ লম্বা কয়েকটি পাতা বাহির হয়। কাণ্ড, বেলুন ও পাতা যোগ দিয়া দেখ ইহাদের দেহ কতখানি লম্বা হইল।

আর একজনের কথা বলিয়া পিঙ্গল সামুদ্রিক শৈবালের কথা শেষ করিব। ইহার নাম **সারগেসম্‌** (Sargassum)। মেক্সিকোর কাছে সারগেসো উপসাগরের নাম হইতেই ইহাদের নামকরণ হইয়াছে। ইহারা বহু শতাব্দী হইতে একই স্থানে আছে। Aristotle ইহাদেরই কথা লিখিয়াছেন বলিয়া অনেকেই অনুমান করেন। Phoeniciansরা ইহাদের এইস্থানেই দেখিয়াছিল মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, কিন্তু Columbusই সর্ব্বপ্রথম ইহাদের কথা

নিরিওসিসটস্‌

লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। একই অবস্থায় এবং একই স্থানে যুগ ধরিয়া লোকে ইহাকে ইহাদিগকে দেখিয়া আসিতেছে। Humboldtএর মতে ইহারা ২৬০,০০০ বর্গ মাইলের উপর, অর্থাৎ পাঁচটা ইংলণ্ডের সমান স্থান জুড়িয়া, সমুদ্রের উপর ভাসমান অবস্থায় আছে। সেই জন্যই ইহাকে ইংরাজীতে floating

vegetation' বলা হয়। ইহাদের দেহ বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত, পাতা দুই তিন ইঞ্চি লম্বা, পাতার প্রান্ত কাটাকাটা। দেহ ভাসাইয়া রাখিবার জন্য ইহাদের গায়ে বায়ুপূর্ণ থলী থাকে।

রক্ত সামুদ্রিক শৈবালের কথা বেশী করিয়া বলিবার কিছু নাই। ইহাদের দেহের সৌন্দর্য্যই ইহাদের বিশেষত্ব। দেহের আকারে এক ফুটের বেশী না হইলেও, প্রকারে খুব বেশী, আর বর্ণের বাহারের তো কথাই নাই।

সমুদ্রকে রত্নাকর বলা হয়। মানুষ তাহার অনেক কিছু সমুদ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়।

সারগেসম্

সামুদ্রিক শৈবালও মানুষের অনেক কাজে লাগে। চিলীয় সলটপিটার স্তর (Chile Saltpetre beds) আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে ল্যামিনেরিয়া, নিরিও-সিসটিস্ ম্যাক্রোসিস্টিস প্রভৃতি সামুদ্রিক শৈবাল আইওডিনের একমাত্র আকার ছিল। ইহাদিগকে কেল্প (Kelp) বলা হয়। আইওডিন ভিন্ন কাচ ও সাবান প্রস্তুতের উপকরণ পটাস্ ও সোডা কেল্প হইতেই সংগ্রহ করা হইত। অতি প্রয়োজনীয় উদ্ভিজ্জ সার হিসাবেও ইহাদের চাহিদা বড় কম ছিল না।

ছুরি, চাবুক, ছড়ি প্রভৃতির হাতল বা বাঁট **ল্যামিনেরিয়া ডিজিটেটার** কাণ্ড হইতে প্রস্তুত হয়। **ল্যামিনেরিয়া স্যাকারিণার** পাতা অনেক সময় ব্যারমিটর এর কাজ করে। সামুদ্রিক শৈবালের প্রস্তুত ঝুড়ি ও ছবি প্রভৃতি বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়।

ঔষধ ও খাদ্যদ্রব্য হিসাবেও সামুদ্রিক শৈবালের ব্যবহার আছে। **কনড্রাস** (Chondrus) এবং **জাইগারটিনা** (Gigartina) নামক রক্ত শৈবাল গলার অসুখের ঔষধ প্যাষ্টিল (pastiles) প্রস্তুতে দরকার হয়। ইহারা রুগীর খাদ্যহিসাবেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। Agar নামক একপ্রকার পদার্থ Gelidium corneum নামক জাপানী শৈবাল হইতে প্রস্তুত হয়। রান্না ও ব্যাক্টিরিয়া কাল্‌চারের জন্য ইহা বহু পরিমাণে দরকার হয়। রান্নার মসলা হিসাবেও সামুদ্রিক শৈবালের ব্যবহার আছে। Laurentia নামক শৈবাল ইহার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার গন্ধটি অতি মনোরম। চীনাদের অতি উপাদেয় খাদ্য 'পাখীর বাসা' (bird's nest) সামুদ্রিক শৈবালেরই এক সংস্করণ। Aberdeen সহরের জেলেনীরা আজও রাস্তায় ফেরি করিয়া Rhodymenia palmata নামক শৈবাল বিক্রয় করে।

অসুস্থ ব্যক্তিকে সামুদ্রিক শৈবাল পথ্য হিসাবে দিবার রীতি প্রচলিত আছে। নাবিকেরা সামুদ্রিক শৈবাল বহুল পরিমাণে খাইয়া থাকে। তাহাদের কখনও অসুখ হয় না। ইহার কারণ আজকাল আর অজানা নাই। আমরা বলিয়াছি সামুদ্রিক শৈবালে আইওডিন থাকে। বর্ত্তমান গবেষণায় ঠিক হইয়াছে স্বাস্থ্যের জন্য আইওডিন একটি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। ভাইটামিনও তাহাই। আইওডিন গলগণ্ডের একটি প্রধান ঔষধ। সামুদ্রিক শৈবালের সহিত রুগী ও নাবিকেরা প্রচুর পরিমাণে আইওডিন পাইয়া থাকে।

সুতরাং তোমরা দেখিলে সামুদ্রিক শৈবাল কেবল তাহাদের সৌন্দর্য্য দ্বারাই মানুষের মনোরঞ্জন করে না মানুষের কাছে তাহাদের প্রয়োজনীয়তাও অনেক।

তোমরা সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গেলে, সামুদ্রিক শৈবাল সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিও।

দৈহিক চর্চ্চায় বিভিন্ন দেশ

চীন

সে অতি প্রাচীন যুগের কথা। বহিঃশত্রুর আক্রমনের কোনও ভয় না থাকায় তখন চীনদেশবাসীদের মধ্যে দেহ-চর্চ্চা বা যুদ্ধবিদ্যা শিখিবার স্পৃহা জাগে নাই। তাহার পর পঞ্চম শতাব্দীতে কোন ধর্ম্মযাজক "কাংফু" নামে এক প্রকার ব্যায়ামের প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু খ্রীষ্ট জন্মের ২৬০০ বৎসর পূর্ব্বেও চীন দেশের লোকদের মধ্যে "বাংগু"র ন্যায় এক প্রকার ব্যায়ামের ব্যবস্থা ছিল। কয়েক প্রকার শারীরিক ভঙ্গী ও শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার দ্বারা তাহারা এই ব্যায়াম করিত। ঐ প্রকার ব্যায়াম দ্বারা তাহারা আভ্যন্তরীন শক্তিবৃদ্ধি করিবার ও দীর্ঘায়ু হইবার চেষ্টা করিত।

তাহার পর যখন তাহারা সামরিক শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করিল, তখন তাহারা দৈহিক শক্তির পরিচয় দিবার জন্য বা শত্রুপক্ষকে পরাজিত করিবার জন্য কতকটা কুস্তীর মত দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রণালী অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিল এবং একজন অপরকে হারাইয়া দৈহিক শক্তির পরিচয় দিবার জন্য জাপানের জাতীয় খেলা "যুযুৎসু" অর্থাৎ আত্মরক্ষা করিবার কৌশল) ন্যায় এক প্রকার ব্যায়াম অভ্যাস করিত। তখনও তাহাদের জাতীয় প্রতিযোগীতামূলক ক্রীড়াদির কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। তবে অতি প্রাচীন যুগ হইতে ঘুড়ি উড়াইবার প্রথা ব্যাপক ভাবে ছিল।

প্রাচীন চীন দেশের কয়েকটি খেলা

দুইটী সমান্তরাল লাইন টান। ঐ দুই লাইনের মধ্যের ব্যবধান হইবে ১০´ ফুট। আবার ঐ লাইনের সমান্তরাল করিয়া উভয় দিকে ১৫´—৩০´ ফুট দূরে লাইন টান। মধ্যের লাইন দুইটী প্রাচীর

বলিয়া ধরা হইল। ঐ প্রাচীরের মধ্যে একজন রক্ষক নিযুক্ত হইবে। আর অন্যান্য খেলোয়াড়রা গোল লাইনের পশ্চাতে রহিবে।
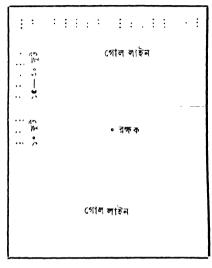
চীনের প্রাচীর

রক্ষক যখন বলিবে 'Start' অর্থাৎ আরম্ভ কর, তখন ঐ গোললাইনের পশ্চাদ্বর্ত্তী খেলোয়াড়গণ রক্ষককে ছোঁয়া না দিয়া, ঐ প্রাচীর পার হইয়া অপরদিকের গোল লাইনে যাইবে।

তাহাদের পার হইবার সময় নিজ সীমামধ্যে রহিয়া (প্রাচীরের বাহিরে না যাইয়া) ঐ খেলোয়াড়দের মধ্যে যাহাকে যাহাকে ছুঁইতে পারিবে তাহারা ঐ রক্ষকের সঙ্গে যোগদান করিয়া এবং তাহার সীমার মধ্যে রহিয়া যাহারা ছোঁয়া পড়ে নাই, তাহাদিগকে ছুঁইবার চেষ্টা করিবে।

ক্রমে সকলেই ছোঁয়া পড়িলে, খেলা শেষ হইবে। শেষ খেলোয়াড়, রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া পুনরায় খেলা আরম্ভ করিবে।

সহরের ফটক আক্রমণ

খেলোয়াড়গণ সকলেই দুই দলে বিভক্ত হইবে, এবং দুই দলের দুইজন দলপতি নিযুক্ত হইবে। এইবার আপন আপন দলের খেলোয়াড়গণ হাত ধরাধরি করিয়া একমুখে এক লাইনে দাঁড়াইবে। দুইদল সামনা সামনি দাঁড়াইবে। দুই দলের মধ্যে ব্যবধান রহিবে ১০' ফুট।

প্রথমে এক দলের দলপতি তাহার একজন খেলোয়াড়কে বিপক্ষদলের হাত ছাড়াইয়া পার হইয়া যাইবার জন্য পাঠাইবে। সে হাত ছাড়াইয়া পার হইতে পারে অথবা হাতের ফাঁকে গলাইয়া পার হইতে পাইবে। একস্থানে পার হইতে না পারিলে সে আরও দুই যায়গাতে পার হইবার চেষ্টা করিতে পাইবে। তিন বারের মধ্যে তাহাকে পার হইতে হইবে। যদি পার হইতে পারে তবে যে দুইজনের হাত ছাড়াইয়া অথবা নীচের দিকে গলাইয়া পার হইয়াছে তাহাদের ঐ দুই জনকে নিজেদের দলের মধ্যে লইয়া আসিবে এবং "বন্দী" হিসাবে তফাতে রাখিবে। আর যদি তিন বারেও পার হইতে না পারে তবে বিপক্ষ দল তাহাকে "বন্দী" হিসাবে, তাহাদের দল হইতে তফাতে রাখিবে।

এইভাবে খেলা শেষ হইলে যাহাদের দল বেশী সংখ্যক বন্দী করিতে পারিবে, তাহাদেরই জিত হইবে।

ফটক আক্রমণ করিবার জন্য উভয় দলই পর পর সুযোগ পাইবে।

সাপের খোলস ছাড়ান

সকল খেলোয়াড়ই পিছনে পিছনে দাঁড়াইবে, এবং সকলেই সম্মুখ দিকে একটু ঝুঁকিয়া বাঁ হাত আপন পায়ের ফাঁক দিয়া পিছনের খেলোয়াড়ের দিকে চালাইবে। আর ডান হাত দিয়া সম্মুখের খেলোয়াড় যে হাত তাহার পায়ের ফাঁক দিয়া চালাইয়াছে, ঐ হাত ধরিবে। তাহার পর নির্দ্দেশ পাইবামাত্র সকলেই পিছন দিকে হাঁটিতে আরম্ভ করিবে। সকলের পশ্চাতের বালক একটু হাঁটিয়াই জমিতে হাত ধরা অবস্থায় চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িবে। আবার তার সম্মুখের বালক তাহাকে দুই পায়ের ফাঁকে রাখিয়া একটু পিছাইয়া যাইবে (হাত না ছাড়িয়া যতদূর সম্ভব) এই ভাবে সকল বালক পশ্চাৎ হাঁটিবে এবং শুইয়া

ছোটদের মেলা

পড়িবে। সুতরাং যে বালক সকলের সম্মুখে ছিল তাহার সকলের শেষে শুইবার পালা পড়িবে। সে শুইবা মাত্রই উঠিয়া সম্মুখ দিয়া পুনরায় অগ্রসর হইয়া যে স্থান হইতে আসিয়াছিল সেই স্থানে ফিরিয়া যাইবে।

কোন অবস্থায় হাতের শিকল বা যোগ ছাড়া চলিবে না।

দৈহিক চর্চ্চায় চীন—আধুনিক

চীন, এক সময় খেলাধূলায় অপরাপর জাতি সকলের পশ্চাতে ছিল, এবং তাহাদের আগ্রহও ছিল সকলের চেয়ে কম। এমন কি তাহারা মোটেই দ্রুত দৌড়াইতে পারিত না। আশ্চর্য্যের কথা নয় কি ?

আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে আধুনিক প্রণালীর ব্যায়াম ও ক্রীডাদি বিষয়ে, চীনদেশীয়গণ মাথা ঘামাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

এখন তাহারা বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যায়াম শিক্ষক পাইয়াছে। আধুনিক প্রণালীর ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়া খেলাধূলায় সকল বিষয় শিক্ষা লাভ করিতেছে।

তাহারা এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে সকলের পরে এবং তাই তাহারা ধীর-গতিতে সতর্ক পদক্ষেপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

দৈহিক চর্চ্চায় পারস্য দেশ

অতি প্রাচীন যুগ হইতে পারস্যবাসীরা খুব সাহসী যোদ্ধা, ঘোড়সওয়ার ও শিকারী ছিল। তখন পারস্যবাসী বালকদিগকে তীর ছোড়া, ঘোড়ায় চড়া ও সত্যকথা বলা শিক্ষা দেওয়া হইত।

ছয় বৎসর বয়সের সময় প্রত্যেক বালককে সামরিক শিক্ষা দিবার জন্য তথাকার রাজকীয় ব্যবস্থা ছিল। বালকদিগকে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠিয়া ক্রীড়াভূমিতে উপস্থিত হইতে হইত। তথায় তাহাদিগকে দৌড়ান, তীর ছোড়া ও বর্শা নিক্ষেপ শিখিতে হইত। এক বৎসর ধরিয়া এই সমস্ত শিখিবার পর তাহাদিগকে ঘোড়ায় চড়া শিখিতে হইত। ইহা ব্যতীত ঘোড়া পূর্ণোদ্যমে দৌড়াইবার সময় তাহাদিগকে পিঠের উপর রহিয়াই ঘন ঘন লম্ফ প্রদান ও তীর নিক্ষেপ শিখিতে হইত। এই সকল ক্রীড়া-কৌশলে পারদর্শিতা লাভ করিলে, রাজকর্ম্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত শিকার-কার্য্যে যোগ দিবার জন্য অনুমতি পাইত। যখন শিকার কার্য্য বন্ধ থাকিত—বালকগণ তখন পূর্ব্বের মত ধনুর্বিদ্যা, ঘোড়ায় চড়া ও প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়াদি নিয়মিতভাবে অভ্যাস করিত। সময় সময় তাহারা ঢাল ও তরবারি ক্রীড়া এবং ফাঁদ নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত রহিত। যদিও ১৫ হইতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কর্ম্মঠ সৈনিক হিসাবে কাজ করিতে হইত; তথাপি ৫-২০ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ পূর্ব্ব বর্ণিত শিক্ষাধীনে থাকিতে হইত।

পোলো-খেলা

পারস্যদেশেই অতি প্রাচীন কালে "পোলো" খেলার উৎপত্তি হয়। তাহার পর একটু রূপান্তরিত হইয়া ভারতবর্ষে ও পরে মধ্য-এশিয়া, চীন এবং জাপানে উহা বিস্তার লাভ করে। এই খেলা সাধারণতঃ রাজন্যবর্গ ও অভিজাত-বংশের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইরাণে (পারস্যে) ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ করিবার রীতি প্রাচীন যুগ হইতে প্রচলিত ছিল। তাহারি ফলে পোলো খেলার সৃষ্টি হয় বলিয়া অনেকে এইরূপ অনুমান করেন।

তিব্বতীয় "**পুলু**" শব্দ হইতে "**পোলো**" নামের উৎপত্তি। তিব্বতীয় উইলো (Willow) গাছের শিকড়কে পুলু বলে। ঐ শিকড় হইতে ঐ খেলার বল প্রস্তুত হইত। সুতরাং "পুলু" হইতে পোলো' শব্দের উৎপত্তি বলিয়া অনুমান হয়।

আবার মোগল রাজত্বের সময় এই খেলাকে "**চৌগান**" বলিত। কিন্তু চৌগান অর্থে প্রধানতঃ খেলিবার যষ্টিকে বা stick টাকেই বোঝায়।

খৃষ্ট জন্মাইবার ৭৭৬ বৎসর পূর্ব্বে, প্রথম যে ওলিম্পিক-ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়, তাহার পূর্ব্বেও ইরাণ ও তুরানে এই খেলার প্রচলন ছিল।

বৃটিশ অফিসারগণ ভারতবর্ষে আসিয়া এই খেলা শিক্ষা করিয়া ইহাকে সমধিক আকর্ষণের ক্রীড়া করিয়া তুলিয়াছেন।

বিলাতে Lillie Bridge-এ প্রথম পোলো-

ক্লাব হয়। বিলাতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে পোলো খেলিবার গ্রাউণ্ড তৈয়ারী হয়। এই খেলায় তাহারা পারদর্শিতা লাভ করিয়া, খেলার নূতন নিয়মাবলী রচনা করেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের মধ্যে প্রথম **জেনারেল সোরাব** "পোলো" শিক্ষা করেন এবং তিনিই কলিকাতায় প্রথম পোলো-ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন।

কলিকাতায় **"দশম হাসার বৃটীশ রেজিমেণ্ট দল"** প্রথমে মণিপুরীদের নিকট হইতে এই খেলা শিক্ষা করে, তাহার পর ইহাদের নিকট হইতে বিলাতে **হার্লিংহাম** ক্লাব পোলো খেলা শিক্ষা লাভ করে। এই ক্লাবের তখন নেতা ছিলেন ভূতপূর্ব্ব যুবরাজ সপ্তম এড্ওয়ার্ড। ইহার পর এই খেলা দ্রুতভাবে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রবর্ত্তিত হয়। জার্মাণী কিন্তু ইহার অনেক পরে, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে, হাম্বর্গ পোলো ক্লাব নামে প্রথম পোলো প্রতিষ্ঠিত করে।

আমাদের দেশে বিদেশী দল ভিন্ন বর্ত্তমানে **জয়পুর, যোধপুর, কাশ্মীর, রুটলাম, রেওয়া মণিপুর** প্রভৃতি করদ রাজ্যে এই খেলার চর্চ্চা আছে।

পোলো গ্রাউণ্ড

এই পোলো খেলার গ্রাউণ্ড হইবে সুন্দররূপ তৃণাচ্ছাদিত। এই গ্রাউণ্ড হইবে দৈর্ঘ্যে ৩০০ গজ এবং প্রস্থে ১৬০ গজ। গ্রাউণ্ডের দৈর্ঘ্যের দিকটা ১″ ইঞ্চি মোটা, ১১″ ইঞ্চি এবং ২″ ইঞ্চি পোঁত দিয়া রক্ষা করা থাকিবে অর্থাৎ বাহিরের দিকে ৯″ ইঞ্চির বেড়া হইবে শেষের দিকে অর্থাৎ গোল পোষ্টের দিকে বেড়া থাকিবে না, কেবল শেষ লাইনের মধ্যস্থলে ২৪′ ফিট ব্যবধানযুক্ত গোলপোষ্ট রহিবে।

সরঞ্জাম

ইংলণ্ডে Willow (উইলো) গাছের শিকড় দিয়া নির্ম্মিত ৩½″ ব্যাস বিশিষ্ট বল লইয়া পোলো খেলা হয়, এবং ঐ বলের ওজন—৫ আউন্স। কিন্তু ভারতবর্ষে বাঁশের শিকড় দিয়া নির্ম্মিত পোলো বলের ব্যবহার হয়। ইংলণ্ডে উইলো অথবা এ্যাস কাষ্ঠের নির্ম্মিত ষ্টিক্ ব্যবহার করে।

ঐ ষ্টিক্ ধরিবার স্থানে একটা ফাঁস থাকে। প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে ৬ আউন্স ওজনের ও ৫৩″ ইঞ্চি লম্বা ষ্টিক্ ব্যবহার করা ভাল। তাহার পর নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী লম্বা ও ওজন পরিবর্ত্তন করিয়া লইবে।

ঘোড়া

এই খেলায় ঘোড়ার উপর হার-জিতের প্রায় সমস্তটা নির্ভর করে। পোলো খেলিবার ঘোড়া, উচ্চতায় ১৫ হাত পর্য্যন্ত চলিতে পারে, কিন্তু ১৪ হইতে ১৪২ হাত পর্য্যন্তই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত। একটু মোটা, ভারকেও ঠিক রাখিতে পারে, তড়িৎ বেগে ঘুরিতে পারে, এইরূপ বিশেষ রকম শিক্ষিত ঘোড়ার প্রয়োজন। আরব দেশীয় শিক্ষিত ঘোড়াই এই খেলার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়।

বর্ত্তমানে, পোলো খুব দ্রুতবেগে খেলা হয়। সুতরাং সেইরূপ বেগবান্ শিক্ষিত ঘোড়াও দরকার।

খেলার স্থায়িত্ব

এই খেলা তিন অথবা চার পিরিয়ড্ করিয়া খেলা হয়। এক এক পিরিয়ডকে ৭ মিনিট করিয়া ধরা হয়।

এই খেলার দুইজন রেফারি থাকে।

খেলোয়াড়দের অবস্থান ও খেলার নিয়ম

পোলো খেলায় এক একদিকে ৪ জন খেলোয়াড় থাকে। ১ এবং ২ নম্বর ফরওয়ার্ড, ৩ নম্বর খেলোয়াড় দরকার অনুযায়ী ব্যাক্ ও ফরওয়ার্ড খেলে। ৪ নম্বর ব্যাক—ইহার কার্য্য গোল রক্ষা করা। আর ৩ নম্বরকে বল পাশ করিয়া দেওয়া। সে আবার ঐ বল ফরওয়ার্ডকে পাশ করিয়া দিবে।

এইরূপে ২ নম্বর বিপক্ষের ৪ নম্বরকে বাধা দেয় অথবা তাহার নিকট হইতে বল কাড়িয়া লয়। ঐ রূপে ২ নম্বর ৩ নম্বরের নিকট হইতে বল লইয়া থাকে। এই খেলায় "অফ্ সাইড" ধরা হয় না।

পরিচালক

বর্ত্তমানে এই খেলার পরিচালক **হার্লিংহাম ক্লাব পোলো কমিটি**। ভারতীয় পোলো খেলোয়াড়গণও ঐ ক্লাবের নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া চলে।

ম্যাচ খেলার রেকর্ড

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের খেলোয়াড়দের সহিত আমেরিকার খেলোয়াড়দের ওয়েষ্টচেষ্টার কাপের প্রথম ম্যাচ খেলা হয় (Westchester)। ঐ ম্যাচে গ্রেটব্রিটেন জয়ী হইয়াছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে Lord Wimborne এর দল ঐ কাপ পুনরায় আমেরিকা হইতে লইয়া আইসে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান দল ইংলণ্ডে আসিয়া ঐ কাপ জিতিয়া লয়। তাহার পর ১৯২৪, ১৯২৮, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কাপ ম্যাচে আমেরিকানরাই জয়ী হয়।

দৈহিক চর্চ্চায়—জাপান

জাপানের জাতীয় আত্মরক্ষা করিবার উপায় বা "কৌশল—"**যুযুৎসু**" নামে পরিচিত। নিয়মিত যুযুৎসু অভ্যাসে শারীরিক ব্যায়াম ও সুন্দররূপ হয়।

বাঙলায়—যুধ—(যুদ্ধ করা)। স (ইচ্ছার্থে সন্)—যুযুৎসু। উ=রণেচ্ছু।

ইহা একরকম জাপানী কুস্তি। কিন্তু জাপানী অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায়, এই যুযুৎসু কৌশল প্রথম চীন দেশবাসী আবিষ্কার করে। তাহার পর ২০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঐ কৌশল জাপানীদের দ্বারা উন্নত হয় এবং তাহারা ঐ কৌশলকে আত্মরক্ষা করিবার ও ব্যায়াম-চর্চ্চা করিবার জন্য গ্রহণ করে। জাপানে এখনও ইহাই ব্যায়াম-চর্চ্চা করিবার প্রধান উপায় বলিয়া পরিগণিত।

Raku Uyenishi ও Yukio Tani নামে দুইজন জাপানী এই যুযুৎসু ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম প্রবর্ত্তন করে।

এই কৌশলে দুর্ব্বল ব্যক্তিও সবল ব্যক্তির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারে এমন কি তাহাকে সহজেই পরাজিত ও করিতে পারে। এই কৌশল প্রয়োগে আক্রমণকারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অতি সহজেই ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়।

এই কৌশল শরীরের অঙ্গসংস্থান ধমনী ও স্নায়ুমণ্ডলী প্রভৃতির সম্যক্ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। এই জ্ঞানের সাহায্যে মোচড় দিবার কৌশলে অন্ততঃ সাময়িক শরীরের যেকোন স্থানকে অসাড় করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যুযুৎসুর "লক" নামক কৌশল প্রয়োগে গ্রন্থি-বিচ্ছেদ ও সন্ধিচ্যুতি অথবা অস্থিবন্ধ ছিন্ন করিয়া দেওয়া অতি সহজ। সুতরাং ঐ রূপ ক্ষেত্রে কৌশল প্রয়োগকারীর নিকট আক্রমণকারীকে হয় পরাজয় স্বীকার করিতে হয় নয় অঙ্গহানী হয়।

এই কৌশল প্রয়োগে ঘাড় ও ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় মেরুদণ্ডের প্রভূত অনিষ্ট করা যাইতে পারে, কিডনি বা মূত্রাশয়কে সঙ্কুচিত ও কোমরের সন্ধিচ্যুত করিয়া সম্ভব। স্নায়ু ছিন্ন হইয়া যায়। ঘাড়ের সঙ্গে স্নায়ু চাপিয়া ধরিলে, সেই স্থান অসার বোধ হয়।

প্রতিযোগিতা হিসাবে যখন যুযুৎসু খেলা হয়, তখন বিপক্ষকে সাধারণতঃ লক কৌশল প্রয়োগের দ্বারা হারাইবার চেষ্টা করা হয়।

কুস্তি করিবার সময় বিপক্ষকে চিৎ করিতে পারিলেই তাহার জিত হয়। কিন্তু যুযুৎসু খেলায় তদ্রূপ নহে। কেহ যদি কাহার সঙ্গে আটিয়া উঠিতে না পারে, তখন সে ভূমিতে শায়িত অবস্থাতেই হাতে অথবা পায়ে করিয়া জমীতে ৩।৪ বার আঘাত করিলেই সে পরাজয় স্বীকার করিল বুঝিয়া বিপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ছাড়িয়া দিবে! ইহাতে শক্তি অপেক্ষা কৌশলই বেশী প্রয়োজন।

আক্রমণকারীর নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিবার হিসাবে যুযুৎসু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

এই কৌশল প্রয়োগ করিবার জন্য যত রকমের "থ্রো" অর্থাৎ নিক্ষেপ করিবার প্রণালী আছে, তন্মধ্যে "**ষ্টমাক থ্রো**"ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ড বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ আক্রমণকারী যখন গলা ধরিয়া জোর প্রকাশ করে, তখনই এই "থ্রো" কৌশল প্রয়োগ করা হয়। এই থ্রো প্রয়োগ করিবার সময় যুযুৎসান্‌কে (যুযুৎসু কৌশলে যে অভিজ্ঞ) আক্রমণকারীর কোট ধরিয়া ২।১ পা পিছাইয়া আসিতে হয়। তাহার পর হঠাৎ এক পায়ের পাতা আক্রমণকারীর ষ্টমাকে (পাকস্থলীর

স্থানে) রাখিয়া তাহার কোট টানিয়া তৎক্ষণাৎ বসিয়াই শুইয়া পড়িতে হয়। তাহা হইলেই তাহার পা উপর দিকে উঠিয়া ডিগবাজী খাইয়া কৌশল প্রয়োগকারীর মাথা ডিঙ্গাইয়া সজোরে চিৎ হইয়া পড়িবে। ইহাতে আক্রমণকারীর মস্তিষ্কে ও স্কন্ধদেশের সন্ধিস্থলে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগিবে।

কিন্তু যাহারা যুযুৎসু বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাহাদের আছাড় খাইবার কৌশল যুযুৎসু শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষা এবং যুযুৎসু শিখিবার পূর্ব্বে ইহা একান্ত প্রয়োজনীয়।

নিজেকে বাঁচাইবার জন্য আছাড় খাইবার কৌশল

কোনও কৌশলে ডিগবাজী খাওয়াইয়া ছুড়িয়া দিলে, আছাড় খাইবার সময় ভূমিতে কাঁধ বা দেহ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে, এক সেকেণ্ডের ও ভগ্নাংশের ও মধ্যে দ্রুতভাবে হাত সোজা করিয়া জমিতে ধাক্কা দিয়া, নিজে নিজেই ডিগবাজী খাইয়া যাইবে। তাহা হইলে আর শরীরে বা মস্তিষ্কে ধাক্কা লাগিবে না।

পায়ে ধরিয়া মাথার উপর দিক যদি কোনও কৌশলে ছুড়িয়া দেওয়া হয়, তবে থুৎনিটা বুকের নিকট সংলগ্ন রাখিয়া হাত ও পায়ের পাতা জমিতে সর্ব্বাগ্রে পরপর ঠেকিয়া পরে কাঁধ ঠেকিবে। তাহা হইলে মেরুদণ্ডে আর আঘাত লাগিবেনা।

যদি একেবারে সোজাসুজি মুখের সামনে আছাড় দেওয়া হয় তবে, পা হইতে ঘাড় পর্যান্ত দৃঢ় ও সোজা করিয়া এবং আছাড় খাইবার সময় কনুই হইতে হাত বাঁকাইয়া হাতের ভরে পড়িতে হইবে।

কিন্তু এই সমস্ত আছাড় খাইবার কৌশলাদি যথেষ্ট পরিমাণে অভ্যাস না থাকিলে দরকারের সময় প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

ঐ আছাড় খাইবার কৌশলাদি বিশেষ রকম অভ্যাস থাকিলে, অনেক ক্ষেত্রে ফুটবল গ্রাউণ্ডে হাত, পা, কব্জি ভাঙ্গা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

কয়েকটি যুযুৎসু-কৌশল

ট্রেণে, ট্রামে, পথে, বিপথে আক্রমণকারীর নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য কয়েকটি যুযুৎসু কৌশল ও কয়েকটি প্রণালীর বিষয় নিম্নে বর্ণিত হইল।

এক

যদি কোন আক্রমণকারী তাহার দক্ষিণ হস্ত দিয়া ঘুসি মারিতে আসে, তাহা হইলে তাহার কব্জিতে নিজের দক্ষিণ হস্ত দিয়া দৃঢ় ভাবে ধরিতে হইবে, (আক্রমণকারীর হাতের তালুর দিকটা যেন উপর দিকে থাকে) এবং সঙ্গে সঙ্গে বাম হস্ত দিয়া

হিপ্ থ্রো

তাহার দক্ষিণ হস্ত বগলে পুরিয়া বাম হস্ত দিয়া নিজের দক্ষিণ হস্ত ধর। এই অবস্থায় নিজের বাম হস্ত একটু উপর দিকে চাপ এবং দক্ষিণ হস্ত দিয়া নীচের দিকে চাপ দিলে, আক্রমণকারীর হাত ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

দুই

যদি কোন আক্রমণকারী বিস্তৃত অঙ্গুলি লইয়া ধাক্কা মারিতে আসে তবে ক্ষিপ্রকারিতার সহিত দুইহাতে তাহার অঙ্গুলিগুলি ধরিয়া তাহারই সম্মুখ দিকে অর্থাৎ তাহার অঙ্গুলিগুলি উপর দিকে রাখিয়া উল্টাদিকে মোচড় দাও। ঐরূপ অবস্থায় ধরিয়া বেশী জোরে চাপ দিলে, আক্রমণকারীর

আঙ্গুল ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা, আবার ঐরূপ ভাবে ধরিয়া যদি আক্রমণকারীকে নিজের কোলের দিকে টানিয়া আনা যায়, তাহা হইলে সে মুখের ভরে জমিতে পড়িয়া যাইবে।

তিন

আক্রমণকারী যদি দক্ষিণ হস্ত দিয়া পেটের মধ্যে ঘুসি মারিতে আসে তবে বামহস্ত তাহার মুষ্টির উপর দিকে এবং দক্ষিণহস্ত তাহার মুষ্টির নীচের দিকে দৃঢ় ভাবে ধরিয়া বাম দিকে মোচড় দিবে। ইহাতে আক্রমণকারী বিশেষ রকম আঘাত পাইবে।

চার

কেহ যদি বামহস্ত দ্বারা মুখে ঘুসী মারিতে আসে তবে দক্ষিণ হস্ত দিয়া তাহার কব্জি ধর এবং বামহস্ত তাহার কনুই এর মধ্যে রাখ এবং তাহার হাত তাহার স্কন্ধের দিকে সজোরে বাঁকাইয়া দাও। তাহা হইলে আক্রমণকারী বিশেষ রকম শিক্ষা পাইবে।

পাচ

আক্রমণকারী যদি বাম হস্ত দিয়া মুখে ঘুসি মারিতে আসে বা গলা ধরিতে আসে, তবে অগ্রে বাম হস্ত দিয়া তাহার বাম হাতের কব্জি ধর,— ধরিয়াই হাতের তালুর দিকটা নীচের দিকে করিবে। ধরিবার সময় নিজের হাত উল্টাইয়া অর্থাৎ হাতের তালুর দিকটা উপর দিকে করিবে, এবং ডান হাত দিয়া কনুইয়ে চাপ দাও। জোরে চাপ পড়িলে, আক্রমণকারী বসিয়া পড়িতে বাধ্য হইবে। ঐ সময় যদি ডান পায়ের হাঁটুর দ্বারা চাপ দেওয়া হয়, তবে আক্রমণকারীর অবস্থা শোচনীয় হয়।

ছয়

আক্রমণকারী যদি ডান হাতে মুষ্টি দ্বারা ঘুসি মারিতে আসে, তাহা হইলে বাঁ হাতের তালু উপর দিক করিয়া তাহার ঐ হাতের কব্জি ধর এবং একটু আগাইয়া তাহার পশ্চাৎ দিক্ হইতে তোমার ডান পায়ে করিয়া ধাক্কা দিয়া তাহার হাঁটু বাঁকাইয়া দাও, আর ঐ সঙ্গে তোমার ডান হাতের তালু তাহার থুত্‌নির মধ্যে রাখিয়া সজোরে ধাক্কা মার। ঐ সময় তাহার ডান হাতের কব্জি ধরিয়া নিজের বাঁ কাঁধের দিকে টানিতে থাকে। কিন্তু এক সঙ্গে তড়িৎ বেগে করিতে হইবে। এইরূপ করিলে আক্রমণকারী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না এবং তোমার আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িবে।

সাত

আক্রমণকারী যদি ডান হাত দিয়া মারিতে আসে, তাহা হইলে চট করিয়া তোমার ডান হাত দিয়া তাহার ডান হাতের কব্জি ধরিয়া

মাথা বন্দী

তাহাকে তোমার বাম পার্শ্বে রাখ এবং তাহার সমস্ত হাতটাকে সোজা অবস্থায় তোমার বুকের উপর চাপ রাখিয়া ডান দিকে টানিতে থাক, অথবা, তাহার ডান হাতকে তোমার মাথার পিছন দিকে ঘাড়ের উপর রাখিয়া ডান দিকে টানিতে থাক। আর ঐ সঙ্গে তোমার বাঁ হাত সোজা অবস্থায় তাহার গলার মধ্যে দিয়ে পিছন দিকে চাপ দিতে থাক। আক্রমণকারী যদি বেশী দুষ্টামি করিতে থাকে, তবে তোমার বাঁ পায়ের হাঁটুর সাহায্যে তাহার ডান পা জমি

হইতে তুলিয়া ফেল। তাহা হইলে, তাহাকে অতি সহজে জমিতে ফেলা যাইবে এবং তোমার আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িবে। কিংবা তাহাকে হাঁটুতে আঘাত করিয়া ফেলিতে পার। ইহাকে হাঁটু নিক্ষেপও বলা হইয়া থাকে।

আট

আক্রমণকারী যদি দক্ষিণ হস্ত দিয়া ঘুসি মারিতে আসে, তবে ক্ষিপ্রতার সহিত ডান হাতের তালু উপর দিকে করিয়া এবং নিজে ঘুরিয়া তাহার ডান হাতের সমস্ত অংশটা তোমার বাম কাঁধের উপরে আনিবে (তাহার হাতের তাল যেন উপর দিকে থাকে) ঐ অবস্থায় চাপ দিলে হাতের সন্ধিস্থল ভগ্ন হইয়া যাইতে পারে। ঐ রকম অবস্থায় পড়িলে আক্রমণকারী সহজেই তোমার বাধ্য হইয়া উঠিবে।

নয়

আক্রমণকারী যদি ছোরা কিংবা ঐ রকম তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়া বুকে মারিতে আসে, তবে বাঁ হাতের তাল উপর দিকে করিয়া তাহার মুষ্টির নীচে ধর এবং সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়া তাহার কনুয়ের নীচে ধরিয়া ঐ হাত ভাঁজ করিয়া ফেল এবং তাহার পশ্চাৎ দিকে মোচড় দাও। অর্থাৎ তাহার ঐ হাতের কনুই উপর দিক হইয়া এবং কানের পার্শ্ব দিক দিয়া পশ্চাৎ দিকে চলিয়া যাইবে। তখন ঐ ব্যক্তি অসহায় হইয়া পড়িবে। ছোরা থাকিলে বাঁ হাত দিয়া তাহার কব্জির অতি নিকটে না ধরিয়া একটু দূরে ধরা ভাল। তারপর ডান পায়ে করিয়া তাহার পশ্চাৎ দিক হইতে ধাক্কা মারিলে অতি সহজেই সে মাটিতে পড়িয়া যাইবে। ছোরা কাড়িবার জন্য তাহার ঐ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি বাঁ হাত দিয়া ধর। তখন ডান হাত দিয়া কাড়িয়া লওয়া সহজ হইবে।

দশ

আক্রমণকারী যদি পশ্চাৎ দিক হইতে আসিয়া বুক বেষ্টন করিয়া হাত সমেত চাপিয়া ধরে তবে সর্ব্বাগ্রে বাঁ পা কোনও রকমে তাহার পশ্চাৎ দিকে আনিয়া তাহার দুই পায়ের ফাঁকে চালাইয়া দাও আর ঐ সঙ্গে জমির সহিত সমান্তরাল করার জন্য জোর দিয়া চেষ্টা কর। দেখিবে তাহার হাত অতি সহজেই ঘুরিয়া যাইবে এবং তাহার নিজের দাঁড়াইয়া থাকিবার জন্য ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিতে পারিবে না।

এগারো

আক্রমণকারী যদি ডান হাতে করিয়া ঘুসি মারিতে আসে, তাহা হইলে ক্ষিপ্রকারিতার সহিত তাহার মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতের কব্জিতে ডান হাত দিয়া ধর, এমন ভাবে ধর, যেন তাহার

টানাটানি (Pull over)

হাতের তালুর দিকটা উপর দিকে থাকে। আর ঐ সঙ্গে বাঁ হাত, এ ধৃত হাতের নীচের দিকে লইয়া গিয়া হাতের তাল তাহার ঘাড়ের উপর রাখিয়া চাপ দাও। চাপ পড়িবামাত্রই তাহার মাথা নীচের দিকে হইয়া যাইবে এবং সে নেহাৎই অসহায় হইয়া পড়িবে।

বারো

আক্রমণকারীকে চিৎ করিয়া যদি জমিতে ফেলিতে পারা যায় তবে, তাহার দুই হাতের কব্জির নিকট ধরিয়া তাহার পেটের উপর ঘোড়ায়

চড়ার মত বস এবং পদদ্বয় তাহার কানের পার্শ্বদিকে ছড়াইয়া দাও। হাত ধরিবার সময় যেন তাহার হাতের তালু উপর দিকে থাকে। তাহার দুই হাত যেন সোজা অবস্থায় থাকে এবং কনুই যেন তোমার জঙ্ঘার উপর থাকে। এই অবস্থায় তাহার হস্তদ্বয়কে নীচের দিকে যদি চাপ দেওয়া যায় তাহা হইলে সে একেবারে অসহায় হইয়া পড়িবে।

তের

আক্রমনকারী যদি ডান হাত দিয়ে ছোরা লইয়া মারিতে আসে তবে ক্ষিপ্রতার সহিত তাহার কব্জির উপরে বাঁ হাতে করিয়া দৃঢ়ভাবে ধর এবং ডান হাত তাহার ঘাড়ের উপর দাও। সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ বেগে তাহার বাঁ হাত পশ্চাৎ দিক দিয়া ঘুরাইয়া মাথার উপর দিকে তোল আর ডান হাত দিয়া তাহার মাথা নীচের দিকে বাঁকাইবার চেষ্টা কর। একটু জোর দিলেই

ঘুসি মারিতে আসিলে আত্মরক্ষা
(Leg Trip Defence)

তাহার কোমর হইতে উপর দিকটা অতি সহজেই বাঁকিয়া যাইবে এবং সে অসহায় পড়িবে।

চৌদ্দ

আক্রমনকারী যদি পড়িয়া চিৎ হইয়া যায়, আর তুমিও যদি তার সঙ্গে তাহার ডান দিকে পড়িয়া যাও তবে ক্ষিপ্রতার সহিত চিৎ হইয়া শোয়া অবস্থায় বাঁ হাতে করিয়া তাহার ডান হাতের কব্জি ধর এবং ডান হাত তাহার ঐ ধৃত হাত তোমার ডান বগলে পুরিয়া তোমার ডান হাত তোমার বাম হাতের কব্জিতে ধর। এইবার তাহার হাত নীচের দিকে চাপ দাও। (ধরিবার সময় যেন তাহার হাতের তালু উপর দিকে

পায়ের গোড়ালি মার (Ankle throw)

থাকে) দেখিবে সহজেই সে তোমার বশ্যতার মধ্যে আসিবে।

পনেরো

যদি আক্রমণকারীকে পূর্ব্ব বর্ণিত কোনও কৌশলে চিৎ করিয়া ফেলিতে পার তবে ক্ষিপ্রতার সহিত তাহার ডান হাতের কব্জি বাঁ হাত দিয়া ধর এবং তাহার চোয়ালের নীচে শিরায় ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া চাপ দাও আর তাহার ডান হাত সোজা রাখিয়া ঐ হাতের নীচে তোমার ডান পা ভাঁজ করিয়া তাহার হাত রাখ। এইবার তোমার পায়ের উপর রাখিয়া তাহার হাত চাপা দিতে বেশ সুবিধা হইবে। মনে রাখিতে হইবে, হাত ধরিবার সময় যেন তাহার হাতের তালু উপর দিকে থাকে। ঐ অবস্থার দুই হাতে জোর দিলে একাধারে তাহার শ্বাস-রোধ ও হাতের সন্ধিস্থল ভাঙ্গিয়া যাইবে, সুতরাং

ঐ ভাবে চাপ পড়িবার পূর্ব্বে তাহার বশ্যতা স্বীকার করা ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকিবে না।

ষোল

আক্রমণকারী যদি তোমার কোটের দুই হাতে ধরে, তবে তৎক্ষণাৎ তুমিও তাহার কোটের দুই হাতে ধর। এইবার তোমার ডান পা দ্বারা তাহার পেটে ধাক্কা লাগাইয়া তাহার কোটের হাত ধর এবং সজোরে নীচের দিকে টানিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়। আর তাহার পেটে ধাক্কা লাগান তোমার পা উপর দিকে করিয়া তাহাকে তুলিয়া তোমার মাথার দিকে সজোরে ধাক্কা মারিয়া দাও। দেখিবে—সে তোমার মাথা পার হইয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। চিৎ হইয়া পড়িয়া গেলে তাহার বুকের উপর গিয়া ঘোড়ায় চড়ার মত বস। এইবার তাহার দুই হাতের তালু উপর দিকে

মাথা বন্দী (Head Lock counter)

রাখিয়া ধর এবং তোমার হাঁটুর উপর চাপ দিতে থাক। এই অবস্থায় অতি অল্প চাপেই সে অস্থির হইয়া পড়িবে। সুতরাং হাড় ভাঙ্গার ভয় থাকিলে তোমার বশ্যতা স্বীকার ভিন্ন তাহার উপায়ন্তর থাকিবে না।

সতেরো

আক্রমণকারী যদি তোমার দুই হাতের কব্জিতে ধরে, এবং সে যদি তোমার চেয়ে বলবান হয়, তাহা হইলে তাহার হাত সোজা করিয়া তাহার
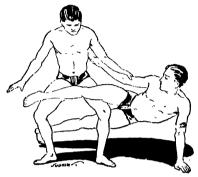
কাচি খেলা (The Scissors)

পশ্চাৎ দিকে একটু ঠেলা মার। আর ঐ সঙ্গে তোমার হাতের মুষ্টি বাঁকাইয়া তড়িৎ বেগে হাত ছাড়াইয়া তাহার দুই কব্জিতে ধর। এইবার নিজে তাহার পিছন দিক হইয়া তাহার দুই হাত তোমার যে কোন কাঁধের উপর রাখ। তাহার হাতের সম্ভবত সমস্ত অংশটা তোমার কাঁধ পার হইয়া যেন তোমার সম্মুখ দিকে চলিয়া আসে। এক্ষণে তাহার হস্তদ্বয়কে নীচের দিকে

বাহুবন্দী (Arm Lock)

সজোরে টানিতে থাক আর তুমি তোমার (কোমর হইতে সমস্ত অংশটা) সম্মুখ দিকে

গুড়ি হইয়া যাও। দেখিবে সে ডিগবাজী খাইয়া চিং হইয়া জমিতে পড়িয়া বিশেষরূপে মেরুদণ্ডে আঘাত প্রাপ্ত হইবে।

আঠারো

তুমি চিৎ হইয়া শুইয়া আছ এমন অবস্থায় আক্রমণকারী আসিয়া যদি তোমার কোটের গলার নিকট ডান দিকে চাপিয়া ধরে, তবে তুমি তৎক্ষণাৎ বাঁ হাত দিয়া তাহার কোটের ডান হাতে চাপিয়া ধর, আর ডান হাত দিয়া তাহার ডান পায়ের ঠিক হাঁটুর নীচে চাপিয়া ধর এবং বাঁ পা দিয়া তাহার বুকে ধাক্কা মার। এই রকম করাতে দেখিবে তাহার বাঁ পা ও মাথা তোমার নিকট আগাইয়া আসিয়াছে। তুমি এই সময় বাঁ হাত যে ভাবে ধরিয়া আছ, ঠিক সেই ভাবেই ধরিয়া রাখিবে কিন্তু ডান হাত তাহার পা ছাড়িয়া দিয়া তাহার ডান হাতের কব্জির মধ্যে ধরিবে। ঐ ভাবে ধরিয়াই তড়িৎবেগে ঘুরিয়া উঠিয়া বস। এক্ষণে ডান হাত দিয়া তাহার কব্জি সজোরে বাঁকাইতে থাক, আর বাঁ হাত দিয়া তাহার স্কন্ধের সন্ধি স্থলে চাপ দিতে থাক। ইহাতে তাহার অবস্থা সঙ্গিন হইয়া উঠিবে ফলে তোমার আয়ত্বের মধ্যে আসিবে।

হিপ থ্রো

উনিশ

তুমি চিৎ হইয়া শুইয়া আছ এমন অবস্থায় আক্রমণকারী যদি তোমার বুকে বসিয়া তোমার কোটের দুই কলারে চাপিয়া ধরে এবং দুই হাত কাছাকাছি করিয়া গলায় চাপ দিবার চেষ্টা করে, অর্থাৎ শ্বাস রোধ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে তুমি তাহার কোটের দুই হাতে চাপিয়া ধর এবং তাহাকে ঠকাইবার উদ্দেশ্যে তাহার হাত ছাড়াইবার জন্য পাশের দিকে টান দাও (কিন্তু ওরকম করিয়া আক্রমণকারীর ঐ ভাবে ধরায় হাত ছাড়ান যায় না) তারপর তোমার জোড় হাঁটু উপর দিকে তুলিয়া তাহার পিছনে সজোরে ধাক্কা মারিয়া ঠেলিয়া দাও। তাহা হইলে দেখিবে সে তোমার মাথা ডিঙ্গাইয়া ও ডিগবাজী খাইয়া চিৎপাত হইয়া

ব্যাক নি ট্রিপ (Back knee Trip)

পড়িবে এবং মেরুদণ্ডে ভীষণ রকম আঘাত প্রাপ্ত হইবে। ঐ ভাবে চিৎ হইয়া পড়িলে তুমি আবার বুকে ঘোড়া-চড়ার মত বসিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত তাহার হাতের কব্জিদ্বয় ধরিয়া ফেল। (হাতের তালু যেন উপর দিকে থাকে।) এইবার তাহার হস্তদ্বয় তোমার হাঁটুর নিকট রাখিয়া সজোরে চাপ দিতে থাক। বেশী জোরে চাপ পড়িলে আক্রমণকারীর হাতের সন্ধিস্থল ভাঙ্গিয়া যাইবে। সুতরাং হাত ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই সে তোমার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।

কুড়ি

আক্রমণকারী যদি পশ্চাৎ দিক হইতে তোমার গলা জড়াইয়া চাপিয়া ধরে, তবে তোমার ডান হাত দিয়া তাহার কোটের ডান হাতে চাপিয়া ধর

আর বাঁ হাত পিছন দিকে চালাইয়া তাহার পিঠের দিকের কোটের কাপড়ে ধর, এবং ঐ সঙ্গে ডান পা সম্মুখদিকে হাঁটু বাকাইয়া আগাইয়া লও। এইবার সম্মুখ দিকে গুড়ি হও। ঐরূপ করিলে সে নিজকে

যুযুৎসু ক্রীড়া আরম্ভ
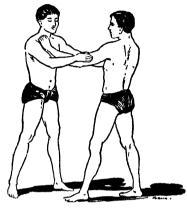
রক্ষা বা সামলাবার জন্য একটি হাত মুক্ত করিয়া ফেলিবে। ডান হাত তোমার ধরা থাকিবে বলিয়া সে বাঁ হাত ছাড়াইয়া ফেলিবে। এখন তাহার সমস্ত শরীরটা জমি ছাড়াইয়া পিঠের উপর রহিয়াছে এইবার আর একটু নীচের দিকে ঝুঁকিয়া গেলে জমিতে সজোরে চিৎ হইয়া আছাড় খাইয়া পড়িবে তখনও তোমার হাত পূর্ব্বের মত তাহার ডান হাত ধরিয়া থাকিবে। সে জমিতে পড়িয়া যাইবার পর তুমি হাটু একটু উঁচু করিয়া তোমার এক পা তাহার মাথায় ও এক পা তাহার বুকে রাখিয়া ধাক্কা মার আর তাহার ডান হাতের তালু উপর দিকে করিয়া তোমার হাঁটুতে চাপ দাও। একটু বেশী জোর প্রয়োগ করিলে তাহার হাত সন্ধিচ্যুত হইয়া যাইবে। সুতরাং তাহার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই তোমার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।

জাপানী কাঁকড়া-দৌড়

দুইটি অথবা কয়েকটি লাইনে সমান সংখ্যক করিয়া বালকদিগকে পিছন পিছন দাঁড় করাও। ঐ প্রত্যেক লাইনের সম্মুখ দিকের অন্ততঃ ২৫ ফুট দূরে চুণ দিয়া তিন ফুট ব্যাসের বৃত্ত অঙ্কিত কর।

নির্দ্দেশ পাইবা মাত্রই সম্মুখের বালক-দলের দিক সম্মুখ রাখিয়া, দুই হাত ও দুই পা সাহায্যে গুড়ি হইয়া বৃত্তের দিকে পিছন করিয়া দৌড়িয়া চল।

এক্ষণে আপন দলের সম্মুখের বৃত্তের মধ্যে পদদ্বয় স্পর্শ করিবা মাত্রই সোজাভাবে দৌড়িয়া আসিয়া আপন দলের সম্মুখের বালককে ছোঁয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াও। ছোঁয়া পাইবা মাত্রই সে আবার পূর্ব্ববর্ত্তী বালকের মত করিতে থাকিবে। যে দল সর্ব্বাগ্রে শেষ করিবে, তাহাদের জিত হইবে।

স্পর্শ খেলা

সীমাবদ্ধ অল্প পরিসর স্থানে সকলে দাঁড়াও। দলের মধ্যে একজন স্বেচ্ছায় খেলার দলের
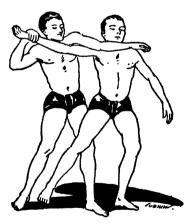
ব্যাক্‌থ্রো (Back Throw from wrist hold)

চোর হও। ঐ চোর ঐ খেলার দলের যে কোন বালকের শরীরের যে কোন স্থানে স্পর্শ করিবে, তৎক্ষণাৎ সেই বালক আবার ঐ স্পৃষ্ট স্থান বাঁ হাতে করিয়া স্পর্শ করিয়া অপর যে কোন

বালকের যে কোন স্থানে স্পর্শ করিবে। এই ভাবে খেলা চলিতে থাকিবে।

দৈহিক চর্চ্চায় জাপান—বর্ত্তমান

সকল দেশ অপেক্ষা জাপানের উন্নতি সকল বিষয়ে অধিক। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তাহাদের ব্যায়াম ক্রীড়াদির উন্নতির জন্যও জাগরণ আসিয়াছে। জাপান হইতে উপযুক্ত ব্যক্তি ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়া তথাকার খেলাধূলা বিষয়ে বিশেষ ভাবে আগ্রহের সহিত শিক্ষালাভ করিয়া, নিজের দেশে প্রবর্ত্তন করিয়াছে।

টেনিস্ খেলায় জাপান এখন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। খেলার মধ্যে 'বেসবল' তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। তারপরই প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়াদি এবং সন্তরণ। ইহাদের 'টেনিস,' 'বাসকেট বল', ভলিবল, ক্রীড়াদির মধ্যে সকলের উচ্চে স্থান। সোকার (Soccer) খেলায় কিন্তু কিছু কম আগ্রহ।

ইহাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান অতি সুন্দর রূপে গঠিত। তাহাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্দীপ্ত করিবার বিশেষ রকম বন্দোবস্ত আছে। বিশ্ব ওলিম্পিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় দেশবাসী প্রতিযোগিরা অনেক বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। আর প্রায় সকল প্রতিযোগিতায় নাম দেয়। তাহারা এ বিষয়ে আরও অধিকতর উন্নতির চেষ্টার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তাহারা এখনও ক্রীড়াতেও বিশ্বজয়ী সম্মান লাভের জন্য ব্যস্ত।

ফিলিপাইন

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে পাশ্চাত্যের সংস্রবে পড়িয়া প্রতীচ্যের অধিকতর ঘনিষ্ঠতা হয়। তাহার ফলে আধুনিক ব্যায়াম শিক্ষা আন্দোলন জাপান, চীন ও ফিলিপাইনে দেখা যায়।

এই ব্যায়াম শিক্ষার মূলীভূত কারণ প্রথমতঃ পাশ্চাত্যের লোকেরা ঐ সকল দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশে গমন করে। গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা-মন্দিরের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি, সৈনিক, নাবিক এবং খ্রীষ্টান মিশনারী প্রভৃতি যাহারা ঐ দেশ সমূহে প্রেরিত হইয়াছিল; তাহাদের দ্বারা চীন, জাপান, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে বর্ত্তমান ব্যায়াম ও ক্রীড়া-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু এ বিষয়ে Y.M.C.A.-র দান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

স্পেনিস-আমেরিকান যুদ্ধের পর পাশ্চাত্য দেশের বহু লোক ফিলিপাইন দ্বীপে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করে।

তাহাদের ব্যায়াম-পদ্ধতি ঐ দ্বীপবাসী পাশ্চাত্যদের প্রণালীতে তাহাদের স্কুলে ব্যায়াম ক্রীড়াদির অতি আধুনিক প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। এবং সমগ্র দ্বীপব্যাপী ব্যায়াম ক্রীড়াদি অভ্যাস করিয়া প্রতিযোগীতায় প্রবৃত্ত হয়।

এখন ঐ দ্বীপবাসী তাহাদের সেই পুরাতন 'মোরগের লড়াই' প্রভৃতি ক্রীড়াদি, বিশেষ বড় করিয়াছে।

এখন ভলিবল, বাসকেট বল, ফুটবল, টেনিস, ও প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়াদি, সন্তরণ ও বক্সিং প্রভৃতির প্রচলন সমগ্র দ্বীপব্যাপী হইয়াছে।

আমরা এখানে জাপানী যুযুৎসুর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ক্রীড়া কৌশলও বিশেষ ভাবে চিত্র দ্বারা প্রকাশ করিলাম।

বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক দেশেই বিভিন্ন প্রকারের ক্রীড়া প্রতিযোগীতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। বিলাতে মিঃ বার্টন রাইট (Mr. Barton Wright) নামে একজন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার জাপানের এই যুযুৎসু ক্রীড়া-কৌশল ইংল্যাণ্ডে প্রবর্ত্তন করেন। তিনি দেশে ফিরিবার সময় জাপান হইতে দুইজন জাপানী যুযুৎসানকে ইংল্যাণ্ডে আনয়ন করেন। জাপানী ব্যায়ামবীরেরা কিছুদিন এই খেলা দেখাইবার ফলে ইংরাজদের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হয় এবং ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই ইহা ইংল্যাণ্ডের একটি বেশ প্রিয় ব্যায়াম রূপে গৃহীত হইয়াছে। জাপানে যে এই ব্যায়াম-প্রণালী দুই হাজার বৎসরেরও পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে সে কথা বলিয়াছি।

প্রকৃত কথাটি কিন্তু জুডো (Judo) তাহাই ক্রমশঃ যুযুৎসু, রূপে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীর সব দেশের লোকের কাছেই এখন যুযুৎসু অত্যন্ত প্রিয় ব্যায়াম। আত্মরক্ষার পক্ষে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

শিশুরঞ্জন পদাবলী

[পদাবলীর মধ্যে শিশুরঞ্জন কবিতার অভাব নাই। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ঘটিত বহু পদ কবিত্বপূর্ণ শ্রুতিমধুর এবং শিশুলীলার মনোরম চিত্র; যেমন ভাষার সরলতা, কোমলতা ও লালিত্য, তেমনই ভাবের মাধুর্য্য। এখানে তাহার কয়েকটি কবিতা প্রকাশ করা হইল]

[২৬০৮ পৃষ্ঠার পর

নাচত মোহন নন্দ-দুলাল

ভাটিয়ারী

নাচত মোহন নন্দ-দুলাল।
বঙ্কিম চরণে মঞ্জীর ধন বাজত
কিঙ্কিণী তাঁহি রসাল॥
স্থল-পঙ্কজদল জিনিয়া চরণ-তল
অরুণ-কিরণ কিয়ে আভা।
তাহার উপরে নখ- চান্দ সুশোভিত
হেরইতে জগ-মন-লোভা॥
মণি-আভরণ কত অঙ্গহি ঝলকত
নাসায় মুকুতা কি বা দোলে।
মা মা বলি চান্দ-বদন তুলি
নবীন কোকিল যেন বোলে॥

কি মোহন যাদুয়া কি রঙ্গ

মায়ুর

কি মোহন যাদুয়া কি রঙ্গ।
নব নলিনী দল জিনি মুখ সুন্দর
পঙ্কজ বিরাজিত অঙ্গ॥
কর জানু ভর গতি চরণ চঞ্চল অতি
ক্ষিতি-চুম্বন মতি-মাল।
নিজ কটি-কিঙ্কিণী রুনুর ঝুনুর শুনি
রহি রহি অঙ্গ নেহার॥
জননী ভরম হৈয়া আনের নিকট যাইয়া
আঁচল ধরিয়া উঠে কোলে।
উর্দ্ধ নয়ান করি বয়ান নেহারে হরি
মা বলিয়া আন দিগে চলে॥
বুদ্ধি-রহিতে হেন ফিরে জগ-জীবন
যশোমতী দেখয়ে আনন্দে।
কহে যদুনাথ দাস জনমে জনমে আশ
সো পহুঁ-চরণারবিন্দে॥

মরি বাছা যাদুমণি ছাড় রে বসন

ভাটিয়ারী

মরি বাছা যাদুমণি ছাড় রে বসন।
কলসী উলায়্যা তোমারে লইব এখন॥
মরি তোমার বালাই লৈঞা আগে আগে চল ধাঞা
ঘুঙুর নূপুর কেমন বাজে শুনি।

রাঙা-লাঠি দিব হাতে খেলাইও শ্রীদামের সাথে
ঘরে গেলে দিব ক্ষীর ননী ॥
মুঞি রৈলুঁ তোমা লৈয়া গৃহ-কর্ম্ম গেল বৈয়া
মোরে এবে কেমন উপায় ।
কলসী লাগিল কাঁখে ছাড়রে অভাগী মাকে
হের দেখ ধবলী পিয়ায় ॥
মায়ের করুণা ভাষ শুনিয়া ছাড়িল বাস
আগে আগে চলে ব্রজ-রায় ।
কিঙ্কিণী কাছনি ধ্বনি অতি সুমধুর শুনি
রাণী বলে সোণার বাছা যায় ॥
ভুবন মোহিয়া ধায় ফিরিয়া ফিরিয়া চায়
সোনায় বান্ধিয়া খোপা তায় ।
ধাইয়া যাইতে পিঠে অধিক আনন্দ উঠে
নরসিংহ দাসে গুণ গায় ॥

নবনী লাগিয়াছে রে

সুহই

অরুণ অধর উরে নবীন লাগিয়াছে রে
মরি মরি বাছনি কানাই ।
হেরী যশোমতী প্রেমেতে পুরিত আঁখি
আয় কোলে বলিহারি যাই ॥
কর মোছে অধর মোছাই ॥
আয় আয় বাছনি কানাই ॥

দু বাহু পসারি আগে যায় নন্দ-রাণী

শ্রীরাগ

দু বাহু পসারি আগে যায় নন্দ-রাণী ।
ধরিতে না ধরা না তারে দেয় নীলমণি ॥
গৃহে গড়ি যায় দধি আর নবনীত ।
কোপ-নয়নে রাণী চাহে চারি ভিত ॥
হাদে রে নবনী-চোরা বলি পাছে ধায় ।
এ ঘর ও ঘর করি গোপাল লুকায় ॥
নড়ি হাতে নন্দ-রাণী যায় খেদাড়িয়া ।
অখিল-ভুবন-পতি যায় পলাইয়া ॥
এ তিন ভুবনে যাঁরে ভয় দিতে নারে ।
সে হরি পালাঞা যায় জননীর ডরে ॥
রাণীর কোল হৈতে গোপাল গেল পলাইয়া ।
আকুল হইলা রাণী গোপাল না দেখিয়া ॥

ঘরে ঘরে উকটিলুঁ সকল গোকুল ।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ হইল আকুল ॥
কার ঘরে আছ গোপাল কহ ডাক দিয়া ।
তোমার মায়ের প্রাণ যায় বিদারিয়া ॥
শ্রীদাম ডাকিয়া বলে কানাই আমার ঘরে ।
সভাকার প্রাণ গোপাল লুকাইল মায়ের ডরে ॥

বৎস-চারণ-লীলা

ধানশী

আগো মা আজি আমি চরাব বাছুর ।
পরাইয়া দেহ ধড়া মন্ত্র পড়ি বান্ধ চূড়া
চরণেতে পরাহ নূপুর ॥
অলকা তিলকা ভালে বন মালা দেহ গলে
শিঙ্গা বেত্র বেণু দেহ হাতে ।
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবলাদি বলরাম
সবাই দাঁড়াঞা রাজপথে ॥
বিশাল অর্জ্জুন জান কিঙ্কিণী অংশুমান
সাজিয়া সভাই গোঠে যায় ।
গোপালের কথা শুনি সজল নয়ানে রাণী
অচেতনে ধরণী লোটায় ॥
চঞ্চল বাছুরি সনে কেমনে ধাইবা বনে
কোমল দু খানি রাঙ্গা পায় ।
বিপ্রদাস ঘোষে বলে এ বয়সে গোঠে গেলে
প্রাণ কি ধরিতে পারে মায় ॥

গোষ্ঠগমন

টোড়ী

অরুণ উদয় বেলা যত শিশু হৈয়া মেলা
সভে গেল নন্দের দুয়ার ।
শিঙ্গা বেণু বংশী রব করয়ে রাখাল সব
গোঠে আইস নন্দের কুমার ॥
গোপাল তুমি যাবে কি না যাবে মাঠে ।
এক বোল বলিলে আমরা চলিয়া যাই
ধবলী শ্যামলী গেল গোঠে ॥
যদি বা এড়িয়া যাই অন্তরেতে বাথা পাই
চিত্ত নিবারিতে মোরা নারি ।
কি বা গুণ জান জান সদাই অন্তরে টান
এক তিল না দেখিলে মরি ॥

শুনিয়া শিশুর বাণী হাসে দেব চূড়ামণি
মুদিত নয়ান পরকাশে।
গোবিন্দদাস-পহুঁ হাসিয়া হাসিয়া লহু
চলিলেন বিহারের রসে॥

যাত্রা

কামোদ

প্রণতি করিয়া মায় চলিলা যাদব রায়
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গো-ক্ষুর-রেণু
শুব নব হরষিত মন॥
আগে আগে বৎস-পাল পাছে ধায় ব্রজ-বাল
হৈ হৈ শবদ ঘন রোল।
মধ্যে নাচি যায় শ্যাম দক্ষিণে সে বলরাম
ব্রজ-বাসী হেরিয়া বিভোর॥
নবীন রাখাল সব আবা আবা কলরব
শিরে চূড়া নটবর-বেশ।
আসিয়া-যমুনা তীরে নানা রঙ্গে খেলা করে
কত কত কৌতুক বিশেষ॥
কেহ যায় বৃষ-ছান্দে কেহ কার চড়ে কান্ধে
কেহ নাচে কেহ গান গায়।
এ দাস মাধব বলে কি শোভা যমুনা-কূলে
রাম কানাই আনন্দে খেলায়॥

গোটে চলে যাদুমণি

মঙ্গল রাগ

গোঠে চলে যাদুমণি উঠিল মঙ্গল ধ্বনি
শিঙ্গা বেণু মুরলী রসাল।
হাম্বা রবে ধেনু চলে হৈ হৈ রাখাল বলে
আগে পাছে চালাইয়া পাল॥
চলিলা শিশুর সঙ্গে গোধন চালাঞা রঙ্গে
যাবট নিকট পথে ধায়।
বৃষভানু-সুকুমারী অট্টালিকা পরে চড়ি
অনিমিখে চান্দ-মুখ চায়॥

গোঠ-বিজয়ী ব্রজ-রাজ-কিশোর

তুড়ী

গোঠ-বিজয়ী ব্রজ-রাজ-কিশোর।
জননী-বিরচিত বেশ উজোর॥
আগে আগে গোধন অগণিত চলিয়া।
পাছে ব্রজ বালক হৈ হৈ বলিয়া॥
সম-বয়-বেশ সবহুঁ এক ছান্দ।
রাম-বামে চলু শ্যামর-চান্দ॥
মউর-শিখণ্ড চূড়ে ঝলমলিয়া॥
মণিময় কুণ্ডল গণ্ডে টলমলিয়া॥
শিব পর চান্দ অধর পর মুরলী।
চলইতে পন্থে করয়ে কত খুরলী॥
কটি-তটে পীত পটাম্বর বনিয়া।
মন্থর-গতি চলু সুন্দর জিনিয়া॥
মণি-মঞ্জীর বাজত রুণি ঝুনিয়া।
গোবিন্দ দাস কহ ধনি ধনিয়া॥

শোন ব্রজরাজ স্বপনেতে আজ

শোন ব্রজরাজ স্বপনেতে আজ
দেখা দিয়া গোপাল কোথা লুকালো
(যেন) সে চঞ্চল চান্দে অঞ্চল ধরিয়া কান্দে
জননি দে ননী দে ননী ব'লে॥
নীল কলেবর ধূলায় ধূসর
বিধু মুখে যেন কতই মধুর স্বর
সঞ্চারিয়ে কান্দে মা ব'লে মা ব'লে
কত কান্দে বাছা বলি 'সর' 'সর'
আমি অভাগিনী বলি 'সর' 'সব,
নাহি অবসর কেবা দিবে সব
'সর' 'সর' বলি ফেলিলাম ঠেলে॥
ধূলা ঝেড়ে কোলে তুলে নিলাম চান্দে
অঞ্চলে মুছালাম চান্দের বদন চান্দ
পূর্ণ চান্দ কান্দে চান্দ বলে এ এ।
যে চান্দেব নিছনি কোটি কোটি চান্দ
সে কেন কান্দিবে বলি চান্দ চান্দ
বল্লাম চান্দের মাঝে তুই অকলঙ্ক চান্দ
ঐ দেখ চান্দ আছে তোর চরণ-তলে

নীল পীত ধড়া নন্দ পরায় আপনি

ভূপালী

নীল পীত ধড়া নন্দ পরায় আপনি।
নন্দন-তিলক দেই যশোদা রোহিণী॥
চূড়ায় ময়ূর পুচ্ছ গলে গুঞ্জ হার।
চরণে নূপুর রাণী দেই দোঁহাকার॥
গোপাল সাজাঞা রাণী দোলমান হিয়া।
একবার কোলে আয়রে মা মা বলিয়া॥

গ্রীক রণদেবতা—মার্স

গ্রীসের শেষ কথা

৩০৫১ পৃষ্ঠার পর
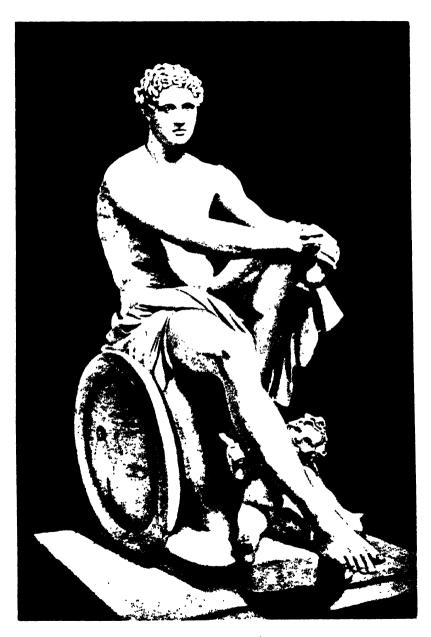
পূর্ব্বে থিবের যুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে ঐ যুদ্ধের পরে গ্রীসে আর একটি যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধ পবিত্র বা Sacred War নামে পরিচিত। **ড্যালফি** নগরে অবস্থিত (Delphi) এপোলোদেবের মন্দির গ্রীকদের কাছে বিশেষ পবিত্র বলিয়া পরিচিত।

একবার ফোসিসের (Phocis) কতকগুলি লোক এপোলো দেবতার মন্দিরের অধিকারভুক্ত কতক জমি চাষ করে, সেজন্য **এমফিকটীওনিক** (Amphictyonic) এর সদস্যগণ ঐ ফোসিয়ানদের উপর একটা জরিমানা করেন।

ফোসিয়ানরা কিন্তু পণ করিল তাহারা জরিমানার টাকা দিবে না—যুদ্ধই করিবে। এথেন্স, স্পার্টা ও এ্যাকিয়ার লোকেরা ফোসিয়ানদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন আর অন্য দিকে এমফিকটিওনিক কাউন্সিলকে সাহায্য করিবার জন্য থিবান, (Theban) লোক্রিয়ান, (Locrian) থেসালীয় (Thessaliun) প্রভৃতি ম্যাকিডোনিয়ার রাজা **ফিলিপকে** অগ্রণী করিয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল।

কোন ঐতিহাসিকের মতে **ম্যাকিডন্** একটী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিচিত। ম্যাকিডন্ রাজ্য অনেক কালের হইলেও, ফিলিপ ম্যাকিডনের সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে উহার সেইরূপ কোন প্রতিপত্তি বা প্রতিষ্ঠা ছিল না।

ফিলিপ ছিলেন রাজ্যলোলুপ এবং একজন প্রকৃত যোদ্ধা। তিনি তাঁহার সৈন্যদল লইয়া যখন গ্রীসের দিকে চলিলেন তখন তিনি মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে সমগ্র গ্রীস আপনার করতলগত করিতে হইবে। সে সময়ে গ্রীকদের মধ্যে লিওনিডাস, মিল্টিয়াডিস কিংবা এপামিনোণ্ডাসের মত কোন বীরপুরুষ ছিলেন না। ফিলিপ ডেমোসথিনিস্ নামক একজন বাগ্মীর অসাধারণ বাক্‌পটুতার জন্য সহজে এথেন্স জয় করিতে পারেন নাই। ডেমোসথিনিস্ এথেন্সের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বাগ্মী পৃথিবীর ইতিহাসে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ফিলিপ যখন এথেন্স আক্রমণ করিতে আসেন, তখন ডেমোসথিনিস যে সকল অগ্নিময়ী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার তুলনা মিলে না। তিনি বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিয়া এথেন্সের অধিবাসীদিগকে ফিলিপের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিলেন।

ম্যাকিডনের রাজার বিরুদ্ধে তাঁহার এই বক্তৃতাগুলি আজিও 'Philippic' নামে পরিচিত।

এথেনীয়ানরা কিন্তু কেরোনীয়া নামক স্থানে ৩৩৮খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ম্যাকিডনের রাজা ফিলিপের

ডেল্‌ফি নগরে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জধাতু নির্ম্মিত সারথির মূর্ত্তি

নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। ঐ সময় হইতে ফিলিপের মৃত্যু পর্য্যন্ত গ্রীস তাঁহার অধীনেই ছিল। এ কথা সত্য, যে ফিলিপ একজন সুদক্ষ নৃপতি ছিলেন। গ্রীক্‌দের মধ্যে ও তাঁহার ন্যায় দক্ষ নৃপতি দুর্লভ ছিল।

রাজা ফিলিপের যেমন অনেক সদ্‌গুণ ছিল তেমন তাঁহার দোষও ছিল অনেক। তিনি অত্যন্ত মদ্যপায়ী ছিলেন। একবার এক ভোজসভায় তিনি এক অদ্ভুত বিচার করিয়া বসিলেন, যে ব্যক্তি বিচারে হারিয়াছিলেন তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আমি মাতাল ফিলিপের কাছ হইতে ধীর ও বিজ্ঞ ফিলিপের নিকট আবেদন করিতেছি।" (I appeal from Philip drunk to Philip Sober)। ফিলিপের যখন মত্ততা দূর হইল, এ কথা না বলিলেও চলে যে তখন তিনি সুবিচার করিয়া আপনার বিচক্ষণতার পরিচয়ই দিয়াছিলেন।

একবার একটী দরিদ্র স্ত্রীলোক বিচারের জন্য ফিলিপের কাছে আসে কিন্তু আজ কাল করিয়া ফিলিপ তাহাকে কেবলই ফিরাইয়া দিতে লাগিলেন। যখনই ঐ দরিদ্র রমণী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিত, তখনি তিনি বলিয়া পাঠাইতেন নালিশ শুনিবার অবকাশ তাঁহার নাই। একদিন সেই মহিলা ফিলিপের নিকট যাইয়া বলিলেন—"যদি তোমার বিচার করিবার

স্পার্টার মেয়ে—স্বাস্থ্য ও সবলতার প্রতিমূর্ত্তি

অবসর না থাকে তাহা হইলে তোমার রাজা হইবার কোন অধিকার নাই।" এই কথায় ফিলিপের প্রাণে আঘাত লাগিল, তিনি স্ত্রীলোক-টিকে ডাকিয়া বলিলেন—"তুমি সত্য কথাই

বলিয়াছ।" তাহার পর ঐ বিধবার নালিশ বেশ মনোযোগের সহিত শুনিয়া সুবিচার করিলেন।

গ্রীস্ দেশের রাজা হইয়া ফিলিপ মাত্র দুই-বৎসর কাল বাঁচিয়াছিলেন। ফিলিপের দেহ-রক্ষীর দলের মধ্যে **পসেনীয়াস** নামে একজন সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। ফিলিপের একজন আত্মীয় তাঁহাকে অন্যায়রূপে আহত করেন। পসেনীয়াস রাজা ফিলিপের কাছে এ বিষয়ে বিচার প্রার্থনা করেন, কিন্তু ফিলিপ সে বিষয়ে উদাসীন রহিলেন।

এদিকে ফিলিপের কন্যার বিবাহের সময় যখন সাধারণ এক রঙ্গালয়ে বিবাহের উৎসব সম্পন্ন

বলের সাহায্যে শ্রমসাধ্য ব্যায়াম

সেকালের গ্রীকেরা বল দিয়া নানা প্রকার ব্যায়াম করিতেন। এই যুবকটি জানুর উপর বল রাখিয়া ভারসাম্য রক্ষা করিতেছে

হইতেছে এবং রাজা ফিলিপ সেখানে প্রবেশ করিতেছিলেন সেই সময়ে পসেনীয়াস্ উন্মুক্ত তরবারী হস্তে প্রবেশ করিয়া ফিলিপকে হত্যা করিলেন। ফিলিপের এই মৃত্যু সংবাদ যখন গ্রীসের চারিদিকে প্রচারিত হইল তখন সারা দেশে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। এথেন্সের লোকদের ত কথাই নাই! তাহারা পসেনীয়াস্‌কে পুরস্কারস্বরূপ একটী স্বর্ণমুকুট দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন, কেন না গ্রীস দেশের লোকেরা কেহই ম্যাকিডনের প্রভুত্ব পছন্দ করিতেছিলেন না।

আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়

ফিলিপের পর তাঁহার ছেলে আলেক্‌জাণ্ডার ম্যাকিডনের রাজা হইলেন। সে সময়ে তাঁহার

গ্রীকদেশের মুষ্টিযুদ্ধ

বয়স ছিল মাত্র কুড়ি বৎসর। এই আলেক্‌জাণ্ডার পরে Great অর্থাৎ মহাবীর নামে অভিহিত হইয়াছিলেন; বয়সে কম হইলেও ছেলেবেলা হইতেই তিনি অসাধারণ পরাক্রমের ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

আলেক্‌জাণ্ডার সমুদয় গ্রীক্‌ষ্টেট্ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের যাহারা বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, তাহাদের দমন করিয়া সমুদয় গ্রীক্‌সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক হইলেন এবং পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনীতে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্য ছিল। তিনি হেলেস্‌পণ্ট (Hellespont) উত্তীর্ণ হইয়া এসিয়ামাইনরের মধ্য দিয়া পারস্যে আসিলেন। পারস্যের নৃপতি দরায়ুস (Darius) বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আলেকজাণ্ডারের গতিরোধ করিবার জন্য ইহাদের (Issus) কাছে আসিলেন। আলেকজাণ্ডার

যুদ্ধবিদ্যা শিখিবার উপযোগী খেলা

তাঁহাকে পরাজিত করিলেন এবং তাঁহার একলক্ষ দশহাজার সৈন্য নিহত করিয়াছিলেন।

দরায়ুস্, এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য পুনরায় প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, এবং নিজে রাজসিংহাসনের অনুরূপ এক মণি-রত্ন-মণ্ডিত রথের উপর বসিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিতে আসিলেন। তাঁহার দেহরক্ষী সৈন্যদের পোষাক-পরিচ্ছদও ছিল তেমনি জাঁকজমকের।

এই যুদ্ধে পারসিক সৈন্যেরা বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিলেও শেষটায় তাহারা গ্রীক্ সৈন্যের কাছে পরাজয় মানিয়া পলায়ন করিল। সম্রাট দরায়ুস একাকী সেই রণক্ষেত্রে পড়িয়া রহিলেন। শেষটায় একটা ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নৃপতিকে তাঁহার নিজের দুইজন বিদ্রোহী সৈনিকের হাতে নিহত হইতে হইল।

এই বিজয়ের পর আলেকজাণ্ডার আপনার বিজয়ী সৈন্য লইয়া **পার্সিপোলিসে** গেলেন। পার্সিপোলিস্ (Persipolis) সে সময়ে পারস্যের রাজধানী ছিল। সেকালে পার্সিপোলিস ছিল ধনে-জনে পরিপূর্ণ অতুল, ঐশ্বর্য্যশালী নগরী। রাজপ্রাসাদের মধ্যে জারক্সেসের (Xerxes) একটি প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি ছিল, গ্রীক্সৈন্যেরা তাঁহার সেই মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া একেবারে ধূলিসাৎ করিল।

আলেকজাণ্ডার পার্সিপোলিসে যে ক'দিন ছিলেন, সে কয়দিন নানাবিধ বিলাসে ও মদ্যপানে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া সময় কাটাইতেছিলেন, একদিন রাত্রিতে একটি ভোজের উৎসবে একজন এথেনীয় রমণীর প্ররোচনায় আলেকজাণ্ডার পার্সিপোলিস নগরী অগ্নি দগ্ধ করিবার নিষ্ঠুর আদেশ দিলেন। প্রাচীন ধন-সম্পদশালী পার্সিপোলিস্ নগরী একেবারে ভস্মস্তূপে পরিণত হইল।

গ্রীক্-কুস্তিগীর

পারস্যবিজয়ের পরে তিনি ভারতের দিকে অগ্রসর হন। সে কথা তোমরা পূর্ব্বে পড়িয়াছ। এবং ভারতবর্ষ হইতে ফিরিবার পথেই বেবিলন নগরে যে মৃত্যু হইয়াছিল তাহাও জান। [শিশু-ভারতী, দ্বিতীয় খণ্ড ৬০৫-৬০৮]

আলেকজাণ্ডার প্রথম জীবনে উদার ও মহৎ ছিলেন, কিন্তু জয়ের পর জয় লাভ করিয়া তাঁহার মনে এইরূপ দাম্ভিকতা জন্মিয়াছিল যে তিনি

আপনাকে দেবতাদের সমকক্ষ বলিয়া বিবেচনা করিতেন; এবং জুপিটার দেবতার পুত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতার সম্বন্ধে এবং হঠকারিতার বিষয়ে অনেক কিছু গল্প প্রচলিত আছে।

গ্রীক্‌দের হাকি খেলা

এখানে তোমাদের কাছে দুই একটি গল্প বলিতেছি। **ক্লিটাস্** (Clitus) নামে একজন প্রাচীন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি তাঁহার পিতার আমলের লোক ছিলেন। একবার এক যুদ্ধে তিনি আলেক্‌জাণ্ডারের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। এজন্য ক্লিটাসের প্রতি আলেক্‌জাণ্ডার শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন এবং তাঁহার কথাও শুনিতেন। কিন্তু একদিন ঘটিল ভীষণ দুর্ঘটনা। এক ভোজ-উৎসবে আলেক্‌জাণ্ডার তাঁহার বিজয় কাহিনী বলিয়া যাইতেছিলেন,—বলিতেছিলেন পৃথিবীতে এমন বীরত্বের কাজ কেহ কোন দিন করেন নাই। বৃদ্ধ ক্লিটাস বলিলেন—"সম্রাট, তোমার পিতা ফিলিপ তোমার অপেক্ষাও অনেক বীরত্বের কাজ করিয়াছিলেন।" আলেক্‌জাণ্ডার ইহাতে এতদূর ক্রুদ্ধ হইলেন যে তিনি তাঁহার একজন অনুচরের খাপ হইতে তাহার তরবারি খানি বাহির করিয়া বৃদ্ধ ক্লিটাসের বুকে বসাইয়া দিলেন। পলক মধ্যে বৃদ্ধের দেহ ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। রক্তের ঢেউ বহিয়া গেল। আলেকজাণ্ডার শিহরিয়া উঠিলেন। একদিন যে তাঁহার জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারই জীবননাশ করিয়া অপূর্ব্ব প্রতিশোধ দিলেন!

আলেকজাণ্ডার ও দস্যুর গল্পটি তোমরা অনেকই জান। আলেকজাণ্ডারের সৈন্যেরা একবার একজন দস্যুকে ধরিয়া আনিয়া তাঁহার নিকট বিচারার্থ উপস্থিত করিলে—আলেকজাণ্ডার বলিলেন—'তুমি দস্যু-বৃত্তি কর কেন?" দস্যু উত্তর করিল—"আমিও যে ভাবে দস্যু-বৃত্তি করি, আপনিও সেই ভাবে দিগ্বিজয় করেন। তফাৎ এই যে আমার লোক জন কম, আর আমি অতি সামান্য ক্ষতিই করি, কিন্তু আপনার বিরাট সৈন্য-বাহিনী, আপনি আমার অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি করেন।"

দস্যু ও দিগ্বিজয়ী বীরে যে কতটুকু তফাৎ তাহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারিতেছ। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহ মূল্যবান শবাধারে (Coffin) আলেকজেন্দ্রিয়া নগরে রক্ষিত হইয়াছিল। মিশরের অধিবাসীরা তাঁহার

কুস্তিখেলা

মৃতদেহের প্রতি দেবতার ন্যায় সম্মান দেখাইয়াছিলেন, যেন তিনি পৃথিবীর কত বড় একজন হিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন!

গ্রীসে গল্‌দের আক্রমণ
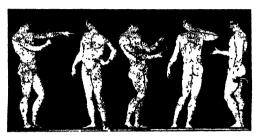
আলেকজাণ্ডার যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তাঁহার অনুচরেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার মৃত্যুর পর গ্রীসের সিংহাসনে কে বসিবে?" সে সময়ে গ্রীস হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। আলেকজাণ্ডার অনুচরগণের কথায় বলিলেন—যোগ্য জন সাম্রাজ্যের অধিকারী হইবে (To the most worthy)।

ব্যায়াম করিবার পরে ব্যায়াম-চিহ্ন অপসারণ করা হইতেছে

একটা আশ্চর্য্যের কথা এই, আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর দেখা গেল যে, তাঁহার সৈন্যদলের মধ্যে তেমন কোন বীর সৈন্যাধ্যক্ষ নাই যিনি সমগ্র সাম্রাজ্যের অধিপতি হইতে পারেন। কাজেই আলেকজাণ্ডারের তেত্রিশ জন প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণের মধ্যে তাঁহার বিরাট সাম্রাজ্য বিভক্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু যেমন হয় এই তেত্রিশ জন সৈন্যাধ্যক্ষ পরস্পরে কলহ করিয়া শেষটায় মাত্র চারিজন এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। এই ঘটনা ৩১২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ঘটিয়াছিল অর্থাৎ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর মাত্র ১১ বৎসর পরের কথা। আলেকজাণ্ডারের আত্মীয়-স্বজন সকলেই এই সব রাজ্যলোলুপ দস্যুদের হাতে নিহত হইয়াছিলেন।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর গ্রীকেরা স্বাধীন হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। **ক্যাশান্দার** (Cassandar) নামে আলেকজাণ্ডারের অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক গ্রীকদিগকে পরাজিত করিয়াছিল। এই বিজয়ের কিছুকাল পরেই ক্যাশান্দারের মৃত্যু হয়। তাহার পর গ্রীসের ইতিহাস শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ, আত্মকলহ এবং বিদ্রোহের ইতিহাসেই পরিপূর্ণ ছিল।

২৭৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে গলেরা বা কেল্টস্‌রা (Kelts) গ্রীস আক্রমণ করে। কেল্টসরা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ এবং বর্ব্বর ছিল। আমরা এখন যে দেশকে ফরাসী বা ফ্রান্স (France) বলি গলেরা সেই দেশের অধিবাসী ছিল। গলদের সেনাপতির নাম ছিল **ব্রেনাস** (Brennus) আর তাহাদের দলে প্রায় দুই লক্ষ লোক ছিল। ব্রেনাসকে কেহ কোন বাধা দেয় নাই সে তাহার সৈন্যদল লইয়া ডেল্‌ফি নগরে আসিল। ডেলফিতেই এপোলো দেবের মন্দির। মন্দিরের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করাই ছিল তাহার অভিপ্রায়। মন্দিরের একজন পুরোহিত ব্রেনাসকে বলিলেন· আপনি দেবতার অর্ঘ গ্রহণ করিবেন না। ব্রেনাস হাসিয়া বলিল—"এপোলের ন্যায় দেবতার অর্ঘের কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমি মানুষ আমার ধন-রত্নের বিশেষ প্রয়োজন আছে।" এই কথা

বর্শা নিক্ষেপ
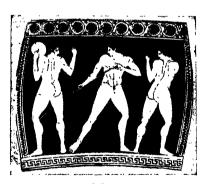
বলার সঙ্গে সঙ্গে গল্‌ সৈন্যেরা যেমন মন্দির ধ্বংস করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে—এমন সময় আকাশে ভয়ানক দুর্য্যোগ করিয়া আসিল। বজ্র গর্জ্জন করিতে লাগিল, অতি প্রবল ভাবে

ঝড়ের বাতাস বহিতে লাগিল, ভূমিকম্প হইতে লাগিল। এইরূপ আকস্মিক দৈব দুর্বিপাকে গল

ব্যায়ামবীরের স্মৃতিস্তম্ভ

সৈন্যেরা হতভম্ব হইয়া পড়িল। কি যে করিবে তাহাই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না একদল গ্রীক্‌,—মন্দির রক্ষার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল তাহারা গলদের এইরূপ বিচলিত ভাব দেখিয়া সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইল। তখন অন্ধকার হইয়া আসিল—কেহ কাহাকেও লক্ষ্য করিতে পারিতেছিল না। কে শত্রু কে মিত্র তাহাও বুঝা যাইতেছিল না। নিজেরাই মারামারি কাটাকাটি করিয়া বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। মন্দির লুণ্ঠন আর হইল না।

প্রাচীন ঐতিহাসিকেরা এ বিষয়টি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—আমরাও তাহাই বলিলাম। ইহার মধ্যে কতটা সত্য আছে তাহা বলা কঠিন তবে এইটুকু মনে হয় এই যুদ্ধই গ্রীকদের একমাত্র শেষ বিজয়। তারপর পতন-যুগ।

গ্রীক্‌ স্বাধীনতা-লোপ

গ্রীকেরা ধীরে ধীরে যেমন স্বাধীনতা হারাইতে লাগিলেন, তেমনি একদিন গ্রীকজাতির মধ্যে যে সকল সদ্‌গুণ বিরাজিত ছিল তাহাও বিলুপ্ত হইল। এখানে তাহারই একটি গল্প বলিতেছি।

স্পার্টাতে এগিস (Agis) নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল গ্রীসের পূর্ব্ব গৌরব ফিরাইয়া আনা। তোমরা জান, স্পার্টায় লাইকার-গাস নামে একজন পণ্ডিত ও দার্শনিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যে ভাবে দেশের বিবিধ সংস্কার করিয়াছিলেন, রাজা এগিসের ইচ্ছা ছিল তিনি ও

নৃত্যভঙ্গিমা

সেই ভাবে দেশের সংস্কার সাধন করেন কিন্তু সে-কালের স্পার্টায় আর এগিসের সময়কার স্পার্টাতে

অনেকখানি প্রভেদ বিদ্যমান ছিল। এ সময়ে স্পার্টার লোকেরা যেমন চরিত্র হারাইয়াছিল সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে তাহারা কাপুরুষ ও হইয়া পড়িয়াছিল। লাইকারগাসের নাম ও শুনিতে পারিত না তাহারা মনে করিল যে রাজা এগিস পুনরায় বিবিধ কঠিন রীতির প্রবর্ত্তন করিয়া দেশে একটা অশান্তির সৃষ্টি করিবেন।

একদিন স্পার্টার লোকেরা রাজ্যের হিতৈষী এই তরুণ নৃপতিকে জোর করিয়া সিংহাসন হইতে টানিয়া লইয়া যাইয়া কারাগারে বন্ধ করিয়া রাখিল। রাজ্যের লোকেরা নিজেরা ভালমন্দ বিচার করিল না তাহারা এই নির্দ্দোষ তরুণ নৃপতিকে কাটিয়া ফেলিল। এগিস্ লোকটি এত ভাল ছিলেন যে, যে জল্লাদের উপর এই নিষ্ঠুর হত্যাকার্য্যের ভার ছিল সেই জল্লাদ পর্য্যন্ত এগিসকে আঘাত করিবার পূর্ব্বে চোখের জল ফেলিয়াছিল। এগিস্ উহা দেখিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন- "তুমি আমার জন্য কাঁদিও না, আমি যাহাদের আদেশে আজ নিহত হইলাম আমি তাহাদের অপেক্ষা অনেক সুখী।" এগিসকে হত্যা করিবার পর তাহার মা ও দিদিমা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যখন কারাগারে আসিলেন তখন তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিয়া সেই মৃত দেহ এগিসের মৃত দেহের উপর ফেলিয়া দিয়াছিল। তাঁহারা পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই যে এগিসকে মারা হইয়াছে হয়ত তাহা হইলে তাঁহারা কারাগারে আসিতেন না।

রাজা ন্যাবিস্

স্পার্টায় পরে যিনি রাজা হইলেন তাহার নাম ছিল ন্যাবিস্ (Nabis)। তিনি যাকে বলে একজন নররাক্ষস ছিলেন। বোধ হয় স্পার্টার লোকদের পাপের উপযুক্ত সাজা দিবার জন্যই বিধাতা এইরূপ একজন লোককে স্পার্টার রাজার সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। ন্যাবিসের রাজপ্রাসাদে তাঁহার রাণীর এক অদ্ভুত প্রতিমূর্ত্তি ছিল। সেই মূর্ত্তিটীর পোষাক-পরিচ্ছদ ঠিক ছিল রাণীরই মত। কিন্তু তাহার হাতগুলি এবং বুকের দিকটা খুব তীক্ষ্ণ লৌহশলাকার দ্বারা নির্ম্মিত ছিল। ঐ সব মূল্যবান বসন-ভূষণে এইরূপ ভাবে আবৃত ছিল যে বাহির হইতে বুঝা যাইত না। রাজা ন্যাবিসের যখন কাহারও নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার ইচ্ছা হইত তখন তিনি সেই লোকটীকে রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন এবং মূর্ত্তিটির কাছে লইয়া আসিতেন। যেমন লোকটি মূর্ত্তির কাছে আসিত অমনি ঐ নারীমূর্ত্তি দুই হাত বিস্তার করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিত। কল-কব্জার সাহায্যে এইরূপ কঠোর পীড়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সেই লোকটী কোনরূপেই মূর্ত্তির আলিঙ্গন হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিত না। লোহার শলাকাগুলি তাহার শরীরের মধ্যে এমন ভাবে বিদ্ধ হইয়া যাইত যে সে কোন ক্রমেই রাজা ন্যাবিসের প্রার্থিত টাকা কড়ি দিবার প্রতিশ্রুতি না দিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিত না।

গ্রীস দেশের এইরূপ দুর্দ্দিনে এবং এইরূপ দুঃশাসনে দেশের লোকের যে কোন শান্তি ছিল না তাহা সহজেই বুঝিতে পার। ১৪৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে গ্রীস রোমের অধীন হইল।

তোমাদের কাছে আমরা প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসের সব কথাই বলিলাম, তোমরা বড় হইয়া যখন গ্রীস দেশের বিস্তারিত ইতিহাস পড়িবে তখন গ্রীসের ইতিহাস যে কিরূপ চিত্তাকর্ষক তাহা অনুভব করিতে পারিবে।

গ্রীসের বর্ত্তমান ইতিহাস

রোমদের অধীন হইবার পর হইতে গ্রীস তাহার পূর্ব্ব গৌরব হারাইয়া ফেলিল। নিজের দেশের উপরও আর তাহার কোন স্বাধীনতা রহিল না কিন্তু গ্রীসের প্রাচীন কবি, লেখক ও ভাস্কর এবং ঐতিহাসিকদের জন্য গ্রীস্ তখনও ইউরোপের অধিবাসীদিগের চক্ষে সম্মানের সহিত পরিলক্ষিত হইত।

খৃষ্টীয় ৩০০ শত এবং ৪০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে রোম সাম্রাজ্য পূর্ব্ব সাম্রাজ্য এবং পশ্চিম সাম্রাজ্য এই দুই ভাগে বিভক্ত হইল। পূর্ব্ব সাম্রাজ্যের রাজধানী হইল কন্‌ষ্ট্যান্টিনোপল্। গ্রীস-রাজ্য এই পূর্ব্ব রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইল। সময় সময় উহা গ্রীক্ সাম্রাজ্য নামেও অভিহিত হইত।

দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের গ্রীক যুবকের মূর্ত্তি

গ্রীসের শেষ-কথা

১৪৫০ খৃঃঅব্দে তুর্কীরা রোমকদের এই পূর্ব্ব সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। রোমকেরা তুর্কীদের কাছে পরাজিত হইল। তাহারই ফলে গ্রীস ও তুর্কীর অধীন হইল। প্রায় চার শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত গ্রীকেরা তুর্কীদের হাতে ক্রীতদাসের মত ব্যবহার পাইয়াছিল। অবশেষে ১৮২১ খৃঃ অব্দে গ্রীকেরা তুর্কীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। গ্রীস ও তুরস্কে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। অনেকদিন পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। ইউরোপের খৃষ্টান অধিবাসীরা অনেকেই গ্রীসের সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। গ্রীসের প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাস স্মরণ করিয়াই বোধ হয় অন্যান্য দেশের লোকেরা এই দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তোমরা ইংরাজ কবি লর্ড বায়রণের নাম শুনিয়া থাকিবে, তিনি গ্রীস দেশকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি গ্রীসের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিলেন এবং এই যুদ্ধেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং রুশ এই সম্মিলিত তিন রাজশক্তির নৌবহর গ্রীসের সমুদ্রউপকূলে আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। এই সম্মিলিত নৌবহরের পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন স্যার এডওয়ার্ড কড্রিংটন (Sir Edward Codrington)। ১৮২৭ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে এই মিলিত নৌবহর তুর্কীদের প্রায় ২০০ নৌবহর আক্রমণ করিল। এই ভীষণ নৌযুদ্ধে তুর্কী নৌবহর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। কতকগুলি জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছিল, কতগুলি পুড়িয়া গিয়াছিল। এইভাবে গ্রীস,—তুর্কীর অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করে। কিন্তু ইংল্যাণ্ড, ফরাসী এবং রুশ রাজসরকার দেখিলেন যে গ্রীস, রাজ্য শাসনসম্পর্কে নিজের পায়ে দাঁড়াইবার মত শক্তি ধারণ করে নাই। এই জন্য ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ওথো নামে (Otho) একজন বেভেরিয়ার রাজপুত্রকে গ্রীসের সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হইল। ওথো প্রজাদের মনোরঞ্জন করিতে না পারায় তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা হইল এবং সেই অল্প সময়ে গ্রীস এক অস্থায়ী রাজসরকার কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে গ্রীকেরা ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র প্রিন্স এলফ্রেডকে গ্রীসের রাজা মনোনীত করেন। ব্রিটিশ রাজসরকার ইহা নামঞ্জুর করিলেন। তাহার ফলে ডেনমার্কের রাজার দ্বিতীয় পুত্র গ্রীসের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দের নভেম্বর মাসে তিনি গ্রীসে আসিলেন এবং প্রথম জর্জ্জ নাম লইয়া গ্রীসের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। আইয়োনীয়ান দ্বীপ সমূহ পূর্ব্বে ব্রিটেনের অধিকারে ছিল এইবার সেইগুলি গ্রীস রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হইল এবং ব্রিটিশ শাসন সংরক্ষণাধীনে (British protection) রাজ্য পরিচালিত হইবার ব্যবস্থা হইল।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বার্লিন কংগ্রেসের বিধানানুসারে গ্রীসের প্রান্ত দেশের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। সেখানে (Thessaly) গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত হইল। ইহার পরে গ্রীকেরা ক্রীট (Crete) দ্বীপ দাবী করার ফলে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ অল্পেই মীমাংসিত হইয়াছিল।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে লণ্ডনের এক সন্ধি বৈঠক (Treaty of London)এর বিধানানুসারে ক্রীট গ্রীকের অন্তর্ভূক্ত হইল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে গ্রীসের রাজা জর্জ্জ একজন গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন। তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র কনষ্টেনটাইন (দ্বাদশ) গ্রীসের রাজা হন। পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের পূর্ব্বক্ষণে গ্রীস নিরপেক্ষ ছিলেন। এই নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে গ্রীসের বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। কেন না, ফরাসীও ব্রিটেন গ্রীসকে তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করিবার জন্য বেশ চাপ দিয়াছিলেন। ১৯১৭ সালের জুন মাসে ফরাসী এবং গ্রেট ব্রিটেন (Protecting Powers) এর ক্ষমতাবলে গ্রীসের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। ঐ সময়ে রাজপক্ষ ও ভেনিজেলিয় (Venizelist) দের মধ্যে গোলমাল চলিতেছিল। গ্রীকেরা গণতন্ত্রের পক্ষপাতী হইলেন। রাজা কনষ্টেণ্টাইন রাজ্য ত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্থানে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আলেক্জাণ্ডার হইলেন গ্রীসের রাজা। ১৯২০ সালের ২৫শে অক্টোবর রাজা আলেকজাণ্ডার বানরের কামড়ে মারা গেলেন। সে সময় হইতে রাজ্য মধ্যে নানারূপ অশান্তি চলিতে লাগিল।
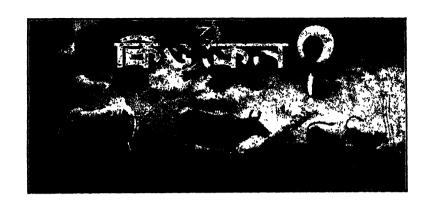
ভিজা বালি শক্ত কেন ?

৩২ পৃষ্ঠার পর

তোমরা প্রায় প্রত্যেকেই এই অভিজ্ঞতাটা লাভ করিয়াছ যে বালিভরা পথে, মাঠে, নদীর পারে বা সমুদ্রের তীরে চলা কিংবা ঘোড়ায় দৌড়ান বড় সহজ নহে। ঝুর ঝুরে বালির মধ্যে পা ডুবিয়া যায়। ঐরূপ পথে চলাও হয় ভীষণ কঠিন। আবার নদীর তীরে কিংবা সমুদ্রের তীরে জোয়ারের পর যদি বেড়াইতে যাও তখন দেখিতে পাইবে যে চলা বেশ আরামপ্রদ, এমন কি তখন তুমি ভিজা বালির উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিতে পার এমন কি ঘোড়া ছুটাইয়া গেলেও কোন অসুবিধা হইবে না। কেন এমন হয় ? শুকনো বালিতে ও ভিজা বালিতে এত প্রভেদ কেন ? শুকনো বালি ঠিক যেন চিনির দানা, কিংবা চালের দানার মত। এই সব চিনির দানা, চালের দানা আলাদা আলাদা থাকে জোবা লাগে না। কাজেই এই সব ঝুর ঝুরে এবং প্রত্যেকটি বিভিন্ন দানার ন্যায় বিভিন্ন অথচ পুঞ্জীভূত বালুকা-রাশির উপর দিয়া যদি তুমি হাঁটিয়া চল, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার পা ডুবিয়া যাইবে। কিন্তু বালুরাশি যখন স্রোতের জলে ভিজিয়া যায়, তখন তরল জলের আবরণে তাহারা সব পরস্পর সংলগ্ন হইয়া বেশ জমাট বাঁধিয়া শক্ত হইয়া যায় প্রত্যেকটা কণা আর পৃথক থাকে না, এ-জন্যই জমাট বাঁধা, শক্ত বালুকারাশি মানুষের, ঘোড়ার ও অন্যান্য জীবজন্তুর বোঝা বহন করিতে পারে।
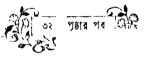
মুক্তা কোথায় পাওয়া যায় ?

পৃথিবীর নানা স্থানে মুক্তা পাওয়া যায়। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া এবং সিংহলেই সবচেয়ে বেশী মুক্তা পাওয়া যায়। সিংহলে ডুবুরীরা, কোনরূপ ডুবুরীর পোষাক না পরিয়াই সমুদ্রের জলে ডুব দিয়া মুক্তা সংগ্রহ করে। তাহারা ডুব দিয়া ৫০-৮০ সেকেণ্ড সময় পর্য্যন্ত জলের নীচে থাকে। তাহারা ঝিনুকগুলি সংগ্রহ করিয়া গলায় ঝুলানো চুপড়ীর ভিতরে পুরিয়া উপরে লইয়া আসে। এই ডুবুরীরা প্রতিদিন মাত্র অল্প কয়েক ঘণ্টা কাজ করিতে পারে। তারপর ক্লান্তিবশতঃ সারাদিন বিশ্রাম করিয়া থাকে।

সিংহলের মুক্তা-ব্যবসায় গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। যাহাতে একটি ঝিনুকও চুরি না হয় সে-জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। কোন কোন দিন ৪০ লক্ষ পঞ্চাশ লক্ষ ঝিনুক বা শুক্তি (Oysters) তোলা হয়।
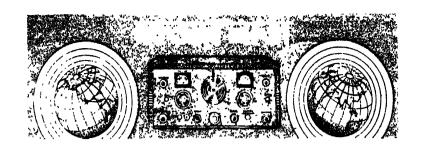
বেতারের সূচনা

বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানেব ব্যবস্থা আধুনিক সভ্যতার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। অতীতকালের তুলনায় এই ব্যবস্থা কত উন্নত কত দ্রুত হইয়াছে তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। এক শত বৎসর আগেও রাজকীয় আবশ্যকীয় সংবাদ পাঠাইতে হইলে ঘোড়াব ডাক বসান হইত—ইহাই ছিল সে সময়কার সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা। দ্রুত সংবাদ প্রেরণের উপায় প্রথম বাহির হইল যখন ষ্টিম-এঞ্জিন ও বেলগাড়ীর উদ্ভাবন হইল। ঘোড়ার ডাকে যেখানে ১০ দিন সময় লাগিত সেখানে ১০ ঘণ্টায় সংবাদ পাঠান সম্ভবপর হইল। কিন্তু দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের যথার্থ উন্নতি হইল যখন গত শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যুতের প্রয়োগ শিখিয়া মানুষ টেলিগ্রাফি উদ্ভাবন করিল। দুইটা দেশের মধ্যে যদি ধাতু-নির্ম্মিত বিদ্যুৎ-পরিচালক তারের যোগ থাকে তা' হইলে তাহার সাহায্যে নিমেষ মধ্যে এক দেশ হইতে অপর দেশে সংবাদ পাঠান এই নবোদ্ভাবিত টেলিগ্রাফির দ্বারা সম্ভব হইল। "নিমেষ মধ্যে" এই কথা রূপকভাবে ব্যবহার করিতেছি না। যদি পৃথিবী বেড়িয়া বিদ্যুত পরিচালক তার থাকে তবে সেই তার বাহিয়া টেলিগ্রাফের সঙ্কেত এক সেকেণ্ডে একাধিকবাব পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে পারে।

টেলিগ্রাফিতে সংবাদ পাঠান হয় সঙ্কেত দ্বারা। সাধারণের পক্ষে বিশেষ শিক্ষা ব্যতীত এই সঙ্কেতের (টরেটক্কার) অর্থ-বোঝা সম্ভব নয়। এই অভাব দূর করার জন্য টেলিফোনের উদ্ভাবন হইল। টেলি-ফোনের বাক্‌যন্ত্রের কাছে কথা বলিলে সেই কথা বিদ্যুৎ-প্রবাহে রূপান্তরিত হইয়া টেলি-ফোনের তার বাহিয়া দূরে গ্রাহকের কাছে পৌঁছায়। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বেশী দিন হইয়াছে; আমরা ইহাদের ব্যবহারে অনেক দিন

হইতেই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া এই দুইটি বৈদ্যুতিক উদ্ভাবন আমাদের কাছে এখন বেশী আশ্চার্য ঠেকে না। কিন্তু এই শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন বেতারে অর্থাৎ প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে তারের যোগ ব্যতীত টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা হইল তখন সকলের নিকট তাহা এক অভূতপূর্ব্ব অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলিয়া মনে হইল। সাধারণ মানুষের এ বিষয়ে আশ্চর্য্য হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। টেলিগ্রাফ বা টেলি ফোনে প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে তারের যোগ থাকে। সংবাদ যে বিদ্যুত-প্রবাহের সাহায্যে তার বাহিয়া এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় যাইতেছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু প্রেরক ও গ্রাহক যেখানে একে অপর হইতে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত, যেখানে দুইয়ের মধ্যে দৃশ্যতঃ কোনও যোগসূত্র নাই, অথচ একে সঙ্কেত করিলে অপরে সেই সঙ্কেত গ্রহণ করিতে পারিতেছে ইহা বাস্তবিকই অত্যাশ্চর্য্য ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়।

এই শতাব্দীর গোড়ায় বেতার টেলিগ্রাফি আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়াছি। আবার ইহার পর ১৫।২০ বৎসর যাইতে না যাইতে বেতার টেলিফোনির উদ্ভাবন হইয়াছে। অর্থাৎ এক জায়গায় কেহ যদি প্রেরক-যন্ত্রের সামনে বসিয়া কথা বলে তবে সেই কথা হাজার হাজার মাইল দূরে অপর ব্যক্তি বেতার-গ্রাহক যন্ত্রের সম্মুখে বসিয়া শুনিতে পায়—অথচ প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহন করিবার জন্য কোনও তারের সংযোগ নাই। এই বেতার-টেলিগ্রাফি ও টেলিফোনির উদ্ভাবনার ইতিহাস যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনই শিক্ষাপ্রদ।

বেতার বার্ত্তা কি?

গোড়াতেই বেতার-বার্ত্তা কি—এইটুকু পরিষ্কার বুঝিয়া লইলে ভাল হয়। বেতার বা Wireless বলিলে আমরা সাধারণতঃ বুঝি, যে একজন প্রেরক ও একজন গ্রাহক আছেন—দুইয়ের মধ্যে দৃশ্যতঃ কোনরূপ তারের সংযোগ নাই—অথচ একজন কথাবার্ত্তা বলিলে আর এক-জনের কাছে সেই কথাবার্ত্তা পৌঁছিতেছে। বেতারের এই সাধারণ সংজ্ঞা যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে আমরা অহরহ "বেতারে" আলাপ করিতেছি। আমি এইখানে বসিয়া কথা বলিতেছি, আর তুমি আমার সম্মুখে পাঁচ সাত হাত দূরে বসিয়া আমার কথা শুনিতেছ, আমার আর তোমার মধ্যে ত তারের কোনও যোগ নাই—তবে ইহাকেও "বেতার-বার্ত্তা" বলিব না কেন?

আমাদের এই সাধারণ কথাবার্ত্তার "বেতার" কি উপায়ে হইতেছে দেখা যাক্। আমি যখন কথা বলিতেছি তখন আমার কণ্ঠের বাক্‌যন্ত্র সম্মুখস্থ বায়ুতে আন্দোলন তুলিতেছে, সেই আন্দোলন বায়ু দ্বারা বাহিত হইয়া তোমার কাণে পৌঁছিতেছে। শব্দের "বেতারের" প্রেরক আমার কণ্ঠ, গ্রাহক তোমার কর্ণ ও বাহক আমাদের উভয়ের মধ্যে বায়ুরাশি। মধ্যে যদি বায়ুরাশি না থাকিত তা' হইলে শব্দ প্রেরণ সম্ভবপর হইত না। এই ধরণের শব্দের "বেতারে" একটা বড় ত্রুটি—যে ত্রুটির জন্য মানুষকে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদি উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে—এই যে ইহার দৌড় বেশী দূর নয়। কথাবার্ত্তা বিশ-পঁচিশ ফুট যায়—খুব জোর গলায় বক্তৃতা করিলে তাহা হয়ত ২।৩ শত ফিট পৌঁছায়। কামানের

বেতারের ক্রমবিকাশ

ধূমের সঙ্কেত   উচ্চস্থান হইতে অগ্নির নিশানা   উইণ্ডমিলের সঙ্কেত

ত্রিকোণাকার কাঠের ইঙ্গিত   ঝিলিমিলির সঙ্কেত   সিমাফোরের সাহায্যে সংবাদ   গোলাকার চাকতির নিশানা

হেলিয়োগ্রাফ   বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ   টেলিফোনের আবিষ্কার

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মার্কনীর বেতার টেলিগ্রাফের সুরু হইল। তাহা হইতেই Wireless Beam আবিষ্কৃত হইয়া ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম ব্যবহৃত হয়

গর্জ্জন হয়ত ৮।১০ মাইল যায়। ইহার বেশী দূরে শব্দ সাধারণতঃ যায় না। শব্দের ঢেউ চলেও মন্থর গতিতে—সেকেণ্ডে মাত্র ১১০০ ফিট। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে এত জোরে শব্দ হইল যে তাহা কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান পৌঁছিতে পারে, তবে পৌঁছিতে ৪॥ মিনিট লাগিবে।

শব্দের "বেতার" ছাড়া আর একরকম উপায়ে বিনাতারে সংবাদ আদান-প্রদান করা যায়। অন্ধকার রাত্রে ইলেক্‌ট্রিক্ টর্চ্চের সাহায্যে ক্ষণে ক্ষণে আলো জ্বালাইয়া ও নিবাইয়া সহজেই দূরে সঙ্কেত পাঠান যায়। প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে যদি কোনও বাধা না থাকে তা হইলে অনেক দূরে ৫।১০ মাইল দূরেও এই উপায়ে সংবাদ পাঠান যায়। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় এই উপায়ে সঙ্কেত পাঠাইবার ব্যবস্থা এখনও সময়ে সময়ে করা হয়। (স্বতন্ত্র মুদ্রিত ছবি দেখ) শব্দের "বেতারের" মত এই উপায়ে সংবাদ আদান-প্রদানের বেলাতেও প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ইহাকে বেতার বার্ত্তা কেন বলিব না? এখানেও ত প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে কোনও তারের সংযোগ নাই। বাস্তবিক পক্ষে ইহাকে আলোর "বেতার" না বলিবার পক্ষে কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন করা যাইতে পারে শব্দের বেলা শব্দের বাহক হইল বাতাসের আন্দোলন বা ঢেউ—কিন্তু আলোকের বাহক কি? সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে, পৃথিবী ও তারকার মধ্যে যে কোটি কোটি যোজন শূন্য আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে সেখানে ত বায়ু নাই, বায়ুর ঢেউও নাই, তবুও ত সূর্য্য ও তারকা হইতে আলো পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছাইতেছে। আলোক তা' হইলে কি বাহিয়া আসে? বৈজ্ঞানিকেরা এইখানে পরিকল্পনা করেন যে এই আপাত-প্রতীয়মান শূন্য আকাশ ইথর নামক এক অতি ঘন পদার্থে পূর্ণ। এই সর্ব্বব্যাপী ইথরের ঢেউই আলোকের বাহক। আমি একটা দীপ জ্বালিবা মাত্র দীপের জলন্ত শিখা ইথরে ঢেউ সৃষ্টি করে। স্থির জলে ঢিল ফেলিতে থাকিলে যেরূপ ঢেউ হয়, ইথরে ঢেউ-ও সেইরূপ চারিদিকে গোলাকার ভাবে ছড়াইয়া পড়ে। ইথরে আলোকেব এই ঢেউয়ের গতিবেগ অসাধাবণ। সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল। এই গতিবেগের কাছে বায়ুরাশিতে শব্দের ঢেউয়ের গতিবেগ (সেকেণ্ডে ১১০০ ফিট) অকিঞ্চিৎকর। ঢেউ চলিবার পথে মানুষের চক্ষু পড়িলে, চক্ষুর অভ্যন্তরস্থিত নেত্রপটে (retina) আঘাত করিয়া ঢেউ মানুষের আলোকানুভূতি ঘটায়।

মানুষের বেতাব-উদ্ভাবনেব বহু পূর্ব্ব হইতে প্রকৃতি মানুষেব চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের গোচরে শব্দ ও আলোকের সাহায্যে বেতার সংবাদ আদান প্রদানের এই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে বেতারের এত রকম ব্যবস্থা থাকিতে আবার নূতন করিয়া বেতার সংবাদ-প্রেরণের উপায় উদ্ভাবন করিবার কি আবশ্যকতা ছিল—আর সে উদ্ভাবনের নূতনত্বই বা কোথায়? শব্দের বেতার ও আলোকের-বেতার এই দুই বেতারের সুবিধা অসুবিধা দুই-ই আছে। প্রথম মস্ত সুবিধা এই যে ইহাদের জন্য বিশেষ কোনও যন্ত্র-পাতি আবশ্যক হয় না। ইহা ছাড়া শব্দের বেলা একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, শব্দ চলিতে চলিতে সাম্‌নে বাধা পাইলে বাঁকিয়া ঘুরিয়া যাইতে পারে। আমি ঘরে বসিয়া কথা বলিতেছি—আপনি ঠিক দরজার সাম্‌নে না

দাঁড়াইয়া আড়ালে থাকিয়াও আমার কথা শুনিতে পান। শব্দ দরজার পাশে ঘুরিয়া আপনার কাণে পৌঁছায়। শব্দের বেতারের এই সুবিধা আলোকের বেতারে নাই। ইথরে আলোকের ঢেউ সোজাসুজি চলে; চলার পথে বাধা পাইলে ঘুরিয়া যাইতে পারে না। ঘরে আলো জ্বলিতেছে, আমি যদি আলোর সামনে হাত ধরিয়া আড়াল করি তা' হইলে আলো আপনার কাছে পৌঁছিবে না।

কিন্তু আলোর একটা মস্ত গুণ আছে। আলো শব্দের অপেক্ষা অনেক বেশী দূর যাইতে পারে—আর আগেই বলিয়াছি, বেগও অতি প্রচণ্ড। মানুষেব উদ্ভাবিত বেতার, শব্দের বেতার ও আলোর বেতার এই দুই বেতারের গুণের সমন্বয় করিয়াছে। এই বেতারের সাহায্যে সংবাদ অতিদূরে যাইতে পারে—গতির বেগ ঠিক আলোকেরই মত—আবার শব্দের ঢেউয়ের মত সাম্‌নে বাধা পাইলে ঘুরিয়া বাঁকিয়া যাইতে পারে। এই বেতারের ঢেউগুলি আলোকের মত ইথরের ঢেউ মাত্র, তফাৎ এই যে ইহার ঢেউগুলি আলোকের ঢেউয়ের চাইতে ঢের বেশী লম্বা। আলোকের ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের একভাগ হইবে; বেতারের ঢেউগুলি ১০০, ২০০, ১০০০, ২০০০ ফিট লম্বা।

ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য কাহাকে বলে তাহা এই-খানে জানিয়া রাখা দরকার। সারিবদ্ধ ঢেউয়ের শ্রেণীতে একটা ঢেউয়ের মাথা হইতে তাহার পাশের ঢেউয়ের মাথার দূরত্বকে ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য বলে। এই দূরত্ব খুব বেশী হইলে বলা হয় ঢেউ খুব লম্বা, দূরত্ব কম হইলে বলা হয় ঢেউ ছোট। ঢেউয়ের মাথা খুব উচু হইলে বলা হয় ঢেউ খুব জোরাল। ঢেউয়ের মাথার উচ্চতা আর ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য দুইটা আলাদা জিনিষ।

সামনে বাধা পাইলে ঢেউ কি পরিমাণ বাঁকিবে তাহা নির্ভর করে ঢেউয়ের দৈর্ঘ্যের উপর। ঢেউ চলিবার পথে যদি সাম্‌নে বাধা পায় ও সেই বাধার আয়তন যদি ঢেউএর দৈর্ঘ্যের তুলনায় ছোট হয় তা' হইলে ঢেউ বাধাকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া যাইতে পারে। পক্ষান্তরে বাধার আয়তন যদি ঢেউএর দৈর্ঘ্যের তুলনায় বড় হয় তা' হইলে ঢেউ বাধাতে প্রতিহত হয় ও বাঁকিয়া ঘুরিয়া বাধাকে বেষ্টন করিয়া বাধার অপর পার্শ্বে যায় না।

বাতাসে শব্দের ঢেউ ২০, ২৫, ১০০ ফিট লম্বা, সুতরাং সাম্‌নে সাধারণ আয়তনের বাধা পাইলে সেগুলিকে সহজেই বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া যাইতে পারে। পক্ষান্তরে ইথরে আলোকের ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য আন্দাজ এক ইঞ্চের লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র। এত ছোট ঢেউ চলিবার পথে সাম্‌নে সাধারণ জিনিষের বাধা পাইলে তাহাকে বেষ্টন করিয়া যাইতে পারে না। ফলে আলোক মোটামুটি সোজা পথে চলে। কিন্তু যদি কোনও উপায়ে ইথরে খুব লম্বা লম্বা ঢেউ তোলা যায় তা হইলে সেগুলিও শব্দের ঢেউয়ের মত চলিবার পথ সাম্‌নে বাধা পাইলে তাহাকে ঘুরিয়া বেষ্টন করিয়া যাইতে পারে। মানুষের উদ্ভাবিত বেতার-বার্ত্তা প্রণালীতে ইথরে লম্বা ঢেউ তুলিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সহজ ভাষায় বলিতে গেলে বলা যায় যে মানুষের উদ্ভাবিত বেতার-যন্ত্রে এক জায়গায় একটি গ্রাহক যন্ত্র আছে। প্রেরক-যন্ত্র হইতে ইথরের বড় বড়

লম্বা লম্বা ঢেউ তোলা হইতেছে; এই ঢেউ সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল বেগে চারিদিকে ছুটিয়া চলিতেছে, সম্মুখে বাধা পড়িলে তাহা বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া যাইতেছে, দূরে গ্রাহক-যন্ত্র এই বেতার-ঢেউ ধরিয়া ঢেউ হইতে প্রেরক-যন্ত্রের সংবাদ আদায় করিতেছে। প্রেরক-যন্ত্র যেন আলোক-বর্ত্তিকা ও গ্রাহক-যন্ত্র যেন চক্ষু: আলোক-বর্ত্তিকা ইথরে ছোট ছোট ঢেউ তুলে, আর মানুষের উদ্ভাবিত বেতার-প্রেরক-যন্ত্র লম্বা লম্বা ঢেউ সৃষ্টি করে: চক্ষু শুধু ছোট ছোট আলোক ঢেউ ধরিতে পারে, বড় ঢেউ চক্ষু এড়াইয়া যায়, বেতারের গ্রাহক-যন্ত্র বড় বড় ঢেউ ধরিয়া সেগুলিকে মানুষের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করে।......কথাটা সাধারণ ভাষায় বেশ সহজ বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু কাজের বেলায় এই প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্র উদ্ভাবন ও তৈয়ারি করিতে মানুষকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছে। এই উদ্ভাবনের ইতিহাস মোটামুটি ভাবে বলিতেছি।

বেতারের আবিষ্কারকগণ

ইথরে ঢেউ তোলা, ঢেউ ধরা ইত্যাদি সবই বিদ্যুতের খেলা। সুতরাং উদ্ভাবনার কথা বলিতে গেলে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রথম যে মনীষী বিশেষভাবে গবেষণা করিয়াছিলেন সেই মনীষী মাইকেল ফ্যারাডের নাম ও তাঁহার গবেষণার কথা সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে।

একটা ছোট সাধারণ পরীক্ষা সকলেই বোধ হয় করিয়াছেন। শীলমোহর করিবার এক টুক্‌রা গালা লইয়া সেটাকে রেশমের কাপড়ে ঘষিলে, তাহাতে বিদ্যুৎ-সঞ্চার হয়। গালার টুক্‌রা ছোট ছোট কাগজের টুক্‌রার সামনে ধরিলে কাগজের টুক্‌রা লাফাইয়া গালায় আসিয়া লাগে। বৈদ্যুতিক আকর্ষণের এই ব্যাপারের হেতু নির্দ্দেশ করিতে ফ্যারাডেই প্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফ্যারাডে বলেন যে আপাত-দৃষ্টি যদিও মনে হয় এই আকর্ষণী শক্তি ঐ গালা ও কাগজে আছে, কিন্তু আসলে তাহা নহে। কাগজ ও গালা উভয়ের

মাইকেল ফ্যারাডে (যৌবনে)

মধ্যে যে আকাশটুকু আছে, সেই আকাশই এই টানাটানি ব্যাপার ঘটাইতেছে। গালা রেশমে ঘষিয়া তাহাতে বিদ্যুৎ সঞ্চার করানর মানে গালার চতুষ্পার্শস্থ আকাশে টান (strain) পড়ানো। গালা ও কাগজের মধ্যস্থিত আকাশে টান পড়ার ফলে কাগজ লাফাইয়া গালাতে আসিয়া লাগে।

বিদ্যুতের বেলা যেমন চুম্বকের বেলাতেও তেমনি চুম্বক যে লৌহকে আকর্ষণ করে

তাহার ব্যাখ্যা করা যায় এই বলিয়া যে চুম্বক ও লোহার মাঝে আকাশে টান
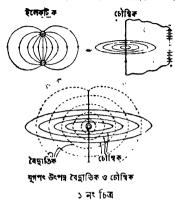
যুগপৎ উৎপন্ন বৈদ্যুতিক ও চৌম্বিক

১ নং চিত্র

[প্রথম ছবিতে স্থির বিদ্যুতের বলক্ষেত্র দেখান হইয়াছে। উপরে পজিটিভ তড়িৎ ও নীচে নেগেটিভ তড়িৎ। দুই বিদ্যুতাশ্রিত গোলকের চারি পাশের যে আকাশটুকু যেখানে বৈদ্যুতিক টান পড়িয়াছে—তাহাকে বৈদ্যুতিক বলক্ষেত্র বলে। গোলক দুইটি যেন অদৃশ্য সুতা দিয়া টান করিয়া পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা আছে—আর সেই জন্যই পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। দ্বিতীয় ছবিতে বিদ্যুত স্থির হইয়া নাই। ব্যাটারি হইতে বিদ্যুত প্রবাহ সোজা তার বাহিয়া একমুখে চলিয়াছে। এইরূপ চলন্ত প্রবাহমান বিদ্যুতের চারিধারে চুম্বক বলক্ষেত্র সৃষ্ট হয়। (গোল গোল লাইন আঁকিয়া দেখান হইয়াছে) চৌম্বিক বলক্ষেত্রের অর্থ এই যে এখানে চুম্বক শলাকা রাখিলে তাহা, বলক্ষেত্র যে লাইনে সেই লাইনে স্থিত হইবে। তৃতীয় ছবিতেও বিদ্যুত সচল। কিন্তু একমুখে নহে—দুই মুখে। বিদ্যুত প্রবাহ মাঝের সোজা তারে বার বার দিক্ পরিবর্তন করিয়া উঠা নামা করিতেছে। তারের ঠিক মাঝখানে অন্টারনেটর রহিয়াছে। ইহা হইতেই দ্বিমুখী বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপন্ন হইতেছে। এইরূপ দ্বিমুখী বিদ্যুত প্রবাহ যদি খুব দ্রুত দিক্ পরিবর্তন করিতে থাকে তা হইলে তাহা হইতে যুগপৎ বৈদ্যুতিক ও চৌম্বিক বলক্ষেত্র সৃষ্ট হয় ও এই বলক্ষেত্রের বিদ্যুত প্রবাহ-বাহী তার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আকাশ-পথে ধাবিত হয়। এই ধাবমান বলক্ষেত্রই বেতার তরঙ্গ ও ইহাই বেতার বার্তার বাহক।]

পড়িয়াছে। বিদ্যুতাশ্রিত বস্তুর বা চুম্বকের চতুষ্পার্শ্বস্থিত জায়গা যেখানে টান পড়িয়াছে তাহাকে বিদ্যুতের বা চুম্বকের "বলক্ষেত্র" বলে। (১নং চিত্র) বিদ্যুত বা চুম্বক স্থির হইয়া থাকিলে তাহাদের চারিধারে কিরূপ বলক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় ১নং চিত্রের প্রথম ছবি ও ২নং চিত্রে তাহাই দেখান হইয়াছে। বিদ্যুতযুক্ত বস্তুর চারিপাশে শুধু বৈদ্যুতিক বলক্ষেত্র ও চুম্বকের চারি-পাশে শুধু চৌম্বিক বলক্ষেত্র প্রসারিত হয়। কিন্তু বিদ্যুত যদি স্থির না থাকিয়া একমুখে
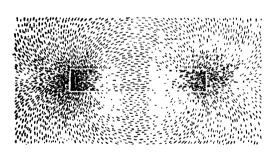
২নং চিত্র

চুম্বক দণ্ডের চারিপার্শ্বে চৌম্বিক বলক্ষেত্র। একটা চুম্বক দণ্ডের উপর একটা পাতলা কাগজ রাখিয়া তাহার উপর লোহা-চূর ছড়াইলে তাহা বলক্ষেত্রের জন্য এই ভাবে সাজাইয়া যাইবে।

চলিতে থাকে, অর্থাৎ যদি একমুখী বিদ্যুত প্রবাহ (direct current) হয়, তাহা হইলে বিদ্যুত প্রবাহের চারিধারে চৌম্বিক

বলক্ষেত্র সৃষ্ট হয় (১নং চিত্রের দ্বিতীয় ছবি) আবার বিদ্যুত প্রবাহ যদি একমুখী না হইয়া দ্বিমুখী হয়—যদি প্রবাহ মুহুর্মুহু দিক পরিবর্ত্তন করিতে থাকে তা হইলে চঞ্চল বিদ্যুতের চারিধারে যুগপৎ চৌম্বিক ও বৈদ্যুতিক বলক্ষেত্র সৃষ্ট হয় (১নং চিত্রের তৃতীয় ছবি) বৈদ্যুতিক ও চৌম্বিক বলক্ষেত্র দ্বয়ের পরস্পরের এই সম্বন্ধ ফ্যারাডে পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে প্রমাণিত করিয়াছিলেন ও এই সম্বন্ধকেই ভিত্তি করিয়া তিনি সহজে বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপন্ন করিবার জন্য ডায়নামো (dynamo) উদ্ভাবন করেন।

ফ্যারাডের মতবাদের প্রসারণ করেন কেম্ব্রিজের অধ্যাপক ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (Clerk Maxwell)। ফ্যারাডে বিদ্যুত ও চুম্বকের পরস্পরের মধ্যে যে সব সম্বন্ধ বাহির

ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল

করিয়াছিলেন ম্যাক্সওয়েলের গবেষণায় তাহা ছাড়া আরও অনেক নূতন তথ্য প্রকাশিত হইল। দেখা গেল যে চঞ্চল বিদ্যুৎ (বা চুম্বক) হইতে যুগপৎ

হাইন্‌রিখ হার্ৎজ

উৎপন্ন বৈদ্যুতিক ও চৌম্বিক বলক্ষেত্র যেন পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। একের অপর ভিন্ন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। আর সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যুগপৎ উৎপন্ন এই দুই বলক্ষেত্র চঞ্চল বিদ্যুৎবাহী জড়বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় ও সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল বেগে ছুটিয়া চলে। এই গতিবেগ শূন্য আকাশে ঠিক আলোকের গতিবেগের সমান। বিদ্যুতের চাঞ্চল্য (প্রতি সেকেণ্ডে যতবার দিক্ পরিবর্ত্তন করিতেছে) যত বাড়ে বলক্ষেত্রও তত বেশী পরিমাণে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। আলোক যেমন ইথরে ঢেউ মাত্র চঞ্চল বিদ্যুৎ হইতে উৎপন্ন এই বলক্ষেত্র দ্বয়ও সেইরূপ আকাশে যুগপৎ উৎপন্ন বিদ্যুৎও চুম্বক শক্তির ঢেউ মাত্র।

ম্যাক্‌স্‌ওয়েলের এই কথায় সে সময়ে বৈজ্ঞানিক-সমাজে তুমুল বাদ-প্রতিবাদ উঠিয়াছিল। ম্যাক্‌স্‌ওয়েল অল্প বয়সে মারা যান। তাঁহার পরিকল্পনার পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ তিনি করিয়া যাইতে পারেন নাই। সে প্রমাণ প্রথম করেন জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক—হার্ৎজ (Heinrich Hertz)। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ কিরূপে সহজেই তোলা যায় তাহা তিনিই প্রথমে হাতে-কলমে দেখাইয়া দেন। বিদ্যুৎ-তরঙ্গের যে আলোক-তরঙ্গের মত প্রতিফলন (reflection), প্রতিসারণ (refraction) হয় তাহাও তিনি দেখাইলেন। হার্ৎজের পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক বৈজ্ঞানিক এই ব্যাপার লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিলেন। ইহাঁদের

স্যার অলিভার লজ

মধ্যে ইংলণ্ডে স্যর্ অলিভার লজ্ (Sir Oliver Lodge) ফ্রান্সে ব্রাঁলি (Branly) ও ভারতবর্ষে স্যর্ জগদীশ বসু অগ্রণী। ব্রাঁলি ঢেউ ধরিবার সহজ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন।

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু

জগদীশ বসু বিদ্যুত-তরঙ্গের গুণ পরীক্ষার জন্য চমৎকার একটী যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। তাঁহার যন্ত্রকে সে-সময়ের বৈজ্ঞানিক-সমাজ শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন।

এতকাল আলোকতত্ত্ব ও বিদ্যুৎতত্ত্ব পদার্থ বিজ্ঞানের দুই বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে ছিল, দুইয়ের মধ্যে কোন যে সম্বন্ধ আছে তাহা কেহই জানিত না। ফারাডে-ম্যাক্সওয়েলের ও হার্ৎজ-ব্রাঁলি-লজ-বসুর গবেষণায় দেখা গেল যে দুই-ই এক,—ইথরে খুব ছোট ছোট ঢেউ হইলে তাহাকে আলোক-তরঙ্গ বলি, আর বড় বড় ঢেউ হইলে তাহাকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বলি।

উপরোক্ত, মনীষীগণের বিদ্যুতচুম্বক-ঘটিত যে সব গবেষণার বিবরণ দিলাম সে সমস্ত গবেষণাই খাঁটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

আলোক ও বিদ্যুতের খেলা একই প্রাকৃতিক-নিয়মে হয় কি হয় না, বিদ্যুতের আকর্ষণ বিকর্ষণের ধর্ম্ম-বস্তুতে আছে না আকাশে আছে, ইথরে টান বা মোচড় কি রকমে

ব্রান্সি

পড়ে ইত্যাদি বিষয় লইয়া পদার্থবিদ্‌গণ গবেষণা করিয়া থাকেন, কারণ জড়জগতের নূতন তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টাই তাঁহাদের জীবনের মূলমন্ত্র। কিন্তু এই সব বৈজ্ঞানিক গবেষণা যতই গভীর হউক না কেন তাহার সংবাদ সাধারণ মানুষের কাছে বেশীর ভাগ সময়েই পৌঁছায় না। সাধারণ মানুষ এই সব গবেষণার খবর পায় শুধু তখন যখন গবেষণার ফল তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কাজে লাগে।

এই কারণে যদিচ উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক-গণই বাস্তবিক পক্ষে বেতারের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তবুও বেতার-আবিষ্কার-প্রসঙ্গে তাঁহাদের নাম প্রায়ই শোনা যায় না। বেতার আবিষ্কার-প্রসঙ্গে ইটালির মার্কনির নামই সর্ব্বদা শোনা যায় কারণ তিনিই প্রথম এই সব গবেষণার ফলকে বেতার-বার্ত্তার কাজে লাগাইয়াছিলেন।

মার্কনির বেতার টেলিগ্রাফ

মার্কনির আবিষ্কার মোটামুটি এই : যখন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ লইয়া, ফ্যারাডে-ম্যাক্স-ওয়েলের তথ্য লইয়া বৈজ্ঞানিক-সমাজে আলোচনা চলিতেছে, তখন মার্কনির উর্ব্বর মস্তিষ্কে উদয় হইল যে, এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ দ্বারা সংবাদের আদান-প্রদান করা যাইতে পারে। মার্কনি বড় লোকের ছেলে ছিলেন, চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কাজ সুরু করিয়া দিলেন। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তুলিবার জন্য হার্ৎজের যন্ত্র রহিয়াছে (Oscillator)। একটা

লি-ডি ফরেষ্ট

বৈদ্যুতিক বর্ত্তনীতে বিদ্যুৎ খুব দ্রুত—সেকেণ্ডে লক্ষাধিক বার—দ্বিমুখী চলাচল করাইলে বর্ত্তনীর চঞ্চল বিদ্যুৎপ্রবাহ হইতে বৈদ্যুতিক ও চৌম্বিক বলক্ষেত্র

*যুগপৎ তরঙ্গাকারে বিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় তরঙ্গ বেশীদূরে যায় না। ঢেউকে দূরে পাঠান যায় কিরূপে? রাশিয়াতে পপফ্ (Popoff) একটা উচু মাস্তুলে তার (aerial) লাগাইয়া আকাশ হইতে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যদি উচু তার আকাশ হইতে বিদ্যুৎ সংগ্রহ ঢেউ অনেক দূর যায়। ঢেউ দূরে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল, কিন্তু ঢেউ ধরা যাইবে কিরূপে? কেন, ব্রাঁলির উদ্ভাবিত coherer রহিয়াছে। হার্ৎজের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তুলিবার বর্ত্তনী—oscillator, পপফ্এর দূরে পাঠাইবার উপায় aerial-ও ব্রাঁলির গ্রাহক যন্ত্র—coherer এই তিনের সমবায়ে
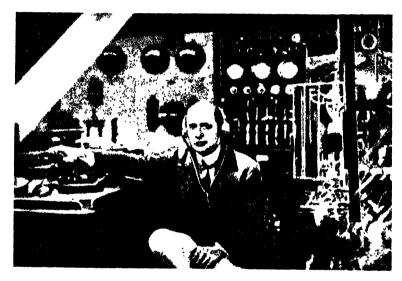
মার্কনি

করিতে পারে, তবে সেই রকম তারে বৈদ্যুতিক আন্দোলন সঞ্চারিত করিলে, তাহা আকাশে বৈদ্যুতিক আন্দোলনও দূরে ছড়াইয়া দিতে পারে বোধ হয়। হার্ৎজের বৈদ্যুতিক বর্ত্তনীকে (Oscillator) আকাশ তারের সঙ্গে যুক্ত (Couple) করিয়া আকাশ-তারে চঞ্চল বিদ্যুৎ পরিচালিত করা হইল। বিদ্যুৎ লক্ষাধিক বার আকাশ-তারে উঠা-নামা করিতে লাগিল। পরীক্ষায় দেখা গেল বাস্তবিক এই উপায়ে মার্কনি বেতারে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন।

মার্কনির উদ্ভাবিত এই বেতার এই শতাব্দীর সুরু হইতে মনুষ্যসমাজের অনেক কাজে লাগিয়াছে। দূর দেশে, যেখানে সাধারণ টেলিগ্রাফের তার বসাইবার কোন উপায় নাই, সেখান হইতে সংবাদ আদান-প্রদান এই ব্যবস্থায় সহজেই হয়। জাহাজ-ডুবির সময় বিপদগ্রস্ত জাহাজে বেতার থাকিলে সে জাহাজ অপর জাহাজকে

নিজের বিপদের কথা জানাইতে পারে। এখন সমুদ্রগামী জাহাজ মাত্রেই বেতারে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আছে। আবার যুদ্ধের সময় অগ্রগামী দূত বেতার সাহায্যে শত্রুর সংবাদ গোলন্দাজকে দিয়া শত্রু ধ্বংসের সুবিধা করিয়া দেয়।
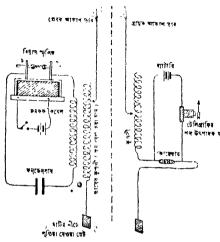
৩নং চিত্র—মার্কনির বেতার টেলিগ্রাফি যন্ত্র

বামে প্রেরক, দক্ষিণে গ্রাহক। রুমকর্ফ কয়েলে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহা সংশ্লিষ্ট বর্ত্তণীতে দ্বিমুখী বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্রুত চলাচল করিতে থাকে। এই প্রবাহের আবেশে (induction) প্রেরক আকাশ তারে (Aerial) বিদ্যুৎ প্রবাহ সঞ্চারিত হয় এরিঅ্যাল হইতে বৈদ্যুতিক ঢেউ আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়।

গ্রাহক তারে এই ঢেউ প্রতিহত হইলে তাহাতে দ্বিমুখী বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত হয়। এই বৈদ্যুতিক প্রবাহ Coherer ধাতুচুর্ণ পূর্ণ কাচ নল এব resistance কমাইয়া দেয়। তখন গ্রাহক যন্ত্রের ব্যাটারি হইতে গ্রাহক যন্ত্রের বর্ত্তনাতে circui একমুখী বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রবাহিত হয় ও টেলিগ্রাফের "টরে টক্কা" আওয়াজ করিয়া যন্ত্র কার্য্য করিতে থাকে।

বেতার টেলিফনি ও ব্রডকাষ্টিং

যা' হউক, মার্কনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন বেতার টেলিগ্রাফ। ইহার সাহায্যে শুধু 'টরেটক্কার' আদান-প্রদান করা যাইতে পারে। সাধারণ কথাবার্ত্তার আদান-প্রদানের জন্য ১৯১৬।১৭ সালে বেতার টেলিফোনির উদ্ভাবন হইয়াছে। বেতার টেলিফোনির সাফল্যের পথে বহুদিন দুইটি অন্তরায় ছিল। সেই অন্তরায়ের জন্য এই শতাব্দীর প্রথম হইতে মহাযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত বেতার-টেলিফোনির বেশী প্রচলন হয় নাই। যুদ্ধের সময় উদ্ভাবনার কিছু কিছু কাজ ফ্রান্সে ও জার্ম্মাণীতে হইয়াছিল—কিন্তু পাছে শত্রুপক্ষ জানিতে পারিয়া কিছু সুবিধা করিয়া লয় সেই জন্য সমস্ত ব্যাপারটা খুব গোপন রাখা হইয়াছিল। যুদ্ধের পর টেলিফোনির কথা সাধারণের কাছে প্রকাশ পাইল।

বেতার টেলিফোনির প্রধান দুইটি অন্তরায় কি ছিল তাহা বলিতেছি। প্রথম অন্তরায় ছিল প্রেরক-যন্ত্রের দিক হইতে দ্বিতীয়টি ছিল গ্রাহক-যন্ত্রের দিক হইতে। বেতার টেলিফোনির জন্য ইথরে অবিচ্ছিন্ন অবিরাম ঢেউ তোলা দরকার—কিন্তু টেলিগ্রাফির জন্য এতদিন শুধু টুকরা টুকরা বিচ্ছিন্ন ঢেউয়ের সমষ্টি-তোলা হইত। অবিচ্ছিন্ন ঢেউ তোলার কোন আবশ্যকতাও ছিল না ও ব্যবস্থাও ছিল না। একটা উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার

হইবে। ধরুণ, স্থির জলের উপরে আপনি একবার আঙ্গুল নাড়িয়া আঙ্গুল তুলিয়া লইলেন, দুই তিনটা ঢেউ বৃত্তাকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল; পাঁচ সেকেণ্ড বাদে আবার একটু আঙ্গুল নাড়িয়া আঙ্গুল তুলিয়া লইলেন, আবার দুই তিনটা ঢেউ বৃত্তাকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। যদি এই রকম পাঁচ সেকেণ্ড অন্তর একবার করিয়া ঢেউ তোলেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে জলের উপর দুই তিনটা ঢেউ চলিয়াছে, তারপর খানিকটা স্থির জল, তারপর আবার দুই তিনটী ঢেউ। ইহাই হইল টুক্‌রা টুক্‌রা বিচ্ছিন্ন ঢেউএর সমষ্টি। আবার ধরুন আপনি

৪ নং চিত্র—বিচ্ছিন্ন ঢেউ ও অবিরাম ঢেউ

প্রথম প্রকারের ঢেউ দ্বারা বেতার টেলিগ্রাফি চলিতে পারে, টেলিফোনি চলেনা। টেলিফোনির জন্য দ্বিতীয় রকমের অবিরাম, অবিচ্ছিন্ন ঢেউ চাই।

জলে আঙ্গুল দিয়া অনবরত জল নাড়িতেছেন তা'হইলে তবে দেখিবেন যে জলের উপর দিয়া অবিরাম ভাবে ঢেউয়ের পর ঢেউ চলিতেছে, কোথাও ফাঁক নাই। টেলিগ্রাফের জন্য ইথরে প্রথমোক্ত রকম বিচ্ছিন্ন ঢেউয়ের সমষ্টি তোলা হইত। (৪ নং চিত্রে প্রথম ছবি) এই রকম ঢেউয়ে টেলিফোনি চলে না। টেলিফোনির জন্য অবিরাম ঢেউ চাই। (৪নং চিত্রে দ্বিতীয় ছবি) এই অবিরাম ঢেউ তোলার কোনও রকম উপায় বহুদিন জানা ছিল না। এই সকল প্রেরক-যন্ত্রের দিক হইতে প্রধান অন্তরায়। এই অবিরাম ঢেউকে যদি কৌশলক্রমে শব্দের তালে তালে

৫ নং চিত্র—শব্দবাহী ঢেউ
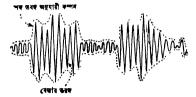
অবিরাম ঢেউ-এর উপর কৌশল ক্রমে শব্দের ঢেউ প্রক্ষেপ করা হইয়াছে এইরূপ ঢেউকে ইংরাজিতে Modulated wave বলে।

কাঁপাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ঢেউ শব্দকে বহন করিয়া বহুদূর লইয়া যাইতে সক্ষম হয় (৫নং চিত্র)।
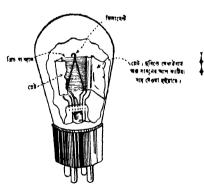
৬নং চিত্র—রেডিও ভালভ্

উপরের কাঁচ কাটিয়া ভিতরের বিভিন্ন অংশ দেখান হইয়াছে। বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্বারা ফিলামেণ্ট উত্তপ্ত করা হয়। হইতে ইলেক্‌ট্রন বাহির হইয়া প্লেটে যায়। ফিলামেণ্ট ও প্লেটের মধ্যে grid বা জাল আছে। ইহা প্লেট—ফিলামেণ্টের মধ্যে ইলেক্‌ট্রন প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে।

গ্রাহক-যন্ত্রের দিক হইতে অন্তরায় ছিল এই যে দূরাগত ক্ষীণ ঢেউ ধরিয়া তাহাকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করিবার জন্য বিশেষ কোনও উপায় জানা ছিল না। প্রেরক-যন্ত্র হইতে ঢেউ যত দূরে যায় তত তাহা ক্ষীণ হইয়া আসে। ক্ষীণ ঢেউ ধরিয়া তাহাকে পরিবর্দ্ধিত (amplify) করার কোনও উপায় যদি না থাকে তবে যত জোরাল প্রেরক-যন্ত্রই হউক না কেন, ৪০।৫০ মাইলের বেশী দূরে সংবাদ পাওয়া যায় না। টেলিগ্রাফির 'টরেটক্কা'র পরিবর্দ্ধক যন্ত্র অনেকদিন হইতেই ছিল কিন্তু টেলিফোনের কথাবার্ত্তা, সঙ্গীত ইত্যাদির পরিবর্দ্ধক যন্ত্র বিশেষ কিছুই ছিল না। এই দুই অন্তরায়ের জন্য বেতার টেলিফোনির প্রচলন অনেকদিন হয় নাই। এই অন্তরায় দুইটি দূর হইল গত মহাযুদ্ধের সময় একটি ছোট যন্ত্র উদ্ভাবনের দ্বারা ও এই যন্ত্রটির জন্যই বেতার-টেলিফোনি সম্ভবপর হইয়াছে। প্রথম উদ্ভাবনের পর হইতে ইতিমধ্যে এই যন্ত্রটির অনেক উন্নতি ও বহুল প্রসার হইয়াছে। যন্ত্রটি দেখিতে সাধারণ বিজলী-বাতির মত—নাম রেডিও ভাল্‌ভ্ (Radio Valve)। সাধারণ রেডিও রিসিভারে ব্যবহৃত এই ভাল্‌ভ বা ভালভ্ টিউব সকলেই দেখিয়াছেন। এই ভাল্‌ভ্ এক-দিকে যেমন গ্রাহকযন্ত্রে—রেডিও-রিসিভারে—দূরাগত ক্ষীণ বিদ্যুৎ-প্রবাহকে লক্ষ লক্ষ গুণ পরিবর্দ্ধিত করার জন্য ব্যবহার করা হয় অপরদিকে তেমন আবার প্রেরক-যন্ত্রে অবিরাম অবিচ্ছিন্ন ঢেউ তুলিবার জন্যও ব্যবহৃত হয়। গ্রাহক-যন্ত্রের ভাল্‌ভগুলি ছোট, শক্তি-শালী প্রেরক-যন্ত্রের ভালভ্‌গুলি খুব বড়। যন্ত্রটি বাস্তবিকই অতি আশ্চর্য্য; এক কথায় বলিতে পারা যায় যে, এই যন্ত্র বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। যন্ত্রের উদ্ভাবকের নাম সকলেই জানিতে চাহেন। উদ্ভাবক কে তাহা লইয়া অনেক বাক্‌বিতণ্ডা, তর্ক বিতর্ক এমন কি মামলা-মোকর্দ্দমা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। যন্ত্রের কতক অংশের কল্পনা Fleming

৭নং চিত্র কলিকাতার নূতন সর্টওয়েভ ষ্টেশনের প্রেরক যন্ত্রের একাংশের দৃশ্য

ছবিতে প্রেরক ভাল্‌ভ দেখা যাইতেছে। ইহা রেডিও সেটে ব্যবহৃত সাধারণ গ্রাহক ভাল্‌ভ অপেক্ষা অনেক বড়।
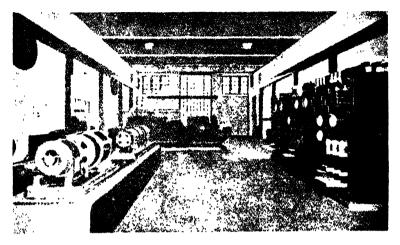
৮নং চিত্র—স্কটল্যাণ্ডের বার্গহেড ষ্টেশনের মেসিন রুম (Machine room)
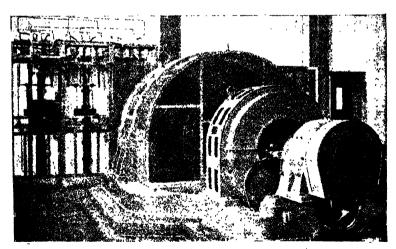
৯নং চিত্র—আয়র্লাণ্ডের লিস্‌নাগার্ভি (Lisnagarvey) প্রেরক ষ্টেশনের ১০০০০ ভোল্ট বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র

নামে একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক এই শতাব্দীর প্রথম দশকে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যন্ত্রের প্রয়োগ বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। আধুনিক পূর্ণ গঠিত যন্ত্রটির উদ্ভাবক একজন আমেরিকান, নাম লি, ডি, ফরেষ্ট্ (Lee de Forest) যন্ত্রটির ভিতরে কি আছে, এবং ঠিক কি উপায়ে উহা বেতার টেলিফোনিতে ব্যবহৃত হয়, তাহা সাধারণ ভাষায় বুঝান শক্ত। এ প্রবন্ধে তাহার অবতারণা সম্ভবপর নয়।

বেতার টেলিফোনের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বেতার ব্রডকাষ্টিং (Broadcasting) এর প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। বেতার টেলিফোনে প্রেরক যন্ত্র হইতে বেতার তরঙ্গ গ্রাহক যেদিকে অবস্থিত মোটামুটি শুধু সেই দিকে প্রেরিত হয়। কিন্তু ব্রডকাষ্টিং-এ প্রেরক যন্ত্র হইতে ঢেউ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবার ব্যবস্থা করা হয়। ব্রডকাষ্টিং সুরু হইয়াছে ১৯২০।২১ সালে। কিন্তু ইহারই মধ্যে ইহার যে অভাবনীয় প্রসার হইয়াছে তাহা বিস্ময়জনক। ইয়োরোপ ও আমেরিকার তুলনায় ইহার প্রসার আমাদের দেশে কিছুই হয় নাই বলিলেও চলে। ঐ সব দেশে প্রত্যেক ৬ জনের মধ্যে একজনের একটি করিয়া রিসিভার আছে। আমাদের দেশে প্রত্যেক ৭০ হাজার লোকের মধ্যে একজন মাত্র রেডিও সেটের অধিকারী! (৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ নং চিত্রে ইংলণ্ডের কয়েকটি ব্রডকাষ্টিং প্রেরক ষ্টেশনের বিভিন্ন অংশ দেখান হইয়াছে।)
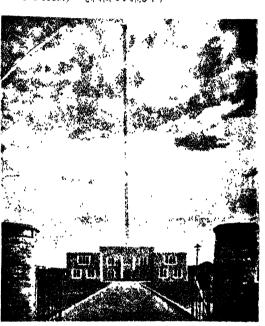
নং চিত্র—বার্গহেড ট্রান্সমিটিং ষ্টেশনের অট্টালিকা। অট্টালিকার পিছনে যে উচু মাস্তুল দেখা যাইতেছে উহাই আকাশ তাররূপে ব্যবহৃত হয়

বার্গহেড ষ্টেশনের মাস্তুল (১০ নং চিত্র) ৫০০ ফুট উচু। সাধারণতঃ আকাশ তার টাঙ্গাইবার জন্য এইরূপ উচু মাস্তুল খাড়া করা হয়। কিন্তু আধুনিক প্রেরক ষ্টেশনে মাস্তুলটিই এমন ভাবে তৈয়ার করা হয় যে ঐ মাস্তুলই আকাশ তারের কাজ করিতে পারে। বার্গহেডের মাস্তুল এই

শ্রেণীর। চীনামাটির একটি বড় ব্লক দ্বারা মাস্তুলটিকে জমি হইতে ইনস্যুলেট (Insulate) করা হইয়াছে। পাশে যে তার দেখা যাইতেছে তাহা শুধু মাস্তুলটিকে সোজা করিয়া রাখার জন্য।

ব্রডকাষ্টিং চলিবার সময় যন্ত্র বিকল হইয়া হঠাৎ ব্রডকাষ্টিং যাহাতে বন্ধ না হয় তাহার জন্য নানারূপ সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ লিসনাগাভির ১০,০০০ ভোল্ট বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রের (৯ নং চিত্র কথা বলা যাইতে পারে। প্রেরক ষ্টেশনে এইরূপ তিনটি যন্ত্র আছে। সাধারণতঃ দুইটি একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। তৃতীয়টি রাখার উদ্দেশ্য—যদি হঠাৎ কোনও কারণে দুইটির একটি বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে তৃতীয়টিকে তাহার স্থানে কাজে লাগাইয়া দেওয়া হইবে।

১১ নং চিত্র—লিসনাগাভি ষ্টেশনের প্রেরক যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ (Control) কক্ষ
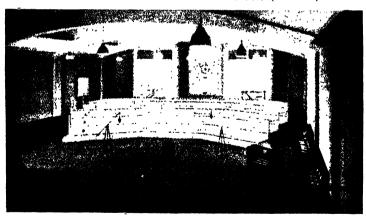
১২নং চিত্র—আধুনিকধরণে সজ্জিত ব্রডকাষ্টিংএর ষ্টুডিও। অর্কেষ্টার জন্য উচু বেদী রহিয়াছে। সম্মুখে ত্রিপদের উপরে মাইক্রোফোন

পাঠান যুগের বাঙ্গলাদেশ

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস

৩২১৩ পৃষ্ঠার পর

পাঠান আমলে বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষায় কতকগুলি ছড়া ও গান প্রচলিত ছিল। এই যুগে দুইজন বৈষ্ণব কবি প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের এক জনের নাম বিদ্যাপতি আর একজনের নাম চণ্ডীদাস। বিদ্যাপতি উত্তর বিহার প্রদেশের মিথিলার লোক ছিলেন। তিনি মিথিলার হিন্দুরাজগণের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার পদাবলী রচনার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার পদাবলীর অধিকাংশই মিথিলার ভাষাতেই রচিত। কিন্তু তাহা এদেশের লোকেও আদর করিত। আর চণ্ডীদাস বাঙ্গলা দেশেরই লোক। তাঁহার পদাবলী বাঙ্গলা ভাষাতেই রচিত। চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামের অধিবাসী। কেহ কেহ তাঁহাকে বাঁকুড়া জেলার ছাতনার লোকও বলেন। চণ্ডীদাসের পদাবলী বাঙ্গলা-সাহিত্যের একটী শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী রাধাকৃষ্ণের লীলা লইয়াই রচিত। বিদ্যাপতির অনেক-গুলি গ্রন্থও আছে। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন' নামে একখানি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস দুইজনেই ব্রাহ্মণ। বিদ্যাপতি মিথিলার রাজসভায় থাকিতেন। আর চণ্ডীদাস বাশুলী দেবীর পূজারী ছিলেন। নিজের রচনায় তিনি নিজেকে বড়ু অর্থাৎ বটু বা ব্রহ্মচারী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

"গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর", অথবা "গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে"—ইত্যাদি বলিয়া তিনি গানের ভণিতা দিয়াছেন। কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাসকে বিভিন্ন ব্যক্তি বলেন। (শিশু ভারতী ১৮৪৭—১৮৫২ পৃষ্ঠা বৈষ্ণব সাহিত্য)।

কৃত্তিবাস

তোমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িয়াছ, তাহাও এই হিন্দু অভ্যুত্থানের সময়েই রচিত হয়। কৃত্তিবাস

তাঁহার আত্ম-পরিচয়ে যে গৌড়ের সভায় নিজের উপস্থিত হওয়ার কথা বলিয়াছিলেন, তিনি একজন পরাক্রান্ত হিন্দুরাজা ছিলেন। কৃত্তিবাস নয় দেউড়ি পার হইয়া রাজদরবারে উপস্থিত হন এবং সিংহসম রাজাকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিতে পান:

"নয় দেউড়ি পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহসম দেখি রাজা সিংহাসন পরে॥'

রাজা পাত্রমিত্র লইয়াই রাজসভায় বসিয়াছিলেন:

"রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রমিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন॥

কৃত্তিবাস এই রাজাকে পঞ্চগৌড়ের অধিপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন:

'পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥'

সুতরাং তিনি যে একজন ক্ষমতাশালী রাজা তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজসভায় শ্লোক পাঠ করিয়া আপনার গুণপনা দেখাইয়া কৃত্তিবাস পুষ্প-মাল্যে ভূষিত ও চন্দনচর্চিত হইয়া যারপর নাই সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া রামায়ণ রচনা করিবার জন্য আদেশ দেন। রাজাদেশেই কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন:

"রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান।"

কৃত্তিবাস অনেক পুরাণাদি আলোচনা করিয়া রামায়ণ রচনা করিয়াছেন:

"পঞ্চ ভাই পণ্ডিত কৃত্তিবাস গুণশালী।
অনেক শাস্ত্র পড়া রচে শ্রীরাম পাঁচালী॥"

কৃত্তিবাস বর্তমান নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে জন্মিয়াছিলেন। ইনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, মুখোপাধ্যায় বংশীয়। ইঁহার পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গের রাজা দনুজমর্দনের অমাত্য ছিলেন:

"পূর্বেতে আছিল যে দনুজ মহারাজা।
তাহার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা॥"

পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণ প্রবল হইয়া উঠিলে, নরসিংহ ফুলিয়ায় আসিয়া বাস করেন। সেই-স্থানে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়। কৃত্তিবাসের পর আরও অনেকে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ যেমন সকল লোকের প্রিয় হইয়াছে, সেরূপ আর কোন রামায়ণ হইতে পারে নাই। এই রামায়ণ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে সকলে আদর করিয়া থাকে। কৃত্তিবাস যে ভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। এখনকার রামায়ণের ভাষা বর্তমান ভাষারই অনুরূপ।

সুন্দরবনে মুসলমান অধিকার

রাজা জালালুদ্দীন মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শামসুদ্দীন আহম্মদশাহ গৌড়ের সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অত্যাচারের জন্য তাঁহাকে নিহত হইতে হয়। তাঁহার দুইজন ক্রীতদাস তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করে। অবশেষে তাহারাও নিহত হয়। এবং ইলিয়াসশাহের বংশধরেরা আবার গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। এই বংশের নাসিরুদ্দীন মহম্মদশাহের রাজত্বকালে **খাঁ জাহান আলি** নামে একজন অধ্যবসায়ী ব্যক্তি সুন্দরবন প্রদেশে মুসলমান অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। জাহান আলি সুন্দরবনের বন-জঙ্গল কাটাইয়া অনেক জমি আবাদ করার ব্যবস্থা করেন। যশোহর ও খুলনা অঞ্চলে তাঁহার অনেক কীর্তিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। খুলনা জেলার বাগেরহাটে তিনি শেষ জীবনে অবস্থিতি করিতেন। সেখানে তাঁহার কোন কোন কীর্তি অদ্যাপি রহিয়াছে। বাগের-হাটের ষাটগম্বুজ নামে সুবৃহৎ মসজিদ তাঁহারই কীর্তি, আর একটা উচ্চ মসজিদ মধ্যে তাঁহার সমাধি রহিয়াছে। মুসলমানেরা খাঁ জাহান আলিকে পীর বলিয়া মনে করে। জাহান আলি অনেকদূর পর্যন্ত রাস্তা করাইয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে নবাব খাঞ্জালি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

জনপ্রিয় বাদশাহ

ইলিয়াস বংশীয়েরা আফ্রিকা হইতে হাবসী খোজাদিগকে আনিয়া প্রাসাদাদি রক্ষার কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ক্রমে ইহারা প্রবল হইয়া

রূপ সনাতন দুই ভ্রাতা পরে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যদেবের শিষ্য হইয়াছিলেন। সে কথা পরে জানিতে পারিবে। হোসেনশাহ যেরূপ প্রজাপালক ছিলেন সেইরূপ দিগ্বিজয়ী বীর-হোসেন শাহ, আসামের কামতাপুর ও কামরূপ বিজয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথমে কৃতকার্য্য হইলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহা অধিকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার সময়ে ত্রিপুরা-জয়েরও চেষ্টা হয়। সে কথা পরে বলিতেছি। হোসেন-শাহের সময় মগধ বা বিহার প্রদেশ গৌড়ের অধীনে আসে। এইরূপে হোসেন শাহ প্রজা-পালন ও রাজ্য-বিস্তারের চেষ্টা করিয়া বাঙ্গলার বাদশাহদিগের মধ্যে স্মরণীয় হইয়া আছেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গলা-সাহিত্যের ও যথেষ্ট উন্নতি হয়।

হোসেন শাহের পর তাঁহার পুত্র নসরত শাহ গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। সেই সময়ে মোগলেরা ভারতবর্ষ জয় করেন। মোগলদিগের প্রথম বাদশাহ বাবর শাহ বাঙ্গলা-জয় করিতে অগ্রসর হইলে নসরত তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। নসরত শাহের সময় মুসলমানেরা আবার কামরূপ জয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেবারও পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। নসরত শাহ পিতা হোসেন শাহের ন্যায় জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই। তাঁহার খোজা ভৃত্যগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। নসরতের পুত্র ফিরোজ শাহ সিংহাসনে বসিলেন, নসরতের ভ্রাতা গিয়াসউদ্দীন মামুদশাহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া বাদশাহ হন। মামুদ শাহই হোসেনশাহ বংশের শেষ বাদশাহ।

ত্রিপুরা-বিজয়

হোসেন শাহের সময় ত্রিপুরা-বিজয়ের চেষ্টা হয়। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মুসলমানেরা পূর্ব্ববঙ্গ জয় করিলেও বহুদিন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা-জয় করিতে পারেন নাই। ত্রিপুরা প্রাচীন কাল হইতে এক হিন্দু রাজবংশের অধীন ছিল। এক্ষণে সেই বংশের রাজারা একরূপ স্বাধীন-নরপতি রূপে ত্রিপুরা শাসন করিতেছেন। হোসেন শাহের সময় মুসলমানেরা ত্রিপুরা অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পারিয়া উঠেন নাই। এই সময়ে মহারাজা **ধন্যমাণিক্য** ত্রিপুরার রাজা ছিলেন। তাঁহার সেনাপতি **রায় চয়চাগ** মুসলমান-দিগকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। মুসলমান-সৈন্যেরা চারিবার ত্রিপুরা আক্রমণ করে। প্রথম তিনবারে তাহারা পরাজিত হয়। শেষবারে তাহারা জয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য অধিকার করিতে পারে নাই। তাহার কতক অংশ মাত্র মুসলমানদের অধিকারে আসিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক অংশ রাজবংশীয়দিগের অধিকারচ্যুত হইলেও এখনও কতক অংশে তাঁহারা একরূপ স্বাধীন-ভাবে রাজত্ব করিতেছেন।

হরিনামের বন্যা

হোসেন শাহের রাজত্ব কাল বঙ্গদেশে এক স্মরণীয় যুগ হইয়া রহিয়াছে। এই সময়ে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব হরিনামের বন্যায় নবদ্বীপ প্লাবিত করিয়া সমস্ত বঙ্গদেশ ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, সমগ্র ভারত-বর্ষেও তাহার স্রোত বহিয়াছিল। শান্তিপুর নবদ্বীপ হইতে তাহার আরম্ভ বলিয়া "শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়" কথা প্রচলিত আছে। তাঁহার জন্মের শুভক্ষণে যে হরিধ্বনি উঠিয়াছিল তাহাই অবশেষে বাঙ্গলার ও ভারতের আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া দিয়াছিল :

"চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিল দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন॥
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রেরে গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে ভাসে ত্রিভুবন॥

চন্দ্রগ্রহণের সময় তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ; তাই সে সময়ে হরিধ্বনি উঠিয়াছিল। সেই হরিধ্বনি যেন তাঁহার কাণে পৌঁছিয়া তাঁহার সমস্ত জীবন হরিনামে মাতাইয়া রাখিয়াছিল।

চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষেরা শ্রীহট্ট প্রদেশে বাস করিতেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র পত্নী

শচীদেবীকে লইয়া নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তখন নবদ্বীপ সংস্কৃতচর্চ্চার প্রধান স্থান ছিল। রাজা লক্ষ্মণসেনের সময় হইতে এখনও পর্য্যন্ত নবদ্বীপ সংস্কৃত চর্চ্চার প্রধান স্থান হইয়া আছে। নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর দুইটী পুত্র সন্তান জন্মে। প্রথমটীর নাম বিশ্বরূপ, দ্বিতীয়ের নাম বিশ্বম্ভর। একটু বয়স হইলে বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া যান। বিশ্বম্ভরকে বাল্যকালে সকলে **নিমাই** বলিয়া ডাকিত। তিনি গৌরবর্ণ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে গৌর বা গৌরাঙ্গও বলা হইত। সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে ইঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয়। নিমাই যথারীতি অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তাঁহার দুইবার বিবাহ হইয়াছিল। প্রথমা পত্নীর নাম লক্ষ্মীদেবী, দ্বিতীয়ার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, নিমাই ক্রমে কৃষ্ণপ্রেমে অনুরক্ত হইয়া পড়েন এবং হরিনাম প্রচারের আগ্রহান্বিত হন। তিনি গয়ায় গিয়া **ঈশ্বরপুরী** নামে একজন সাধুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া হরিনাম প্রচারে রত হন। তাঁহার সহিত **নিত্যানন্দ** নামে একজন সন্ন্যাসী ও **অদ্বৈত** নামে একজন বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ মিলিত হইয়া হরিনাম প্রচার আরম্ভ করেন। অদ্বৈতের বাটী শান্তিপুর ছিল, নিত্যানন্দ পূর্ব্বে রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে সন্ন্যাসী বা অবধূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস বীরভূম জেলার একচাকা গ্রামে। ইঁহাদের হরিনাম প্রচারে সে সময়ে নবদ্বীপে খোল করতালের সহিত হরিধ্বনি ভিন্ন আর কিছু শুনা যাইত না :

"মৃদঙ্গ করতাল সংকীর্ত্তন উচ্চধ্বনি।
হরি হরি ধ্বনি বিনে আর নাহি শুনি॥"

নবদ্বীপে যে হরিধ্বনির বন্যা আসিল, তাহা সমগ্র বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়া তুলিল। ক্রমে ভারতবর্ষ মধ্যে তাহা প্রবাহিত হইয়া গেল। এই সময়ে অনেকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল। যাহারা একেবারে মুসলমান না হইত তাহাদের আচার ব্যবহার অধিকাংশই মুসলমানের ন্যায় হইত। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা অনেকে মুসলমান হইয়া যাইতেছিল। এই স্রোত নিবারণ করিবার জন্য চৈতন্যদেব সকলকে বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগকে হরিনাম প্রদান করিয়া ধর্ম্ম-পথে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

হোসেন শাহের প্রধান কর্ম্মচারী **রূপ** ও **সনাতন** রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। হোসেনের পূর্ব্ব প্রভু সুবুদ্ধি রায়ও ইঁহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। কেবল হিন্দুদের মধ্যে বলিয়া নহে, তাঁহারা মুসলমানদের মধ্যেও হরিনাম প্রচার করিয়া তাহাদিগকে বৈষ্ণব করিয়া লইতে আরম্ভ করেন। একজন মুসলমান পরম বৈষ্ণব হইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ইঁহার নাম হইয়াছিল হরিদাস। যে সকল হিন্দু অনাচারী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারাও ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব হইতে লাগিল। জগাই মাধাই নামে দুইজন অনাচারী ব্রাহ্মণ-সন্তান এইরূপে বৈষ্ণব হইয়াছিলেন।

বাদশাহ হোসেন শাহ চৈতন্যদেবের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিরাপদে রাখিবার জন্য আদেশ প্রচার করেন :

"সর্ব্বলোক লই সুখে করুন কীর্ত্তন।
কি বিরলে থাকুন যে লয় তাঁর মন॥
কাজী বা কোটাল তাঁহাকে কোনো জনে।
কিছু বলিলেই তার লইব জীবন॥"

এইরূপে হরিনাম প্রচার করিতে করিতে নিমাই কেশবভারতী নামে একজন সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস লইয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম ধারণ করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব তাহার পর সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য, রাজধানী গৌড়, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন সর্ব্বত্রই তিনি গমন করিয়াছিলেন।

কভু দক্ষিণ কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন।

এইরূপে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি শেষ জীবনে পুরীধামে অবস্থিতি করেন। পুরীর রাজা প্রতাপ-রুদ্র তাঁহার ভক্ত হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেব পুরীতেই দেহ রক্ষা করিয়া দিব্যধামে চলিয়া যান।

চৈতন্যদেবের পর শ্রীনিবাস আচার্য্য নামে একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পণ্ডিত বিস্তৃত ভাবে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম আজিও বঙ্গদেশে প্রচলিত রহিয়াছে।

হোসেন শাহের রাজত্ব কাল হইতে বঙ্গ-সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি আরম্ভ হয়। রাজা গণেশের সময় হইতে যে ইহার সূচনা হইয়াছিল সে কথা তোমরা জানিয়াছ। কিন্তু হোসেন শাহের সময় হইতে ইহা উন্নতির পথে চালিত হয়। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার উন্নতি ক্রমেই বাড়িয়া যায়। হোসেন শাহ, তাহার পুত্র নসরৎ শাহ এবং তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা বাঙ্গলা সাহিত্য-চর্চ্চার জন্য যে উৎসাহ প্রদান করিতেন, তাহা সে কালের কবিগণের লেখা হইতে জানিতে পারা যায়। হোসেন শাহের সময় বরিশাল (বাখরগঞ্জ) জেলার গৈলা ফুল্লশ্রী নিবাসী কবি বিজয়গুপ্ত মনসা দেবীর বিবরণ লইয়া "মনসা-মঙ্গল" রচনা করেন। তাহার ভণিতা আছে :

"সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি তিলক।"

পরাগল খাঁ নামে হোসেন শাহের এক সেনাপতির আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর উপাধিধারী শ্রীকর নন্দী নামক কবি মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহাতে এইরূপ জানিতে পারা যায় :—

"নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তানহক সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি॥"

শ্রীকর নন্দী পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্ব রচনা করেন। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে :

নসরৎ শাহ নাম অতি মহারাজা।
পুত্রসম রক্ষা করে সকল প্রজা॥
"নৃপতি হুসেন সাহ হয় ক্ষমাপতি।
সামদান দণ্ড ভেদে পালে বসুমতী॥
তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটিখান।
ত্রিপুরা উপরে করিল সন্নিধান॥"

কুলীন গ্রাম নিবাসী মালাধর বসু সেই সময়ে ভাগবতের কোন কোন অংশের অনুবাদ করিয়াছিলেন। হোসেন শাহ তাঁহাকে গুণরাজ খাঁ উপাধি প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ বিপ্রদাস তাঁহার "মনসা-মঙ্গলে" হোসেন শাহের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"নৃপতি হোসেন সা গৌড়ের সুলক্ষণ।"

তোমরা দেখিতে পাইলে বড় কবি হোসেন শাহের গুণগান করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে সাহিত্যের কিরূপ চর্চ্চা হইত, এই সকল কবিতা হইতে তোমরা তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিতেছ।

বঙ্গে পর্ত্তুগীজ

গোয়ার একজন পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তার নির্দ্দেশে হোসেন শাহের রাজত্ব সময়ে পর্ত্তুগীজেরা বাঙ্গলায় আসিতে আরম্ভ করে। রোদ্রিগ ডে নামে একজন পর্ত্তুগীজ প্রথমে চট্টগ্রামে আসেন। তাহার পর প্রতি বৎসর তাহাদের বাণিজ্য-তরী বঙ্গদেশে আসিতে থাকে। হোসেন শাহের পুত্র মামুদ শাহের সময়ে গোয়ার পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তার আদেশে মেলো জুসার্ত্তে নামে একজন পর্ত্তুগীজ পাঁচখানি জাহাজে দুইশত পর্ত্তুগীজ সৈন্য লইয়া চট্টগ্রামে উপস্থিত হন। ইহাদের যে কেবল এদেশে বাণিজ্য করাই উদ্দেশ্য ছিল তাহা নহে, রাজ্য স্থাপন ও লুণ্ঠনাদি করাও তাহাদের অভিপ্রায় ছিল। বাঙ্গলায় রাজ্যস্থাপন করিতে না পারিলে ইহাদের দস্যুতা, লুণ্ঠনাদি ও অন্যান্য অত্যাচারে বঙ্গভূমি যে এককালে উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহারা এদেশে ফিরিঙ্গী নামে অভিহিত হইত। ফিরিঙ্গী ও ব্রহ্মদেশের আরাকানের অধিবাসী মগদিগের অত্যাচারের কথা তোমরা পরে শুনিতে পাইবে।

মেলো জুসার্ত্তে বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া কয়েকজন অনুচরকে সুলতান মামুদ শাহের নিকট গৌড়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সুলতান ইহাদের অন্যরূপ অভিপ্রায় মনে করিয়া সেই সকল লোককে বন্দী করিতে আদেশ দেন। তিনি মেলো জুসার্ত্তেকেও বন্দী করিয়া গৌড়ে পাঠাইতে আদেশ প্রচার করেন। মেলো জুসার্ত্তে বন্দী হইয়া গৌড়ে আসেন। তাহার পর দিলভা মেনেজেস নামে একজন পর্ত্তুগীজ গোয়ার শাসনকর্ত্তার আদেশে নয়খানি জাহাজে তিনশত পর্ত্তুগীজ সৈন্য লইয়া চট্টগ্রামে উপস্থিত হন।

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্কের একটা সংজ্ঞা দেওয়া বড় মুস্কিল, তবে বলা যায় যে ব্যাঙ্কিং কারবার যে-প্রতিষ্ঠান চালায় তাহাই হইল ব্যাঙ্ক। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা দিলে তোমরা কিছুই বুঝিবেনা। যে স্থানে মূল্যবান দ্রব্যাদি, বিশেষতঃ টাকাকড়ি, জমা রাখিয়া ভবিষ্যতে ইচ্ছামত তাহা সম্পূর্ণ ভাবে (intact) উঠাইয়া লওয়া যায়, সাধারণ ভাবে সেই স্থানগুলিকে আমরা ব্যাঙ্ক বলি। তবে এ যুগের ব্যাঙ্ক শুধু টাকাকড়ি বা অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য জমা রাখে না, ব্যাঙ্ক টাকাও কর্জ্জ দেয়। আজকাল ঋণদান ও কর্জ্জ গ্রহণ ব্যাপারটা একরকম পুরাপুরি ব্যাঙ্কের হাতে।

ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেয় অল্প মিয়াদে অর্থাৎ খুব অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাঙ্কের ধার পরিশোধ করিয়া দিতে হয়; দীর্ঘ মিয়াদে টাকা ধার দেয় অপর এক প্রকারের প্রতিষ্ঠান; তাদের ব্যাঙ্ক বলেনা, বলে **ইস্যু হাউস ও ট্রাষ্ট কোম্পানী**। টাকা কর্জ্জ লইবার প্রয়োজন হইলে তুমি যাইবে ব্যাঙ্কের কাছে, আর তোমার টাকা আছে, তুমি সে টাকা খাটাইতে চাও, তখন তুমি যাইবে এই ইস্যু হাউস্ বা ট্রাষ্ট কোম্পানীর কাছে। ব্যাঙ্কের সাহায্যে সিকিউরিটী ক্রয় করা যায় বটে, কিন্তু ব্যাঙ্ক সেস্থলে শুধু মধ্যবর্তীর কাজ (intermediary) করে।

ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিলে ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ একখানা চেক বহি দিয়া থাকে। এই চেকে টাকার পরিমাণ লিখিয়া সহি করিয়া দিয়া ব্যাঙ্কে দাবী করিলেই সেই টাকা দিয়া থাকে। ব্যাঙ্ক যে টাকা আমানৎ রাখিয়া চেক কাটিয়া উঠাইবা লওয়া যায় তাহাকে **ব্যাঙ্ক আমানৎ** বলে। ধর একটা আমানৎ ব্যাঙ্ক কায়েম করা হইয়াছে; এই ব্যাঙ্কে 'ক', 'খ', প্রভৃতি কয়েকজনে মিলিয়া প্রত্যেকে ১০০০ টাকা করিয়া মোট ১০০০০ টাকা জমা রাখিয়াছে। এখন ধরা যাক 'ক' 'খ'-কে ১০০৲ দিতে চাহে; 'ক' তাহা হইলে 'খ' কে সঙ্গে করিয়া ব্যাঙ্কে লইয়া গিয়া চেক ভাঙ্গাইয়া নগদ টাকা করিয়া ১০০ 'খ'-কে দিবে এবং 'খ'-ও আবার সেই টাকা ব্যাঙ্কের তহবিলে জমা দিয়া দিবে ও রসিদ লইয়া ফিরিবে। 'ক' আর এক পন্থাও গ্রহণ করিতে পারে, দুজনেই ব্যাঙ্কে না গিয়া 'ক', 'খ' কে ১০০৲ টাকার একটা চেক লিখিয়া দিতে পারে। উভয়ের ফল একই—উভয় ক্ষেত্রেই 'ক'-র আমানতি টাকা ১০০০৲ হইতে ৯০০৲ হইয়া দাঁড়াইবে ও 'খ'-র আমানতি টাকা ১১০০৲ হইবে। দেখা যাইতেছে যে এরূপক্ষেত্রে নগদ টাকার বদলে চেকই হাত-ফের করে।

কিন্তু এরূপক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের কোন লাভ নাই বরং লোকসানই ষোল-আনা; কেননা লোকের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য যে ব্যয় করিতে হয়, (ঘরভাড়া, এস্‌টাব্লিশমেণ্ট খরচা প্রভৃতি) তাহা পায় না। কিন্তু যদি এই ব্যাঙ্ক তহবিলের টাকার কিয়দংশ ঋণ দেয়, তবে সুদের বাবদ একটা আয় করিতে পারে। ইহাতে আমানৎকারীদের খুঁৎখুঁৎ করিবার কিছুই নাই, কেননা তাহারা যে টাকাগুলি জমা দিয়াছে ঠিক সেই টাকাগুলিই চাহে না—তাহারা চাহে যে, যখন ইচ্ছা করিবে ঐ পরিমাণ টাকা উঠাইয়া লইবে। সুতরাং টাকা অনুৎপাদকভাবে ফেলিয়া না রাখিয়া কিঞ্চিৎ ঋণ দিয়া আয়ের চেষ্টা করাই ব্যাঙ্কের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত।

অতএব ধরা যাক্ যে ব্যাঙ্ক, তহবিলের টাকার অর্দ্ধেক পরিমাণ কর্জ্জ দিবার মতলব করিয়াছে। ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ ঋণ-গ্রহীতার নিকট হইতে হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লইয়া টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকে। সুতরাং দাঁড়াইতেছে যে, ঋণ হইতেছে—হ্যাণ্ডনোটের সহিত টাকার বিনিময়। ধরা যাক্ যে ঋণ-গ্রহীতা, ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নগদ ৫০০০৲ লইয়াছে; তাহা হইলে ব্যাঙ্কের হিসাব দাঁড়ায়—

সম্পত্তি		দেয়	
নগদ	৫,০০০৲	'ক'-কে দেয়	৯০০৲
হ্যাণ্ডনোট	৫,০০০৲	'খ'-কে দেয়	১,১০০৲
		অন্যান্য দেয় ···	৮,০০০৲
	১০,০০০৲		১০,০০০৲

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে তহবিলে মোটে নগদ ৫০০০৲ আছে, অথচ আমানতের পরিমাণ সেই ১০,০০০ টাকা অর্থাৎ তহবিলে যত টাকা মজুত আছে তাহা অপেক্ষা অধিক টাকা আমানৎকারীরা জমা দিয়া রাখিয়াছে।

এখন ধরা যাউক যে, ঐ ঋণ-গ্রহীতা ৫০০০৲ নগদ লইয়া আবার সেই ব্যাঙ্কেই জমা রাখিল অর্থাৎ ঋণের টাকাটা সেই ব্যাঙ্কেই আমানৎ রাখিয়া উহার বদলে চেক্ কাটিয়া ঐ পরিমাণ টাকা যখন খুসী উঠাইবার ক্ষমতা গ্রহণ করিল অর্থাৎ ব্যাঙ্কের কাছ হইতে ৫০০০৲ টাকা ধার করিয়া ঐ ৫০০০৲ ব্যাঙ্ককেই ধার দিল। তাহা হইলে ব্যাঙ্কের খাতায় হিসাব দাঁড়াইবে—

সম্পত্তি		দেয়	
নগদ	১০০০০৲	'ক'-কে দেয়	৯০০৲
হ্যাণ্ডনোট	৫০০০৲	'খ'-কে দেয়	১১০০৲
		অন্যান্য দেয়	৮০০০৲
		ঋণ-গ্রহীতাকে দেয়	৫০০০৲
	১৫০০০৲		১৫০০০৲

এখানে তহবিলে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়ে নাই; শুধু ব্যাঙ্ক একটা হ্যাণ্ডনোট পাইয়াছে ও তাহার বদলে ঋণ গ্রহীতাকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা উঠাইবার ক্ষমতা দিয়াছে। সুতরাং নগদ টাকা লইয়া এত ঘোর-ফের না করিয়া, যদি ব্যাঙ্ক হ্যাণ্ডনোট লইয়া টাকা উঠাইবার ক্ষমতা ঋণ-গ্রহীতাকে দিত, তবে একই ফল দাড়াইত। সুতরাং ব্যাঙ্কের হিসাব দাঁড়াইল:—

(ক) ঋণ দানের পূর্ব্বে—

নগদ	১০,০০০৲	আমানৎকারীকে দেয়	১০০০০৲

(খ) ঋণ-দানের পর

নগদ	১০,০০০৲	আমানৎকারীকে দেয়-	
হ্যাণ্ডনোট	৫০০০৲		১৫,০০০৲

ব্যাঙ্ক যে শুধু আমানৎ টাকাই ধার দিতে পারে তাহাই নহে; ব্যাঙ্ক নিজের তৈরী নোট ও ধার দিতে পারে। এই সব নোটকে **'ব্যাঙ্কে-নোট'** বলে। এ ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা ব্যাঙ্কে হিসাব না খুলিয়া একতাড়া নোট পকেটে লইয়া ফিরে। দাবী করিলেই ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক-নোটের বদলে টাকা দিতে বাধ্য। এখন যদি ধরা যায় যে ব্যাঙ্ক ৫০০০৲ নোট ছাড়িয়াছে, তবে ব্যাঙ্কের হিসাব দাঁড়াইবে:—

সম্পত্তি		দেয়	
নগদ	১০,০০০৲	আমানৎকারীকে দেয়	
ঋণ	১০,০০০৲		১৫০০০৲
		নোট-গ্রহীতাকে দেয়	৫০০০৲
	২০,০০০৲		২০,০০০৲

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ক্রেডিটের সাহায্যে

ব্যাঙ্কের আমানৎ ও নোট, নগদ টাকাকে ছাপাইয়া যাইতে পারে।

ব্যাঙ্ক-কারবারীকে টাকা-কড়ির দালাল বা ব্যবসায়ী বলা চলে। প্রয়োজন হইলেই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা পাওয়া যায় বলিয়া আর প্রত্যেককে টাকা মজুত করিয়া রাখিতে হয় না, কেননা লোকে যখন জানে যে, সুদ দিবার শপথ করিলেই ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা পাওয়া যায়, তখন অযথা ঝক্কি ঝঞ্ঝাট বাড়াইয়া টাকা নিজের কাছে মজুত করিয়া রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। লোকে তাই নগদ টাকা নিজের কাছে না রাখিয়া ব্যাঙ্কের ডেপোজিটে দিয়া চেক কাটিয়া টাকা ভাঙাইবার ক্ষমতা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকে। ব্যাঙ্ক এই ভাবে চেক ও নোট ছাড়িয়া, ধাতব মুদ্রা ব্যবহারের পরিসর খাটো করিয়াছে।

শক্তিমান ব্যাঙ্ক-কারবারী, লোকের মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মাইতে পারে যে, ঐ ব্যাঙ্কের স্বাক্ষরিত শপথ-পত্র বা ঐ ব্যাঙ্কের দস্তখতবিশিষ্ট অপর কোন ব্যক্তির শপথ-পত্র, নগদ টাকার মত কাম্য হইয়া দাড়ায়।

অপর ব্যক্তির স্বাক্ষরিত শপথ-পত্র ডিসকাউন্ট করিয়া বা ভাঙ্গাইয়া দিয়া, ব্যাঙ্ক যে শুধু টাকা আগাম দেয় তাহা নহে---ব্যাঙ্ক এই সব ক্রেডিট-পত্রে চলিয়া যাইবারও সুবিধা করিয়া দেয়। প্রয়োজন হইলেই ভাঙ্গাইয়া টাকা পাওয়া যাইবে এ বিশ্বাস থাকিলে লোকে সহজেই হুণ্ডী বা বিল অফ্-এক্সচেঞ্জ লইতে চাহিবে। ব্যাঙ্ক, হুণ্ডী বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি ক্রেডিট পত্র ভাঙ্গাইবার সুবিধা করিয়া দিয়া ক্রেডিটের চলাচল বাড়াইয়া দেয়।

ব্যাঙ্কের নগদ টাকার পরিমাণ সাধারণতঃ দায় অপেক্ষা অধিক থাকে। কিন্তু সব সময়েই ব্যাঙ্ককে এরূপ হিসাব করিয়া তহবিলে নগদ টাকা রাখিতে হইবে যে আমানৎকারী বা নোট-গ্রহীতা দাবী করিলেই তাহা দ্বিধা না করিয়া মিটাইয়া দিতে পারে—নতুবা ব্যাঙ্কের পক্ষে অমঙ্গল সুনিশ্চিত। উদাহরণ লওয়া যাউক। ব্যাঙ্কের শেষ যে হিসাব দিয়াছি তাহাতে দেখান হইয়াছে যে তাহাতে ব্যাঙ্কের তহবিলে নগদ মোট ১০,০ আছে অথচ দাবী করিলেই নগদ টাকা দিতে হইবে এরূপ দায় আছে ২০,০০০৲ টাকার। ধরা যাক্ ব্যাঙ্ক পরিচালক মনে করিলেন যে, নগদ টাকা ১০,০০০৲ তহবিলে জমা করিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই, তাহা বেশ লাভজনকভাবে ধার দেওয়া যাইতে পারে এবং সেই হেতু ধার দিতে লাগিলেন। দেখা গেল যে নগদ তহবিলের পরিমাণ ১০০০৲ হইয়া দাড়াইয়াছে অথচ দায় ২৯,০০০৲ টাকায় ঠেকিয়াছে। এখন যদি কেহ (আমানৎকারী ও ঋণ-গ্রহীতাদের মধ্যে) ২,০০০৲ দাবী করিয়া বসে তবে, ব্যাঙ্কের পক্ষে সে দায় মিটানো অসম্ভব হইয়া দাড়াইবে। দাবী করিবা মাত্র নগদ টাকা দিবার ব্যাঙ্কের যদি চুক্তি না থাকিত তাহা হইলে হ্যাণ্ডনোট হস্তান্তরিত করিয়া ব্যাঙ্ক উদ্ধার পাইতে পারিত বা কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিত। টাকা অপ্রতুল হইবার সূচনা দেখিলেই ব্যাঙ্কের জমা দলিলাদি বিক্রয় করিয়া টাকা সঞ্চয় করা প্রয়োজন কিন্তু দৈবাৎ এরূপভাবে অধিক টাকা সঞ্চয় করা ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভব নহে। যদি কয়েকজন আমানৎকারী ও নোট-গ্রহীতা এক সাথে এরূপ অবস্থায় নগদ টাকা দাবী করিয়া বসে তবে ব্যাঙ্কের পক্ষে টাকা দেওয়া মুস্কিল হইয়া পড়ে লোকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি এইভাবেই হয় ও তাহার ফলে অনেক ব্যাঙ্ককেই দেউলিয়া হইতে হয়। সুতরাং প্রত্যেক ব্যাঙ্কের ঋণ-দান ও নোট-ছাড়া এরূপভাবে নিয়মিত করা উচিত যাহাতে তহবিলে আবশ্যক অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণ নগদ টাকা থাকে।

এইবার ব্যাঙ্কের ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া দেখা যাক। ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্ক অফ্ ভেনিস্ প্রতিষ্ঠিত হয়; আজকাল ব্যাঙ্ক বলিলে আমরা যাহা বুঝি তাহার সব বিশেষত্বগুলি এই প্রতিষ্ঠানটীর ছিল না হয়ত, কিন্তু ব্যাঙ্ক নামে উহাই প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময়ে ইউরোপে কৃষি যেরূপ জাঁকিয়া উঠে নাই, তাই মাংসই ছিল প্রধান খাদ্য, বিশেষতঃ উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে। কিন্তু মাংসকে কিরূপে টাটকা রাখা যায় সেটা ছিল বড় সমস্যা—তাই

খাদ্য সমস্যা ছিল ভীষণ; লবণও যে খুব পাওয়া যাইত তাহা নহে; অধিকন্তু লবণ-দিয়া-রাখা মাংস খাইলে 'স্কার্ভি' রোগ হওয়ার আশঙ্কা ছিল। প্রাচ্যের মশলার চাহিদা ছিল খুব বেশী, কিন্তু যান-বাহনের অসুবিধা ছিল বলিয়া পূব-দেশের মশলা বিকাইত চড়া দামে। পৃথিবী বলিতে তখন বুঝাইত ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার উত্তরাংশের খানিকটা—লোকের জ্ঞান ছিল এতই সীমাবদ্ধ; অশ্বটানা গাড়ী ও নৌকা জাহাজই ছিল মালপত্র চলাচল করার একমাত্র উপায়।

প্রাচ্যের সহিত ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের যে বাণিজ্য তাহা ছিল একরকম পুরাপুরি হ্যান্সিয়াটীক্ লিগের (Hanseatic League) হাতে। এই বাণিজ্য পথের মাঝে মাঝে ঠগ্ ডাকাত প্রভৃতির উপদ্রব লাগিয়াই থাকিত। বাকী ইউরোপের যা-কিছু আবশ্যকীয় যোগাইত ভেনিস্ নগর। পরে জেনোয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। এই দুই সহরের দক্ষিণে ছিল ফ্লোরেন্স। ফ্লোরেন্সও একটা বড় বাণিজ্য-কেন্দ্র হইয়া উঠিতে পারিত, কিন্তু কোন সামুদ্রিক বন্দর ছিল না বলিয়া ব্যাঙ্কিংএর দিকেই নজর পড়ে। ভেনিস ও জেনোয়ার বণিকেরা সর্ব্বক্ষণই টাকার অন্বেষণ করিত; ফ্লোরেন্স তাহা যোগাইতে লাগিল এবং এইভাবে 'ডিস্কাউন্টিং' ও 'আর্বিট্রেজ' নীতি আয়ত্ত করিল। প্রায় তিন শতাব্দী ধরিয়া ফ্লোরেন্সই ইউরোপের টাকা-পয়সার কেন্দ্র ছিল; এমন কি রাজা-বাদশারাও এদের কাছে হাত পাতিত।

ভেনিস ও হান্স পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রাধান্য করিয়া আসিয়াছে; মাঝে মাঝে জেনোয়া ভেনিসের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াছে, কিন্তু হঠাইতে পারে নাই। এই দেশগুলির সহিত বাণিজ্য করিয়া দক্ষিণ জার্ম্মাণীর বণিকরা ক্রমশঃ ধনী হইয়া উঠিতেছিল।

মধ্যযুগে ইটালীর বাহিরে ব্যবসা সংক্রান্ত লেন-দেন চলিত এক-একটা মেলায়; ২।৩ মাস অন্তর বিভিন্ন স্থানে এইরূপ মেলা বসিত। পশ্চিম ইউরোপের কেন্দ্র ছিল ব্রাজেস্ (Bruges) দূর দূর দেশ হইতে বণিক ও ব্যাঙ্কারগণ আসিয়া এখানে কারবার করিত। ফ্লোরেন্টাইন কন্সালের বাড়ীর সামনে একটী স্কোয়ারে বিল ডিসকাউন্ট করা চলিত। একটা বিলের পাওনা, আর একটা মেলায় মিটাইয়া দিতে হইত, অর্থাৎ ২।৩ মাসের মিয়াদ ছিল বিলগুলির। মেলায় একজন অফিসর বসিয়া সমস্ত ক্রয়-বিক্রয়ের (কি পণ্য বা বিল বা বণ্ড) হিসাব রাখিতেন; অবশেষে দেনা-পাওনার একটা নিষ্পত্তি হইত। সুতরাং এই সব মেলায় ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসা দু-কারবারই চলিত বলা যায়।

১৪০১ খৃষ্টাব্দে বার্সিলোনায় প্রথম ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্ত পর্য্যন্ত ভেনিসই বাণিজ্যে প্রাধান্য করিয়াছে আর ব্যাঙ্কিং কারবারে ফ্লোরেন্স। ইতিমধ্যে তুরস্ক কিছু শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল; তাই যে-পথ দিয়া প্রাচ্যের পণ্য ভেনিসে আসিত সে পথ তুর্কীদের আক্রমণে বিপদসঙ্কুল হইয়া ওঠে।

১৪১৫ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগালের রাজকুমার হেন্‌রী তাঁহার দু-ভায়ের সহিত মুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আফ্রিকা যাইতেছিলেন: তাঁহার যাইবার পথে পশ্চিমে অজ্ঞাত অনন্ত সমুদ্র পড়িয়াছিল। এই অজ্ঞাত প্রদেশে পাড়ি দিবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে জাগে।

তিন বৎসর হেন্‌রী বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেন; তারপর দেশে ফিরিয়া সমুদ্রে অভিযানের অনুরূপ লোক ও জাহাজ সংগ্রহ করিতে মনোনিবেশ করেন। যথা সময়ে তিনি অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিলেন। ১৪৬০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তাঁহারা গ্যাম্বিয়া (Gambia) পৌঁছেন; এমন সময়ে হেন্‌রী মারা যান; কিন্তু তাঁহার অনুচরবর্গ সে অভিযান ত্যাগ করিলেন না। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে বার্থলমিউ ডিয়াজ্ (Bartholomew Diaz) কেপ্ অফ্ গুড্ হোপ্ পরিক্রমণ করেন। দশ বৎসর পরে ভাস্কো-ডিগামা ভারতবর্ষ আগমন করিয়া গোয়া (Goa) উপনিবেশ স্থাপন করেন। [শিশু-ভারতী তৃতীয় খণ্ড ১১২১-১১২৮ পৃষ্ঠা দেখ]

এই অভিযানের ফলে প্রাচ্যের ঐশ্বর্য্য ইউরোপে উপনীত হইতে লাগিল, প্রধানতঃ

অ্যান্ট-ওয়ার্প বন্দর দিয়া। সমুদ্র দিয়া মাল আনয়ন করার জন্য পূর্ব্বের তুলনায় যাতায়াত খরচা অনেক কম লাগিতেছিল; তাই পূর্ব্বের তুলনায় প্রাচ্যের পণ্যগুলি ই৹ দামে বিকাইতে লাগিল, সুতরাং খাদ্যাভাবের ভয় অনেকটা দূর হইল।

১৪৯২ খৃষ্টাব্দে ক্রিষ্টোফার কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন; এই অভিযানের ফলেই ল্যাটিন্ আমেরিকার উদ্ভব। এই সব দেশ হইতে স্প্যানিয়ার্ডরা প্রধানতঃ সোণা রূপাই ইউরোপে আমদানী করিতেছিল এবং এইভাবে অপর্য্যাপ্ত সোণা-রূপা স্পেনে জমিয়া ওঠায় পণ্যের দর চড়িয়া যায়; ক্রমশঃ সমগ্র ইউরোপে পণ্যের দর চ'ড়ে।

স্পেন পর্ত্তুগালের অভ্যুদয়ে ভেনিস, জেনোয়া, ফ্লান্স্ ও ফ্লোরেন্স আধিপত্য হারাইল।

ষোড়শ শতাব্দীতে অ্যান্ট-ওয়ার্প ও লিয়ঁ (Lyon) সহর ছিল টাকা কড়ির প্রধান বাজার আর হাউস্ অফ ফাগার (House of Fugger) ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কার।

১৫১০ খৃষ্টাব্দে অ্যান্ট-ওয়ার্পে বণিকদের দৈনিক মিলনের জন্য 'বুস' (Bourse) স্থাপিত অতি অল্প সময়েই এইটা আন্তর্জ্জাতিক জার কেন্দ্র হইয়া উঠিল। যে সব পণ্য দেশে আমদানী করিত, সেগুলি র দেশে বণ্টন করিত বৈদেশিক বণিকেরা। বাণিজ্য চালাইবার জন্য প্রয়োজন হইত ও হুণ্ডীর এবং বিল্ ও হুণ্ডীগুলি ভাঙ্গান হইত বুর্সে। পরে রাজা-বাদশা, রাষ্ট্র, মিউনিসিপ্যালিটীও অ্যান্ট-ওয়ার্পে টাকা কর্জ্জ লইবার জন্য আসিত।

ফ্রান্সে এমন স্থান ছিল না, যেখানে বিদেশী বণিকের নিকট হইতে রাজা টাকা কর্জ্জ করিতে পারেন। টাকার প্রয়োজন হইলেই ফ্রান্সের রাজাকে বিদেশে প্রতিনিধি পাঠাইয়া টাকা কর্জ্জ লইতে হইত। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য তিনি লিয়ঁ সহরে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন— ব্যবসায়-বাণিজ্যের সকল সুবিধা এই প্রদর্শনীকে দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল— বহু বিদেশী বণিক সেখানে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি লিয়ঁ একটা বড় কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল।

অ্যান্টওয়ার্প বুর্সে গোড়ার দিকে পণ্য কেনা বেচাই ছিল প্রধান কাজ। ক্রমশঃ বণিকগণ যত সঞ্চয় করিতে লাগিলেন ততই তাঁহারা ব্যবসা ত্যাগ করিয়া বিল, হুণ্ডী ডিস্কাউণ্ট করাতেই মনোনিবেশ করিলেন। তারপর চড়া সুদের লোভে ডিস্কাউন্টিং ত্যাগ করিয়া বণ্ডে টাকা ন্যস্ত করিলেন।

এই সময় ইউরোপে পণ্যের দরে বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল; টাকা কড়ি হতাদর বিশিষ্ট হইল (depreciating currency)। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে বণ্ড-হোল্ডার গণ দেখিল যে বণ্ড গুলির কোন মূল্য নাই, ডিস্অনার (dishonored) করা হইয়াছে। ফলে অ্যান্টওয়ার্প ও লিয়ঁর শ্রেষ্ঠত্ব লোপ পাইল।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে অ্যামষ্টার্ডাম্ টাকাকড়ির প্রধান বাজার হইয়া দাঁড়ায়। হল্যাণ্ড, উপনিবেশ বিস্তারের সহিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও প্রধান হইয়া ওঠে; কাজেই ব্যাঙ্কিং-এর ব্যবস্থা করিতে হয়।

১৬০৯ খৃঃ ব্যাঙ্ক অফ্ অ্যামষ্টার্ডাম প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাঙ্কটী ছিল পুরাপুরি আমানতি ব্যাঙ্ক—ঋণ দিবার ক্ষমতা ছিল না এই ব্যাঙ্কের। মুদ্রা জমা রাখিয়া তাহার বদলে ব্যাঙ্ক একটা রসিদ দিত। ব্যাঙ্ক যে রসিদ দিত তাহা হাত হইতে হাতে ঘুরিয়া আন্তর্জাতিক সিক্কার কাজ করিত; অনেক ক্ষেত্রেই মুদ্রা অপেক্ষা অধিক আগ্রহের সহিত এই ব্যাঙ্ক-রসিদ লোকে গ্রহণ করিত। সমস্ত বিল, হুণ্ডীর টাকা ব্যাঙ্কের টাকায় (Bank money) দিতে হইত। বিলের দালাল ও শেয়ারের দালাল বিভিন্ন ব্যক্তি ছিল। ব্যাঙ্কের একাজ ছিল না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হল্যাণ্ডের সহিত বিটেনের যুদ্ধ বাধে এবং সেই যুদ্ধে উপনিবেশ গুলি হল্যাণ্ডের হস্তচ্যুত হয় ও বহির্বাণিজ্য ব্যহত হয়। ব্যবসায় মন্দাপড়ায় ব্যাঙ্ক অফ্ অ্যামষ্টার্ডাম্ও কাহিল হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ব্যাঙ্ক অফ্ অ্যাম্ষ্টার্ডাম্ লুকাইয়া লুকাইয়া টাকা ডাচ্ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও হল্যাণ্ড রাষ্ট্রকে কর্জ্জ দিতে থাকে।

১৭৯৭খৃ নেপোলিয়নের আক্রমণের পর ব্যাঙ্কের এই সব গলতি ধরা পড়ে: ফলে ব্যাঙ্ক উঠিয়া যায়।

হল্যাণ্ড হইতে আসিয়া উইলিয়াম্ ও মেরী যখন ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখন স্পেনীয় যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় টাকা কড়িতে টান ধরে, তাই ১৬৯৪খৃঃ উইলিয়ামের সম্মতি ক্রমে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাঙ্কের সহায়তায় মোটা টাকা কর্জ্জ পাইবার সুবিধা হইল।

ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ব্রিটিশ সরকারের টাকা কড়ির অভাব অনেকটা ঘুচিল। ব্যাঙ্ক সোজাসুজি সরকারকে টাকা কর্জ্জ দিত এবং তাহার বদলে নোট ছাড়িবার ক্ষমতা পাইয়াছিল। এইরূপে ক্রেডিট্ খুব বাড়িয়া যায়। দেশের বাণিজ্য যেভাবে বাড়িতেছিল, তাহাতে ক্রেডিট্ প্রসারের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। পরে সরকার বাজারে ষ্টক্ বিক্রয় করিতে সুরু করিলেন; এবং তাহা আদায় ও মিটানোর ভার দেওয়া হয় ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ডকে। দেশের লোকের হাতে তখন যথেষ্ট টাকা ছিল বলিয়া ষ্টক্ গুলির আদর ছিল। ছোট-বড় ব্যাঙ্কের পক্ষেও ষ্টকে টাকা খাটানো লাভজনক ছিল, কেননা, প্রয়োজনমত ষ্টকগুলি বাজারে বিক্রয় করা চলিত। ধনী লোকেরাও ষ্টক ক্রয় করিতেন, যেহেতু, ব্যাঙ্কে টাকা আমানৎ রাখিলে যে সুদ পাওয়া যাইত, ষ্টক ক্রয় করিলে তাহা অপেক্ষা বেশী সুদ পাওয়া যাইত; অধিকন্তু প্রয়োজন হইলে এই ষ্টক্ গচ্ছিত রাখিয়া ব্যাঙ্কের কাছ হইতে ওভারড্রাফ্ট্ গ্রহণ করা চলিত। এই ভাবে ঋণ গ্রহণ সরকারের পক্ষে এতই সুবিধাজনক হইয়াছিল যে, চ্যান্সেলার অফ্ এক্স্ চেকার বাজেট্ ঘাটতি হইলেই এই পন্থা অবলম্বন করিতেন। সরকারের সহায়তায় নানা আপদ-বিপদ্ উপেক্ষা করিয়া ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ড কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে।

১৬৯৫ খৃঃ অব্দে ব্যাঙ্ক অফ্ স্কট্ল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭১৬ খৃঃ অব্দে এর একচেটিয়া নষ্ট হয়। ১৭২৭ খৃঃ অব্দে রয়্যাল ব্যাঙ্ক অফ্ স্কট্ল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে ব্রিটিশ লিনেন্ কোম্পানী ব্যাঙ্ক কারবারে নামে। এই গুলিকে চার্টার্ড ব্যাঙ্ক (Chartered Bank) বলিত। নোট ছাড়ার ক্ষমতা ছিল ইহাদের। অর্থশালী জেলাগুলিতে শাখা প্রতিষ্ঠিত করায় অর্থের সুগম হয় এবং তাহার ফলে যে সব জেলায় অর্থের অনটন হেতু শিল্প মাথা তুলিতে পারিতেছিল না, সেই সব স্থানে শিল্প গজাইয়া উঠে। ১৮১০ খৃঃ অব্দে অনেক টাকা ক্যাপিটেল লইয়া কমার্শিয়্যাল ব্যাঙ্ক অফ্ স্কট্ল্যাণ্ড গড়িয়া উঠে। অল্প দিনেই নানাস্থানে ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ন্যাশন্যাল, দি ইউনিয়ান্, দি ক্লাইডস্‌ডেল্ ও নর্থ অফ্ স্কট্ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেকগুলি প্রাইভেট্ ব্যাঙ্ক লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়। নোট ছাড়িবার ক্ষমতা এই ব্যাঙ্ক গুলির ছিল না, তবে কান্ট্রি ব্যাঙ্কারদের এজেণ্ট হিসাবে অনেক কাজ করিতে হইত।

স্থানীয় বিত্তশালী লোকদের সহায়তায়ই কান্ট্রি ব্যাঙ্কিং গড়িয়া উঠে; এই সকল ধনী লোকদের হাতচিঠা সহজেই হাতফের করিত। ১৮১৮ পর্য্যন্ত বিশ বৎসরে ২৩০টী কান্ট্রি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়। ফলে একটা আন্দোলন হয় এবং শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট জয়েণ্ট-ষ্টক ব্যাঙ্ক দেখা দেয়। আজ লণ্ডন ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ২২,০০কোটি পাউণ্ডেরও অধিক।

ইউরোপে বাণিজ্য-বিষয়ক ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠে প্রধানতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে; ইন্‌ডাষ্ট্রীয়্যাল কোম্পানী গড়িয়া তোলাই ছিল এই সব ব্যাঙ্কের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সেজন্য ব্যাঙ্ক, কোম্পানীর মোটা রকম শেয়ার্ ক্রয় করিতেন এবং আবশ্যক হইলে দীর্ঘ মিয়াদে মোটা টাকা কর্জ্জ দিতেন। কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরও একটী স্থান ছিল। ইন্‌ডাষ্ট্রীয়্যাল্ কোম্পানীগুলিকে টাকা দাদন দিবার জন্য চড়া সুদে আমানৎ রাখিতে হইত; সুতরাং বলা যায় যে ইউরোপীয় ব্যাঙ্কারগণ একটু অতিরিক্ত মাত্রায় সাহসী (Venturer) ছিলেন; আমানৎ-কারীদের স্বার্থ রক্ষার চেয়ে মুনাফার উপরই ছিল বেশী নজর। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ ব্যাঙ্কারগণ আমানৎকারীদের স্বার্থটাকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন—শিল্পে টাকা ন্যস্তকরা হইতেছে গৌণবাদ।

ফার্ণ

৩২৫২ পৃষ্ঠার পর

উদ্ভিদ জগতের সমস্ত উদ্ভিদকে দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়—এক যাহাদের ফুল ফল হয় এবং বীজ দ্বারা বংশ রক্ষা ও বিস্তার করে; দ্বিতীয় যাহাদের ফুল ফল হয় না, এবং যাহারা বীজ দ্বারা বংশ রক্ষা কিংবা বিস্তার করে না। ফার্ণ দ্বিতীয় শ্রেণীর উদ্ভিদের অন্তর্গত। ইহাদিগকে **ক্রিপ্টোগেম** (Cryptogam) বলা হয়। ক্রিপ্টোগেমের মধ্যে চক্ষুর অদৃশ্য উদ্ভিদ হইতে আরম্ভ করিয়া ডাল, কাণ্ড, শিকড় পাতা প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিভক্ত শরীরওয়ালা গাছ পালা সবই দেখিতে পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত প্রকার ক্রিপ্টোগেমের অন্তর্গত হইতেছে ফার্ণ ও তাহার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী বর্গ। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে। গ্রীষ্মমণ্ডল হইতে মেরুমণ্ডল, এমন কি গ্রীন্‌ল্যাণ্ডের উত্তর অংশ পর্য্যন্ত এবং সমুদ্রের লেভেল (level) হইতে পর্ব্বতের উপর ১৬০০০ হাজার ফুট উঁচু অবধি—সমান ভাবে ইহাদের কাহাকেও না কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের প্রায় ছয় হাজার প্রজাতিকে (species) দেড়শত গণে (genera) ভাগ করা হয়। এখানে আমরা শুধু ফার্ণের কথাই বলিব।
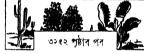
অ্যাস্‌পিডিয়ম অ্যাকিউলিয়েটম

আমাদের বাঙ্গালা দেশের সমতল ভূমিতেই অনেক প্রকার ফার্ণ জন্মে। যদি তাহাদিগকে দেখিতে চাও তবে স্যাঁৎসেঁতে রৌদ্র-বিহীন স্থানে, গাছের আওতায়, ভিজা দেওয়ালের উপর, বর্ষাকালে গাছের ডালে পাতার ছায়ায়, পুকুরের ধারে খুঁজিও। দার্জ্জিলিং, খাসিয়া প্রভৃতি পাহাড়ে ইহাদের বহু পরিবার বাসা বাঁধিয়াছে দেখিতে পাইবে। চট্টগ্রাম ও ওই প্রদেশের পার্ব্বত্য-

অঞ্চলে ফার্ণের বহু পরিবার সগৌরবে বসবাস করিতেছে, দেখিলে মনে হইবে এই প্রদেশেই

রূপালি ফার্ণ

যেন উহাদের আদি জন্মভূমি। এইখানেই বনে জঙ্গলে লোকচক্ষুর অন্তরালে বুনিয়াদী ফার্ণ বৃক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু ফার্ণ গাছ দেখিতে তোমাদিগকে বনে-জঙ্গলে পাহাড়-পর্ব্বতে যাইতে হইবে না, পুকুর পারে কিংবা গাছেও চড়িতে হইবে না। ইহার কাটাকাটা সুন্দর পাতার জন্য সৌখীন লোকে টবে করিয়া এই গাছ রাখে। এমন কি কাহারও কাহারও বাগানে ইহাদের জন্য ফার্ণারি পর্য্যন্ত তৈরী করা হয়। কলিকাতার কাছে কোম্পানির বাগানে ফার্ণারি দেখিয়া আসিও। বাড়ী কিংবা সভাস্থল সাজাইতে হইলে টবে করিয়া নানা রকমের অতি সুদৃশ্য ফার্ণ গাছ ও পাম গাছ আনা হয়। আমাদের দেশে, বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে, ঢেঁকির শাক হিসাবে ইহাদের দুই একজনকে বাজারে বিক্রয় হইতে দেখিতে পাইবে।

ফার্ণ অবীজজ। সুতরাং সন্তানোৎপাদনের জন্য ইহাদের ফুল ফল বীজ কিছুই হয় না। তাহা হইলে ইহাদের বংশ বিস্তার হয় কি প্রকারে? বহুদিন পর্য্যন্ত এ তথ্য রহস্যাবৃতই ছিল, আর ইহা লইয়া কতই না আজগুবি গল্প রচনা হইয়াছিল!

আমাদের এই বাঙ্গলা দেশেই অদৃশ্য 'ডুমুরের ফুল' লইয়া প্রবাদ বচন গড়িয়া উঠিয়াছে। 'সাপের পা' এবং 'ডুমুরের ফুল' সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া আমাদের দেশে এখনও সাধারণ লোক বিশ্বাস করে। ইহা হইতেই তাহাদের ধারণা ডুমুরের ফুল যে দেখিতে পাইবে তাহার ভাগ্যে রাজত্ব লাভ, আর না হয় বাদশাগিরি নিশ্চয়ই মিলিবে! কাহাকেও অনেক দিন না দেখিলেই ডুমুরের ফুলের সহিত তুলনা করা হয়। বিলেতে, এমন কি প্রায় সমগ্র ইউরোপখণ্ডে, ফার্ণ সম্বন্ধে এই প্রকার একটা কুসংস্কার ছিল। এই সে দিন পর্য্যন্তও সেখান-

নেফ্রোডিয়ম মোলে গ্র্যাণ্ডিসেপ্স্
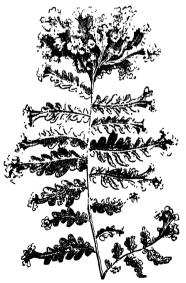
কার লোকে বিশ্বাস করিত ফার্ণের বীজ হয় কিন্তু সহজে কেহ তাহা দেখিতে পায় না।

দুইটি ফার্ণ গাছ—(১) অ্যান্‌জিওপ্‌টেরিস ইভেক্‌টা (২) অ্যাক্রস্‌টিকম সারভিনম

যাহার নিকট ফার্ণ-বীজ থাকে সে লোকচক্ষুর অদৃশ্য হয়।

নেফ্রোলেপিস কফেসেন্স ট্রাইপিনাটিফিড।

আমরা রূপকথায় দ্রব্যগুণের প্রভাবে কত রাজপুত্রকে অদৃশ্য হইতে শুনিয়াছি। ফার্ণ-বীজের কথাও সেই গল্প কথার মতই উপভোগ্য, এবং তোমাদের মনে হইবে আমি যদি একটা ফার্ণ-বীজ পাইতাম! বিলেতের লোকে সত্য সত্যই বিশ্বাস করিত যাহার নিকট ফার্ণ-বীজ থাকিবে তাহার উপস্থিতি, তাহার চলাফেরা কেহ জানিতে পারিবে না। ইংরাজী সাহিত্য হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া তোমাদিগকে ইহার প্রমাণ দিতেছি।

বেন্ জনসন্ ফার্ণ-বীজ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"I had
No medicine, sir, to go invisible,
No fern seed in my pocket."

অর্থাৎ মহাশয়, আমার পকেটে ফার্ণ-বীজ নাই যে আমি অদৃশ্য হইয়া যাইব।

সেক্সপীয়র তাঁহার 'চতুর্থ হেনরি' নাটকে একজন পাত্রকে দিয়া বলাইয়াছেন—

'আমাদের নিকট ফার্ণ-বীজ আছে, আমরা অদৃশ্য ভাবে চলাফেরা করি'।

এডিসন তাঁহার 'ট্যাটলারে' একজন ভাঁড়ের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন তিনি ফার্ণের স্ত্রীবীজ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে মিড্‌লসেক্সের চেষ্টন নামক স্থানের একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক তাঁহার একজন প্রশ্নকারীকে বলিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার বাল্যকালে 'সেণ্টজন দি ব্যাপটিষ্ট' উৎসবের পূর্ব্ব দুপুর-রাত্রে ফার্ণ-বীজ সংগ্রহ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস অনেকবার করিয়াছেন। ইহার জন্য তাঁহারা গাছের নীচে একখানা প্লেট রাখিয়া দিতেন যাহাতে গাছ হইতে আপনা হইতেই তাহার উপর বীজ পতিত হয়। গাছ ঝাঁকাইয়া বীজ পাড়িলে যে তাহাতে কোন ফল হইবে না! ফার্ণ-বীজ সংগ্রহ

অ্যাক্রস্টিকম অসমান্ডেসিয়ম

বিষয়ে De Gubernatis যাহা লিখিয়াছেন বাহুল্য হইলেও তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

"গ্রীষ্মকাল যখন মাঝামাঝি অবস্থায় আসিয়া

পৌঁছিয়াছে সেই সময় রাত্রি ১২টা বাজিবার পূর্ব্বে একখানি সাদা ধবধবে তোয়ালে, একটী ক্রুশ,

জিমনোগ্রামে টাবর্টেবিয়া

একখানি বাইবেল গ্রন্থ, এক গ্লাস জল ও একটী পাঁ লইয়া যিনি ফার্ণ-বীজ সংগ্রহ করিবেন তাঁহাকে বনের ভিতর যেখানে ফার্ণ গাছ জন্মে সেইখানে যাইতে হইবে। ফার্ণের একটী গাছ ঠিক করিয়া তাহার তলায় ক্রুশ দ্বারা একটী বৃত্তাকার গণ্ডি অঙ্কিত করিয়া তাহার ভিতর তোয়ালিয়া খানি বিছাইতে হইবে। বিছান তোয়ালিয়ার উপর ক্রুশ-খানি, বাইবেল ও জলের গ্লাসটি রাখিতে হইবে। এই সমস্ত ঠিক করিয়া তিনি ঘড়ি দেখিবেন। ঘড়িতে যখন ঠিক ১২টা বাজিবে তখন ফার্ণ গাছে ফুল ফুটিবে এবং তাহা হইতে বীজ ঝরিয়া পড়িবে। সৌভাগ্যবশতঃ যিনি বীজ ঝরিয়া পড়া দেখিতে পাইবেন তিনি অনেক কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবেন। তিনি তিনটী সূর্য্য ও একটী চন্দ্র দেখিতে পাইবেন। সূর্য্য ও চন্দ্রের সাহায্যে অদৃশ্য ও লুকান জিনিষও তাঁহার কাছে প্রকাশমান হইবে, তিনি নানাপ্রকার হাসি ও কলরব শুনিতে পাইবেন। তাঁহার মনে হইবে তাঁহাকে নাম ধরিয়া কেহ যেন ডাকিতেছে। যদি তিনি উৎকর্ণ বা সচকিত থাকেন তবে তাঁহার অন্তঃদৃষ্টি খুলিয়া যাইবে এবং তিনি পৃথিবীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী জানিতে পারিবেন।"

(De Gubernatis, "La Mythologie des Plantes ou les Legends du Regne Vegetable" Paris)

তোমরা তা হলে জানিলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্তও ইংলণ্ডে ফার্ণ সম্বন্ধে এই অন্ধবিশ্বাস ছিল, এ দোষে আমরাই কেবলমাত্র দোষী নই। যাক সে কথা। এখানে তোমাদের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই যে পৃথিবী জোড়া অন্ধবিশ্বাস ইহার মূলে ছিল কি?

আমার মনে হয় ইহার মূলে ছিল একটি দেখিয়া অন্যটির সম্বন্ধেও অনুরূপ কল্পনা করিবার মানুষের চিরন্তন প্রবৃত্তি।
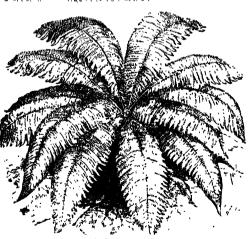
টোডিয়া স্থপারবা

মানুষ দেখে আম, জাম, কাঁঠাল, প্রভৃতি গাছের বীজ হইতেই নূতন গাছ জন্মে। ফার্ণও
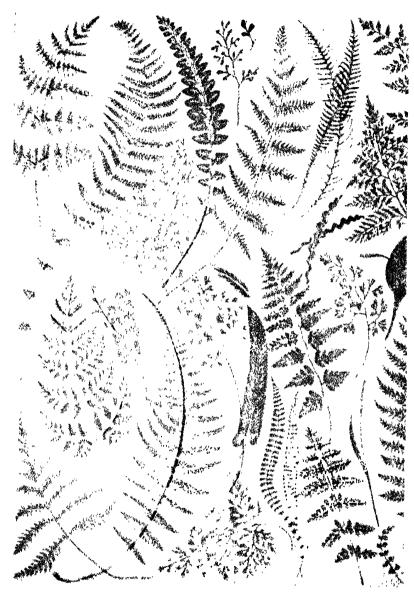
কয়েকটি ফার্ণ—পারস্‌লি ফার্ণ, পলিপড ফার্ণ, সর্পজিহ্বা ফার্ণ, এল্‌পাইন ফার্ণ, মেডেন হেয়ার ও আরও নানা প্রকার ফার্ণের পাতা।

আম, জাম, কাঁঠালের মতই ডালপালাওয়ালা সবুজ গাছ। ফার্ণে সে জননী দেহের অংশ

১, ফলকের নীচের পৃষ্ঠে বীজধানী ; ২, বীজধানীর কর্তিত অংশ ; ৩, বীজরেণু ও তাহার থলি

ছাড়াই নূতন গাছ জন্মিতে দেখে, কিন্তু ফার্ণের বীজ খুঁজিয়া পায় না। অন্যান্য গাছের বেলায় যদি বীজ হইতে তাহাদের সন্তান জন্মে তাহা হইলে ফার্ণে তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? সুতরাং ফার্ণ গাছেও সন্তানোৎপাদনের জন্য বীজ নিশ্চয় হয় তবে সে বীজ ডুমুরের ফুলের মতই কেহ দেখিতে পায় না। কাজেই সংস্কার জন্মিল এই অদৃশ্য বীজ যে সংগ্রহ করিতে পারিবে, সে নিজেও নিশ্চয়ই লোকচক্ষুর অদৃশ্য হইতে সমর্থ হইবে।

কল্পনাপ্রসূত অনিশ্চিতের পিছনে ছোটা মানুষের চিরকালীন স্বভাব। তাই ডুমুরের ফুল আবিষ্কার করিতে প্রাক্-বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের চেষ্টার যেমন বিরাম ছিল না, তেমনই ফার্ণের অদৃশ্য বীজ আবিষ্কার কিংবা লাভ করিবার ব্যর্থ চেষ্টাও বহুদিন ধরিয়া পাশ্চাত্য দেশে চলিয়াছিল।

ফার্ণে যদি সত্যই বীজ না হয় তবে সে কি করিয়া সন্তানের জন্ম দেয়? ফার্ণে বীজ হয়, তবে সে বীজ আম, জাম কাঁঠালের বীজের মত নহে। সে বীজকে আমরা বীজরেণু (spore) বলি। ফার্ণ গাছকে পরীক্ষা করিও দেখিতে পাইবে যখন সন্তানোৎপাদনের সময় হয়, তখন উহার পাতার ছোট ছোট ফলকের নীচের পৃষ্ঠে শিরার পাশে পাশে কিংবা উপশিরার মাথায় কতকগুলি স্থান চাকতির আকারে উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। দিন কতক বাদে সেই স্থান গুলির চারি পাশ দিয়া বাদামী রংএর বীজরেণু বাহির হইতে দেখিবে। এই বীজরেণুগুলি প্রথম অবস্থায় কতকগুলি থলির (sporangium) মধ্যে থাকে। পরে থলি ফাটিয়া তাহারা বাহিরে আসে, এবং বাতাসের

ফার্ণ প্রোথালস্

সাহায্যে নানাদিকে ছড়াইয়া পড়ে। প্রথম

অবস্থায় ইহাদের রৌদ্র বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার উপায়টাও সুন্দর। ছাতার মত একটা উপাঙ্গ বাহির করিয়া, কিংবা পাতার কিনারা উলটাইয়া তাহার নীচে ইহারা লুকাইয়া থাকে; ছড়াইয়া পড়িবার অনুকূল অবস্থা পাইলেই ছাতাটাকে উঁচু করিয়া তাহার ফাঁক দিয়া বীজরেণু বাহির হইয়া পড়ে। আত্মরক্ষার কি সুন্দর ব্যবস্থা, বল দেখি?

বীজরেণুগুলি সবই ছোট। মাটিতে পড়িলে মাটির সহিত এমন ভাবে মিশিয়া যায় যে তখন উহাদিগকে চেনা কঠিন হইয়া পড়ে। তারপর হইতে অনুকূল জল বাতাসের প্রভাবে যে হৃদয়-নাকৃতি সবুজ বর্ণের প্রোথালস্ (prothallus) জন্মে তাহার আবিষ্কার করেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে বীজরেণু হইতে প্রোথালসের উৎপত্তির কিছুদিন পরেই উহা হইতে ফার্ণ-শিশুর আবির্ভাব হয়। এতদিন পরে ফার্ণ-শিশুর জন্মের একটা হদিস পাওয়া গেল।

কিন্তু ফার্ণ-শিশুর জন্মের মূল তথ্যটি তখনও অজানাই রহিয়া গেল। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সপুষ্পক গাছে স্ত্রী ও পুং জননকোষের মিলন না হইলে যে সন্তানোৎপাদন হয় না তাহা জানা ছিল

অ্যাডিয়েণ্টম ফরমোসম

বীজরেণু হইতেই ফার্ণ গাছ জন্মে না, সুতরাং ফার্ণ গাছের উৎপত্তির তথ্যটি বহুকাল আবিষ্কার না হওয়ার জন্যই লোকের মনে ফার্ণের অদৃশ্য বীজের অবস্থিতির ধারণা এত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

১৬৭০ খৃষ্টাব্দে **জন রে** (John Ray) যখন তাঁহার উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ বন্ধুর ফার্ণ-বীজ ধরিবার চেষ্টাকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন তখন তিনি নিজেও ফার্ণ জীবনে বীজরেণুর প্রয়োজনীয়তার কথা জানিতেন না। তবে তিনিই সর্ব্বপ্রথম বীজরেণু না। সেই বৎসর **নেহেমিয়া গ্রু** নামক ইংরাজ বৈজ্ঞানিক এবং তাহারই ১৭ বৎসর পরে **জ্যাকব ক্যামেরেরিয়স** নিঃসংশয় ভাবে প্রমাণ করিলেন পরাগ সংযোগ না হইলে গর্ভাশয়স্থিত ডিম্বাণু বীজে পরিণত হয় না। পরাগের ভিতর পুং জনন-কোষ এবং ডিম্বাণুর ভিতর স্ত্রী-জননকোষ থাকে।

ইহার পর হইতেই উদ্ভিদ-বিদ্যাবিদ্‌গণ উঠিয়া পড়িয়া ফার্ণের পরাগরেণু খুঁজিয়া বাহির করিতে লাগিয়া গেলেন। তাঁহারা মনে করিলেন ফার্ণের বীজরেণু হইতেছে উহার ডিম্বাণু। একা ডিম্বাণু

এল্সোফিলা পিক্নোকারপা—
পেরুভিয়ার বৃক্ষ-ফার্ণ
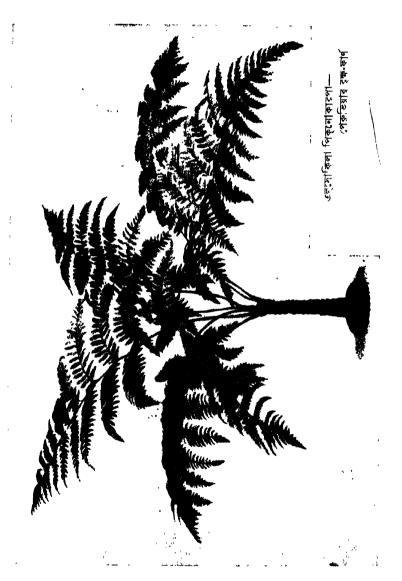
হইতে সন্তানোৎপাদন হইতে পারে না, সুতরাং পরাগরেণু নিশ্চয়ই আছে যখন দেখা যাইতেছে ফার্ণের নব শিশু উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু খুঁজিলে কি হইবে, ফার্ণের পরাগরেণু থাকিলে তো। তখন হতাশ হইয়া তাঁহারা প্রচার করিলেন ফার্ণ গাছের গায়ের রোমই উহার পুংকেশর। অজ্ঞতা আর কতদূর যাইতে পারে!

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে **নাগেলি** এবং **সুমিনিস্কি** প্রমাণ করিলেন প্রোথালসের নীচের পৃষ্ঠে দুই রকম যন্ত্র দেখা দেয় উহাদিগকে প্রজনন যন্ত্র (reproductive organs) বলে। তাহার কতকগুলি স্ত্রী আর কতকগুলি পুং জনন-যন্ত্র। স্ত্রীজনন-যন্ত্রের ভিতর স্ত্রীজনন-কোষ এবং পুং-জনন যন্ত্রের ভিতর পুংজনন-কোষ থাকে। পুংজনন-কোষ বাহিরে আসিয়া জলে সাঁতরাইয়া স্ত্রীজনন যন্ত্রে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীজনন কোষের সহিত মিলিত হয়। এই মিলনের ফলে ভ্রূণাণু উৎপন্ন হয়। প্রোথালসের প্রস্তুত খাদ্য শোষণ করিয়া ভ্রূণাণু ক্রমে ভ্রূণে (embryo) পরিণত হয়। পরিশেষে ভ্রূণ অবস্থা হইতে ফার্ণ শিশু আত্মপ্রকাশ করে।

এতদিন পরে ফার্ণের জন্মরহস্য উদ্‌ঘাটিত হইল। বিজ্ঞান কুসংস্কারকে দূর করিল।

ফার্ণের জন্ম-রহস্য তোমরা জানিলে। কিন্তু এই ফার্ণ কত বড় বুনিয়াদি ঘরের ছেলে তাহা তোমরা জান কি? পৃথিবী যখন বয়সে নবীনা, সে আজ কোটি কোটি বৎসর আগের কথা—মানুষ তখন জন্মায় নাই, কীটপতঙ্গ দেখা দেয় নাই—সেই সময়ে ফার্ণ বংশ পৃথিবীর বুকে সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছে। তখন আমাদের বসুন্ধরা "ধন ধান্যে পুষ্পেভরা" ছিল না, ছিল ফার্ণ গাছের জঙ্গলে ভরা। তখন ফার্ণগাছ ছিল এক একটা মহীরুহ। কিন্তু আজ যে রাজা, কালের প্রবাহে কাল সে প্রজা। 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ'। ফার্ণের সেদিন আর রহিল না, ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিল, তাহার রাজত্ব শেষ হইল, অন্যে আসিয়া তাহার সিংহাসন দখল করিল। মনের দুঃখে ফার্ণ হইল বনবাসী। নিভৃতে, কন্দরে, জনকোলাহলের বাহিরে সে স্থান লইল। অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া ম্রিয়মাণ অবস্থায় মানসিক কষ্টে ছোট হইতে হইতে আজ তাহার এই দশা!

অ্যাডিয়েন্টম কডেটম এজওয়ার্দি

কিন্তু আজও তাহার পূর্ব্ব গৌরবের সাক্ষী-স্বরূপ ফার্ণের কয়েকটি মহীরুহ জ্ঞাতি-ভাই বর্ত্তমান আছে। তাহারা অতীতের কথা ভাবিয়া লোকালয়ে বড় একটা মুখ দেখাইতে চাহে না, তাই পাহাড়ের উপরে, আর না হয় ঘোরতর জঙ্গলে তাহাদের দুই চারিজনকে ক্বচিৎ দেখা যায়।

আকারে ও দেহের সৌন্দর্য্যে বৃক্ষ-ফার্ণ (Tree Ferns) পাম জাতীয় (Palms) গাছকে হার মানাইয়া দেয়। New Zealand, Tasmania, Norfolk Island, Mexican

Highlands প্রভৃতি দেশেই ইহাদিগকে বেশী দেখা যায়। আমাদের বাঙ্গলা দেশেও ইহাদের

অ্যাডিয়েণ্টম টেনেরম ফাবলেয়েন্স
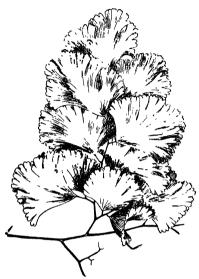
কয়েক জন বাস করে। ২০´ ফুট উচ্চ ও ২ ফুট পরিধি দেহ ইহাদের অতি সাধারণ কথা। ইহাদেরই একজনের, Dicksoniaর, ৭০´ ফুট উচ্চ দেহ Tasmania কিংবা New Zealandএ হামেশাই দেখা যায়। Alsophilaর ৮০´ ফুট উচু দেহ, আর ১৪´ কি ১৫´ ফুট লম্বা পাতা এক অভিনব দৃশ্য। শ্রীহট্টের বনসম্পদের কথা বলিতে গিয়া হুকার বৃক্ষ-ফার্ণ সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়াছেন তোমাদের অবগতির জন্য তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম—"the most interesting botanical ramble about Silhet is to the tree-fern groves on the path to Jynteepore, following the bottoms of the shallow valleys, and along clear streams······In the narrower parts of the valleys tree-ferns are numerous on the slopes rearing their slender brown trunks forty feet high with feathery crowns of foliage, through which the sun beams trembled on the boad shining foliage of the tropical herbage below". (Himalayan Journals, vol. 1, p. 325).

কিন্তু তোমাদের অনেকের পক্ষেই ইহাদিগকে দেখার সুযোগ বা সুবিধা হইবে না। তাই তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি তোমরা কেহ দার্জ্জিলিং গেলে লয়েড বটানিক্যাল বাগানে

সিয়াথিয়া ডিয়াল্‌ব্যাটা
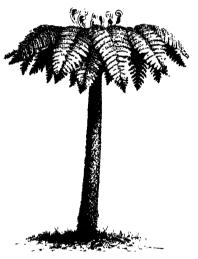
গিয়া আভিজাত্যের নিদর্শন স্বরূপ ইহাদিগের দুই একটীকে দেখিয়া আসিও।

ফার্ণ প্রয়োজন কেবল বাগান কিংবা বাড়ী সাজাইবার জন্যই নহে। ইহারা মানুষের খাদ্যদ্রব্যও সরবরাহ করে। বাংলা দেশে ঢেঁকির শাক নামে ফার্ণ বাজারে বিক্রয় হয়। তাসমেনিয়া দেশে এক রকম ফার্ণ হয় যাহার কন্দ মানুষ ও শূকরের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এদিক দিয়াও ফার্ণ মানুষের কাজে লাগে।

ভারতের আদিম কালো মানুষ

খাদ্য ও পানীয়

পূর্ব্বে তোমাদের কাছে [শিশু-ভারতী ৩১৯৭ পৃষ্ঠা] কাডার জাতির বিষয় আলোচনা করিয়াছি। এইবার তাহাদের সম্পর্কে অন্যান্য কথা বলিতেছি।

প্রথমেই খাদ্য ও পানীয়ের কথা শোন। এই সব জাতি ক্রয়-বিক্রয়ের পরিবর্ত্তে তাহাদের সংগৃহীত বন্য ফলমূল ও মধু এবং মৃগয়ালব্ধ পশুর ছাল প্রভৃতি বিনিময় (barter) দ্বারা সভ্যতর জাতিদের নিকট হইতে চাউল প্রভৃতি সংগ্রহ করে। ইহাদের মধ্যে দুইখণ্ড কাঠের পরস্পর সংঘর্ষণে (frictionএ) অথবা চকমকির (flint and steel) সাহায্যে অগ্নি উৎপাদন করিবার প্রথা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। কন্দাদি এবং আমিষ খাদ্য কোনপ্রকারে অগ্নিদগ্ধ করিয়া কিংবা কখনও বা জলে সিদ্ধ করিয়া খায়। **মালাসার** জাতির লোকেরা মৃত গোরুর ও বন্য বৃষের (Bisonএর) পচা মাংস ভক্ষণ করে। কিন্তু কাডার জাতির পক্ষে মৃত পশুর মাংস এবং বন্য বৃষ ও ভল্লুক মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ (taboo)। এই সমস্ত জাতিগুলি তাড়ি (toddy) পানে সমধিক আসক্ত। সাধারণতঃ অন্য কোনও প্রকার মাদক দ্রব্যের ব্যবহারে ইহারা অভ্যস্ত নহে।

গৃহ-নির্ম্মাণ

ইহাদের গৃহ-নির্ম্মাণ প্রণালীও নিতান্ত আদিম ধরণের। এক বা একাধিক পরিবার পাহাড়ের উপর বা ঢালু জমিতে অথবা বন্য-ভূমিতে অল্পচ্ছ পর্ণাচ্ছাদিত কুটির নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে; আর ঊর্দ্ধদেশে লম্বমান কোনও পর্ব্বত-গহ্বরের আশ্রয়েও (rock-shelter) এক বা একাধিক পরিবার বাস করে। এই সব বাসস্থানের আসবাবের মধ্যে দুই একখানা চাটাই বা মাদুর, কয়েকখানি মৃৎপাত্র, এবং দুই চারিটি ঝুড়ি উল্লেখযোগ্য; তৈজসপত্রের

মধ্যে আজকাল দুই একখানা কাঁসা বা পিতল বা এলিউমিনিয়ামের পাত্রও দেখা যায়। প্রত্যেক গৃহে দুই একখানি কুঠার ও অপর কোনও অস্ত্র, আর কোনও কোনও গৃহে দুই একটি বাদ্যযন্ত্রও রাখা হয়। রন্ধন এবং গৃহ-কর্ম্ম এমন কি গৃহ-নির্ম্মাণ পর্য্যন্ত, স্ত্রীলোকের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম। পুরুষেরা শিকার প্রভৃতি দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করে; কেহ কেহ বা মজুরের কাজও করে।

পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি

বলাবাহুল্য যে এইসব অসভ্য জাতির পরিচ্ছদ সামান্য ও অত্যল্প। পুলিয়া জাতীয় স্ত্রীলোকেরা কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত বৃক্ষপত্রের আচ্ছাদন (apron) দ্বারা আবৃত করিয়া লজ্জা-নিবারণ করে। ঐ বৃক্ষের নাম 'পাণ্ডা', এজন্য উহাদিগকে পাণ্ডা পুলিয়াঁ নামে অভিহিত করা হয়। উরুলা বা উরালি ও অন্যান্য জাতির স্ত্রীলোকেরা অল্প পরিসর (আনুমানিক সাত হাত লম্বা) বস্ত্র দ্বারা কোমর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত আবৃত করে, তাহাদের পুরুষেরা সাধারণতঃ কটিদেশে নাতি-দীর্ঘ বস্ত্র খণ্ড বা লাঙ্গোটি পরিধান করিলেও কেহ কেহ মাথায় পাগড়ি বাঁধে ও জামা গায় দেয়। কাডার জাতির পুরুষেরা আজকাল অল্পায়তন বর্ণহীন ধুতি এবং স্ত্রীলোকেরা বর্ণহীন সাড়ী ও অনেকে ছোট জামাও (bodice) পরিধান করিতেছে। এই সমস্ত জাতির রমণীরা গলায় নানা বর্ণের কাচের অথবা কড়ির মালা (bead necklaces), হাতে পিতলের মোটা চুড়ি, এবং কানের নিম্নভাগে ছিদ্র করিয়া বৃক্ষপত্রের বা অন্য কোনও রকমের গুঁজি (plugs) পরিধান করে ও কেহ কেহ ধাতু-নির্ম্মিত মাকড়ি (earring) পরে। কাডার রমণীরা চুলের খোঁপায় বাঁশের নির্ম্মিত সুন্দর নক্সাকাটা চিরুণী পরিধান করে; এই চিরুণীগুলি মলয় উপদ্বীপের সেমাং প্রভৃতি নেগ্রিটো জাতির চিরুণীর অনুরূপ। কাডার স্ত্রী পুরুষ উভয়েই শোভাবর্দ্ধনের জন্য সামনের কয়েকটি দাঁত ঘষিয়া আগার দিকে সূক্ষ্মাগ্র বা ছুঁচালো করিয়া লয়। এই চিরুণীগুলি কাডারদের স্বহস্ত নির্ম্মিত; কিন্তু পিতলের গহনা প্রভৃতি সমতল প্রদেশের হিন্দু ফেরিওয়ালাদের (pedlar) নিকট হইতে ক্রয় করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা পরিধান বস্ত্রের অঞ্চলের দ্বারা শিশু-সন্তানকে পরিপাটীরূপে পৃষ্ঠদেশে বাঁধিয়া লইয়া চলাফেরা ও কাজকর্ম্ম করে। কাডার পুরুষদের ক্ষিপ্র-গতিতে নারিকেল প্রভৃতি সোজা লম্বা বৃক্ষে আরোহণ লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

এই সমস্ত জাতিরা, বিশেষতঃ ইহাদের যুবক-যুবতীরা নৃত্যগীতে সবিশেষ আসক্ত। পুরুষেরা বাজায় ও স্ত্রী-পুরুষ সকলেই গীতগায় ও নাচে। ইহাদের পূজাপার্ব্বণ উপলক্ষে নৃত্যগীত ও বাদ্যের আধিক্য দেখা যায়। পাণ্ডাপুলিয়াঁ জাতির যুবক-যুবতীরা শীত ঋতুর প্রারম্ভ হইতে গ্রীষ্মের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত স্বগ্রামে গৃহ হইতে গৃহান্তরে নৃত্য করিতে করিতে চাঁদা আদায় করিয়া বেড়ায়, এবং এইরূপে সংগৃহীত অর্থ ও শস্যাদির বিনিময়ে মুরগী প্রভৃতি দেব-পূজার উপকরণ সংগ্রহ করে। লগুড় হস্তে এক কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে নৃত্যকালীন পরস্পর পরস্পরের লাঠিতে লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া তালমান রক্ষা করা ইহাদের নাচের একটি বিশেষত্ব; এবং এইরূপ নৃত্য ইহাদের সমধিক চিত্তবিনোদক।

সমাজ ব্যবস্থা ও আইন কানুন

যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইতে দেখা যায় যে প্রথম হইতেই প্রত্নমানব দলবদ্ধ হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। দলবদ্ধ হইয়া কোনও কার্য্য করিতে গেলে দলের নায়ক বা নেতার প্রয়োজন হয়; এবং বিধিনিয়ম মানিয়া সকলকে চলিতে হয়। এই সমস্ত আদিম বিধিনিয়ম ব্যক্তি বিশেষের বা সঙ্ঘ বিশেষের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রবর্ত্তিত হয় নাই; বংশ-পরম্পরার অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বপুরুষাগত এই সব বিধিনিয়ম ইহারা মানিয়া থাকে। ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট বিধি বলিয়া সমাজের অবশ্য-পালনীয় এইসব বিধি-বিধান লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি প্রদান দলপতির নির্দ্দেশ অনুসারে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী হইয়া থাকে। বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে কিংবা পরিবার বিশেষের বিভিন্ন ব্যক্তির

পরস্পরের মধ্যে বিবাদের আপোষে মীমাংসা না হইলে দলপতির মধ্যস্থতা বা বিচার অনুযায়ী নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। এই সব জাতির মধ্যে যদিও পুত্রই পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, তথাপি দলপতির পদ সাধারণতঃ ভাগিনেয়ের প্রাপ্য। তবে কোনও কোনও জাতির দলপতিকে গোত্র বিশেষের লোক হওয়া আবশ্যক, যেমন উরালি জাতির মধ্যে "সম্বে" গোত্রের লোক ব্যতীত অপর কোনও গোত্রের ব্যক্তি দলপতি ("যেজমান") নিযুক্ত হইতে পারে না। মালাসার জাতির প্রত্যেক দলের দলপতি ("ভোগারি") পঞ্চায়েতের সহকারিতায় স্বদল বা গ্রাম পরিচালনা করে।

বিবাহ

এই সব জাতির বিবাহ সম্বন্ধ স্বজাতির মধ্যেই সীমা-বদ্ধ। অধিকন্তু স্বগোত্রের বিবাহও ইহাদের মধ্যে একেবারে নিষিদ্ধ। ইহাদের প্রতিবেশী সভ্য "নায়ার" জাতির মধ্যে যেরূপ মামার গোত্র ভাগিনেয় পায়, এই সব জাতির মধ্যে সেরূপ মাতুলের গোত্র অনুসারে ভাগিনেয়ের গোত্র নির্দ্দিষ্ট হয় না। তবে নায়ার জাতির ন্যায় ইহাদের মধ্যেও মামাতো পিসতুতো ভাই বোনের পরস্পরের বিবাহ সম্বন্ধ প্রচলিত, এবং দলপতির পদ সাধারণতঃ মাতুল হইতে ভাগিনেয়তে বর্ত্তায়। কিন্তু পিতাই আপন পরিবারের কর্ত্তা। সাধারণতঃ প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক-যুবতীর বিবাহই এইসব জাতির মধ্যে সমধিক প্রচলিত। কেবল খাণ্ডা-পুলিয়াঁ জাতির বালিকাদের ছয়-সাত বর্ষ বয়সেই বিবাহ হয়; বিবাহের সময় পাত্রীকে খাণ্ডা-পাতের বস্ত্র (apron) পরিধান করিতে হয়।

এই সমস্ত আদিম জাতির বিবাহ বন্ধন অতি সামান্য কারণেই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। স্ত্রীপুরুষ ইচ্ছানুযায়ী এক অপরকে ত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে। বহু বিবাহ ইহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে।

মালাসার জাতির বিবাহে বরকন্যাকে একটী মুষলের উপর দাড় করাইয়া স্নান করান হয়, এবং একখানি থালাতে লাল ও কালো রঙ্গে রঞ্জিত ভাতের উপর পলিতা জ্বালিয়া সেই দীপ-যুক্ত থালা দ্বারা তাহাদিগকে বরণ করা হয়। কাডার জাতির বিবাহের প্রধান অনুষ্ঠান বরকন্যা পরস্পরের দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি সংগ্রথিত করিয়া বিবাহ-মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করা ও পরস্পর তাম্বুল বিনিময় করিয়া তাহা চর্ব্বণ করা। সম্প্রতি প্রতিবেশী হিন্দু-জাতিদের অনুকরণে ইহারা বরকন্যার গলায় বিবাহের চিহ্ন স্বরূপ ধাতু-নির্ম্মিত পদক ("টালি") পরাইয়া দেয়।

মৃতের সৎকার

সাধারণতঃ এইসমস্ত জাতি মৃতদেহ ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া মৃত্তিকা ও প্রস্তর দ্বারা সমাধি স্থান আবৃত করিয়া থাকে। উরালি জাতির লোকেরা মৃত ব্যক্তির স্মৃতিস্তম্ভস্বরূপ উচ্চ প্রস্তর-খণ্ড সমাধি-স্থানে প্রোথিত করে।

কাডার জাতি মৃতের জন্য কোনও স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করে না, কিন্তু কবর মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত করিবার পূর্ব্বে মুষ্টিমেয় চাউল শবের উপর অর্ঘ্যস্বরূপ কিংবা পরলোকে মৃতআত্মার খাদ্যস্বরূপ ছিটাইয়া দেয়। খাণ্ডা পুলিয়াঁরা কবরে চারিটি মশাল জ্বালিয়া দেয়, এবং মৃত ব্যক্তির পুত্র কিংবা ভাগিনেয় ঐ চারি কোণের প্রত্যেক কোণে চাউল ছিটাইয়া দেয়। ভূতের ভয় ইহাদের মধ্যে অতিমাত্রায় বর্ত্তমান।

ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও যাদু

প্রচেষ্টায় ধর্ম্মকর্ম্মের উদ্ভব হয়। এই সমস্ত জাতি তাহাদের বৃদ্ধ ব্যক্তিদের পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে কুক্কুটাদি বলি প্রদান করে, এবং বিশেষ আরব্ধ কর্ম্মের সাফল্যের জন্য, রোগমুক্তি ও স্বাস্থ্যের জন্য, ও খাদ্যাদির স্বাচ্ছল্যের জন্য তাহাদের দেবতারূপে আশীর্ব্বাদ বা সহায়তা ভিক্ষা করে। অশুভ শক্তির প্রতিশোধের জন্য বনদেবতা বা বৃক্ষ-দেবতা, পাহাড়-দেবতা, জল-দেবতা প্রভৃতি নানা-প্রকার অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে ইহারা বিশ্বাস করে। এবং উহার উপর সমধিক নির্ভরশীল হয়।

স্যার ওয়াল্টার স্কট

স্যার ওয়াল্টার স্কটের নাম তোমরা জান। তিনি ইংরাজী-ভাষার একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও কবি ছিলেন। তাঁহার লিখিত সেই সুন্দর কবিতাটি

Breathes there the man
with soul so dead,
Who never to himself hath said,
"This is my own, my native land"
Whose heart hath ne'er
within him burn'd
As home his footsteps he hath turn'd
From wandering on a foreign strand?
—ইত্যাদি

কি সুন্দর কবিতাটি! যে স্কট একদিন সাহিত্য-জগতে অসাধারণ যশস্বী হইয়াছিলেন সেই স্যার ওয়াল্টার স্কট যখন আইনের শিক্ষানবিশী করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বাবা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন "আমার ছেলের আইনের দিকেও ঝোঁক নাই; ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকেও তত মন নাই, হয়ত এই ছেলের জীবন শুধু ভবঘুরে হয়ে কাটবে। আইন ব্যবসায়ের প্রতি পুত্রের অনুরাগের
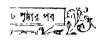
অভাব দেখিয়াই বোধ হয় স্যার ওয়াল্টার স্কটের বাবা এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি ত তখন ভাবিতে পারেন নাই স্কটের প্রতিভা কোন্ দিকে বিকশিত হইবে।

১৭৭১ খৃঃ অব্দে ১৫ই আগষ্ট স্কট এডিনবরাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাবার নামও ওয়াল্টার (Walter) ছিল। তাঁহার মাতা মার্গারেট ছিলেন একজন অধ্যাপকের কন্যা। ছেলেবেলায় স্কট রোগা ও লাজুক ছিলেন। দিনরাত পড়াশোনা করিতেই ভালবাসিতেন। গল্পের বই নাটক ও ইতিহাস তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। বাড়ীর লাই-ব্রেরীর ঘরের কোণে বসিয়া ধুলায় মলিন ইতিহাসের বইগুলি তিনি তন্ময় হইয়া পড়িতেন। স্কটের বাবা মা তাঁহার স্বাস্থ্যের দিকে খুব বেশী নজর দিতেন, যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না, কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, স্কট শৈশবে রুগ্ন ছিলেন। কিন্তু যৌবনে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল হয়। তখন তিনি নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চা করিতেন।

স্কট একটু বড় হইলে তাঁহার এক মেষপালক বন্ধু জুটিল। এই সঙ্গীর কাছে, তিনি স্কটল্যাণ্ডের প্রান্তদেশের নানা অদ্ভুত গল্প শুনিতে ভাল-

স্যার ওয়াল্টার স্কট

ওয়াল্টার স্কটের সমাধি

স্যার ওয়াল্টার স্কটের বাড়ী

বাসিতেন। তাঁহার এক আত্মীয়া মিস জ্যানেট স্কট (Miss Janet Scott) তাঁহাকে স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত বীর পুরুষগণের কাহিনী শুনাইতেন।

স্কট রোমাঞ্চকর গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। কোথায় কোন্ বীরপুরুষ অন্ধকারের মধ্য দিয়া পর্ব্বতের পথে চলিয়াছেন, কোথায় কোন্ রাজনন্দিনী হ্রদের জলের মধ্যে ক্ষুদ্র এক দ্বীপের অজানা পুরীতে বন্দিনী অবস্থায় আছেন, তাঁহার রাখাল-বন্ধুর কাছে, এই ধরণের গল্প শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনও অজানা রাজ্যে ছুটিয়া যাইত।

এক দুর্যোগের রাত্রিতে স্কটকে বাড়ী পাওয়া গেল না। বাড়ীর লোকেরা তাঁহাকে খুঁজিয়া হয়রান হইলেন; অবশেষে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, দুর্দ্দান্ত বালক একটা পাহাড়ের গুহায় বসিয়া আনন্দের সহিত প্রত্যেকটা বিদ্যুৎ চমকানির সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিয়া বলিতেছে—"Bonnie! Bonnie! Dae it again! Dae it again!"

অল্প বয়স হইতেই স্কটল্যাণ্ডের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং তিনি নানারূপ পুরাণো পুঁথি, গাথা প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেন। স্কট যখন এডিনবরা সহরে পড়িতে আসিলেন সে সময়ে দেশের রূপকথা সম্বন্ধে ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ কোন উৎসাহ ছিল না। স্কুলে পড়িবার সময়ই তিনি ফরাসী ভাষা শিখিয়াছিলেন। ফরাসী উপন্যাস তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। পনরো বৎসর বয়সে ইটালিয়ান ভাষা শিখিয়া তিনি দান্তের মহাকাব্য পড়িয়াছিলেন। স্কট স্কুলের ছুটীর সময় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া গ্রাম্যগাথা এবং নানাপ্রকার জনপ্রবাদ এবং উপাখ্যান সংগ্রহ করিতেন।

১৭৯২ খৃঃ অব্দে স্কট 'এডভোকেট' হইলেন তাঁহার আইনের দিকে কিন্তু মোটেই ঝোঁক ছিল না। এ বিষয়ে তাঁহার পিতার অভিমত প্রথমেই বলিয়াছি। কথিত আছে, তিনি পাঁচ বৎসরকাল ব্যারিষ্টারী করিয়া ১৪৪ পাউণ্ড ১০ শিলিং মাত্র পাইয়াছিলেন! যেটুকু অবসর পাইতেন, তিনি সাহিত্যসেবায় মন দিতেন। ১৭৯৯ সালে তিনি সেলকার্ক সহরের সেরিফ নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী The Lay of the Last Minstrel, Rob Roy, Rokeby, এই তিনখানি গ্রন্থে অমর হইয়া আছেন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে স্কট দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তাঁহার এই স্ত্রী দেখিতে খুব সুন্দরী ও বিবিধ সদগুণশালিনী ছিলেন।

স্কট ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ওয়েভার্লী উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি কোথায় রাখিয়াছিলেন তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ঐ উপন্যাসটি খুঁজিয়া পান ও প্রকাশিত করেন। কিন্তু উহাতে লেখকের নাম ছিল না। তথাপি সেই অজ্ঞাতনামা লেখকের লেখা পড়িয়া হাজার হাজার লোক মুগ্ধ হইল। স্কটের রচনার বিশেষত্ব এই যে তিনি তাঁহার জাতীয় চরিত্র এবং দেশের কথা, পুরুষ ও নারীর চরিত্র, এমন সুন্দর ভাবে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন যে আজ এতদিন পরে তাহা পড়িতে গেলে মনে হয়, সেইসব চরিত্রগুলি রক্তমাংসের শরীর লইয়া যেন আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্কট সর্ব্বশুদ্ধ ৩২ খানা উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি এমন নির্ভুল এবং ইহাতে ঐতিহাসিক তথ্যের সহিত নায়ক-নায়িকার চিত্রের এমন সামঞ্জস্য দেখানো হইয়াছে যে, পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। স্কট কোন ছোটখাট জিনিষ লইয়া লিখিতে পারিতেন না—তাঁহার চিত্রপট ছিল বড়। যখন তিনি কোন ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিতে বসিতেন তখন তিনি তাঁহার নিজের দেশের লোকদের, চরিত্রের বিশেষত্ব খুঁটিনাটিটুকু নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্কটের লেখা উপন্যাসের মধ্যে The Heart of Midlothian, Rob Roy, Ivanhoe, ও Kenilworth বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

The Heart of Midlothian ১৮১৮ সালে জুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই বইখানির মধ্যে অনেক চরিত্র আছে, তবে সেই সকল চরিত্রের মধ্যে জেনি ডিন্‌সএর চরিত্র অতি সুন্দর। আমরা তোমাদের কাছে এই উপন্যাসের

গল্পটি সংক্ষেপে বলিলাম। ১৮১৯ সালে তাঁহার Bride of Lammermoor, The Legend of Montrose ও প্রকাশিত হয়।

তোমাদের কাছে স্কটের Ivanhoe নামক উপন্যাস বোধ হয় সমধিক পরিচিত। স্কুল কলেজের পাঠ্য হিসাবে তোমরা অনেকেই হয়ত সে বইটি পড়িয়া থাকিবে। ইহাতে বর্ণিত রেবেকা, রোয়েনা, প্রভৃতি চরিত্রগুলি পাঠকের বিশেষ প্রিয়।

এই সকল বই ছাড়া স্কটের লিখিত— Monastery, The Pirate, St Ronan's well প্রভৃতি অনেক উপন্যাসই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন তাহা তোমরা বড় হইলে নিজেরাই পড়িতে পারিবে।

বৃদ্ধ বয়সে ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থের ক্ষতি হওয়াতে দুর্ভাবনায় ও পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সাহিত্যে তিনি অসাধারণ যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। ইউরোপের সর্বত্র তাঁহার নাম ও যশঃ প্রচারিত হইয়াছিল এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার নির্ম্মিত Abbotsford নামক গৃহে দূর-দেশান্তর হইতে বহু ব্যক্তির সমাগম হইত। স্কট যেমন গদ্য লিখিতে পারিতেন তেমনি কবিতা লিখিয়া ও তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ২১শে সেপ্টেম্বর স্কট পরলোক-গমন করেন। শত বিপদ আপদেও তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা ছিল। শত অভাব-অভিযোগের মধ্যেও তাঁহাকে কোনদিন কেহ বিমর্ষ হইতে দেখে নাই। তিনি অত্যন্ত ভদ্র এবং শিষ্টাচারসম্পন্ন ছিলেন। গ্রামের খোলা মাঠে বেড়াইতে এবং গ্রামের সাধারণ চাষীদের সহিত মিশিতে তিনি অত্যন্ত ভাল-বাসিতেন। তাঁহাদের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রার-কাহিনী তাঁহাকে আনন্দিত করিত। বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহার সৌজন্যে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিতেন। স্কট তাঁহার দাসদাসীর প্রতি প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিতেন। দেখা যায় যে বড় লেখকেরা বড় একটা ভাল মানুষ থাকেন না— কিন্তু স্কটের সম্বন্ধে একথা খাটে না—তিনি অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন। কোনও কোনও সমালোচকের মতে দান্তে, সেক্সপীয়ার, ডিকেন্সের মত স্কটের নামও সাহিত্যজগতে চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

হার্ট অব্ মিড্‌লোথিয়ান

[এক]

আগেকার দিনে ইংলণ্ডে প্রকাশ্য স্থানে, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রাণদণ্ড দিবার প্রথা ছিল। সেইজন্য সে সময়ে ইংলণ্ডের সমস্ত সহরেই একটি করিয়া মশান থাকিত আর হাজার হাজার লোক প্রাণদণ্ড দেখিবার জন্য সেখানে আসিয়া মিলিত হইত। এডিনবরায় গ্রাস মার্কেট ও (Grass Market) ছিল এই রকম একটি মশান। সেখানে একদিন জন পোরটিয়াস্ (John Porteous) নামে একজন নগররক্ষীদলের কাপ্তেনের ফাঁসী দেখিবার জন্য হাজার হাজার লোক আসিয়া মিলিত হইয়াছিল।

জন পোরটিয়াস্ লোকটির স্বভাব বেশ ভাল ছিল না এবং তাহার উপর সকলেরই একটা আক্রোশ ছিল। কিছুদিন আগে একজন জনপ্রিয় চোরের ফাঁসী উপলক্ষে মিলিত জনতার উপর সে অকারণে গুলি ছোঁড়ে, এই কারণে আজ তাহার ফাঁসী হইবার কথা ছিল। কাজেই ক্রুদ্ধ জনতা অধীর আগ্রহে জন পোরটিয়াসের মৃত্যু দেখিতে আসিয়াছিল। তাহারা তখন প্রতিশোধ লইবার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। সমস্তই যখন ঠিক জনতা নিঃশব্দ অধীরভাব সহিত ফাঁসীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে, এমনি সময় খবর আসিল পোরটিয়াসের ফাঁসী আরো ছয় সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখা হইবে।

এই সংবাদে ক্রুদ্ধ জনতা আরোও চঞ্চল হইয়া উঠিল তাহা বলাই বাহুল্য। সে-দিন রাত্রিতে এক ভীষণ কাণ্ড হইয়া গেল। উত্তেজিত জনতা টলবুথ কারাগারে যাঁকে সাধারণতঃ Heart of Midlothian **হার্ট অফ্ মিড্‌লোথিয়ান্** নামে অভিহিত করা হইত সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। পোরটিয়াসকে তারা কারাগার হইতে টানিয়া লইয়া আসিল এবং গ্রাস মার্কেট যেখানে কাপ্তেন পোরটিয়াসের জন্য অনেক হতভাগ্য নির্দ্দোষী প্রাণ

হারাইয়াছে বলিয়া জনতার বিশ্বাস সেখানে ফাঁসী-কাঠে ঝুলাইয়া দিল।

বাট্‌লার নামে একজন অল্প বয়সী যাজককে বিদ্রোহী দল জোর করিয়া পোরটিয়াসের শেষ কাজ করিবার জন্য তাহাদের সঙ্গে ধরিয়া আনিয়াছিল। বাট্‌লার নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া ক্রুদ্ধ জনতাকে শান্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পোরটিয়াসকে ক্রুদ্ধ জনতা তখন ফাঁসীকাঠে ঝুলাইয়া দিবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহাদের তখন সু-পরামর্শ দেওয়া বৃথা। জনতা যখন এই কার্যে ব্যস্ত, তখন বাটলার সুবিধা বুঝিয়া সেই ভয়াবহ স্থান হইতে পলায়ন করিল। সে বেচারা এত ভয় পাইয়াছিল যে কি করিলে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবে তাহাই সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। এই রুবেন বাটলারের মাতাপিতা ছিল না। সে শিশুকাল হইতেই বৃদ্ধা পিতামহীর নিকট মানুষ হইয়া আসিতেছিল। অবস্থা তাদের নিতান্তই খারাপ ছিল। কোন রকমে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আর জমিদার ডামবিড়াইকসের (Dumbiedikes) এর দেওয়া অল্প সামান্য একটু জমিতে চাষবাস করিয়া তাহাদের জীবিকা-নির্বাহ হইত।

বাট্‌লারদের প্রতিবাসী ছিলেন ডেভিড ডিন্‌স (David Deans) নামে একজন ধার্মিক বৃদ্ধ। তিনি অনেক সময় বাটলারদের অনেক বিষয় সাহায্য করিতেন।

ডেভিডের মেয়ে জেনির সঙ্গে বাটলার ছেলেবেলা হইতেই একসঙ্গে বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাদের দু'জনের মধ্যে খুব ভাব ছিল। রুবেন আর জেনি যখন খুব ছোট ছিল, তখন তারা একসঙ্গে মেষ চরাইত, তারপর আরো কিছু বড় হইয়া তাহারা একসঙ্গে স্কুলে পড়িতে যাইত। রুবেনের বুদ্ধি ছিল খুব তীক্ষ্ণ, সেই ছিল স্কুলের মধ্যে সব চেয়ে ভাল ছেলে, অন্যদিকে জেনি লেখাপড়ায় রুবেনের অনেক নীচে পড়িয়া থাকিত। কিন্তু তাহার নিটোল স্বাস্থ্য আর সুন্দর স্বভাব সেই অভাব পোষাইয়া লইয়াছিল।

রুবেন বড় হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে গেল। তাহার ইচ্ছা ছিল পাদ্রী হইবার। কাজেই সে, সে-বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতেই গিয়াছিল।

ইতিমধ্যে জেনির বাবা আর একবার বিবাহ করিলেন এবং তাহার আর একটি কন্যা জন্মিল। কিন্তু কিছুদিন পর তাঁহার এই স্ত্রীও প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন ডেভিড—তাহার পুরাতন বাসস্থান ত্যাগ করিয়া এডিনবরা হইতে আধ মাইল দূরে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি তখন গোয়ালার ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। জেনির অক্লান্ত পরিশ্রমে শীঘ্রই তাহাদের ব্যবসার বেশ উন্নতি হইল। ছোট বোন এফি, জেনির স্নেহাঞ্চলে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। মায়ের অভাব কি জেনির যত্নে তাহাকে তাহা একদিনও বুঝিতে হয় নাই। এফির মত সুন্দরী খুব অল্পই দেখা যাইত। কাজেই সে যখন বড় হইয়া উঠিল তখন তাহার সৌন্দর্যের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার নাম হইল Lily St. Leonard's অর্থাৎ কিনা, সেণ্ট লেওনার্ডের (যেখানে তারা থাকে সেই গ্রামের নাম) পদ্মফুল।

কিন্তু এফির অদৃষ্ট বিশেষ সুপ্রসন্ন ছিল না। নিজের শিশুপুত্রকে হত্যা-অপরাধে এফিকে একদিন কারাগারে যাইতে হইল। শান্তিপূর্ণ ডিন্‌স্ পরিবারে হঠাৎ একদিন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই ঘটনায় ডেভিড ডিন্‌স আর জেনি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। এফি যদিও হত্যা-অপরাধ অস্বীকার করিল কিন্তু সে শিশুর জন্মবৃত্তান্ত কাহারো নিকট বলে নাই, এই অপরাধে স্কটল্যাণ্ডের আইন অনুসারে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছিল। রুবেন বাট্‌লার এই সময়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল এবং জেনির সঙ্গে তাহার বিবাহ এক রকম স্থির ছিল। রুবেন অবস্থার একটু উন্নতি করিতে পারিলেই এই বিবাহ হইবে ইহাই একরকম স্থির ছিল। যাহাহো'ক এই ভীষণ দুর্ঘটনার সংবাদ জানিতে পারিয়া রুবেন জেনির পিতা ও জেনিকে দেখিবার জন্য একদিন সেণ্টলেওনার্ডে আসিল। তাহার মনের অবস্থা ও এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় ডেভিড ও জেনির অপেক্ষা কম ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। ক্লান্ত দেহে সে আসিয়া দরজায় ধাক্কা দিতেই,

জেনির মধুর কণ্ঠ তাহাকে ঘরে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিল এবং ঘরে ঢুকিয়া সে দেখিল বৃদ্ধ ডেভিড ডিন্‌স এককোণে চেয়ারে বহু ব্যবহৃত জীর্ণ বাইবেলটি হাতে করিয়া বসিয়া আছে বাটলারকে দেখিয়া সে মুখ ফিরাইল।

বাটলার বৃদ্ধের সেই শোকাহত মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না। বৃদ্ধের হাত দুটির মধ্যে মাথা লুকাইয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া উঠিল। ভগবান আপনাকে শান্তি

এফি ডিনস্ ও তাহার প্রণয়ী

দান করুন। ইহার বেশী আর কোন সান্ত্বনার কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

ডিনস্ উত্তর দিলেন—বন্ধু ভগবান নিশ্চয়ই তা করবেন। তিনি তো সকল সময়েই শোকে সান্ত্বনা দান করে থাকেন। আমি ঈশ্বরের দান বলে আমার এই দুঃখ যেন মেনে নিতে পারি, এই প্রার্থনাই করছি।

রুবেন আরো কিছুক্ষণ বৃদ্ধের কাছে বসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল। তারপর জেনির সঙ্গে গোপনে কয়েকটা কথা বলিবার জন্য গেল। রুবেন জেনিকে বলিল যে একজন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে পথে তাহার কথা হইয়াছে এবং এই ব্যক্তি জেনিকে তাহার সহিত চন্দ্রোদয়ের পর Muschat's Cairn দেখা করিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াছে। জেনি রুবেনের মুখে এই খবর শুনিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই আমি যাব।" রুবেন তখন জেনিকে জিজ্ঞাসা করিল সেই অপরিচিত ব্যক্তি কে এবং কেন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়, কিন্তু জেনি তাহাকে কিছুই বলিল না।

এমন সময় ডেভিড ডিনসের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া তারা দু'জনে বসিবার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। দেখা গেল যে জমিদার ডামবিডাইকের এফির জন্য একজন উকিল নিযুক্ত করিবার কথায় ডিনস এত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছেন। কেননা তাহার মতে উকীলরা স্বার্থপর ও কূটবুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নন্।

যাহা হউক অনেক তর্ক-বিতর্কের পর শোকাতুর ক্লান্ত বৃদ্ধ হতাশ হইয়া শয়ন করিতে গেলেন। আর স্থির হইল যে ডামবিডাইক নিজে এফির জন্য উকীল নিযুক্ত করিবে।

বাটলার তৎক্ষণাৎ টলবুথ কারাগারে এফির সহিত দেখা করিতে যাত্রা করিল, যাহাতে এফি তাহাকে সকলের নিকট যে সকল কথা গোপন করিয়াছে, তাহা বলে। "জেনি বিদায়,—আমি ফিরে আসবার আগে তুমি কোন দুঃসাহসিকতার কাজ কোরনা।"

এই কথা বলিয়া রুবেন বাটলার, হার্ট অফ মিডলোথিয়েনে আসিয়া পৌঁছিল।

কিন্তু বাটলার কারাগারে উপস্থিত হইবা মাত্র পোরটিয়াসের ফাঁসী দেবার ষড়যন্ত্রে বিদ্রোহী জনতার সহিত লিপ্ত ছিল বলিয়া কারাপ্রহরী তাহাকে ধরিয়া রাখিল।

রেটক্লিফ নামে একজন বন্দী বলিয়াছিল যে সে রবার্টসন নামে বিদ্রোহীদলের নেতাকে চিনিতে পারিয়াছে আর সে দেখিয়াছে রবার্টসন এই গোল-মালের মধ্যে এফিকে পালাইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়

যে এফির সন্তানের পিতা আর পোরটিয়াসের হত্যাকারী রবার্টসন একই ব্যক্তি। তারপর বাট্লারের কথা হইতে আরও জানা গেল যে জেনির সঙ্গে এক অপরিচিত ব্যক্তি চন্দ্রোদয়ের সময় দেখা করিবে বলিয়া কথা দিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া একদল সৈন্য তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে প্রেরিত হইল, কিন্তু বিপদের সন্ধান পাইয়া সৈন্যদের পৌছিবার পূর্ব্বেই সেই অপরিচিত ব্যক্তি পলাইয়া গেল। কিন্তু পলায়নের পূর্ব্বে সে জেনিকে বলিয়া গেল যে একমাত্র সেই এফির প্রাণ রক্ষা করিতে পারে।

[দুই]

কিছুদিন পরে রেটক্লিফ্ নামে যে বন্দী রবার্টসনকে চিনিতে পারিয়াছে বলিয়া বলিয়াছিল সে মুক্ত হইল এবং পুরস্কারস্বরূপ সেই কারাগারেই কারারক্ষক নিযুক্ত হইল।

রেটক্লিফ কারারক্ষক হইয়া যাহাতে জেনির সঙ্গে এফির সাক্ষাৎ হয় তাহার জন্য অনবরত চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটরা ইহাতে অস্বীকৃত হইলেন। তাহাদের ধারণা ছিল এমনি করিয়া তাহারা রবার্টসনের বিষয় জানিতে পারিবেন। কিন্তু তাহাদের এই ভাবে অনুসন্ধান ব্যর্থ হইল। জেনি বলিল যে রবার্টসন বলিয়া কাহাকেও আগে চিনিত না, সেদিন রাত্রিতে যে অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে তাহার কথা হইয়াছিল সে রবার্টসন কিনা তাহাও জানিতে পারে নাই। যদি হয়, তবে সেই রাত্রি ছাড়া আর কখন সে তাহাকে দেখে নাই। সে ব্যক্তি তাহাকে এফির সম্বন্ধে কিছু পরামর্শ দিতে আসিয়াছিল, ইহা ছাড়া সে আর কিছুই জানে না।

এফির নিকট হইতেও কোন কথাই বাহির করা গেল না।

তখন এফির সঙ্গে জেনির দেখা করিবার জন্য একটি দিন স্থির করা হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে এফির সঙ্গে জেনির সাক্ষাৎ হইল। দুই বোনের মিলনের সেই করুণ দৃশ্যে কঠোর হৃদয় কারাপ্রহরীর চোখ পর্য্যন্ত সজল হইয়া আসিল। তুমি কি হয়ে গিয়েছ! জেনি এফিকে বলিল—তোমাকে যে আর চেনাই যায় না। এর চাইতে দশগুণ খারাপ হলেই বা কি? জেনি কেন যে আমি হয়েই মারা যাইনি তা'হলে এত দুঃখ ভোগ করতে হ'ত না। এফি উত্তর দিল। রেটক্লিফ দূরে দাঁড়াইয়া মন দিয়া তাহাদের সব কথা শুনিতেছিল। কিন্তু তাহাকে লক্ষ্য না করিয়াই দুই বোনে আস্তে আস্তে কথা বলিতে লাগিল।

বড়বোন বলিল—এফি কেন তুমি আমার কাছে সব কথা গোপন করলে? আমি তো

কারাগৃহে—জেনি ও এফি ডিনস্

তোমাকে নিজের হাতে মানুষ করেছি,—একটা কথা বলিলেই—

এফি বলিল—তা যে হবার কোন উপায় নেই জেনি। আমি যে বাইবেল ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।

জেনি উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া উঠিল। তারপর একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিল—যদি তুমি আমাকে বলতে কি রকম অবস্থায় তোমার এরকম দশা হয়েছে, তা হ'লে নিশ্চয়ই তুমি মুক্তি পেতে।

এফি একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে এ কথা কে বলেছে?

"সবাই তো বলছে"।

রেটক্লিফ দূরে দাঁড়াইয়া দুই বোনের কথা মন দিয়া শুনিতেছিল সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—কেন তুমি বেচারীকে গোলমালে ফেলছ—তোমাকে নিশ্চয়ই রবার্টসন একথা বলেছে।

এফি উত্তেজিত ভাবে বলিল—জেনি সত্যই

কি তাই? সত্যই কি রবার্টসন তোমাকে একথা বলেছে। বেচারী জজ! আমাকে বাঁচাবার জন্য সে যখন নিজের প্রাণ ও বিপন্ন করে তুলছে আর আমি কিনা তখন তাকে মনে মনে হৃদয়হীন বলে অভিশাপ দিচ্ছি। জেনি সে তোমাকে কি বলেছে, তার প্রত্যেক কথাটি আমাকে বল। বল, বল সে কি হতভাগ্য এফির জন্য তোমার কাছে কোন রকম শোক প্রকাশ করেছে?

জেনি বলিল—তোমাকে সে কথা বলে লাভ কি? আগে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে পরে অন্যের প্রাণ বাঁচানোর জন্য কয়েকটা কথা বলতে ত সকলেই পারে।

তুমি ভুল বুঝেছ জেনি। আমি ত জানি তার নিজের জীবন কি রকম বিপন্ন। তাও সে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে—এই কথা বলিতে বলিতে রেটক্লিফের দিকে নজর পড়িতে এফি থামিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে এফি আবার জিজ্ঞাসা করিল - আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য তোমাকে সে কি করতে বলেছিল?

সে চেয়েছিল আমি যেন মিথ্যা বলে তোমাকে রক্ষা করি—জেনি উত্তর দিল।

তুমি তাকে কি উত্তর দিলে? এফি জিজ্ঞাসা করিল। তুমি নিশ্চয় বলেছ যে আমি ত আর কচি খুকীটি নই। আমার মৃত্যু আমি নিজে ডেকে আনলে তুমি কি করে বাধা দেবে? জেনি এফির কথায় আহত হইয়া বলিল—এফি তুমি আমাকে এরকম মনে কর? এফি বলিল—আমি জানি, জেনি, আমি রবার্টসনকে ভালবাসি বলে তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, রবার্টসন যদি তুমি হ'ও তাহলে—

হায়! এফি, সত্যি আমি তোমাকে আমার জীবন দিয়েও যদি রক্ষা করতে পারতাম!

কেন মুখে বলতে ত সবাই পারে। যদি একটা মুখের কথা আমাকে বাঁচাতে পারে, তাহলে সেই মিথ্যে কথা বলাটা কি খুব দোষের?

বল কি এফি? সে যে ভয়ানক পাপ!

জেনি, থাক, আর বলো না—ঢের হয়েছে। অনেকক্ষণ মিঃ রেটক্লিফকে আমরা দাঁড় করিয়ে রেখেছি। জেনি তুমি নিশ্চয় আর একবার আসবে বিচারের——

কেন এমনি করে কি আমরা বিদায় নেব? এফি ভাল করে ভেবে দেখ দেখি, তুমি আমাকে কি করতে বলছ? আমার বিবেক যে কিছুতেই এতে সায় দিচ্ছেনা।

এফি জবাব দিল—জেনি, তুমি ঠিক বলেছ। আমার মন এখন স্থির হয়েছে। আমি চাইনা কোন কীট-পতঙ্গ ও আমাকে মিথ্যা কথা বলে প্রাণ দান করে।

কিন্তু পরদিন বিচারের সময় এফিকে যখন জেনি দেখিতে পাইল, তখন দেখিল এফি কি রকম কাতরতার সহিত তাহার দিকে চাহিয়া আছে। দুই বোনে যদিও কোন কথা হইতে পারিল না তথাপি তাহার দুই চোখ জেনিকে যেন বার বার একান্ত অনুনয়ের সহিত বলিতে লাগিল বাঁচাও- আমাকে বাঁচাও।

জেনি নিরুপায় ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে বিচারপতির নিকট এই প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়াছে—একমাত্র সত্য—কোন কিছু না লুকাইয়া একমাত্র সত্য বলিতে হইবে। যে এ না করিবে তাহাকে শেষ বিচারের দিনে ঈশ্বরের নিকট ইহার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হইবে।

জেনি শৈশব হইতে ধর্ম্মের আবহাওয়ায় মানুষ হইয়াছে। এই প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া তাহার মনের সমস্ত প্রলোভন সে দূর করিয়া দিল। যদিও এফির উকীল তাহাকে মিথ্যা বলার জন্য যথেষ্ট সুযোগ দিল তথাপি মনের সমস্ত জোর দিয়া মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখে সে বলিল—হায়, এফি আমাকে একটি কথাও বলে নাই।

সমস্ত বিচার গৃহে করুণ আর্ত্তনাদ শোনা গেল। জেনির পিতা অজ্ঞান হইয়া সেখানেই পড়িয়া গেলেন। তাঁহার মনে গোপন আশা ছিল হয়ত এফি জেনির কাছে সব কথা বলিবে এবং তাহাতে এফির রক্ষার কোন উপায় হইবে। এখন এই শেষ আশায় হতাশ হইয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া লুটাইয়া পড়িলেন। এফি করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—হায় হায়, আমিই বাবাকে মারিলাম। আমাকে তোমরা বাবার কাছে নিয়ে যাও।

এমনকি বিচারপতির হৃদয়ও এই দৃশ্যে গলিয়া গেল। তিনি আদেশ দিলেন যেন জেনির ও তাঁহার পিতার ভালরূপে পরিচর্য্যা করা হয়। যতক্ষণ তাহাদের দেখা গেল এফি একদৃষ্টে সেদিকে তাকাইয়া রহিল। পরে যখন তাহাদের আর দেখা গেল না তখন নিজের মনে বলিয়া উঠিল— আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষার দিন আজ সমান। একমাত্র রাজা দয়া করে এফিকে ক্ষমা করতে পারেন।

সত্যই কি রাজা এফিকে ক্ষমা করতে পারেন?

ঠিক জানিনা—তবে তাঁর ইচ্ছা হ'লেই তিনি পারেন। দেখলে না রাজার ইচ্ছায় পোরটিয়াসের ফাঁসীর হুকুম কি রকম ছয় সপ্তাহের জন্য বন্ধ হ'বার কথা ছিল।

বিচারালয়—এফির বিচার হইতেছে

গেল। এখন ভগবান যা আমাকে নিয়ে করবেন আমি তাই মাথা পেতে নেব।

[তিন]

ডেভিড ডিনস্ আর জেনিকে কাছেই তাদের এক আত্মীয়ের বাড়ী লইয়া যাওয়া হইল। ডেভিডের যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন দুর্ব্বলতার দরুন কোন কথাই সে বলিতে পারিতেছিল না। জেনি তাহার আত্মীয়া মিসেস স্যাডলট্রিকে জিজ্ঞাসা করিল সবই কি ফুরিয়ে গেল? কোন উপায়েই কি আর এফিকে রক্ষা করা যায় না। মিসেস স্যাড্‌লট্রি বলিলেন—একরকম ত তাই—আর একটি মাত্র যে উপায় আছে তা না থাকারই

জেনি, পোরটিয়াসের নামোল্লেখে হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল। 'হাঁ, ঠিক হয়েছে। মিসেস স্যাড্‌লট্রি, আচ্ছা এখনকার মত বিদায়! আমার অনেক কাজ করবার আছে।

জেনি মিসেস্ স্যাড্‌লট্রিকে আর কিছু বলিবার অবসর না দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মিসেস স্যাডেলট্রী জেনির ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন মেয়েটার হইল কি!

এফি তাহার কারাগৃহে নির্জ্জনে হতভম্বের ন্যায় বসিয়াছিল এমন সময় জেনি আসিয়া তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল।

এফি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—এ আবার কি

জেনি? আমাকে মেরে ফেলে এখন আবার আমাকে আদর করতে এসেছ? তোমার মুখের একটা কথায়ই ত আমার প্রাণ রক্ষা হতো।

জেনি খুব জোর গলায় উত্তর দিল। এফি তুমি কিছুতেই মরবে না। আমি রাজার কাছে লণ্ডনে যাচ্ছি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে। রাজা নিশ্চয়ই তোমাকে দয়া করবেন। কিন্তু তোমার প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে তুমি মন খারাপ করে নিজের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

এই রকম কথাবার্তার পর জেনি অল্পক্ষণ পরেই এফির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। কারা-রক্ষক রেটক্লিফ জেনির সঙ্কল্পে আশ্চর্য্য এবং দ্রবীভূত হইয়াছিল। সে জেনিকে উপদেশ দিল যে ডিউক অফ আর্গাইলের (Duke of Argyle) সঙ্গে প্রথম দেখা করিয়া পরে যেন সে রাজার নিকট যায়। ইহা ব্যতীত সে একখণ্ড কাগজে কয়েকটা কথা লিখিয়া জেনির হাতে দিয়া বলিল যদি সে পথে কোন চোর-ডাকাতের হাতে পড়ে তবে যেন এই কাগজখানা দেখায়। তাহা হইলে তাহার আর কোন ভয় থাকিবে না।

জেনি বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তারপর জমিদার ডামবিডাইকের কাছ হইতে টাকা ধার করিয়া এক মুহুর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া লণ্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা হইল। পথে সে রুবেন বাটলারের সঙ্গে দেখা করিতে গেল। রুবেনের তখন ভয়ানক অসুখ করিয়াছে। তাও জেনির একা লণ্ডনে যাইবার কথা শুনিয়া তাহাকে বাধা দিতে সে যথেষ্ট চেষ্টা করিল এবং বলিল যে জেনিকে এখনই সে বিবাহ করিবে এবং তাহা হইলে জেনিকে আর একা লণ্ডনে যাইতে হইবে না। জেনি উত্তর দিল যে রুবেনের এই রকম অসুখ অবস্থায় বিবাহ হওয়া অসম্ভব এবং তাহার ও এক মুহুর্ত্ত দেরী করিবার সময় নাই।

রুবেন তখন জেনিকে নাছোরবান্দা দেখিয়া অগত্যা যাইতে অনুমতি দিল। সে জেনিকে কয়েকখণ্ড দলিল পত্র দিয়া বলিল যে ডিউক অফ আরগাইলকে ইহা দেখাইলে তিনি নিশ্চয় জেনিকে সাহায্য করিবেন। রুবেনের পিতামহ ডিউক অফ আরগাইলের পরিবারের জন্য এক সময় যথেষ্ট করিয়াছিলেন সুতরাং তাহার পরিবর্ত্তে তিনি নিশ্চয়ই বাটলার এবং বাটলারদের আত্মীয় বন্ধুদের সাহায্য করিবেন।

জেনি তখন বার বার বাটলারকে এফি আর ডেভিড ডিনের খোঁজ খবর লইতে বলিয়া লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিল।

হাসিমুখে পথশ্রম সহ্য করিয়া দিনে কুড়ি মাইল বা তাহারও বেশী হাটিয়া জেনি স্কটল্যাণ্ডের দক্ষিণ ভাগে আসিয়া পৌছিল। পথে সে একবার ডাকাতের পাল্লায় পড়িয়াছিল এবং তখন রেটক্লিফের কাগজের টুকরাটা কাজে লাগিয়াছিল। যাহা হউক বহু কষ্টে সেখান হইতে পালাইয়া অবশেষে সে লণ্ডনে পৌছিল।

শীঘ্রই ডিউক অফ আরগাইলের সহিত তাহার সাক্ষাৎ লাভ হইল।

ডিউক অফ আরগাইল যখন সাদাসিধা স্কট-ল্যাণ্ডের পোষাকপরিহিতা জেনিকে দেখিলেন তখন তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। বিশেষ যখন বাটলারের দেওয়া কাগজগুলি পড়িলেন তখন জেনিকে সাহায্য করিতে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন। তিনি স্বয়ং সঙ্গে করিয়া জেনিকে রাণীর নিকট লইয়া গেলেন।

রাণী জেনির হতভম্ব ভাব, গ্রাম্য সুরের কথা-বার্ত্তা শুনিয়া হাসিলেন কিন্তু দয়াদ্র চিত্তে জেনির কথা শুনিলেন। 'রাজা যদিও তোমার বোনকে ক্ষমা করেন, তাহা হইলেও তোমার দেশবাসীরা তোমার বোনকে নিশ্চয়ই ফাঁসী কাঠে ঝুলাইবে। তোমার দেশবাসীদের ত সেই গুণ আছে।

রাণী এত শীঘ্র জন পোরটিয়াসের ব্যাপার ভুলিয়া যান নাই। তাঁহার ধারণা সমস্ত এডিনবরার অধিবাসীরাই ষড়যন্ত্র করিয়া পোরটিয়াসের হত্যা-কারীদের লুকাইয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু জেনি এত কাতরভাবে রাণীর দয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল।

তিনি রাজাকে এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুরোধ করিবেন বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কয়েকদিন পর ডিউক অফ আরগাইল জেনিকে জানাইলেন যে এফিকে ক্ষমা করা হইয়াছে তবে

এই সর্ত্তে যে চৌদ্দ বৎসর সে স্কটল্যাণ্ডে আসিতে পারিবে না।

এফির এই চৌদ্দ বৎসর নির্ব্বাসন-দণ্ডে জেনির কোমল-হৃদয় ব্যথিত হইল, সে কাঁদিতে লাগিল।

[চার]

জেনি আবার বাড়ী ফিরিয়া চলিল। এবার আর হাঁটিয়া নহে, ডিউক অফ আরগাইল স্বয়ং তাহার পৌছাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গাড়ীতেই জেনি ফিরিয়া চলিল।

আইল অফ রোজনিথে পৌঁছিতেই অপ্রত্যাশিত-ভাবে পিতাকে দেখিতে পাইয়া সে অবাক হইয়া গেল। সে দেখিতে পাইল ডেভিড ডিনস্ তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পোষাকটি পরিয়া, তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

জেনি—জেনি—আমার সোনার মেয়ে। লক্ষ্মী মেয়ে! স্বয়ং ঈশ্বর তোমার পিতা। আমি তোমার পিতা হইবার যোগ্য নই। একমাত্র তুমিই আমার বংশের মর্য্যাদা ফিরিয়ে আনতে পারলে। এই কথাগুলি বলিতে বলিতে চির গম্ভীর ডেভিড-ডিনসের চোখ সজল হইয়া আসিল।

বাবা, এফি? এফির খবর কি? জেনি ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল।

ডেভিড গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, 'বাছা তুমি আর কোন দিন তাকে দেখ্‌তে পাবে না।

তবে কি এফি আর নেই! তবে কি আমার সব কাজই ব্যর্থ হল! জেনি দারুণ বেদনায় দুই হাত মুচড়াইতে লাগিল।

না, বাছা সে মরে নাই—সে পার্থিব সাজা থেকে মুক্ত ও হয়েছে কিন্তু সে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। তার বুড়ো বাবা, যে, তার জন্য কেঁদে কেঁদে চোখ ভাসিয়েছে, সারা রাতদিন তার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেছে, মায়ের চেয়েও অধিক স্নেহে বড় করে তুলেছে তাঁকে একা ফেলে সে পালিয়ে চলে গিয়েছে।

সেই লোকটার সঙ্গে, যাঁর জন্য এত কাণ্ড হ'ল? জেনি জিজ্ঞাসা করিল।

হাঁ, কিন্তু জেনি আর কখনোই আমরা সেই অকৃতজ্ঞ সন্তানের নাম করব না।

জেনির জন্য আরো বিস্ময়কর বস্তু সঞ্চিত ছিল। সে দেখিতে পাইল রুবেন বাটলার ও তাঁহার সহিত দেখা করিতে আইল অফ রোজনিথে (Isle of Roseneath) আসিয়াছে।

ডিউক অফ আরগাইল তাহাকে রোজনিথের নকটারলিটি গীর্জ্জায় পাদ্রী নিযুক্ত করিয়াছেন।

এতদিন পরে রুবেন ও জেনির বিবাহের আর কোনই বাধা রহিল না। শীঘ্রই এক সুন্দর প্রভাতে তাহাদের উভয়ের মিলন হইল।

এফি রবার্টসনকে বিবাহ করিয়াছিল। রবার্টসনের নাম কিন্তু আসলে রবার্টসন ছিল না। সে বেশ বড় বংশের ছেলে ছিল এবং নাম ছিল স্টনটন্। (Stanton)।

অনেক দিন পরে যখন রাজবিদ্রোহ হইতে মুক্ত হইয়া সে স্যর জর্জ্জ স্টনটন হইয়াছিল, তখন দু'বোনের মধ্যে প্রায়ই ভাবের আদান-প্রদান চলিত।

ডেভিড ডিনস্ মারা যাইবার কিছু পরে লেডি স্টনটন অর্থাৎ এফি কয়েকদিনের জন্য বোনের সঙ্গে আসিয়া থাকিয়া গিয়াছিল।

লেডি স্টনটনের সৌন্দর্য্যের এবং বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার আর কোন ছেলেমেয়ে হয় নাই। তাহার সেই প্রথম সন্তান যাহাকে হত্যা করিবার অপরাধে সে ধৃত হইয়াছিল, তাহাকে জিপসীরা ধরিয়া নিয়া গিয়াছিল। তাহার আর কোন সন্ধানই মিলে নাই।

জেনি আর রুবেন সুখে শান্তিতে বহুদিন কাটাইয়া সকলের নিকট আদর এবং সম্মান ভোগ করিয়া অবশেষে একদিন প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। এখনো তাহাদের কথা সেখানকার কেহ ভুলিতে পারে নাই।

হার্ট অব্ মিডলোথিয়ান উপন্যাস খানির মধ্যে জেনি ডিনের চরিত্রটি অতি সুন্দর। অনেকের মতে এই চরিত্রটি স্কট একটি সত্য ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। হার্ট অব্ মিডলোথিয়ান বইখানা নাট্যাকারে রূপান্তরিত হইয়া বহুবার অভিনীত হইয়াছে।

বুনন্-বৈচিত্র্য

জোড়া ফণী

২২৯৪ পৃষ্ঠার পর

১২ ঘর হিসাবে ঘর লইতে হয়, সর্ব্বশেষে ৪ ঘর বেশী।

১ম সারি—* ৪ সোজা, ১ উলটা, ৬ সোজা, ১ উলটা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ৪ সোজা।

২য় সারি—* ৪ উলটা, ১ সোজা, ৬ উল্টা, সোজা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ৭ উল্টা।

জোড়া ফণী

৩য় সারি— প্রথম সারির মত।

৪র্থ সারি— দ্বিতীয় সারির মত।

৫ম সারি— প্রথম সারির মত।

৬ষ্ঠ সারি— দ্বিতীয় সারির মত।

৭ম সারি—* ৪ সোজা, ১ উল্টা, এইবার অপর একটি কাঁটায় বাঁ কাটা হইতে ৩ ঘর না বুনিয়া তাহাতে তুলিয়া লও এবং ঐ বাড়তি কাঁটাকে বোনার সামনের দিকে রাখ, ৩ সোজা, এখন বাড়তি কাটায় তোলা ঘর তিনটিকে বাঁ হাতের কাঁটায় পরাইয়া লও এবং ঐ ৩ ঘরকেও সোজা বোন, ১ উল্টা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ৪ সোজা।

৮ম সারি—* ৪ উলটা, ১ সোজা, ৬ উল্টা, ১ সোজা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ৪ উলটা।

ইহার পর আবার প্রথম সারি হইতে বোনা হইবে।

জাল ফাঁস

৩ ঘর হিসাবে ঘর লইতে হয়।

দ্রষ্টব্য—এই নমুনা পোষাকের উল্টাপিঠ হইতে প্রথম আরম্ভ করিতে হয়।

১ম সারি—সব সোজা।

২য় সারি—১ সোজা, * সামনে সুতা, ২ ঘর না বুনিয়া বাঁ হাতের কাটা হইতে ডান হাতের কাঁটায় তুলিয়া লও কাঠির পিছনের দিকের সুতা লইয়া, ১ সোজা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষের ২ ঘর সোজা।

৩য় সারি—২ সোজা, * ৩ সোজা, গতবারের

সাম্‌নে সুতা লওয়ার দরুন যে সুতা বাঁ হাতের কাঠির উপর আছে তাহাকে ফেলিয়া দাও *

জাল ফাঁস

পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ১ সোজা। ইহার পর আবার দ্বিতীয় সারি হইতে বোনা হইবে।

তেরছা জাল

৮ ঘর হিসাবে ঘর লইতে হয়, সর্ব্বশেষে ১ ঘর বেশী।

১ম সারি—*৭ সোজা, ১ জোড়া, সাম্‌নে সুতা, ১ জোড়া, সাম্‌নে সুতা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ১ সোজা।

২য় সারি—১ সোজা, * ৩ উল্‌টা, ৫ সোজা, * পুনরাবৃত্তি কর।

৩য় সারি—৩ সোজা, ১ জোড়া, সাম্‌নে সুতা, ১ জোড়া, সাম্‌নে সুতা, * ৪ সোজা, ১ জোড়া, সাম্‌নে সুতা, ১ জোড়া, সাম্‌নে সুতা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ২ সোজা।

৪র্থ সারি—২ সোজা, * ৩ উলটা, ৫ সোজা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ৩ উল্‌টা, ৪ সোজা।

৫ম সারি—২ সোজা, ১ জোড়া, সামনে সুতা, ১ জোড়া, সামনে সুতা, * ৪ সোজা, ১ জোড়া, সামনে সুতা, ১ জোড়া, সামনে সুতা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ৩ সোজা।

৬ষ্ঠ সারি—৩ সোজা, * ৩ উলটা, ৫ সোজা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ৩ উলটা ৩ সোজা।

৭ম সারি—১ সোজা, ১ জোড়া, সাম্‌নে সুতা, ১ জোড়া, সাম্‌নে সুতা, * ৪ সোজা, ১ জোড়া, সাম্‌নে সুতা, ১ জোড়া, সাম্‌নে সুতা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ৪ সোজা।

৮ম সারি—৪ সোজা, * ৩ উল্‌টা, ৫ সোজা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ৩ উল্‌টা, ২ সোজা।

৯ম সারি—(১ জোড়া, সামনে সুতা,) ২ বার, * ৪ সোজা, ১ জোড়া, সামনে সুতা, ১ জোড়া, সাম্‌নে সুতা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ৫ সোজা।

১০ম সারি—* ৫ সোজা, ৩ উলটা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ১ সোজা।

১১শ—১ সোজা, ১ জোড়া, সাম্‌নে সুতা, * ৪ সোজা, (১ জোড়া সাম্‌নে সুতা,) ২ বার * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ৬ সোজা।

১২শ সারি—৬ সোজা, * ৩ উল্‌টা ৫ সোজা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ৩ উলটা।

১৩শ সারি—১ জোড়া, সাম্‌নে সুতা, * ৪ সোজা, (১ জোড়া, সাম্‌নে সুতা,) ২ বার * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ৪ সোজা, ১ জোড়া, সাম্‌নে সুতা, ১ সোজা।

১৪শ সারি—২ উলটা, * ৫ সোজা ৩ উল্‌টা * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ৫ সোজা, ২ উলটা।

১৫শ সারি—৫ সোজা, (১ জোড়া, সাম্‌নে সুতা,) ২ বার * ৪ সোজা, (১ জোড়া, সাম্‌নে সুতা,) ২ বার, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ৪ সোজা, ১ জোড়া, সামনে সুতা, ২ সোজা।

১৬শ সারি—* ৩ উল্‌টা, ৫ সোজা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ১ সোজা। ইহার পর আবার প্রথম সারি হইতে বোনা হইবে।

তেরছা জাল

তাবিজ

৮ ঘর হিসাবে ঘর লইতে হয়, সর্ব্বশেষে ২ ঘর, বেশী।

১ম সারি—১ সোজা, * ১ সোজা, সামনে সূতা, ১ জোড়া, ৩ সোজা, ১ জোড়া, সামনে সূতা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ১ সোজা।

২য় সারি সব উলটা। প্রতি একান্তর সারিই উল্‌টা বোনা হইবে।

৩য় সারি—১ সোজা, * ২ সোজা, সামনে সূতা, ১ জোড়া, ১ সোজা, ১ জোড়া, সামনে সূতা, ১ সোজা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ১ সোজা।

৫ম সারি—১ সোজা, * ৩ সোজা, সামনে সূতা, ১ তোলা, ১ জোড়া, তোলা ঘর জোড়া ঘরের উপর দিয়া ফেলিয়া দাও, সাম্‌নে সূতা, ২ সোজা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ১ সোজা।

৬ষ্ঠ সারি—সব উলটা।

তাবিজ

ইহার পর আবার প্রথম সারি হইতে বোনা হইবে।

মাছি

৪ ঘর হিসাবে ঘর লইতে হয়।

দ্রষ্টব্য—এই নমুনা পোষাকের উল্টা পিঠ হইতে প্রথম আরম্ভ করিতে হয়।

১ম সারি— * ৩ঘর একসঙ্গে উল্‌টা-জোড়া, ১ সোজা এইঘর কাঁটা হইতে না ফেলিয়া ঐ ঘরেই আবার সাম্‌নে সূতা, ১ সোজা, বুনিয়া লও, * পুনরাবৃত্তি কর।

২য় সারি—সব উল্‌টা। প্রতি একান্তর সারিই উল্‌টা বোনা হইবে।

৩য় সারি— * ১ সোজা এই ঘর কাঁটা হইতে না ফেলিয়া ঐ ঘরেই আবার সাম্‌নে সূতা, এক সোজা বুনিয়া লও, ৩ ঘর একসঙ্গে উল্‌টা-জোড়া, * পুনরাবৃত্তি কর।

৪র্থ সারি—সব উলটা।

মাছি

ইহার পর আবার প্রথম সারি হইতে বোনা হইবে।

পাণিশঙ্খ

১৪ ঘর হিসাবে ঘর লইতে হয়, সর্ব্বশেষে ৪ ঘর বেশী।

১ম সারি—১ সোজা * ১ সোজা, সামনে সূতা, ২ সোজা, ৩ উলটা, ৩ ঘর একসঙ্গে উলটা-জোড়া, ৩ উলটা, ২ সোজা, সাম্‌নে সূতা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ৩ সোজা।

২য় সারি—১ সোজা, * ৪ উল্‌টা, ৭ সোজা, ৩ উল্‌টা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ১ উল্‌টা, ২ সোজা।

৩য় সারি—১ সোজা, * ২ সোজা, সাম্‌নে সূতা, ২ সোজা, ২ উলটা, ৩ ঘর একসঙ্গে উলটা-জোড়া, ২ উল্‌টা, ২ সোজা, সাম্‌নে সূতা, ১ সোজা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ৩ সোজা।

৪র্থ সারি—১ সোজা, * ৫ উল্‌টা, ৫ সোজা, ৪ উল্‌টা * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ১ উল্‌টা ২ সোজা।

৫ম সারি—১ সোজা, * ৩ সোজা, সাম্‌নে সূতা, ২ সোজা, ১ উল্‌টা, ৩ ঘর একসঙ্গে উল্‌টা-জোড়া, ১ উল্‌টা, ২ সোজা, সাম্‌নে সূতা, ২ সোজা * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ৩ সোজা।

৬ষ্ঠ সারি—১ সোজা, * ৬ উল্‌টা, ৩ সোজা, ৫ উল্‌টা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে—১ উল্‌টা, ২ সোজা।

৭ম সারি—১ সোজা, * ৪ সোজা, সাম্‌নে সূতা, ২ সোজা, ৩ ঘর একসঙ্গে উল্‌টা-জোড়া, ২ সোজা,

পাণিশঙ্খ

সাম্‌নে সূতা, ৩ সোজা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ৩ সোজা।

৮ম সারি—১ সোজা, * ৭ উল্‌টা, ১ সোজা, ৬ উল্‌টা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে—১ উল্‌টা, ২ সোজা।

৯ম সারি—১ সোজা, ১ উল্‌টা-জোড়া, * ৩ উল্‌টা, ২ সোজা, (সাম্‌নে সূতা, ১ সোজা,) ২বার, ১ সোজা, ৩ উল্‌টা, ৩ ঘর একসঙ্গে উল্‌টা-জোড়া, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে—১ উল্‌টা-জোড়া, ২ সোজা।

১০ম সারি—১ সোজা, * ৪ সোজা, ৭ উল্‌টা, ৩ সোজা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে—৩ সোজা।

১১শ সারি—১ সোজা, ১ উল্‌টা-জোড়া, * ২ উল্‌টা, ২ সোজা, সাম্‌নে সূতা, ৩ সোজা, সাম্‌নে সূতা, ২ সোজা, ২ উল্‌টা, ৩ ঘর একসঙ্গে উল্‌টা-জোড়া, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে—১ উল্‌টা-জোড়া, ২ সোজা।

১২শ সারি—১ সোজা, * ৩ সোজা, ৯ উল্‌টা, ২ সোজা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষ—৩ সোজা।

১৩শ সারি—১ সোজা, ১ উল্‌টা-জোড়া, * ১ উল্‌টা, ২ সোজা, সাম্‌নে সূতা, ৫ সোজা, সাম্‌নে সূতা, ২ সোজা, ১ উল্‌টা, ৩ ঘর একসঙ্গে উল্‌টা-জোড়া, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ১ উল্‌টা-জোড়া, ২ সোজা।

১৪শ সারি—১ সোজা, * ২ সোজা, ১১ উল্‌টা, ১ সোজা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ৩ সোজা।

১৫শ সারি—১ সোজা, ১ উল্‌টা-জোড়া, * ২ সোজা, সাম্‌নে সূতা, ৭ সোজা, সাম্‌নে সূতা, ২ সোজা, ৩ ঘর একসঙ্গে উল্‌টা-জোড়া, *পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ১ উল্‌টা-জোড়া, ২ সোজা।

১৬শ সারি—১ সোজা, * ১ সোজা, ১৩ উল্‌টা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ৩ সোজা। ইহার পর আবার প্রথম সারি হইতে বোনা হইবে।

গমের শিষ্

৭ ঘর হিসাবে ঘর লইতে হয়, সর্ব্বশেষে ৮ ঘর বেশী।

১ম সারি—১ সোজা, * ২ উল্‌টা, ১ জোড়া, সাম্‌নে সূতা, ১ সোজা, সাম্‌নে সূতা, ১ তোলা, ১ সোজা, তোলা ঘর ফেলিয়া দাও * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে—২ উল্‌টা, ১ সোজা।

২য় সারি—১ সোজা, * ২ সোজা, ৫ উল্‌টা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে—৩ সোজা।

৩য় সারি—১ সোজা, * ২ উল্‌টা, ৫ সোজা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ২ উল্‌টা, ১ সোজা।

গমের শিষ্

৪র্থ সারি—১ সোজা, * ২ সোজা, ৫ উল্‌টা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ৩ সোজা। ইহার পর আবার প্রথম সারি হইতে বোনা হইবে।

মাফ্‌লার

মাপ—চওড়া ৭" ইঞ্চি, লম্বা ইচ্ছানুযায়ী।

প্রয়োজনীয় জিনিস—৩ তারের ক্রীম রঙের

উল ৮ আউন্স, ৩ তারের চকোলেট রঙের উল ২ আউন্স, ১০ নম্বরের কাঁটা ১ জোড়া।

প্রথমে ক্রীম রঙের উলে ১২০ ঘর তুলিয়া লও।

১ম সারি—সমস্ত সোজা।

২য় সারি—* ১ সোজা, সামনে সুতা, ১ তোলা, পিছনে সুতা, * পুনরাবৃত্তি কর।

৩য় সারি—দ্বিতীয় সারির মত।

শেষের দুই সারির মত ৫" ইঞ্চি মাপে বোন।

তারপর ক্রীম রঙের উল ছিঁড়িয়া চকোলেট রঙের উল যোগ কর, এবং ঐ নমুনাতেই ১০ কাঠি বোন।

আবার চকোলেট উল ছিঁড়িয়া, ক্রীম উল যোগ করিয়া ১০ কাঠি বোন।

তাহার পর ক্রীম উল ছিঁড়িয়া, চকোলেট উল যোগ করিয়া ২০ কাঠি বোন।

আবার চকোলেট রঙের উল ছিঁড়িয়া, ক্রীম রঙের উল যোগ করিয়া ১০ কাঠি বোন।

তাহার পর ক্রীম রঙের উল ছিঁড়িয়া চকোলেট রঙের উল যোগ করিয়া ১০ কাঠি বোন।

এই পর্য্যন্ত বুনিলে বর্ডার বোনা শেষ হইল।

এইবার চকোলেট রঙের উল ছিঁড়িয়া, ক্রীম রঙের উল যোগ করিয়া, অপর দিকের বর্ডার হইতে শেষ পর্য্যন্ত বাদে যতটা লম্বা করিবার ইচ্ছা, ততটা ক্রীম রঙে বুনিয়া যাও। এই বোনা শেষ হইলে আগে যেরূপ ভাবে বর্ডারের বুনন দেওয়া আছে, তাহা বুনিয়া শেষ কর। যেমন—চকোলেট রঙে ১০ কাঠি, ক্রীম রঙের ১০ কাঠি, চকোলেট রঙে ২০ কাঠি, ক্রীম রঙে ১০ কাঠি, চকোলেট রঙে ১০ কাঠি।

এইবার ক্রীম উল যোগ করিয়া প্রথমের মত ৫" ইঞ্চি বুনিতে হইবে।

সর্ব্বশেষের সারি * ১ জোড়া * পুনরাবৃত্তি কর। এই ভাবেই শেষ করিতে হইবে। তাহার পর ঘর বন্ধ করিয়া দাও।

এইবার ক্রীম ও চকোলেট রঙের উল মিশাইয়া মাফ্লারের দুইদিকে দৃষ্টি সুন্দর করিবার জন্য ঝালর তৈয়ারী করিতে হইবে। তাহা এইরূপে—

২ তার ক্রীম ও ২ তার চকোলেট উল, ৬" ইঞ্চি মাপে কাটিয়া লও। এইবার ঐ তার গুলিকে সমান করিয়া, তাহাদের মাঝামাঝি জায়গায় মাথার সরু লোহার কাঁটার মধ্যে পরাইয়া মাফ্লারের (ঘর তোলার বা বন্ধ করার) ধারে ঢুকাইয়া বাহির করিয়া লও। তাহার পর এই অর্দ্ধেক করা উলের মধ্যে যে টানা হইল তাহার মধ্যে দিয়া অন্যদিক ঢুকাইয়া ফাঁস টানিয়া দাও। এইরূপ ভাবে খুব কাছাকাছি উল পরাইয়া যাও। ঝালর বাঁধা শেষ হইলে ধার ঠিক করিবার জন্য সমান করিয়া কাঁচি দিয়া ছাঁটিয়া ফেল।

বোনা শেষ হইলে, মাফ্লারের উপর ভিজা

মফলার

কাপড় রাখিয়া গরম ইস্ত্রির চাপ দিলেই কার্য্য শেষ হইল।

ভেষ্ট

১ বৎসরের শিশুর উপযোগী—

প্রয়োজনীয় জিনিস—৩ তারের নরম উল ৩ আউন্স, ৯ নম্বরের কাঁটা ১ জোড়া, ১ গজ সরু রিবন, হাড়ের ক্রুস একটি।

প্রথমে পিছনের জন্য ৭০ ঘর তুলিয়া লও।

১ম সারি—* ২ সোজা, ২ উল্টা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ২ সোজা।

২য় সারি—* ২ উলটা, ২ সোজা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ২ উলটা।

এই দুই সারির 'বন্ধনীর' বুনন পর পর ১৮ সারি বুনিয়া লও। তাহার পর সব সোজা এই 'গোট' বুনন বুনিয়া যাও যতক্ষণ ঐ বুননের মাপ ৯॥ ইঞ্চি পুরা না হয়। তাহার পর গলার জন্য ঘর ভাগ কর। এইভাবে—

১ম সারি—১৮ সোজা, ৩৪ ঘর বন্ধ, ১৮ ঘর সোজা। শেষে ১৮ ঘরের উপর ৩ ইঞ্চি মাপ মত 'গোট' বুনন দিয়া উল ছিঁড়িয়া ফেল। এইবার ওপাশে যে ১৮ ঘর ছাড়া আছে তাহাতে গলার দিক হইতে উল যোগ কর এবং এপাশেও ৩ ইঞ্চি মাপে 'গোট' বুনন দিয়া লও। তাহার পর গলার দিকে আসিয়া যেন বোনা শেষ হয় এইভাবে ১ সারি বুনিয়া লও। এইবার ঐ কাঁটাতেই ৩৪ ঘর তুলিয়া লও, ওপাশের ১৮ ঘরকেও এই কাঠিতে বুনিয়া লও। এখন কাঠিতে আবার ৭০ ঘর ঘর পুরা হইল। এইবার ৯॥ ইঞ্চি মাপে গোট বুনন দিয়া যাও। তাহার পর ১৮ সারি 'বন্ধনীর' বুনন দিয়া বেশ ঢিলা ভাবে সমস্ত ঘর বন্ধ করিয়া দাও।

হাতা

এখন বোনা জিনিসটি আধাআধি ভাবে ভাঁজ করিয়া লও। কাঁধ হইতে দুই পাশেই ৪ ইঞ্চি

ভেষ্ট

করিয়া (মোট ৮ ইঞ্চি) জায়গার মধ্যে ৪০টি ঘর বুনিয়া তুলিয়া লও। এইবার ঐ ঘরগুলির উপর ১২ সারি 'বন্ধনীর' * ২ সোজা, ২ উল্টা * বুনন দিয়া বেশ ঢিলা ভাবে ঘর বন্ধ করিয়া দাও। অপর হাতাটিও ঠিক এই নিয়মে ঘর তুলিয়া বুনিয়া লও।

এখন বোনার উল্টা পিঠে ভিজা কাপড় রাখিয়া সাবধানে গরম ইস্ত্রির চাপ দিয়া বুননের কোঁচকান ইত্যাদি সমান করিয়া লও। জামাটির দুই পাশ ও হাতার ধার সেলাই করিয়া দাও। ক্রুসের সাহায্যে গলার চারিদিকে সরু লেশ মত বুনিয়া দাও। এই লেসের ফাঁকের মধ্যে দিয়া রিবন পরাইয়া ফাঁস বাঁধিয়া দাও।

মোজা

দুই তিন মাস বয়সের শিশুর উপযোগী। প্রয়োজনীয় জিনিস—মোজা বোনার সরু ৩ তারের উল ১ আউন্স, মোজা বোনার সরু লোহার দুই মুখ ছুঁচালো ১০ নম্বরের কাঁটা ৩টি।

মোজা

প্রথমে উপরি উক্ত উলে ৪৪ ঘর তুলিয়া লও।

১ম সারি—২ সোজা, * ১ উল্টা, * পুনরাবৃত্তি করিয়া যাও। প্রথম সারির মত ৮ সারি বোন।

৯ম সারি—সব সোজা।

১০ম সারি—সব উল্টা। প্রতি একান্তর সারিতে এইরূপ বুনন হইবে।

১১শ সারি—১ সোজা, * ৩ সোজা, সামনে সূতা, ৩ ঘর এক সঙ্গে জোড়া, সাম্‌নে সূতা, * পুনরাবৃত্তি করিয়া যাও। সর্ব্বশেষে ১ সোজা।

১৩শ সারি—১ সোজা, * সামনে সূতা, ৩ ঘর এক সঙ্গে জোড়া, সাম্‌নে সূতা, ৩ সোজা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ১ সোজা।

১০ম সারি হইতে ১৩শ সারি পর্য্যন্ত বুননের আরও ৭ বার পর পর পুনরাবৃত্তি করিয়া যাও। তাহার পর—

৪২ম সারি—সব উলটা।

৪৩ম সারি—১ সোজা, * সামনে সূতা, ১ জোড়া, ২ সোজা, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষে ১ সোজা।

৪৪ম সারি—সব উল্‌টা।

৪৫ম সারি—সব সোজা।

৪৬ম সারি—সব উল্‌টা।

এখন পায়ের চেটোর জন্য এই ভাবে ঘর ভাগ করিয়া লও—১৫ সোজা, এই ঘরগুলিকে একটি কাঠিতে আলাদা করিয়া রাখ। তাহার পর ১৪ ঘর সোজা, এখন এই ১৪ ঘরের উপর বোনা হইবে। এ পাশের বাকী ১৫ ঘর এবং আলাদা করিয়া রাখা ১৫ ঘর দুই পাশের জন্য এখন রাখিয়া দাও।

এই ১৪ ঘরের উপর ২৪ সারি শুধু সোজা 'গোট' বুনন দিয়া উল ছিঁড়িয়া ফেল এবং ইহা আলাদা করিয়া রাখ। তাহার পর বোনার সোজা দিকটা সামনে রাখিয়া অপর একটি কাঠি লও এবং ডানদিকে যে ১৫ ঘর ছাড়া আছে তাহার প্রথম ঘরের সামনে হইতে উল যোগ করিয়া ঐ ১৫ ঘরে সোজা বুনন দাও। পায়ের চেটোর সামনে যে ২৪ সারি বোনা হইয়াছে তাহার পাশ হইতে সোজাভাবে ১৩ ঘর এই কাঁটাতেই বুনিয়া তুলিয়া লও, আর চেটোর সামনে যে ১৪ ঘর আছে তাহা হইতেও ৭ ঘর এই কাঁটাতে সোজা ভাবে বুনিয়া লও। এখন ডানদিকের এই কাঁটাটি রাখিয়া দাও। অপর একটি কাঁটা লইয়া পায়ের চেটোর সামনের ৭ ঘর সোজা, পায়ের চেটোর জন্য বোনার পাশ হইতে ১৩ ঘর সোজা ভাবে বুনিয়া তুলিয়া লও, শেষের ১৫ ঘরকেও এই কাঁটাতে সোজা বুনিয়া লও। এখন প্রত্যেক কাঁটাতে ৩৫টি করিয়া ঘর থাকিল। তাহার পর এই দুই কাঁটার উপর ঘরগুলিকে তৃতীয় কাঁটার সাহায্যে গোল ভাবে ৮ কাঠি সোজা বোন। তাহার পর প্রতি কাঠির বোনা শেষ হইলে শেষে একটি করিয়া জোড়া বুনন দিতে হইবে। এই নিয়মে পর পর ৬ কাঠি বুনন দিতে হইবে। তাহার পর বুননের উল্‌টা পিঠ সামনে করিয়া দুই কাঠির ঘর পাশাপাশি রাখ। তাহার পর তৃতীয় কাঁটা লইয়া এই দুইটি কাঁটারই প্রথম দুই ঘরে পরাও এবং দুই ঘরকে লইয়া একটি জোড়া বোন, এইভাবে আরও একটি জোড়া বোন * এখন আগের বোনা জোড়া ঘরকে দ্বিতীয় জোড়া ঘরের উপর দিয়া ফেলিয়া দাও। কাঠিতে একটি জোড়া রহিল আবার একটি জোড়া বোন * পুনরাবৃত্তি কর। এইভাবে সমস্ত ঘর বন্ধ করিয়া দাও। ঘর বন্ধ করার পর মোজার পাশ সেলাই করিয়া দাও। অপর মোজাটী ঠিক এইভাবে বুনিয়া ও সেলাই করিয়া লইতে হইবে। এখন উল দিয়া মোজা বাঁধিবার দড়ি তৈয়ারী করিয়া পায়ের গোছের কাছে যে ঘর আছে তাহাতে পরাইয়া দাও। তাহার পর দড়ির দুই মুখে দুইটি থোপনা করিয়া আট্‌কাইয়া দাও।
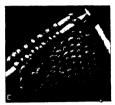
দুই পাটের ঘর বন্ধ করা

উপরে যে নিয়মে ঘর বন্ধ করিতে বলা হইল সেই নিয়মে ঘর বন্ধ করার প্রয়োজন হয় সেখানে যেখানে দুই পাটের ঘর একসঙ্গে বন্ধ করার প্রয়োজন হয়। এই নিয়মে জোড় দিবার সময় বুননের উলটা পিঠ সামনে রাখিয়া বন্ধ করা উচিত কারণ এই নিয়মে জোড় দিলে যে দিক সামনে রাখিয়া জোড় দেওয়া হয় সেদিকে একটি শিরা মত পড়ে।

ফ্রক

এক বৎসর হইতে দেড় বৎসরের শিশুর উপযোগী।

প্রয়োজনীয় জিনিস—৩ তারের নরম উল ৩ আউন্স, ৯ নম্বরের কাঁটা ১ জোড়া, উলের রঙের সহিত মানান মত ছোট বোতাম ৪টি।

মাপ—কাঁধ হইতে তলার ঝুল ১৬ ইঞ্চি। বাহুমূল হইতে হাতার ঝুল ৪ ইঞ্চি।

প্রথমে সামনের ভাগের জন্য (তলা হইতে আরম্ভ) ১১৬ ঘর তুলিয়া লও। ইহার উপর ৬ সারি শুধু সোজা 'গোট' বুনন দাও। তাহার পর 'মাছি' নমুনা কর।

১ম সারি—* ১ সোজা, এই ঘর কাঁটা হইতে ফেলিবার আগে ঐ ঘরেই আবার সামনে সুতা, ১ সোজা, বুনিয়া লও, ৩ ঘর একসঙ্গে জোড়া, * শেষ পর্য্যন্ত পুনরাবৃত্তি কর।

২য় সারি—সব সোজা।

পৃথিবীর নানা দেশের মানুষ

সিন্ধু দেশের লোক, শিখ-পুরোহিত, লিশা ও মাখা,

এ্যাঙ্গোনী দেশের বাদক, টোঙ্গাবেলির স্ত্রীলোক, এস্কিমো মা ও সন্তান

৩য় সারি—* ৩ ঘর এক সঙ্গে জোড়া, ১ সোজা, এই ঘর কাঁটা হইতে ফেলিবার আগে ঐ ঘরেই আবার সামনে সুতা, ১ সোজা, বুনিয়া লও। * শেষ পর্য্যন্ত পুনরাবৃত্তি কর।

৪র্থ সারি—সব সোজা।

এই ৪ সারির বুনন পর পর ৮ বার বুনিয়া লও। তাহার পর ৮ সারি 'গোট' বুনন দাও।

৩৩ম সারি—সব সোজা।

৩৪ম সারি—সব উলটা।

শেষের দুই সারি পর পর বুনিয়া যাও এই 'বিছা' বুননের মাপ ৪॥ ইঞ্চি [illegible] তাহার পর—

১ম সা[illegible]—* ১ সোজা, (১ জোড়া,) ২ বার পুনরাবৃত্তি কর শেষ পর্য্যন্ত। এখন কাঠিতে ৭০

ফ্রক

ঘর অবশিষ্ট রহিল। এইবার ৮ সারি 'গোট' বুনন দাও। তাহার পর বিছা বুনন ৮ ইঞ্চি মাপ মত বুনিয়া লও। উলটার সারি বুনিয়া শেষ কর। তাহার পর গলা ভাগ করিয়া লও এইভাবে—২৩ ঘর সোজা, ২৪ ঘর বন্ধ করিয়া দাও, শেষের ২৩ ঘর সোজা। শেষে ২৩ ঘরের উপর 'বিছা' বুননই দিয়া যাও যতক্ষণ এই গলা ভাগ করা জায়গা হইতে ঐ বুননের মাপ ১॥ ইঞ্চি পুরা না হয়। তাহার পর ঘর বন্ধ করিয়া দাও। অপর দিকে যে ২৩ ঘর ছাড়া আছে তাহাতে গলার দিক হইতে উল যোগ করিয়া এ পাশের কাঁধের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বুনিয়া ঘর বন্ধ করিয়া দাও। এখন সামনের ভাগ বোনা সম্পূর্ণ হইল।

পিঠের জন্য সামনের মত ১১৬ ঘর তুলিয়া সামনের বুননের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ৭০ ঘর বসান পর্য্যন্ত বুনিয়া আইস। তাহার পর 'বিছা' বুনন আরম্ভ করিয়া ৩ ইঞ্চি মাপে 'বিছা' বুনন বোনা হইলে উলটার সারি বুনিয়া শেষ কর। তাহার পর পিঠের বোতাম পটি আরম্ভ কর এইভাবে—

১ম সারি—৩৫ ঘর সোজা, বোনা ঘুরাইয়া লও। বাকী ঘর গুলি এখন থাকিতে দাও।

২য় সারি—৫ সোজা, ৩০ উলটা, শেষের এই দুই সারির বুনন পুনরাবৃত্তি করিয়া যাও যতক্ষণ আরম্ভ হইতে বোনার মাপ ১৪॥০ ইঞ্চি পুরা না হয়। সোজার সারি বুনিয়া শেষ কর। তাহার পর ১২ ঘর বন্ধ, সব উলটা। এখন যে ২৩ ঘর অবশিষ্ট রহিল তাহার উপর ১॥০ ইঞ্চি মাপে বিছা বুনন দিয়া ঘর বন্ধ করিয়া দাও।

এখন যে ঘরগুলি ছাড়া আছে তাহা বোনা আরম্ভ হইবে। প্রথমে একটি কাঠিতে ৫ ঘর তুলিয়া লও এইবার যে ঘর ছাড়া আছে (যেখান হইতে ঘর ভাগ হইয়াছে সেইখান হইতে) তাহা এই কাঠিতে সব সোজা বুনিয়া লও। তাহার পর—

১ম সারি—৩৫ ঘর উলটা, ৫ ঘর সোজা।

২য় সারি—সব সোজা। শেষের এই দুই সারি পুনরাবৃত্তি করিয়া যাও যতক্ষণ আরম্ভ হইতে বোনার মাপ ১৪॥০ ইঞ্চি পুরা না হয়। উলটার সারি বুনিয়া শেষ কর। ১৭ ঘর বন্ধ, সব সোজা। এখন যে ২৩ ঘর বাকী রহিল তাহার উপর ১॥০ ইঞ্চি মাপে বিছা বুনন দিয়া ঘর বন্ধ করিয়া দাও। এখন পিঠের ভাগ বোনা সম্পূর্ণ হইল।

হাতা করার নিয়ম

বুক ও পিঠের কাঁধের অংশ এক করিয়া জুড়িয়া লও। তাহার পর কাঁধের জোড় হইতে দুই পাশেরই ৪ ইঞ্চি করিয়া জায়গা লইয়া যে ৮ ইঞ্চি জায়গা হইবে তাহাতে বোনার সোজা পিঠ সামনে রাখিয়া মোট ৬০ ঘর তুলিয়া লও। এইবার ঐ ঘরগুলির উপর ৪ সারি বিছা বুনন দাও। তাহার

পর ফ্রকের নীচে যে মাছি নমুনা দেওয়া হইয়াছে ঐ নমুনা পর পর ২টী পুরা করিয়া (৮ সারি) বুনিয়া লও। আবার ৪ সারি গোট বুনন দাও। এই গোট বুনন দিবার সময় প্রতিবার যখন প্রথম বোনা আরম্ভ করিবে তখন ১টি করিয়া জোড়া বুনিয়া তাহার পর সমস্ত সারি বুনিবে। তাহার পর সমস্ত ঘর বন্ধ করিয়া দাও।

অপর হাতাটিও ঠিক এই নিয়মে বুনিয়া লও।

ফ্রকের দুই পাশ ও হাতার তলা সেলাই করিয়া দাও। বোতাম পটির কাছে যে ৫ ঘর তোলা হইয়াছিল বোনার উল্‌টা পিঠের দিকে সূঁচের সাহায্যে ঐ ঘর তোলার ধারকে জুড়িয়া দাও। বোতাম গুলি ভিতরের পটিতে বসাইয়া দাও। ছোট বোতাম লাগাইবার জন্য ঘর করা প্রয়োজন হয় না বোতাম গুলি যথা স্থানে বসাইয়া ঐ বোতামের উপযুক্ত জায়গা হইতে বোতামকে উপরের পটি হইতে বাহির করিয়া আটকাইয়া দিলেই হইবে।

ফ্রকটির উল্‌টা পিঠে ভিজা কাপড় রাখিয়া সাবধানে গরম ইস্ত্রির চাপ দিয়া বুননের কোঁচকান ইত্যাদি সমান করিয়া লও।

মাছি—লেস

প্রয়োজনীয় জিনিষ—২০ নম্বরের ক্রুসের সূতা, ১৯ নম্বরের লোহার কাঁটা ১ জোড়া।

প্রথমে ৯ ঘর তুলিয়া লও।

১ম সারি—১ তোলা, সাম্‌নে সূতা, ১ সোজা ১ জোড়া, (সাম্‌নে সূতা, ১ সোজা,) ৪ বার, ১ সোজা।

২য় সারি—১৩ উল্‌টা।

৩য় সারি—১ তোলা, ১ সোজা, সাম্‌নে সূতা, ১ জোড়া, সাম্‌নে সূতা, ৩ সোজা, (সাম্‌নে সূতা, ১ সোজা,) ২ বার, ২ সোজা, সাম্‌নে সূতা, ২ সোজা।

মাছি—লেস

৪র্থ সারি—১৭ উল্‌টা।

৫ম সারি—১ জোড়া, ১ সোজা, সাম্‌নে সূতা, ১ জোড়া, * সাম্‌নে সূতা, ১ তোলা, ১ জোড়া, ১ জোড়া, তোলা ঘর এবং প্রথম জোড়া ঘরকে দ্বিতীয় জোড়া ঘরের উপর দিয়া ফেলিয়া দাও, সামনে সূতা, ১ জোড়া, * পুনরাবৃত্তি কর। সর্ব্বশেষের ১ ঘর—সোজা।

৬ষ্ঠ সারি—৪ ঘর বন্ধ, ৮ উল্‌টা।

ইহার পর আবার প্রথম সারি হইতে বোনা হইবে।

মতিদানা—ইনসারসান্

২৬ নম্বরের ক্রুসের সূতা, ১৯ নম্বরের লোহার কাঁটা ১ জোড়া।

প্রথমে ৮ ঘর তুলিয়া লও।

মতিদানা

১ম সারি—সাম্‌নে সূতা, ১ জোড়া, ৬ সোজা।

২য় সারি—সাম্‌নে সূতা, ১ জোড়া, ১ সোজা, ১ জোড়া, কাঁটায় ২ বার উল জড়াইয়া লও, ১ জোড়া, ১ সোজা।

৩য় সারি—সাম্‌নে সূতা, ১ জোড়া, ১ সোজা, ১ উল্‌টা, ৪ সোজা। ইহার পর আবার প্রথম সারি হইতে বোনা হইবে।

সীবন-শিল্পে বুননের কথা বলা হইল। সব কথা ত আর লিখা যায় না। আর নিত্য নূতন নানাপ্রকার নমুনা ও ফ্যাসানের ও আমদানী হইতেছে। তবে আমরা তোমাদের কাছে যাহা বলিলাম তাহা হইতে এই বুনন ব্যাপারে অনেকখানি সাহায্য পাইবে। সীবন-শিল্প, শিল্পের দিক্ দিয়া একটি অতি প্রয়োজনীয় শিল্প। ইহার প্রতি মনোযোগী হইলে নিজেদের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে পারিবারিক সাহায্য হইয়া থাকে এবং আনন্দ লাভও হয়।

সিন্ধাবাদ নাবিকের তৃতীয়বার বাণিজ্য-যাত্রা

[৩২৪২ পৃষ্ঠার পর]

সিন্ধাবাদ ও তাঁহার দলের লোকেরা বাড়ী প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহারা যেখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, তাহা একটি প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ। সম্মুখে বিস্তৃত অঙ্গন। অঙ্গনের পাশে খুব বড় বড় ঘর। তাহারই একদিকে মানুষের মাথার খুলি ও হাড়ের এক বিরাট স্তূপ পড়িয়া আছে। আর অন্য দিকে লম্বা লম্বা কতকগুলি শিক পড়িয়া আছে মাংস

পোড়াইয়া খাইবার জন্য। সিন্ধাবাদ ও তাঁহার সঙ্গীরা এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িলেন, তাঁহারা আর এক পা ও অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। এমন সময় তাঁহারা দেখিলেন যে হঠাৎ ভয়ানক শব্দে সম্মুখের ঘরের একটি দরজা খুলিয়া গেল এবং তালগাছের মত লম্বা একটি কৃষ্ণ বর্ণের বিকটাকার দৈত্য বাহির হইয়া আসিল। তাহার কপালের মধ্যে একটি মাত্র চক্ষু, সে চক্ষুটি জ্বলন্ত কয়লার মত জ্বলিতেছিল, আগুনের মতই লাল একটি তীব্র জ্যোতিঃ তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল। ঐ ভীষণাকার দৈত্যের সম্মুখের দাঁত দুইটি লম্বা এবং খুবই ধারালো, ঐ দাঁত দুইটি তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। মুখটা ঘোড়ার মুখের মত লম্বা, নীচের ঠোঁটটা বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, উহার কান দুইটি হাতীর কানের মত চওড়া, একেবারে কাঁধ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। হাতের আঙ্গুল গুলি যেমন লম্বা, তেমনি তার হাতের নখগুলিও ভীষণ ধারালো। বৃহদাকার ঈগল পাখীর পায়ের নখের মত তীক্ষ্ণ ও দীর্ঘ। পায়ের আঙ্গুল গুলিও অনুরূপ দীর্ঘ ও সুতীক্ষ্ণ নখে ঢাকা।

সিন্ধাবাদ ও তাঁহার সঙ্গীরা ভয়ে ও বিস্ময়ে একপাও নড়িতে পারিতেছিল না। তাহাদের পা চলিতেছিলনা। তাদের যখন একটু চৈতন্য হইল, তখন তাহারা দেখিতে পাইল যে সেই ভীষণাকার দৈত্যটা তাহাদের দিকে অগ্নিময় দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। তাহার পর সে হাত বাড়াইয়া প্রথমেই সিন্ধাবাদকে ধরিল, এবং তাহাকে উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিল, পরে শীর্ণকায় মনে করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। এই ভাবে তাহার সঙ্গিগণকে একে একে পরীক্ষা করিয়া অবশেষে জাহাজের কাপ্তেনকে ধরিল। কাপ্তেন তাহাদের দলের মধ্যে সব চেয়ে মোটা ও মাংসল ছিল, কাজেই তাহাকে আর ছাড়িয়া দিল না তৎক্ষণাৎ আগুন জ্বালিয়া কাপ্তেনকে ঝলসাইয়া খাইয়া ফেলিল।

পরদিন বেলা হইলে পর, ভীষণাকার সেই দৈত্য বাহিরে চলিয়া গেল। সিন্ধাবাদ ও তাঁহার সঙ্গীরা সেই বিরাট বাড়ীর মধ্যেই আবদ্ধ রহিলেন। তাঁহার দলের সকলেই প্রাণভয়ে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সিন্ধাবাদ ও তাঁহার সঙ্গিগণ কি উপায়ে এই ভীষণ দৈত্যের কবল হইতে মুক্তি লাভ করা যায় সে বিষয়ে নানারূপ কল্পনা-জল্পনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনও একটা মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সেদিন তাহারা দ্বীপের এদিকে ওদিকে

আগুনে ঝলসাইয়া খাইয়া ফেলিল

লমণ, লতাপাতা ফল ইত্যাদি যাহা কিছু পাইয়াছিল তাহা খাইয়াই দিন কাটাইয়া দিল। সন্ধ্যার সময় তাহারা দ্বীপের কোথাও রাত্রি যাপন করিবার মত স্থান না পাইয়া আবার সেই ভীষণ দৈত্যের বাড়ীতেই ফিরিয়া আসিল।

সে দিন সন্ধ্যার সময় দৈত্য তাহাদের সঙ্গিগণের মধ্যে আবার একজনকে পূর্ব্ব দিনের মত আগুনে ঝলসাইয়া খাইয়া ফেলিল।

পরের দিন দৈত্য বাহিরে চলিয়া গেলে পর সিন্ধাবাদ তাঁহার সঙ্গিদের সহিত পরামর্শ করিলেন যে এইভাবে দিনের পর দিন

সিন্ধাবাদ নাবিকের তৃতীয়বার বাণিজ্য-যাত্রা

এক জনের পর আর একজনের প্রাণনাশ হওয়া অপেক্ষা পলায়ন করিবার একটা উপায় করাই কর্ত্তব্য। সিন্ধাবাদের পরামর্শ অনুযায়ী একটা কাঠের ভেলা তৈয়ারী করিয়া তাহাতে চড়িয়া পলায়ন করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইল। এইরূপ পরামর্শ স্থির হইলে সিন্ধাবাদ ও তাহার দলের লোকেরা দুই এক দিনের মধ্যেই অবসর মত সমুদ্রের তীরে যাইয়া একটি কাঠের বেশ বড় ভেলা প্রস্তুত করিয়া ফেলিল এবং একদিন সুযোগ বুঝিয়া ভেলাটিকে সমুদ্রে ভাসাইয়া তাহার উপর চড়িয়া দূর সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এদিকে দৈত্য টের পাইয়া সমুদ্রের তীরে ছুটিয়া

পাগড়ী খুলিয়া নাড়িতে লাগিলেন

আসিয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বড় বড় পাথর ছুড়িয়া মারিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। এই ভেলায় চড়িয়া সিন্ধাবাদ ও তাঁহার দুইজন মাত্র সঙ্গী রক্ষা পাইয়াছিলেন, আর সকলেই সেই দৈত্যের হাতে প্রাণ হারাইয়াছিল।

সিন্ধাবাদ ও তাঁহার সঙ্গী দুইজন অনুকূল-পবনে সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে আর একটি দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমুদ্রের পারে ভেলাটিকে বেশ ভাল ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়া তাঁহারা একটা গাছের তলায় ঘুমাইয়া পড়িলেন। গভীর রাত্রিতে ভীষণ ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনিয়া তাঁহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন যে তালগাছের মত লম্বা এবং মোটা একটা অজগর সাপ তাহাদের দিকে বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইবার পূর্ব্বেই সেই অজগর সাপটা তাঁহাদের একজন সঙ্গীকে গ্রাস করিয়া ফেলিল।

সিন্ধাবাদ ও তাঁহার অপর সঙ্গী এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারে বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং তাড়াতাড়ি একটা খুব উঁচু গাছে উঠিলেন। সিন্ধাবাদ গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালের উপর যাইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গী তাড়াতাড়ি আর ততটা উপরে উঠিতে পারেন নাই। এমনি দুর্ভাগ্য যে সেই অজগর সাপটা ছুটিয়া আসিয়া সিন্ধাবাদের সেই সঙ্গীকে গ্রাস করিয়া চলিয়া গেল।—সিন্ধাবাদ একাকী সেই গাছের উপর বসিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।

পরের দিন বেলা হইলে পরে সিন্ধাবাদ সমুদ্রের তীরে চলিয়া গেলেন এবং মনে মনে এই সঙ্কল্প করিলেন যে অজগর সর্পের গ্রাসে প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা সমুদ্রের জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন।

সিন্ধাবাদের ভাগ্য ভাল। তাই তিনি সমুদ্রের তীরে যাইয়াই দেখিতে পাইলেন যে একখানি জাহাজ দ্বীপের অল্প দূর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সিন্ধাবাদ জাহাজখানি দেখিতে পাইয়া উৎসাহিত হইলেন এবং ঐ জাহাজখানি থামাইবার জন্য প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার পাগড়ী খুলিয়া নাড়িতে লাগিলেন। ঐ জাহাজের নাবিকেরা সিন্ধাবাদকে দেখিতে পাইয়াছিল। কাপ্তেন কয়েকজন সুদক্ষ নাবিকসহ একখানি নৌকা পাঠাইয়া দিলেন, সিন্ধাবাদ নিরাপদে জাহাজে উঠিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

সেই জাহাজের কাপ্তেন এবং নাবিকেরা সিন্ধাবাদ কেমন করিয়া এই বিজন দ্বীপে আসিলেন, সে বিষয়ে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সিন্ধাবাদ তাহাদিগকে সমুদয় কাহিনী শুনাইলে পর তাহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

একদিন সিন্ধাবাদ দেখিলেন যে জাহাজের একজন কর্ম্মচারী কতকগুলি মালের উপর কোনও নাম লেখা নাই দেখিয়া কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে ঐ অনামী মালগুলির উপর কাহার নাম লেখা হইবে। তখন কাপ্তেন

বলিলেন যে—"উহার উপর সিন্ধাবাদ নাবিকের নাম লেখ।"

সিন্ধাবাদ কাপ্তেনের মুখে তাঁহার নাম উচ্চারিত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং কাপ্তেনের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে এই সে কাপ্তেন, যে কাপ্তেন দ্বিতীয়বার যাত্রার সময় তাঁহাকে এক দ্বীপে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

নানারূপ আলাপ ও বাক্যবিনিময়ের পরে উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিলেন এবং এইরূপ আকস্মিক ভাবে মিলিত হওয়ায় উভয়েই ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন।

এইবার তাঁহারা সালহাট নামক একটি দ্বীপ হইতে লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি নানাপ্রকার বাণিজ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলেন। তারপর সুদীর্ঘ যাত্রার পর বালসোরা হইয়া সিন্ধাবাদ নিরাপদে বাসস্থান বোগদাদ নগরে ফিরিয়া আসিলেন।

সিন্ধাবাদের তৃতীয় বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ সমাপ্ত হইলে পর, তিনি হিন্দাবাদকে এক শত সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন এবং পরের দিন তাঁহার নিকট চতুর্থবার বাণিজ্য-যাত্রার বিবরণ বলিবেন বলিয়া জানাইয়া দিলেন।

সিন্ধাবাদ নাবিকের চতুর্থবার বাণিজ্য-যাত্রা

সিন্ধাবাদ তৃতীয়বার বাণিজ্য যাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কিছুদিন বোগদাদ নগরীতে পরম আনন্দের সহিত বিশ্রাম করিয়া পুনরায় পণ্য-দ্রব্যাদির দ্বারা জাহাজখানি সুসজ্জিত করিয়া বাণিজ্য করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। কয়েকদিন বেশ নিরাপদে কাটিয়া গেল, একদিন হঠাৎ ভীষণ ঝড়ে পড়িলেন। সমুদ্রের বুকে তাল গাছের মত উচু উচু ঢেউ উঠিতে লাগিল, বাতাসের বেগে জাহাজের সব পাল ছিঁড়িয়া গেল। কাপ্তেন কিছুতেই জাহাজ-খানিকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। একটা জোর দমকা বাতাসে জাহাজখানি একটা জলমগ্ন পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। জাহাজের অনেক নাবিক প্রাণ হারাইল। পণ্য-দ্রব্যাদি সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত হইল।

সিন্ধাবাদ এবং তাঁহার সঙ্গী কয়েকজন বণিক্ ও নাবিক কোনরূপে প্রাণে বাঁচিলেন এবং নেহাৎ সৌভাগ্যবশতঃ ভগ্ন জাহাজের কয়েকখানি কাঠ পাইয়া ভাসিতে লাগিলেন।

জাহাজ যেখানে ডুবিয়াছিল, তাহার অল্প দূরেই একটি দ্বীপ ছিল। স্রোতের টানে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহারা সেই দ্বীপে যাইয়া পৌছিলেন। দ্বীপটি বেশ সুজলা সুফলা ছিল। সেখানে সিন্ধাবাদ ও তাঁহার সঙ্গী নাবিকেরা ও বণিকেরা সুমিষ্ট জল ও সুপক্ক ফল পাইয়া—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দূর করিয়া বেশ সবল হইলেন। সেদিন তাঁহারা এতদূর ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে যেখানে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন, দ্বীপের সেই অংশেই শুইয়া থাকিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিলেন।

পরের দিন সকালবেলা সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা দ্বীপের ভিতরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদূর যাইতে না যাইতেই এক দল অতি কুৎসিত আকারের কৃষ্ণকায় রোমশ নরখাদকের দল আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং তাহাদিগকে বন্দী করিল। এবং তাহারা সিন্ধাবাদ ও তাঁহার সঙ্গিগণকে কয়েকটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া লইয়া চলিল।

সিন্ধাবাদ ও তাঁহার পাঁচজন সঙ্গী একটি দলে ছিলেন। তাহাদিগকে ঐ নরখাদকগুলি গাছের শিকড় ও লতাপাতা খাইতে দিল। সিন্ধাবাদ তাহা খাইলেন না, মনে করিলেন যে নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোনও দুষ্ট অভিসন্ধি নিহিত আছে। তারপর তাহাদিগকে নারিকেল তৈল মিশ্রিত করিয়া ভাত খাইতে দিল। সিন্ধাবাদ অতি অল্পই খাইলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গীরা উহা প্রচুর পরিমাণে খাইয়া ফেলিল। ওষধির গুণে সঙ্গীরা পাগল হইয়া গেল। এইভাবে সঙ্গিগণকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট করিয়া নরখাদকেরা খাইয়া ফেলিল।

সিন্ধাবাদের দিকে এ সময়ে তেমন কড়া নজর কেহ করিত না। একদিন সুযোগ বুঝিয়া তিনি পলায়ন করিলেন এবং ক্রমাগত সাতদিন হাঁটিয়া আটদিনের দিন সিন্ধাবাদ সমুদ্র তীরে আসিয়া পৌছিলেন। সেখানে তাঁহার সহিত একদল স্বদেশী বণিকের সাক্ষাৎ হইল। বণিকেরা এই দ্বীপে গোলমরিচ সংগ্রহের জন্য আসিয়াছিলেন।

কাচ

আজকাল এমন কেহ নাই—সে দুই তিন বৎসরের ছোট ছেলেমেয়েই হো'ক না কেন যে, কাচের কথা না জানে। কেন বলত? বর্ত্তমান সময়ে সভ্য-জাতি মাত্রেই কাচের তৈরী জিনিষের খুব বেশী ব্যবহার করেন। তোমার চোখের চশমা, তোমার বাড়ীর মুখ দেখিবার দর্পণ, জানালার সার্শী, ঘড়ি, দূরবীণ, অণুবীক্ষণ, জলপান করিবার গ্লাস, খাবার জিনিষ রাখিবার নানা আকারের বড় ছোট বোতল ও পাত্র, ছবি বাঁধাইবার কাচ, এইভাবে এমন কোন জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায় না, যেখানে কাচের ব্যবহার না হয়। অথচ যদি তুমি কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর, কাচ কি কি জিনিষ দিয়া তৈয়ারী এবং কি ভাবে উহা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা হইলে হয়ত খুব কম লোকেই তাহার উত্তর দিতে পারিবে।

আমরা ছেলেবেলায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত 'বোধোদয়ে' পড়িয়াছিলাম, যে একবার একদল ফিনিশিয় বণিক জাহাজ ডুবিয়া যাওয়ার ফলে একটি দ্বীপে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে সময়ে তাহারা শীতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সমুদ্রের পাড়ে আগুন জ্বালিয়াছিল। আগুন নিবিয়া গেলে দেখা গেল বালির সঙ্গে অন্য কোনও অজ্ঞাত পদার্থের মিশ্রণের ফলে কাচ তৈয়ারী হইয়াছে।

বালির উপাদানের সঙ্গে Silica সিলিকা নামে একপ্রকার পদার্থ আছে। সিলিকা কিন্তু অতি সাধারণ জিনিষ। পাথরের গুড়ো, বালি, পাথরের কুচি প্রভৃতির মিশ্রণেই হইতেছে সিলিকার উৎপত্তি। তাহার সহিত অগ্নির সংযোগ হইলে কাচ তৈয়ারী হওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু এ হইতেছে মোটা রকমের কাচ তৈয়ারীর কথা। কিন্তু তোমরা যে সকল কাচের তৈয়ারী বাসন-কোশন, গ্লাশ, জানালার কাচ ইত্যাদি দেখিতে পাও, সে সমুদয় কাচ তৈয়ারী করিতে নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট খনিজ পদার্থের প্রয়োজন হয়। ঐ সকল উপাদানের মধ্যে সামান্য পরিমাণ এলুমিনিয়াম ও দেওয়া হয় যাহাতে কাচ বেশ শক্ত হয়।

প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ফটিক বা কাচের ব্যবহারের বিষয় জানিতে পারা যায়। তোমরা মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের কথা পড়িয়া থাকিবে। সেই যজ্ঞসভায় কাচের ব্যবহার খুব বেশী পরিমাণ হইয়াছিল এবং সেকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ময়দানব

যেরূপ নৈপুণ্যের সহিত সেই যজ্ঞস্থল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার অতি সুন্দর বর্ণনা তোমরা "মহাভারতে" পড়িও। আমরা এখানে কাশীরাম দাসের "মহাভারত" হইতে সামান্য কয়েক পংক্তি তুলিয়া দিলাম :—

"হেন মতে নিজদেশে গেল সর্ব্বজন।
ইন্দ্রপ্রস্থ রহিল শকুনি দুর্য্যোধন ॥
বাঞ্ছা বড় ধর্ম্মরাজ সভা দেখিবারে।
কতদিন রহে তথা কুরু নৃপবরে ॥
জল জানি নরপতি তুলিল বসন।
পশ্চাৎ জানিয়া বেদী লজ্জিত রাজন ॥
তথা হইতে কতদূরে গেল নরবর।
লজ্জায় মলিন মুখ কাঁপে থরথর ॥
স্ফটিকমণ্ডিতবাপী ভ্রমে না জানিল।
সবসন দুর্য্যোধন বাপীতে পড়িল ॥
*　　*　　*
স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে স্ফটিকমণ্ডন।
দ্বার হেন জানিয়া চলিল দুর্য্যোধন ॥

কাঁচা মাল, চুল্লী ও তরল করিবার যন্ত্রপাতি

শকুনি সহিত সভা নিত্য নিত্য দেখে।
দিব্য মনোহর সভা অনুপম লোকে ॥
নানা রত্ন বিরচিত যেন দেবপুরী।
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন কুরু অধিকারী ॥
অমূল্য রতনেতে মণ্ডিত গৃহগণ।
এর গৃহ তুল্য নহে হস্তিনা ভুবন ॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা অন্তরে চিন্তিত।
একদিন দেখে তথা দৈবের লিখিত ॥
মাতুল সহিত বিহরয় নরবর।
স্ফটিকের বেদী দেখে যেন সরোবর ॥
ললাটে প্রাচীর লাগি পড়িল ভূতলে।
দেখিয়া হাসিল কত সভাসদ দলে ॥"

কিন্তু এই যে রাজসূয় যজ্ঞে স্ফটিকের ব্যবহার হইয়াছিল, তাহা—"কৈলাসের উত্তর মৈনাক পর্ব্বত সন্নিধানে হিরণ্যশৃঙ্গ নামে মহামণিময় মহাগিরি," হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, বলিয়া ময়দানব বলিয়াছেন। স্ফটিক ও কাচে প্রভেদ আছে। একথা যেন মনে থাকে।

বৌদ্ধযুগে কাচের ব্যবহার বিশেষ ভাবে প্রসার লাভ করে। সারনাথ, তক্ষশিলা, প্রভৃতি স্থানে

F. 9—42

প্রাচীন বৌদ্ধ-কীর্ত্তি-মণ্ডিত নগরে স্তূপ ও সমাধির ভিতর হইতে যে সমুদয় সম্পূটক বা Casketএর ভিতর বুদ্ধদেবের দেহ-অস্থি-ভস্ম রক্ষিত হইয়াছে, সেইগুলি স্ফটিক বা কাচের তৈয়ারী ছিল। এই রূপে বৌদ্ধ যুগের কাচ-নির্ম্মিত সম্পূটক মথুরা, সারনাথ, তক্ষশিলার, পাটনা এবং কলিকাতা যাদুঘরে দেখিতে পাইবে। কলিকাতা 'মহাবোধি-সোসাইটিতেও" ঐরূপ একটি সম্পূটক আছে। পুরাণে ও রামায়ণে কাচের কথা রহিয়াছে এবং প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও উপকথায় এবং বিবিধ গল্প ও কাহিনীতে কাচের উল্লেখ আছে। কাজেই ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে কাচের ব্যবহার ছিল তাহা আমরা জানিতে পারি। কিন্তু সেকালে কি ভাবে কাচ প্রস্তুত হইত তাহা আমরা বিশেষ ভাবে বলিতে পারি না। তোমরা অনেকেই অজন্তা গুহার মধ্যে যে চিত্র আছে তাহার প্রতিলিপি দেখিয়াছ। তাহাতে দেখিতে পাইবে একজন রাণী দর্পণ হস্তে কেমন ভাবে প্রসাধন করিতেছেন।

টেঙ্ক ফার্ণেসের অভ্যন্তর ভাগ

বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, এ সময়ে নানা ভাবে যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাচের জিনিষ পত্র তৈয়ারী হয়। যে সব কারখানায় কাচের জিনিষ প্রস্তুত হয় তাহার নাম Glass factory বা কাচ তৈরীর কারখানা। যদি কখনো কোন কাচের কার-খানা দেখিতে যাও তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তোমরা যেমন সাবানের বুদ্বুদ লইয়া খেলা কর তেমনি কাচের কারখানায় ও বোতল ইত্যাদি তৈয়ারীর সময় নির্ম্মাতারা লম্বা মস্ত বড় নল দিয়া ফুঁ দিতে থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে বলে Blown। বোতল ও গ্লাশ তৈয়ারী করিবার ছাঁচ থাকে, সেই ছাঁচের অনুপাতে আকার অনুযায়ী বোতল ইত্যাদি তৈয়ারী হয়। কাচের বোতল নানা আকারের ও নানাবর্ণের তৈয়ারী হইয়া থাকে, উহার কতক হয় কলে কতক হয় হাতে। এই যে বোতল তৈয়ারী হয় তাহার সঙ্গে নানাপ্রকার কাঁচা মালের সংমিশ্রণ থাকে। প্রধানতঃ (১) সিলিকা—বালুর আকারে, (২) সোডা (৩) চুণ, এই সঙ্গে প্রয়োজন মত আরোও কতক উপাদানের

ব্যবহার হয়। তবে তাহা বোতল ইত্যাদি নির্ম্মাণে পরিমাণ অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়।

কাচ যখন তরল অবস্থায় থাকে, তখন তাহার সঙ্গে কতক বায়ু মিশাইবার ব্যবস্থা করা হয়। বাতাস টানিয়া লইবার জন্য কাচের কারখানায় চিমনি খুব উচু থাকে। তাহারই ফলে ছাঁচের আকারে বোতল ইত্যাদি তৈয়ারী হয়। খুব বেশী উন্নত প্রণালীর কাচের জিনিষ হাতে তৈয়ারী হয়। তোমরা ভেনি-শিয়ান কাচের দ্রব্যাদির নাম শুনিয়াছ। এক সময়ে ভেনিশের তৈয়ারী কাচের দ্রব্যাদি অত্যন্ত মূল্য-বান বলিয়া বিবেচিত হইত। অতি উচ্চশ্রেণীর দক্ষ কারিগরেরা নানাবর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া অতি সুন্দর দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিত।

জানালার সার্শীর জন্য, ছবি বাঁধাইবার জন্য যে সকল কাচের চাদর 'সিট গ্লাস' (sheet glass) তৈয়ারী হয় তাহার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকে। খুব চওড়া পাত্রের উপর তরল কাচের রোলার দ্বারা ইহাদিগকে পাতলা এবং সম মাপের উপযোগী করিয়া তোলে। তারপর আকার অনুযায়ী টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া রাখা হয়, ঠাণ্ডা হইলে পর যন্ত্র দ্বারা মসৃণ করিয়া বিক্রয়ের জন্য পাঠানো হয়। যখন কাচ বাঁকানোর প্রয়োজন হয়, তখন ঐরূপ আকারে ছাঁচে ফেলিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

গ্লাশ ইত্যাদি গোলাকার জিনিষ তৈরী করিতে হইলে তরল কাচ আকার অনুযায়ী ছাঁচে ফেলিয়া অত্যন্ত বেগে ঘোরান হইতে থাকে। যেমন কুমোরের চাকে মাটির বাসন ইত্যাদি তৈরী হয়। পরে উহাদিগকে পালিশ করিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে।

চশমা, দূরবীণ, ক্যামেরা, অণুবীক্ষণ এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতে অতি উৎকৃষ্ট উপাদান ব্যবহৃত হয়। লেনস্ বা পরকলা তৈরী করিতে হইলে, আকার অনুযায়ী অত্যন্ত গরম থাকিতে কাটিতে হয়। তারপর হীরা কাটিবার (Diamond cutter) যন্ত্রের দ্বারা কাটিয়া লইয়া প্রয়োজনানুরূপ আকৃতি দেওয়া হয়। বড় বড় দূরবীক্ষণের লেনস্ তৈয়ারী করিতে যন্ত্রের উপর নির্ভর করা চলে না। তখন সুদক্ষ শিল্পীরা যন্ত্র-পাতি দ্বারা হাত দিয়া ঘষা মাজা সম্পন্ন করে।

এই যন্ত্রের নীচের দিকে ছাঁচ ও অন্যদিকে কাটিবার যন্ত্র

টেব্‌ল্ ব্লোয়ারেরা কাজ করিতেছে

হাত দিয়া বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতেছে—জেকোস্লাভা

কাচের অলঙ্কার, যেমন চুড়ি ইত্যাদি, বোতলের Stopperগুলিও ঐরূপ ভাবে হাতে ঘসিয়া তৈয়ারী করা হয়। বর্তমান সময়ে কাচের জিনিষ তৈয়ারীর যন্ত্রপাতির এতদূর উন্নতি হইয়াছে যে অতি সহজে সাধারণ লোকেও কলের দ্বারা কাচের জিনিষ পত্রাদি তৈয়ার করিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে।

তোমরা নানা রঙের কাচ দেখিতে পাও, এই রঙ কিন্তু কাচ তৈয়ারী হইবার পরে তাহার গায়ে মাখানো হয় না। কাচ যখন তরল অবস্থায় থাকে সে সময়ে ছাঁচে ফেলিবার সহিত রঙ মিশাইয়া দেওয়া হয়। কাচকে উত্তপ্ত করিবার পূর্ব্বে কাঁচা মাল মসলার সঙ্গে রঙ মিশানো হইয়া থাকে। এখন কাচের কত কি না হইতেছে?

মানুষ কাচের পোষাক পরিতেছে, কাচের বাড়ী তৈয়ারী করিতেছে, কাচের তৈয়ারী বেহালা বাজাইতেছে! এমন কল্পনাও চলিতেছে যে রাস্তা-ঘাটও কাচে তৈয়ারী করা হইবে। কেননা কাচ দিয়া রাস্তা তৈয়ারী করিলে রাস্তা নষ্ট হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই বলিয়া বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস। আমাদের কাছে এই কথা আজ অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় কিন্তু এমন একদিন হয়ত শীঘ্রই আসিবে যখন এগুলি সত্য হইয়া দাঁড়াইবে।

কাচ সাধারণতঃ তিন প্রকারের হইয়া থাকে! সিট্ গ্লাস (Sheet Glass), ব্লোন (Blown) উহা হইতে নল ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এবং অপ্‌টিকেল (Optical) দৃষ্টি-যন্ত্রাদি যেমন দূরবীণ, অণুবীক্ষণ, চশমা ইত্যাদি।

কাচ সম্বন্ধে তোমাদের কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রথম কথা এই যে—কাচ কোন ধাতু নহে। ইহা কঠিন ও ভঙ্গুর। সহজেই ভাঙ্গিতে পারে, তবে সমুদয় কাচের পক্ষে একথা প্রযোজ্য নহে।

বোতল তৈরী হইয়াছে

কাচ—রাসায়নিক কতকগুলি দ্রব্যের মিশ্রণে নির্ম্মিত হয়। যেমন—বালি, (সিলিকা) পটাশ, চূণ, সোডা, ম্যাগনেশিয়া, জিঙ্কঅক্সাইড, সোডিয়াম্ কার্ব্বোনেট ইত্যাদি। প্রয়োজন মত আরও রাসায়নিক দ্রব্যাদির মিশ্রণ আবশ্যক হইয়া থাকে।

কাচের রংয়ের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কি ভাবে কোন্ রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণে কোন্ রং হয় এইবার তাহা শোন।

নীল রং (Blue) Cobalt Compound।

গভীর লাল রং (Blue Colour) Cuprous oxide and Collodial gold, (কিউপ্রাস অক্সাইড্ এবং কোলোডিয়াল গোল্ড) ইত্যাদির সংমিশ্রণ।

ইতিহাসের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে মিশরেই সর্ব্বপ্রথম কাচের বাসনের ব্যবহার ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। গ্রীসদেশে ও রোম-দেশে কাচ নির্ম্মিত দ্রব্যাদির বিশেষ উৎকর্ষ সাধন
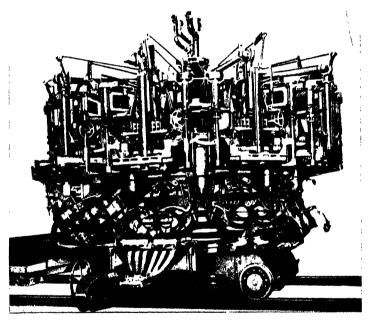
বোতল তৈরী করিবার যন্ত্র

সবুজ রং (Green) Ferrous Compound (ফেরাস্ কম্পাউণ্ড)

লাল ও বেগুনির আভা (Violed red-shades) Manganese Compound (ম্যাঙ্গানিজ কম্পাউণ্ড)।

নীল সবুজ আভা—Cupric oxide (কিউপ্রিক্ অক্সাইড্) (Blue green shades)

হইয়াছিল। রোমকেরা কাচ-শিল্পের অনেক করেন। খৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইটালির ভেনিস নগরী কাচ-শিল্পের জন্য জগদ্বিখ্যাত ছিল। ক্রমশঃ ইউরোপের সর্ব্বত্র কাচ-শিল্পের প্রসার হয়। ইংল্যাণ্ডেও সম্ভবতঃ অনেকদিন হইতেই কাচের ব্যবহার ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে "ভেনেশিয়ান" (Venetian) অর্থাৎ
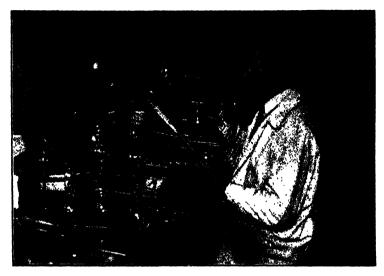
"টেবল ব্লোয়ার" (Table Blower) হাতে কাজ করিতেছে
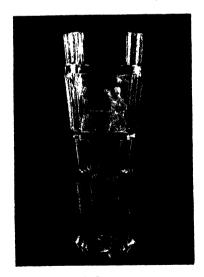
কারুকার্য্যখচিত কাচের পাত্র

কারুকার্য্যখচিত গ্লাস

ভেনিসের ন্যায় কাচ নির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর পাত্র লণ্ডনে নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইংল্যাণ্ডের কাচের শিল্প তেমন বিখ্যাত হইতে পারে নাই, এবং কাচের সকল

লেন্স তৈরী

প্রকার দ্রব্যাদিও উহার পূর্ব্বে প্রস্তুত হইত না। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই কাচ শিল্প ইউরোপে বিশেষ ভাবে প্রসার লাভ করে এবং উহার যথেষ্ট উন্নতি হয় তদবধি কাচশিল্প দিন দিনই উন্নতি লাভ করিতেছে।

আমেরিকাতে জার্ম্মান উপনিবেশিকদের মধ্যে হেনরিক উইলহেলম্ ষ্টিগেল Heinrich Wilhelm Stiegel নামক একজন জার্ম্মেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমেরিকায় কাচ-শিল্পের প্রবর্ত্তন করেন। বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকাতে কাচ-শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। বিশেষ করিয়া দৃষ্টিযন্ত্র সম্পর্কিত দ্রব্যাদি নির্ম্মাণে আমেরিকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। বড় বড় দূরবীণ, অণুবীক্ষণ, যন্ত্রপাতি, চশমা প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য আমেরিকা পৃথিবীর সব দেশ হইতেই শ্রেষ্ঠ।

জার্ম্মেনী, সুইটজারল্যাণ্ড এবং জেকোস্লাবা ও কাচ-শিল্পের জন্য ইউরোপে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। আমরা এখানে জেকোস্লাবার তৈয়ারী কয়েকটি কাচের দ্রব্যের চিত্র ও প্রকাশ করিলাম।

বর্ত্তমান সময়ে Safety glass, Ultraviolet ray glass ইত্যাদি ও প্রস্তুত হইতেছে। Safety glass তৈয়ারী করিবার সময় তরল অবস্থায় উহার সহিত Wire netting করা হয় এবং তাহার সঙ্গে সেলুলোজ (Cellulose) ব্যবহৃত হয় বলিয়া এই কাচ ভাঙ্গিয়া খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায় না।

বিভিন্ন কাচ কি ভাবে প্রস্তুত হয় কাচের কলকারখানার ছবি হইতে তাহার অনেকটা বুঝিতে পারিবে।

বাঙ্গালাদেশে কয়েকটি কাচের কারখানা আছে, তাহাদের মধ্যে ঢাকার হবদেও গ্লাস ওয়ার্কসের কার্য্যপ্রণালী আমরা নিজের চক্ষে দেখিয়াছি। এতদ্ব্যতীত দমদমের বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কস, বেলঘরি-

খনি হইতে তোলা অপরিষ্কৃত হীরক
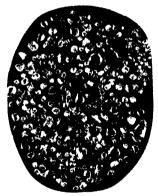
য়ার 'ভারত গ্লাস ওয়ার্কস' বেলগাছিয়ার 'ক্যালকাটা গ্লাস' ও 'সিলিকেট ওয়ার্কস্,' কলিকাতা সায়েন্টিফিক্ গ্লাস ওয়ার্কস্, উলটাডাঙ্গার 'নিউ ইণ্ডিয়ান গ্লাস ওয়ার্কস্,' 'ওরিয়েণ্টাল গ্লাস্ ওয়ার্কস্,' কলিকাতা, ইম্পিরিয়াল গ্লাস ওয়ার্কস্ প্রভৃতি কতকগুলি কাচের কারখানা বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।
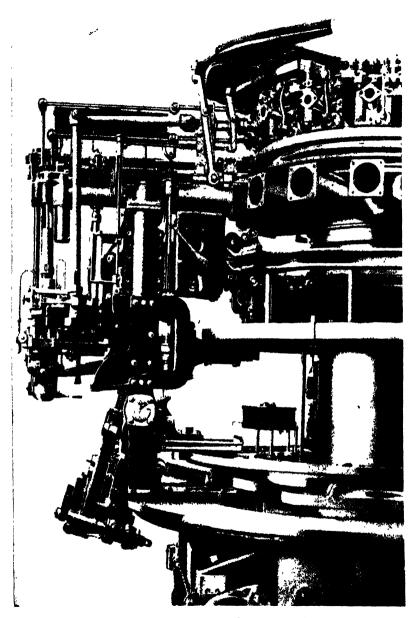
শোষণ যন্ত্র (Suction machine) যন্ত্রের সহিত ছাঁচ সংলগ্ন রহিয়াছে

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও কাচের কারখানা আছে। পুনার পয়সা ফণ্ড গ্ল্যাস ওয়ার্কসটি বেশ প্রসিদ্ধ। আমাদের দেশে দিন দিনই কাচ-শিল্প উন্নতি লাভ করিতেছে। কিন্তু তবু তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ টাকার কাচের নানা জিনিষ আসে।

কাচপাত্র

জাপানী কাচের নানা জিনিষ ত তোমরা ফেরী-ওয়ালাদের কাছে প্রায় প্রতিদিনই দেখিতে পাও এবং সস্তায় কিনিয়াও থাক।—এক কাচের চুড়িই প্রতি বৎসর আমাদের দেশে প্রায় ২৯২৬০০৪৲ টাকার আসে।

কাচের জিনিষ বিদেশ হইতে আসিবার সময় অনেকটা ভাঙ্গিয়া যায়। এজন্য অনেক ক্ষতি হয়। জাপান কাচ-শিল্পে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জাপান কাচ-শিল্পে (Glass manufactures) পৃথিবীর মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক সময়ে জাপানী বৈদ্যুতিক বাতি তেমন ভাল হইত না কিন্তু এখন জাপান Electric Bulbs এর প্রচুর উন্নতি করিয়াছে। নিপ্পো (Nippon) হইতে প্রচুর পরিমাণে কাচের জিনিষ ভারতবর্ষে আসে। ইউরোপ হইতে কাচের মাল আমদানী হইতে বিলম্ব হয়, তারপর তাহা আসিবার সময় অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু জাপান হইতে মালপত্র অল্প সময়ে আসে বলিয়া ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া তেমন নষ্ট হইতে পারে না। আর জাপানী কাচের জিনিষ এত সস্তা বিক্রয় হয় যে ধনী, দরিদ্র প্রায় সকলের ঘরেই জাপানী কাচের জিনিষ দেখা যায়।

ভারতবর্ষে কাচের ব্যবসায়ের বিশেষ প্রসার হইতে পারে। ভারতে কাচের কারখানা বেশী— হইলে ভারতের চাহিদা আংশিক পরিমাণে ভারতের নির্ম্মিত কাচের সাহায্যেই মিটিতে পারে।

কাচের ব্যবহার আজকাল পৃথিবীর সব দেশেই বাড়িয়া গিয়াছে এবং আশা করা যায় দিন দিন আরও বাড়িয়া চলিবে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা ইহা নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে যে কাচের পাত্রে খাদ্য দ্রব্যাদি, ঔষধ-পত্র প্রভৃতি রাখিলে তাহা অবিকৃত থাকে। অন্য যে কোন ধাতু পাত্রেই রাখ না কেন তাহা খারাপ হয় এবং নানাভাবে জীবাণু সংযুক্ত হয়, কাচের জিনিসের দিক্ দিয়া সে সম্ভাবনা একরূপ নাই বলিলেই চলে। এসব নানা কারণেই কাচের বাসনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে। কাচের তৈয়ারী দ্রব্যাদি হাল্কা, সহজেই বহন করিয়া নেওয়া যায়। সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিলে কাচের জিনিষ সহজে ভাঙ্গিয়াও যায় না। স্বচ্ছ, দেখিতে সুন্দর এবং সহজ বহনযোগ্য হিসাবেও কাচ সর্ব্বত্র সমাদৃত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তোমার বাড়ীর ল্যাম্পের চিম্‌নী, ইলেকট্রিক বাতি, ঔষধ খাইবার শিশি-বোতল সবইত কাচের। ঘরের দরজা, জানালা, আলমারি ইত্যাদি কাচের দ্বারা শোভিত হইয়া অতি সুন্দর দেখিতে হয়। রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের প্রায় সমুদয় যন্ত্রপাতিইত কাচের তৈরী! এই ভাবে নানা দিক্ দিয়াই সভ্যদেশে কাচের ব্যবহার দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে।

ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর কাচের চুড়ি ছাড়া অন্যান্য কাচের জিনিষ এত বেশী আসে যে তোমরা সে হিসাব দেখিলে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে।

দর্শনের কথা

৩১১৩ পৃষ্ঠার পর

অ্যারিষ্টটলের দর্শনের খানিকটা পরিচয় তো তোমরা পেয়েছ, কিন্তু তাঁর পুরোপুরি পরিচয় ছ'য়েকটা প্রবন্ধ কেন, ছ'চারখানি বই লিখেও দেওয়া সম্ভব নয়। এককথায় তিনি ছিলেন যাকে বলে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, সমস্ত দিকে তাঁর প্রতিভা ছিল অসামান্য।

বিজ্ঞানেরও গোড়া পত্তন তাঁরই হাতে সুরু হয়—সে বিষয়ে অনেক মজার মজার গল্প আছে। আলেকজান্দারের নাম তোমরা শুনেছ—আমরা তাঁকে বলি সিকান্দার শাহ। গ্রীস দেশ থেকে তিনি পৃথিবী জয় করতে বেরিয়েছিলেন এবং ছুনিয়ার বহুদেশ জয় করতে করতে ভারতবর্ষে এসে হাজির হন। সেই সিকান্দার শাহ ছিলেন অ্যারিষ্টটলের শিষ্য। পৃথিবী জয়ে বেরোবার সময় সিকান্দার গুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন—বিদেশ থেকে তিনি গুরুর জন্য কি আনবেন? অ্যারিষ্টটল বল্লেন, দেশ-বিদেশের যত জানোয়ার পাখী জীবজন্তু, সবগুলিরই এক এক জোড়া আমাকে পাঠিও।

তোমরা তো সবাই নিশ্চয়ই চিড়িয়াখানা দেখেছ। কত রকম জানোয়ার সেখানে, কত অদ্ভুত তাদের চেহারা! ছুটির দিনে চিড়িয়াখানায় জিরাফের লম্বাগলা আর হিপোর সুন্দর চেহারাখানাও দর্শনীয়!

কিন্তু অ্যারিষ্টটলই বোধ হয় প্রথম চিড়িয়াখানা তৈরী করবার কথা ভাবেন। এবং তিনি চিড়িয়াখানা করেছিলেন বিজ্ঞানের খাতিরে। যত জীবজন্তু প্রাণী তাঁর কাছে আসত, তিনি তাদের এমন করে সাজিয়ে রাখতেন যে একবার চিড়িয়াখানা দিয়ে বেড়িয়ে এলেই পৃথিবীতে সমস্ত জীবনই যে এক সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকতনা। তোমরা হয়ত হাসছ, ভাবছ সে আবার কেমন করে হবে? মানুষের সঙ্গে কুমীরের সম্বন্ধ কি? আর গাছ-পালাকে কি জ্যান্ত বলা চলে?

অ্যারিষ্টটল সোজা পাত্র ছিলেন না, তাঁকে অত সহজে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অনেক পোকামাকড় আছে যে তাদের দেখলে তারা যে কি বোঝাই যায় না—মনে হয় এক টুকরো কাল কাঠ পড়ে আছে। কোথাও বা মনে হয় যে বুঝি গাছের পাতায়ই একটু দাগ। তাদের কে সাজিয়ে তার পাশে রাখলেন ফড়িংয়ের মতন জীব—তাদের কাঠও মনে হয় না, আবার কাঠফড়িংয়ের সঙ্গে তাদের মিলও সহজেই চোখে পড়ে। তারপরে ধর আরো কত রকমের জানোয়ার—একটার পরে একটি এমন করে তিনি সাজিয়ে রেখেছিলেন যে

তাদের মধ্যে যোগ সহজেই ধরা পড়ে, আবার যদি আগের আর গোড়ার জন্তুর দিকে তাকাও, তবে মনে হবে তাদের মধ্যে একটুও মিল নাই, থাকতে পারে না।

ছয়টা তিনটের-দুগুণ। জীবজন্তুর বেলায়ও ঠিক তেমন।

বড় হয়ে অ্যারিষ্টটলের কথা আরো অনেক জানবে—অনেক শিখবে, এবং তাঁর মতামত সব

অ্যারিষ্টটল ও প্লেটো

যেমন ধর, একটা ভাগে যদি তিনটে কমলা থাকে আর একটায় চারটে, তবে তাদের মধ্যে তফাৎ কতটুকু? তেমনি চারটের সঙ্গে পাঁচটার বা পাঁচটার সঙ্গে ছয়টারও বেশী তফাৎ নেই, অথচ তিনটের সঙ্গে ছয়টার তফাৎ এই যে

হয়তো তোমাদের ভালও লাগবে না। কিন্তু তবু তাঁর অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয়ে অবাক হয়ে ভাববে—একটা মানুষের মাথায় এত বিদ্যা ধরল কেমন করে?

অ্যারিষ্টটলের পর বহুদিন আর ইয়োরোপের

দর্শনে নতুন তেমন কিছু আবিষ্কার হয়নি। দার্শনিক তখনো অনেকেই ছিলেন, কিন্তু তাঁরা **প্লেটো** আর **অ্যারিষ্টটলের** দর্শনের বিচার করেছেন বেশী,
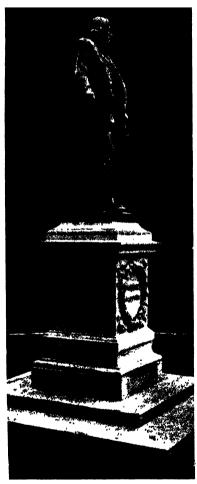
লণ্ডনের 'গ্রে-ইন' নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত বেকনের প্রস্তর মূর্ত্তি

নিজেরা আর নতুন কোন তথ্য সংগ্রহ করেননি। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন **একুইনাস**। তিনি মানুষের আত্মার সঙ্গে শরীরের সম্বন্ধ কি বিচার করতে চেষ্টা করেছিলেন। আর একজন বললেন যে আত্মা যখন অশরীরি, তখন দেহের সঙ্গে তার সম্বন্ধ হবে কি করে?

এমনি তর্কবিতর্কের মধ্যে ইউরোপের দর্শন পথ হারিয়ে ফেলেছিল—তাদের যে সব তর্ক, তা শুনলে তোমরা আজ হাসবে। ডিম

বেকন—লর্ড চ্যান্সেলার

আগে না পাখী আগে তা নিয়ে সে-দিনকার ইউরোপের পণ্ডিত মাথা ঘামিয়েছেন—আর মাথা ঘামিয়েছেন একখণ্ড চুলের উপর কয়টা ফেরেস্তা নাচতে পারে তার চুলচেরা হিসাব নিয়ে। ইউরোপের সেই দুর্দ্দিনে আরবেরা নিয়ে এলেন এক নতুন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলো। আজকাল

যেমন আমাদের সব কলকজা আসে বিদেশ থেকে, এমন কি আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে কেউ কেউ কাপড় পর্য্যন্ত বিলাতী পরে, লেখাপড়া শিখ্তে আমরা যাই ইউরোপে, তখনকার দিনে কিন্তু ঠিক ছিল উল্টো। ইউরোপের লোক শিক্ষার জন্য তাকিয়েছিল আরবদেশের দিকে। তাদের লর্ড চ্যান্সেলর বেকনের চেয়ে দার্শনিক বেকনের কথাই লোকে বেশী মনে রেখেছে। অ্যারিষ্টটলের মতন তিনিও ছিলেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত—এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—সমস্ত বিদ্যা, সমস্ত জ্ঞান আমার আয়ত্বের মধ্যে নিয়েছি—তাই দিয়ে নতুন সৃষ্টি কর্‌বার সাধনাই তাঁর সব চেয়ে কৃতিত্ব।

লণ্ডনের বিখ্যাত গ্রে-ইন (Gray's Inn) নামক গৃহ

সমস্ত চিন্তাকে মুক্তি দিল আরবদের জ্ঞান। তারই ফলে ইউরোপে আবার নতুন দর্শনের যুগ শুরু হ'ল।

নতুন যুগের দার্শনিকদের মধ্যে প্রথম এবং স্মরণীয় নাম—**বেকন**। তিনি যে কেবলমাত্র দার্শনিক ছিলেন, তা নয়। এলিজাবেথীয় যুগে বিলেতে তাঁর মত আইনজ্ঞ ও বেশী ছিল না। তবু

দর্শনের অনেক গল্প তো তোমরা শুন্‌লে—অনেক জিনিসই হয়তো তোমাদের নতুন লেগেছে। অনেক সময় তোমরা ভেবেছ—এ সমস্ত জিজ্ঞাসার সার্থকতা কি? সে প্রশ্নের উত্তর বেকন যেমন স্পষ্ট ভাবে দিতে চেয়েছেন (এবং বোধহয় পেরেছেনও) এমন আর কেউ বোধহয় পারেননি! তিনি বল্লেন—জিজ্ঞাসার সার্থকতা এই যে জিজ্ঞেস

না কর্‌লে জানা যায় না। এবং না জান্‌লে কোন কিছু করবারও কোন উপায় নেই। ধর, আগুনে যে রান্না করা যায়, এ-কথাটা তো আমরা প্রায় বিনা বাক্যে বিনা সন্দেহে মেনে নিই। কিন্তু আগুনে যে সত্যই রান্না করা যায়, সে তত্বটাও একদিন আবিষ্কার করতে হয়েছে। যে জিনিষটা আমরা জানি, তা সহজেই আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। সাইকেল চালাতে যখন প্রথম

দার্শনিক বেকন

শেখ, তখন কি কষ্ট? কিছুতেই আর সাইকেলটা ঠিক থাকেনা। একবার বাঁয়ে একবার ডাইনে কেবলি হেলে পড়ে। অথচ যখন চালাতে শিখলে তখন তো কিছুই মনে হয় না—এমন কি হাত ছেড়ে দিয়ে চালানও তখন আর কষ্টকর নয়।

আগুনে রান্নার সম্বন্ধে একটা বেশ মজার গল্প আছে—তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পড়ে থাকলেও বোধহয় বেশীর ভাগই তা জাননা। ল্যাম্বের (Lamb) পোড়া মাংসের গল্প কোনদিন পড়েছ? এক ছিল চীনা—সে একদিন বাড়ী ফিরে দেখে যে তার বাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গোরু, ভেড়া, মুরগী ও শূয়োর যা কিছু ছিল, সব গেছে জলে। নেহাৎ বিষণ্ণভাবে ছাইগুলো নেড়ে চেড়ে দেখছে যে কোন কিছু বাঁচল কিনা। এমন সময় হঠাৎ পোড়া-মাংসে আঙ্গুল গেল পুড়ে। বেচারা আর কি করে, তাড়াতাড়ি আঙ্গুল চুষতে গিয়ে দেখ্‌ল যে ভারীতো মজা! তখন আবার পোড়ামাংসে আঙ্গুল ঠেকিয়ে দেখে যে খেতে সত্যি চমৎকার—এ-রকম সে আর কোনদিন খায়নি। তখন থেকে প্রায়ই তার বাড়ী পুড়তে লাগল। অনেকদিন পরে শেষে সে আবিষ্কার কর্‌ল যে সমস্ত বাড়ী না পুড়িয়েও মাংস পোড়ানো যায়—এই হ'ল রান্না আবিষ্কারের ইতিহাস।

বেকনও তাই বল্লেন যে সব কিছু আমাদের জানতে হবে, না জানলে কেমন করে প্রকৃতিকে বশ মানাব? আজ যে আল্‌কাতারা থেকে রাস্তা তৈরী হচ্ছে, সরবত তৈরী হচ্ছে, সুগন্ধ তৈরী হচ্ছে, খাবার জিনিষ কত তৈরী হচ্ছে—সে সম্ভব হ'ল কেমন করে? আলকাতরার প্রকৃতি জেনেই তো তা সম্ভব হয়েছে। সে বিষয়ে যদি কোনদিন কেউ জিজ্ঞেস না করত, তবে তো আর এ-সমস্ত জিনিষ তৈরী হ'ত না। দর্শনেরও কাজ হ'ল জিজ্ঞেস করা—কেবলমাত্র এ সব বস্তুর বিষয়েই জিজ্ঞেস নয়, ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানে যে সমস্ত জিজ্ঞেস করা হয়, তাদের জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাও দর্শনের কাজ।

এই জিজ্ঞাসা করেছিলেন বলেই বেকন বড় দার্শনিক। বিজ্ঞানে যে আমরা নতুন নতুন তথ্য জান্‌তে পাই, সে-সমস্ত জানবার সত্যিকার উপায় কি? কি ভাবে চল্‌লে বিজ্ঞান তাড়াতাড়ি এগুতে পারে, তার বিচার কর্‌তে গিয়ে বেকন বল্লেন যে, প্রথমে সব জিনিষ লক্ষ্য কর্‌তে হবে, তাদের হিসেব রাখতে হবে, কিন্তু কেবলমাত্র দেখে আর হিসেব লিখে আর কতদূর এগুনো যায়? তোমরা যা কিছু দেখেছ, সবগুলির যদি লিষ্টি তৈরী কর, তবে তাতেই বা বেশী কি লাভ? তাই কেবলমাত্র লিষ্টি কর্‌লে চলে না—কিসের

সঙ্গে কিসের যোগ তারও হিসেব রাখতে হবে। এ রকম যোগ রয়েছে সে কথা যদি একবার ধরা পড়ে, তবে তো আর ভাবনা নেই—নতুন বিজ্ঞানের একটা সূত্র আবিষ্কার হ'ল। অক্সিজেন যত যোগানো যায়, আগুন তত বাড়ে; অক্সিজেন কমলে আগুনও কমে আসে আর অক্সিজেন না থাকলে আগুন নিভে যায়—কাজেই অক্সিজেনের সঙ্গে আগুনের যোগ।

বেকনের একখানা নাম করা বইয়ের নাম—New Atlantis—নতুন অতলান্ত দেশ। সে এক

বেকন তাঁহার বিখ্যাত 'Essays' নামক গ্রন্থ লিখিতেছেন

মানস রাজ্য—বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাসায়নিক, পদার্থবিদ্, অর্থনৈতিক, কেবলমাত্র জ্ঞানীর হাতে সে-দেশের শাসনভার। তাই সে দেশের লোক আকাশে উড়বার যন্ত্র বের করেছে। সমুদ্রের তলায় তাদের জাহাজ চলে। গ্যাস দিয়ে তারা অসুখ সারায়—পড়ন্ত জলে তাদের দেশে কল চলে। এ সব বেকন লিখেছেন কবে জান? আজ থেকে তিনশো বছরেরও আগে! তখন এরোপ্লেন সাবমেরিণ তো দূরের কথা—রেলগাড়ী বা ষ্টিমারের স্বপ্নও মানুষ দেখতে সুরু করেনি!!

নতুন যুগের দার্শনিকদের মধ্যে বেকন প্রথম হলেও আধুনিক দর্শনের সুর এবং গুরু দেকার্ড। বেকন বিজ্ঞানের নতুন একটা পথ দেখিয়ে গেলেন, বল্লেন যে কেবলমাত্র বসে বসে গুটিপোকার মতন পেট থেকে তথ্য বের করলে চলবেনা—চোখ মেলে দেখতে হবে, শুনতে হবে, শিখতে হবে। কেবল তাই নয়। অ্যারিষ্টটলের সময় থেকেই তর্কশাস্ত্র দিয়ে মানুষ কেবল প্রমাণই করত, নতুন তথ্য আর আবিষ্কার করত না। মানুষ মরে, রহিম মানুষ, কাজেই রহিমও মরবে—এই ছিল তর্ক-শাস্ত্রের পরিধি। বেকন বল্লেন, মানুষ যে মরে সে কথা যদি সত্যিই জানি তবে একথাও জানি যে রামও মরবে, রহিম ও মরবে—কাজেই এখন আর তর্ক দিয়ে নতুন কিছু শেখা হ'ল কই? তাই তিনি বল্লেন যে তর্কশাস্ত্রের কাজ তা নয়—যে কথা জানাই আছে তার দ্বিরুক্তি করে বিজ্ঞান ও এগোয় না, দর্শনের ও গৌরব বাড়ে না। অনেক দেখা শোনার ফলে বিজ্ঞান নতুন তথ্য আবিষ্কার করে—সেই আবিষ্কার কেমন করে সম্ভবপর, তাই হ'ল দর্শনের বিচারের বিষয়। অক্সিজেন ও আগুনের কথা তোমাদের আগেই বলেছি—অমনি আরো হাজারো যোগ রয়েছে প্রকৃতির মধ্যে, তাদের খোঁজা, তাদের আবিষ্কার করবার রীতি ঠিক করাই দর্শনের লক্ষ্য।

দেকার্ডও নিজে বৈজ্ঞানিক ছিলেন—অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর অনেক অনেক আবিষ্কার আছে। জ্যামিতি তোমরা তো সবাই পড়, কিন্তু তার সঙ্গে পাটীগণিত বা বীজগণিতের যে যোগ আছে, সে-কথা কি তোমাদের সহসা মনে হয়? সেই যোগ দেকার্ডই প্রথমে আবিষ্কার করেছিলেন, এবং আজ পর্য্যন্ত গণিতজ্ঞদের মধ্যে তাঁর স্থান খুবই উঁচু।

রাজনীতি নিয়েও দেকার্ড এককালে নাড়াচাড়া করেছিলেন—তোমরা হয়তো ভাবছ দার্শনিক আবার—গণিতজ্ঞ, রাজনীতিবিদ্ হ'ল কেমন করে? কিন্তু আসলে দেখবে যে যাঁরাই বড় দার্শনিক, তাঁরাই কেবলমাত্র দার্শনিক নন। তাঁরা পৃথিবীর জ্ঞান ও বিস্তার দিক্ দিয়ে অনেক কিছু কাজ করেছেন।

আগ্নেয়গিরির দ্বারা কি পৃথিবীর কোন মঙ্গল হয় ?

যখন কোন আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্ন্যুৎপাত হয় তখন যে কত বড় অমঙ্গল হয়, সেকথা আর তোমাদের বলিতে হইবে না, তোমরা অমনি পম্পি নগরীর ধ্বংসাবশেষের কথা বলিয়া নজির উপস্থিত করিবে। কিন্তু ঐ সব উদাহরণ বাদ দিলে বৈজ্ঞানিকদের মতে আগ্নেয়গিরির নিঃস্রাব দ্বারা পৃথিবীর উপকার হইয়া থাকে। এজন্য বৈজ্ঞানিকেরা আগ্নেয়গিরির নিঃস্রাবকে পৃথিবীর "Safety valves" নামে আখ্যা দিয়াছেন—তাঁহারা বলেন, আগ্নেয়গিরির নিঃস্রাব দ্বারা পৃথিবীর গভীরতম অংশে যে সকল গলিত ধাতু, প্রস্তর ইত্যাদি আছে' তাহা আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়া এবং পার্শ্বস্থ রন্ধ্র পথে বাহির হওয়ার ফলে পৃথিবী ভূমিকম্পের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে ঘন ঘন ভূমিকম্প হইয়া পৃথিবীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটিত। এবং কত সুন্দর সুন্দর জনপূর্ণ নগর-নগরী যে ধ্বংস হইত তাহার অবধি থাকিত না, কিন্তু আগ্নেয়গিরির নিঃস্রাবের জন্য তাহার আক্রমণ হইতে আমরা রক্ষা পাইতেছি।

পৃথিবী জুড়িয়া সব সুদ্ধ প্রায় ৩০০। ৪০০ শত আগ্নেয়গিরি আছে। ঐ সব আগ্নেয়গিরি হইতে ভস্ম, গলিত ধাতু ও প্রস্তর খণ্ড উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। আগ্নেয়গিরিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। সজীব, নির্জীব ও মৃত। বিসুবিয়স্, এটনা, ষ্ট্রম্বোবলি প্রভৃতি সক্রিয়, জাপানের ফুজিয়ামা, প্রভৃতি নির্জীব বা নিষ্ক্রিয়, যেন একেবারে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। আর কতকগুলি একেবারে মৃত, যেমন স্নোডোন্ (Snowdon)।

আগ্নেয়গিরি যে পৃথিবীর অমঙ্গলের কারণ নহে, তাহা বোধ হয় এইবার বুঝিতে পারিলে।

বিদ্যুতের দৈর্ঘ্য কত ?

আকাশে আমরা বিদ্যুৎ চমকাইতে দেখি। যাঁরা বিদ্যুৎ সম্বন্ধে গবেষণা করেন তাঁরা বলেন যে আমরা আকাশে যত বড় দীর্ঘ বিদ্যুৎ ঝলকিতে দেখি, তাহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় তদনুরূপই থাকে। এ বিষয়ে আমাদের চোখের কোন ভুল হয় না। কোন সময় একটা একটা বিদ্যুৎ পাঁচ মাইল দীর্ঘ হইয়া থাকে। আর ঐরূপ বিদ্যুতের শক্তি (Energy) ২০০ টন ভারী একখানি রেলগাড়ীর প্রতি ঘণ্টায় ৫০ মাইল গতির সমান।

সামুদ্রিক রক্ত-শৈবাল

বেতার তরঙ্গের গতি-ভঙ্গী

যাঁহারা আজকাল রেডিও সেট দিয়া ইংলণ্ড বা ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ হইতে প্রেরিত বেতার-বার্ত্তা শুনিয়া থাকেন তাঁহারা প্রায় প্রশ্ন করেন যে পৃথিবীর কুব্জ পৃষ্ঠের উপর দিয়া বেতার ঢেউ কিরূপে ঘুরিয়া আসে। প্রশ্নের তাৎপর্য্য ১৩নং চিত্র হইতে বোঝা যাইবে। চিত্রে দেখা যায় যে প্রেরক যন্ত্র হইতে ঢেউ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। ঢেউ যদি তীর অঙ্কিত পথে সোজা মুখে চলে তা'হইলে তাহা পৃথিবী ছাড়াইয়া চলিয়া যাইবে, পৃথিবীর কুব্জ পৃষ্ঠ অনুসরণ করিয়া গ্রাহক যন্ত্রে পৌঁছিতে পারিবে না। কিন্তু বাস্তবিক দেখা যায় যে যদিও পৃথিবীপৃষ্ঠে আমেরিকা ভারতবর্ষের উল্টা দিকে অবস্থিত তবুও আমেরিকা হইতে শক্তিশালী প্রেরক যন্ত্রের ঢেউ ভারতবর্ষে পৌঁছায়। বেতার ঢেউ এই ভাবে পৃথিবীর কুব্জ পৃষ্ঠ অনুসরণ করিয়া কিরূপে ঘুরিয়া আসিতে সক্ষম হয় সে সম্বন্ধে কিছু বলিব।

কুব্জ পৃষ্ঠ অনুসরণ করিয়া আসার কারণ প্রথম নির্দ্দেশ করেন ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অধ্যাপক হেভিসাইড (Prof. Heaviside) ও আমেরিকার অধ্যাপক কেনেলি (Prof Kennely) এই বৈজ্ঞানিকদ্বয় পরিকল্পনা করেন যে পৃথিবী পৃষ্ঠ হইতে যদি ৫০।৬০ মাইল উর্দ্ধে উঠা যায় তবে দেখা যাইবে যে সেখানকার বিরল বায়ুমণ্ডল বিদ্যুৎ-পরিচালক। আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ সাধারণ বায়ু রাশি বিদ্যুতের অপরিচালক। সূর্য্যকিরণের বেগুনিয়ার পরের অদৃশ্য (Ultra-violet) রশ্মিগুলি উচ্চস্তরের বায়ু মণ্ডলের উপর পড়িয়া সেখানকার অণু-পরমাণুগুলিকে বিদ্যুৎ-কণা (electron) ও বিদ্যুৎসঞ্চারিত পরমাণুতে বিভক্ত করিয়া ফেলে। তাহার ফলে ঐ উচ্চ স্তরের বায়ু মণ্ডল অতি মাত্রায় বিদ্যুৎ-পরিচালক না

হইয়া পারে না। এখন বিদ্যুৎ পরিচালক বস্তুর একটা ধর্ম্ম এই যে, তাহা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রতিফলিত করিতে পারে—কতকটা দর্পণের আলোক-তরঙ্গ প্রতিফলিত করার মত। পৃথিবী ঠিক যেন ৫০।৬০ মাইল উপরে একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ-প্রতিফলক আস্তরণে

১৩ নং চিত্র
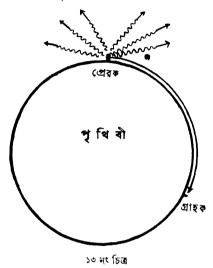
প্রেরক যন্ত্র হইতে ঢেউ তীরমুখে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। মনে হয় যে ঢেউ পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, পৃথিবীর কুব্জ পৃষ্ঠ অনুসরণ করিয়া বেশী দূর যাইতে পারিবে না। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায় যে বেতার ঢেউ পৃথিবীর পৃষ্ঠ দিয়া বহু দূর পর্য্যন্ত যায়। এমন কি পৃথিবীকে পাক দিয়া ঘুরিয়া আসিতে পারে।

ঢাকা রহিয়াছে। ইহার ফলে প্রেরক যন্ত্র হইতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পৃথিবী পৃষ্ঠ ছাড়াইয়া বেশী দূর যাইতে পারে না; ৫০।৬০ মাইল উপরে গিয়াই এই স্তর হইতে প্রতিফলিত হইয়া আবার নীচের দিকে ফিরিয়া আসে। প্রেরক যন্ত্র হইতে বেতার ঢেউ এই ভাবে পরিচালক স্তরে প্রতিহত হইয়া গ্রাহক যন্ত্রে কিরূপে পৌঁছায় তাহার একটা ছবি (১৪ নং চিত্র) দেওয়া গেল।

কুব্জ ভূপৃষ্ঠ অবলম্বন করিয়া long wave, medium wave, short wave ইত্যাদি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গের গতি-ভঙ্গী এখানে এই প্রসঙ্গে উত্থাপন করা আবশ্যক। ২০।৩০ হাজার মিটার হইতে হাজার মিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গকে long wave বলা হয়। হাজার হইতে একশত মিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গকে medium wave ও একশত মিটারের কম দৈর্ঘ্যের তরঙ্গকে short wave বলা হয়। ঢেউএর দৈর্ঘ্যভেদে পৃথিবী পৃষ্ঠে ঢেউএর গতি-ভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হয়। উচ্চাকাশে প্রতিফলক স্তরের সাহায্যে লং ওয়েভ যে ভাবে যায় মিডিয়ম বা শর্ট ওয়েভ সে ভাবে যায় না। ঢেউএর দৈর্ঘ্য কাহাকে বলে তাহা আগে বলা হইয়াছে (শিশু-ভারতী ৩২৮৪ পৃষ্ঠা দেখ)। মার্কনি কর্ত্তৃক বেতার টেলিগ্রাফি প্রচলনের সুরু হইতে ১৯২২।২৩ সাল পর্য্যন্ত লং ওয়েভেরই বেশী প্রচলন ছিল। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে বেতার টেলিগ্রাফের যে তরঙ্গ ব্যবহৃত হইত তাহার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১৯০০০ মিটার! শর্ট ওয়েভের প্রচলন সুরু হয় প্রায় ব্রড-কাষ্টিং এর প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ও ইহার সূত্রপাতের ইতিহাস অতি কৌতূহলো-দ্দীপক।

মহাযুদ্ধের পর ভাল্‌ভের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে সখ করিয়া নিজগৃহে বেতার প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র নির্ম্মান সুরু করিয়া-ছিলেন। এই সখের বেতারবিদেরা যাহাতে আন্তর্জ্জাতিক বেতার বার্ত্তায় বিঘ্ন জন্মাইতে না পারেন যে জন্য তাঁহাদের উপর হুকুম-জারি হইয়াছিল যে তাঁহারা মাত্র শর্ট

ওয়েভ ব্যবহার করিতে পারিবেন। মিডিয়ম ওয়েভের ব্যবহারও নিষিদ্ধ হইল কারণ মিডিয়ম ওয়েভ বেতার ব্রডকাষ্টিং প্রতিষ্ঠান গুলিকে দেওয়া হইল। সে সময়ে বেতার বিশেষজ্ঞ মহলে ধারণা ছিল যে short wave বিশেষ কোনও কাজে লাগে না। ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে বেতার বার্ত্তার আদান প্রদান করিতেছেন। আর ইহাদের যন্ত্রের শক্তিই বা কতটুকু? বড় বড় বেতার কোম্পানী যেখানে উচ্চ ও বিশাল আকাশে তার তুলিয়া সহস্র সহস্র কিলোওয়াট শক্তি ব্যবহার করেন এই
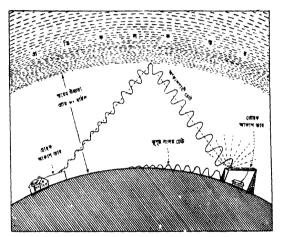
১৪ নং—চিত্র

প্রেরক ষ্টেষণের আকাশ তার হইতে বিচ্ছুরিত বিদ্যুৎ-তরঙ্গের কতক অংশ ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন হইয়া আসে। প্রেরক ষ্টেষণের কাছাকাছি ৪০।৫০ মাইলের মধ্যে যাঁহারা থাকেন তাঁহারা এই ভূপৃষ্ঠ-সংলগ্ন ঢেউ হইতে বেতার সংবাদ সংগ্রহ করেন। বিদ্যুৎ তরঙ্গের কতক অংশ উপরদিকে উৎক্ষিপ্ত হয। এই অংশ উচ্চাকাশে বিদ্যুৎ প্রতিফলক স্তর হইতে প্রতিফলিত হইয়া নীচে ফিরিয়া [illegible]। প্রেরক যন্ত্র হইতে যাঁহারা দূরে অবস্থিত তাঁহারা এই প্রতিফলিত [illegible] হইতে বেতার সংবাদ পাইয়া থাকেন।

দূরদেশে সংবাদ আদান প্রদানের জন্য ইহার কোনও কার্য্যকারিতা নাই। ইহার দৌড় প্রেরক যন্ত্র হইত বড় জোর একশত মাইল পর্য্যন্ত। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল যে সখের বেতারবিদেরা নিজেদের ঘরে বসিয়া এই শর্ট ওয়েভের সাহায্যে সখের বেতারবিদেরা সেখানে মাত্র ৫।১ ওয়াট শক্তির সাহায্যে দূর দেশে সংবাদ পাঠাইতেছেন। বৈজ্ঞানিক সমাজ প্রথমে ব্যাপারটাকে অবিশ্বাস্য বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়াই দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দিনের পর দিন

রিপোর্ট আসিতে লাগিল যে বাস্তবিক শর্ট ওয়েভের সাহায্যে অতি অল্প শক্তিতেই বহুদূরে বেতার বার্ত্তা পৌঁছাইতেছে তখন অবিশ্বাস করিবার আর কোনও উপায় রহিল না।

কি উপায়ে শর্ট ওয়েভ এত দূরে যাইতে সক্ষম হয় তাহা সন্ধানের জন্য উচ্চাকাশের বিদ্যুৎ প্রতিফলক স্তর সম্বন্ধে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেক গবেষণা হইয়াছে। গবেষণার ফলে আমরা এই স্তরের প্রকৃতি, গুণ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারিয়াছি। স্তরের তলদেশ ভূপৃষ্ঠ হইতে উপরে প্রায় ৬০ মাইল ঊর্দ্ধে অবস্থিত ও সেখান হইতে উপরে প্রায় ২০০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত (১৫নং চিত্র)। গবেষণার ফলে দেখা যায় যে পৃথিবীর কুব্জ পৃষ্ঠ অনুসরণ করিয়া যাইবার জন্য লং ওয়েভ ও শর্ট ওয়েভ উভয়ই উচ্চাকাশের এই প্রতিফলক স্তরের সাহায্য লয় বটে কিন্তু শর্ট ওয়েভের গতি ভঙ্গী লং ওয়েভের গতি ভঙ্গী হইতে বিভিন্ন। প্রতিফলক স্তর-ও পৃথিবী-পৃষ্ঠের মধ্যে ৬০ মাইল বিস্তৃত যে আকাশ-টুকু আছে লং ওয়েভ তাহারই মধ্য দিয়া যায়। পক্ষান্তরে শর্ট ওয়েভ বহু উচ্চে অবস্থিত বিদ্যুত প্রতি-ফলক স্তর আশ্রয় করিয়া তাহার মধ্য দিয়া চলে। নীচে অপেক্ষাকৃত

১৫ নং—চিত্র

পৃথিবীর উপরে বায়ু মণ্ডলের বিভিন্ন স্তর
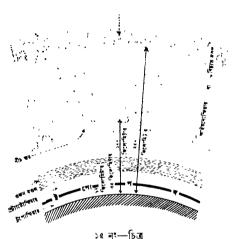
পৃথিবী পৃষ্ঠ হইতে ১২।১৪ কিলোমিটার পর্য্যন্ত বায়ু মণ্ডলকে তাপমণ্ডল (troposphere) বলে। এই খানে বায়ুরাশি পৃথিবী পৃষ্ঠ হইতে তাপ সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা উত্তপ্ত ও লঘু হয় ও উপরে উঠে। এই কারণে এইখানের বায়ুরাশি সর্ব্বদা আলোড়িত হয়। ঝঞ্ঝা, ঝটিকা, বৃষ্টি ইত্যাদি নৈসর্গিক ঘটনা এইখানে ঘটে। তাপ মণ্ডলের উপরে হিমমণ্ডল (stratosphere) এখানে উপরে উঠিলে বায়ুরাশির শৈত্য আর বাড়ে না—উষ্ণতা সমান থাকে। তাপমণ্ডল ও হিম-মণ্ডলের যেখানে বিভেদ হইয়াছে সেই অংশকে tropopause বলে। হিমমণ্ডলের উপরে ওজোনমণ্ডল। আকাশের এই অংশে ২০ হইতে ৪০ কিলোমিটার পর্য্যন্ত বায়ুতে অত্যধিক পরিমাণে ওজোন (ozone) বিদ্যমান। ওজোন মণ্ডলের উপরে প্রায় ১০০ কিলোমিটার হইতে ঊর্দ্ধে ২৫০।৩০০ কিলোমিটার পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ প্রতিফলক স্তর অবস্থিত। এই খানে বিরল বায়ুরাশিতে সূর্য্যের বেগুনীয়ার পরের রশ্মির ক্রিয়ার জন্য ইলেক্ট্রন ও বিদ্যুতাশ্রিত অল্পপরমাণু (ion) সৃষ্ট হয়। এই ইলেক্ট্রন ও ion গুলিই আকাশের এই স্তরবাশিকে বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রতিফলন (reflection) অথবা প্রতিসরণ (refraction) করিবার ক্ষমতা দেয়। এই স্তরের ইংরাজী নাম ionosphere, আমরা ইহাকে বিদ্যুৎ মণ্ডল বলিব। বিদ্যুৎ মণ্ডলের প্রধানতঃ দুইটি স্তর আছে—একটি নীচে ও অপরটি উপরে। দুইটি স্তরই বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রতিফলিত করিতে পারে।

ঘন বায়ুরাশির মধ্যে লং ওয়েভ শোষিত হয়। শর্ট ওয়েভ উচ্চাকাশের বিরল বায়ু-
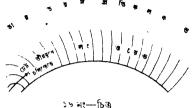
১৬ নং—চিত্র

লং ওয়েভের গতিভঙ্গী

বিদ্যুৎ প্রতিফলক স্তর ও পৃথিবী পৃষ্ঠের মধ্যে যে আকাশ তাহারই মধ্য দিয়া লং ওয়েভ চলে। এখানে বিদ্যুৎ তরঙ্গ অত্যধিক পরিমাণে শোষিত হয়।

রাশির মধ্য দিয়া যায় বলিয়া খুব কম শোষিত হয় (১৬ ও ১৭নং চিত্র)। সেই কারণে শর্ট ওয়েভ লং ওয়েভ অপেক্ষা অনেক অল্প শক্তিতে বহুদূর যাইতে পারে। উচ্চাকাশের এই প্রতিফলকে স্তর সম্বন্ধে কলিকাতা ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি অনেক গবেষণা হইয়াছে। কলিকাতার অনেক গবেষণাতে দেখা গিয়াছে যে ৬০ মাইলের নীচেও অনেক সময় - যথা ৪০ ও ২৫ মাইল ঊর্দ্ধে বিদ্যুত তরঙ্গ প্রতিফলক স্তরের আবির্ভাব হয়। এই সব স্তর দূরদর্শন বা টেলিভিসনের জন্য যে অতি হ্রস্ব তরঙ্গ (ultra-short wave) ব্যবহৃত হয় তাহাকে প্রতিফলিত করিতে পারে।

আমরা উপরে লং ওয়েভের ক্রটির কথা বলিয়াছি। কিন্তু এইখানে লং ওয়েভের স্বপক্ষে একটা কথা বলা আবশ্যক। লং ওয়েভের জন্য শক্তি বেশী লাগে বটে কিন্তু দূরে যেখানে বার্ত্তা পৌঁছায় সেখানে দিনে রাতে বা ঋতুভেদে বার্ত্তার সর্ব্বদাই প্রায় সমান জোর থাকে। পক্ষান্তরে শর্টওয়েভের জোর দিনে রাত্রে বা ঋতু ভেদে আকাশে সূর্য্যের অবস্থান অনুসারে খুব বেশী পরিবর্ত্তিত হয়। শর্টওয়েভের দৈর্ঘ্য সেজন্য অহোরাত্রের সময় ভেদে বা বৎসরের মধ্যে ঋতু ভেদে পরিবর্ত্তন করা হয়। যাঁহারা শর্ট ওয়েভে ইংলণ্ড বা ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের বেতার বার্ত্তা ধরেন তাঁহারা ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতায় নূতন শর্ট ওয়েভ প্রেরক যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইহার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হইল দিনমানে ৩১,৪৪ মিটার ও রাত্রে ৬১,৪৭ মিটার। শর্ট-ওয়েভের এই সব ক্রটি থাকা সত্ত্বেও আজ-কাল দূর দেশে বেতার বার্ত্তা প্রেরণের জন্য শর্টওয়েভেরই ব্যবহার হয়। লং-ওয়েভের ব্যবহার প্রায় উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।
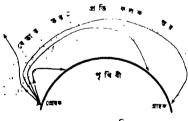
১৭ নং—চিত্র

শর্ট ওয়েভের গতি

শর্ট ওয়েভ প্রেরক যন্ত্রের আকাশ তার হইতে বাহির হইয়া ঊর্দ্ধমুখে যাইয়া বিদ্যুৎ মণ্ডলের ভিতর প্রবেশ করে ও বিদ্যুৎ মণ্ডলের উচ্চ অথবা নীচ স্তর অবলম্বনে বহুদূর পর্য্যন্ত যাইতে সক্ষম হয়। এইখানকার বায়ুরাশি অত্যন্ত বিরল, সেইজন্য শর্ট ওয়েভ বহুদূর পর্য্যন্ত যাইলেও খুব কম শোষিত হয়।
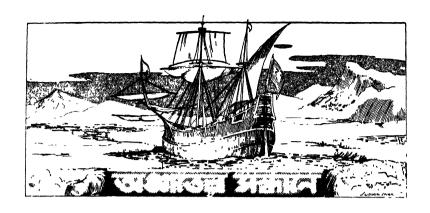
লুডোভিকো ভার্‌থেমার

ইটালীয় পর্য্যটক লুডো-ভিকো ভারথেমা'র নামের সঙ্গে তোমরা অনেকেই হয়ত পরিচিত নও। কারণ পর্য্যটক হিসাবে তিনি যে খুব বিখ্যাত ছিলেন তাহা নহে। কিন্তু তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক বলিয়াই তোমাদের তাহা শুনাইতেছি।

ভ্রমণে বাহির হইবার কারণ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন "আমি লোকের মুখে মুখে মিশর, সিরিয়া, আরব দেশ, ভারতবর্ষ এবং ইথিওপিয়া (বর্ত্তমান আবিসিনিয়া) সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিয়াছিলাম। কিন্তু লোকের মুখে শোনার চাইতে নিজের চোখের দেখার দাম অনেক বেশী। যে সব জায়গার কথা লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম সে সব জায়গা নিজের চোখে দেখিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবার ইচ্ছা আমাকে প্রবলভাবে পাইয়া বসিল। এ জন্যই আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িব।"

১৫০২ খৃষ্টাব্দের শেষ দিক দিয়া ভার্‌থেমার ইতালী ত্যাগ করিলেন এবং সেই বছরই আলেক-জান্দ্রিয়াতে পৌঁছিলেন। ভূগোল পড়িয়া তোমরা নিশ্চয়ই জানিয়াছ যে আলেকজান্দ্রিয়া মিশরদেশের প্রধান বন্দর। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩৩২ অব্দে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার এই নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন; তাঁহার নামানুসারেই এই নগরীর নামকরণ হয়।

আলেকজান্দ্রিয়া হইতে ভার্‌থেমা কায়রোতে গেলেন। তারপর আবার সমুদ্রোপকূলে ফিরিয়া আসিয়া জাহাজে চড়িয়া বেরাউটে (Beyrout) গেলেন। স্থলপথে আলেপ্পোর মধ্য দিয়া দামস্কাস সহরে গিয়া তিনি একজন ধর্ম্মত্যাগী খৃষ্টান্ সেনাপতির অধীনে ম্যামেলিউক্ সৈন্যদলে চাকুরী নিলেন। ভার্‌থেমা খুলিয়া না বলিলেও স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে তিনি নিজে কাজ হাসিল করিবার জন্য মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৫০৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল ৪০,০০০ লোক এবং ৩৫,০০০ উটের একটী বিরাট দল দামস্কাস্ হইতে মদিনা তীর্থ অভিমুখে রওনা হইল। ভার্‌থেমা এই দলে যোগ দিলেন। জর্ডান্ (Jordan) নদীর উপত্যকার পাশ দিয়া গিয়া মরুভূমি পার হইয়া সকলে চল্লিশ দিন পর মদিনা পৌঁছিলেন।

মক্কা নগরী মদিনা হইতে তিন দিনের পথ। একবার আরব-দস্যুরা এই দলটীকে আক্রমণ করিয়া অত্যন্ত বিব্রত করিয়াছিল। তাহাদিগকে উৎকোচ প্রদান করিয়া কিছুকাল ঠাণ্ডা রাখা হইল। অবশেষে ম্যামেলিউক সৈন্যদল আসিয়া পড়িল। ম্যামেলিউকদের হাতে প্রায় ১৬০০ আরব মারা পড়িল।

মদিনার চার মাইল আগে একটা বড় কূপের কাছে আসিয়া সকলে থামিলেন। উদ্দেশ্য পবিত্র-নগরীতে প্রবেশের পূর্ব্বে স্নান করা এবং পরিষ্কার পোষাক পরা।

মদিনা এবং মদিনার অধিবাসী সম্বন্ধে ভারথেমার ধারণা খুব ভাল নয়। কিন্তু তিনি হজরত মুহম্মদের সমাধি-মন্দির দেখিয়া তাহার খুব প্রশংসা করিয়াছেন।

মদিনা হইতে তিনি মক্কা আসিলেন। মক্কা নগরীর ভারথেমা খুব প্রশংসা করিয়াছেন। ভারথেমা বলিয়াছেন সহরটির যেমন সুন্দর অবস্থান, তেমনি উহার গঠনও অতি চমৎকার এবং একাধারে ইহা একটী বাণিজ্য-কেন্দ্র এবং পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। মক্কার বৃহৎ মস্‌জিদের সঙ্গে তিনি রোম-নগরীর কলোসিয়ামের তুলনা করিয়াছেন।

হজ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে ভারথেমার প্রবল ইচ্ছা হইল অন্যান্য দেশ দেখিবার।

সঙ্গী ম্যামেলিউকদের এড়াইয়া পালাইতে গিয়া ধরা পড়িলে বিপদ। বিপদ ঘাড়ে করিয়া জনৈক বণিকের সাহায্যে তিনি জিদ্দা বন্দরে পালাইয়া গেলেন। সেখান হইতে একটা বাণিজ্য জাহাজে চড়িয়া তিনি এডেনে উপস্থিত হইলেন। ভারথেমা লিখিয়াছেন "এডেন অতি চমৎকার সহর। ভারত-বর্ষ, ইথিওপিয়া এবং পারস্য হইতে যে সব জাহাজ আসে সে সবই এখানে আসিয়া জড় হয়। কোন জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিলে সুলতানের কর্ম্মচারী-গণ জাহাজে উঠিয়া পড়ে এবং জাহাজ কোথা হইতে আসিতেছে এবং জাহাজে কত লোক আছে তাহা জানিয়া নেয়। তারপর তাহারা জাহাজ হইতে পাল, মাস্তুল, নোঙর ইত্যাদি খুলিয়া লইয়া যায়, যেন সুলতানের প্রাপ্য না দিয়া জাহাজ লইয়া লোকেরা পালাইয়া না যাইতে পারে।"

এইবার দুর্ভাগ্যক্রমে ভারথেমা পড়িলেন মহা বিপদে। খৃষ্টান্ গুপ্তচর সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করা হইল। ভাগ্যে সেখানে তখন মৃত্যুদণ্ডের প্রথা প্রচলিত ছিল না, তাই তখন তিনি প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন। যখন তিনি হাত পা শিকলে বাঁধা অবস্থায় কারাগারে ছিলেন তখন একদল মূর ইউরোপীয়দের হাত হইতে পলাইয়া আসিয়া তাহাদের নৃশংস ব্যবহার বর্ণনা করিতে লাগিল। ইহাতে লোকেরা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কারা-গারের দিকে ছুটিল অন্যান্য সব ইউরোপীয়দিগকে মারিয়া ফেলিতে। অকথ্য অত্যাচার সহিয়া সে যাত্রা ভারথেমারের মরিতে হইত, কিন্তু রক্ষীদের তৎপর-তায় তিনি রক্ষা পাইলেন। নয় সপ্তাহ বন্দী থাকিবার পর এডেনের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে 'রাডা'তে সুলতানের দরবারে পাঠাইয়া দিলেন বিচারের জন্য। রাডা এডেন হইতে আট দিনের পথ। সুলতানের সম্মুখে ভারথেমাকে উপস্থিত করা হইলে তাঁহাকে এই কথা বলিতে আদেশ করা হইল—"এক আল্লা ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই, এবং মুহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ।" কেন্তু যে কারণেই হউক ভারথেমা এ কথা বলিতে পারিলেন না। ফলে আবার তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তাঁহাকে অতি সামান্য খাবার দেওয়া হইত, এবং পানীয় জলও প্রয়োজন মত দেওয়া হইত না।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময় সুলতানের সঙ্গে প্রতিবেশী একজন বিদ্রোহী সর্দ্দারের লড়াই বাঁধে। সুলতানের অনুপস্থিতিকালে ভারথেমা বেশ একটু চালাকী খেলিলেন। পাগ্‌লামীর নানারকম ভান করিতে করিতে তিনি সকলের মনে ধারণা জন্মাইয়া দিলেন যে তিনি বাস্তবিকই পাগল হইয়া গিয়াছেন। সুলতানের একজন বেগম ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে এডেনে পাঠাইয়া দিলেন সেখানে কোন পীরের চিকিৎসায় তাঁহার রোগ নিরাময় করিবার উদ্দেশ্যে কিন্তু ভারথেমা'র তো আর বাস্তবিকই মাথা খারাপ হয় নাই—তিনি পলাইবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন মাত্র। এডেন হইতে তিনি জাহাজে ভারতবর্ষ অভিমুখে পলাইয়া গেলেন।

প্রথম জাহাজ লাগিল আফ্রিকার উপকূলস্থ 'জেইলা'তে। এই স্থানটী ছিল ক্রীতদাস, হাতীর দাঁত এবং সোনার ব্যবসায়ের একটী কেন্দ্র।

সেখান হইতে বারবেরাতে থামিয়া তারপর গুজরাটের অন্তর্গত 'দিউ' বন্দরে জাহাজটী ভিড়িল।

তারপর পারস্য উপসাগরের মুখে ভার্‌থেমা তীরে নামিয়া স্থলপথে পারস্য ও আফগানিস্থান ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শিরাজে কাজাজিয়োনর নামে একজন পারস্যদেশীয় বণিকের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। এই বণিকের সঙ্গে মক্কায় ভার্‌থেমার বেশ খাতির হইয়াছিল। কাজাজিয়োনর ভার্‌থেমাকে পুরাতন বন্ধু বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার ভ্রমণের সঙ্গী হইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। কাজাজিয়োনর ভার্‌থেমাকে বাস্তবিকই ভালবাসিয়াছিলেন এবং ভার্‌থেমার সহিত নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহের কথা পাড়িয়াছিলেন। কিছুকাল একত্র ভ্রমণের পর তাঁহারা পারস্য উপসাগরের মুখে অর্মাজ দ্বীপে পৌঁছিলেন। সেখান হইতে জাহাজে চড়িয়া তাঁহারা আসিলেন গুজরাটের অন্তর্গত ক্যাম্বেতে। এখানকার সুলতানের গোঁফ জোড়া ছিল এমন বিষম লম্বা যে তিনি মাথার পিছন দিকে নয়টা গেরো দিয়া উহা বাঁধিয়া রাখিতেন। গুঁফো সুলতান হিসাবে তাঁহার বেশ একটু খ্যাতি ছিল।

ক্যাম্বে হইতে তাঁহারা ভারতের পশ্চিম উপকূল বাহিয়া দক্ষিণাভিমুখে 'গোয়া'তে পৌঁছিলেন। সেখান হইতে ভিতর দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা পৌঁছিলেন দাক্ষিণাত্যের রাজধানী বিজাপুর। বিজাপুরের রাজপ্রাসাদটী অতি চমৎকার। সেখান হইতে তাঁহারা গেলেন

বিজয়নগরের রাজার সৈন্য-বিভাগের যুদ্ধের হাতী

ক্যানানোর! ক্যানানোরে ভার্‌থেমা পর্তুগীজদের এড়াইয়া চলিলেন, নহিলে পাছে সঙ্গী কাজাজিয়োনর সন্দেহ করেন যে তিনি খাঁটি মুসলমান নন। তারপর তাঁহারা গেলেন কৃষ্ণা নদীর তীরে অবস্থিত বিজয়নগরে। বিজয়নগরের রাজার সৈন্য-বিভাগে ছিল চারিশত হাতী, লড়াইতে এই হাতী গুলিকে অদ্ভুতভাবে কাজে লাগানো হইত। প্রত্যেকটী হাতীর পিঠে লোহার শিকলের সাহায্যে জিন আট্‌কানো থাকিত। জিনের দুইধারে ঝুলানো থাকিত দুইটী বাক্স। প্রত্যেকটী বাক্সে

তিনটি করিয়া লোক থাকিত। হাতীর ঘাড়ের উপর দুইধারে দুই পা ঝুলাইয়া বসিত একজন লোক। সবশুদ্ধ এই সাতজন লোক হাতীর উপর চাপিত। হাতীর মাথা, কপাল এবং শুঁড়ের কতকটা ঢাকিয়া বর্ম্ম পরাইয়া দেওয়া হইত। বর্ম্মের সম্মুখভাগে এক গজ লম্বা একটা তলোয়ারের ফলা আঁটিয়া দেওয়া হইত। ঘাড়ের উপর যে লোকটা বসিত সে লোকটার হুকুম মত হাতী অগ্রসর হইত, পিছু হটিত এবং তলোয়ার চালাইত। কিন্তু হাতীগুলিকে এভাবে লড়াইতে পাঠানোর একটা বিপদ ছিল এই যে একবার কোনো কারণে ভয় পাইয়া ইহারা পলায়ন সুরু করিলে ইহা-দিগকে আবার ফিরায় কাহার সাধ্য? হাতীর সাহায্যে কিভাবে জাহাজে ঠেলিয়া জলে নামানো হইত ভারথেমা তাহারও বর্ণনা করিয়াছেন।

কালিকাট সম্বন্ধে ভারথেমা অনেক কিছু লিখিয়াছেন। বিখ্যাত পর্ত্তুগীজ নাবিক ও পর্য্যটক ভাস্কো-ডা-গামা এখানকার অধিবাসীগণকে খৃষ্টান বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন। এখানকার মন্দিরের গায়ে আঁকা শিশু বুদ্ধ ও বুদ্ধজননীর ছবি দেখিয়া তিনি শিশু যিশুখৃষ্ট এবং খৃষ্টজননী মেরী বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন। গামার ভুলের ইহা ভিন্ন আরো কারণও ছিল। ভারথেমা এরূপ ভুল করেন নাই। জাতিভেদ প্রথার ও তিনি মোটামুটি বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন।

হত্যার শাস্তি ছিল শূলে চড়াইয়া প্রাণদণ্ড। অন্যায় প্রহারের শাস্তি জরিমানা। কোনো ঋণী কিছুতেই ঋণ শোধ না করিলে ঋণদাতা কি উপায়ে ঋণ আদায় করিত শোন। সে ঋণী লোকটার চারি-দিকে একটা দাগ কাটিয়া দিয়া তিনবার বলিত :— "ব্রাহ্মণদের মাথার এবং রাজার দিব্বি, আমার পাওনা শোধ না করিয়া তুমি এই গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারিবে না।" ঋণী লোকটা হয় ঋণ শোধ করিত, না হয় সেখানেই অনাহারে মারা পড়িত কারণ ঐ গণ্ডীর ভিতরে তাহাকে আহার্য্য দিবার অধিকার কাহারো থাকিত না। এবং ঋণ শোধ না করিয়া ঐ গণ্ডীর বাহিরে পা বাড়ানোর একমাত্র শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড।

কালিকাটে পর্ত্তুগীজদের বার বার আক্রমণের ফলে বাণিজ্যের এমন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল যে কাজাজিয়োনরের ব্যবসায়ে সুবিধা হইতেছিল না। সুতরাং সে জায়গা ছাড়িয়া আরো কয়েক জায়গায় ঘুরিয়া কাজাজিয়োনর এবং ভারথেমা জাহাজে চলিয়া গেলেন টেনাসেরিম। যাইবার আগে কিছুদিন করমণ্ডল উপকূলে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজরা মালাবার উপকূলের মূরদের উপর অত্যাচার করিয়াছিল বলিয়া করমণ্ডল উপকূলের খৃষ্টানদের উপরও নানাপ্রকার অত্যাচার হইত।

টেনাসেরিমের সতীদাহ বা সহমরণ-প্রথা ভারথেমার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। এই প্রথাটীর সহিত যাহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িয়াছ তাহারাই পরিচিত আছ, সুতরাং বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। ভারথেমা আরেকটা অদ্ভুত প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন। কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে কি-ভাবে তাহাকে ভালবাসা জানাইত বলিতেছি। সে একটা ন্যাকড়া জলে ভিজাইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়া জ্বলন্ত ন্যাকড়াটা হাতের উপর রাখিয়া দিত। এদিকে হাতে পুড়িতেছে ; কিন্তু তাহার যেন ভ্রূক্ষেপ নাই, সে দিব্বি স্বাভাবিকভাবে স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে কথা বলিতেছে। ভাবটা যেন "দেখ, তোমার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে আমি আগুনের জ্বালায়ও ভ্রূক্ষেপও করিতেছি না। তোমার জন্য আমি কি না করিতে পারি?"

টেনাসেরিমের পেগুতে কিছুদিন থাকিয়া তাঁহারা দুজনে গেলেন পূর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জে (East Indies)। মালয় দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণকালে তাঁহারা মালাক্কাতে কিছুদিন রহিলেন। তখনো মালাক্কা টিনের খনির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তারপর সুমাত্রা জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি ঘুরিয়া আবার ফিরিয়া গেলেন ভারতবর্ষে। বোর্ণিও সম্বন্ধে ভারথেম একটা মস্ত ভুল করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন বোর্ণিওই পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দ্বীপ।

১৫০৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের প্রথম দিকে তাঁহারা কালিকাটে পৌঁছিলেন। ইউরোপীয় ভারথেমা এতদিন বিধর্ম্মীদের সংসর্গে থাকিয়া হয়রাণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই এবার তিনি ঠিক করিলেন যেমন করিয়াই হউক ক্যানানোরে

পর্ত্তুগীজদের দলে ভিড়িবেন। পর্ত্তুগীজরা সেখানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

কিন্তু ক্যানানোরে গিয়া পর্ত্তুগীজদের সঙ্গে যোগ দেওয়াও অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার। তিনি যে মুসলমান নন তাহা ধরা পড়িলে বিপদ। তিনি অসুখের ভাণ করিয়া কাজাজিনরকে বলিলেন তাঁহার বায়ু পরিবর্ত্তন দরকার, এবং ক্যানানোর জায়গাটাই তাঁহার পছন্দ। ধরা পড়িবার হাত হইতে অল্পের জন্য রক্ষা পাইয়া অবশেষে তিনি ক্যানানোরে পৌঁছিলেন। এবং সেখানকার পর্ত্তুগীজ অধ্যক্ষকে খবর দিলেন যে পর্ত্তুগীজ দুর্গ নষ্ট করিয়া দিবার জন্য কালিকাটে যুদ্ধ জাহাজ সাজানো হইতেছে।

ইহার অল্প পরেই দূরে সমুদ্রের বুকে দেখা গেল দুই শত নয়টি যুদ্ধ জাহাজ। পর্ত্তুগীজদের ছিল মাত্র ১৬ খানা। কিন্তু তবুও যুদ্ধে পর্ত্তুগীজরাই জিতিল। মুরদের জাহাজগুলি হটিয়া গেল।

ইহার পরে মুররা আবার আসিয়া চারমাস ধরিয়া পর্ত্তুগীজদের অবরোধ করিয়া রহিল। পরে কয়েকটা পর্ত্তুগীজ জাহাজ আসিয়া ক্যানানোরে পর্ত্তুগীজদের অবরোধের হাত হইতে রক্ষা করিল।

পর্ত্তুগীজরা ঠিক করিল মুরদের বেশ ভালরকম পাল্‌টা জবাব দিতে হইবে। তাহারা শত্রুদলকে তাড়া করিয়া নিয়া কালিকটের কিছু দক্ষিণে পানানী সহর দখল করিল, প্রচুর রক্তপাতের পর। এই আক্রমণে বীরত্বের জন্য ভারথেম্ পর্ত্তুগীজ রাজ-প্রতিনিধি ফ্রান্‌সিস্কো দ্য:আল্‌মেইদা (Francisco d' Almerida) হইতে নাইট্ উপাধি পাইলেন।

১৫০৭ খৃষ্টাব্দে ভারথেমা উত্তমাশা অন্তরীপ হইয়া পর্ত্তুগাল পৌঁছিলেন। তারপর ভারথেম সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না।

ভারথেমার জীবনীটি বড় সুন্দর। আপনার জীবনকে বিপন্ন করিয়া নানা বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া তিনি পৃথিবীর নানা দেশ পর্য্যটন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা বড়ই চিত্তাকর্ষক। তিনি যখন ভারতে আসেন তখন ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার বেশ একটি সুন্দর সঠিক বর্ণনা আছে। তাহা হইতে অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

ভারথেমার বর্ণনা হইতে মনে হয় যে তিনি দক্ষিণ ভারতেই আসিয়াছিলেন, উত্তর ভারতের কোন দেশে বা নগরে তিনি আসেন নাই, যদি আসিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই উত্তর ভারতের কোন কোন স্থানের বর্ণনা তাহাতে থাকিত।

দক্ষিণ ভারতের যে যে স্থানে তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানের বিবরণ ও সামরিক প্রথা সম্বন্ধে তাঁহার বিবরণ যে অনেকাংশেই সত্য তাহা পরবর্ত্তী ভ্রমণকারীদের বর্ণনা হইতে ও আমরা অনেকটা বুঝিতে পারি। সেকালের পর্য্যটকদের পক্ষে দেশ ভ্রমণ যে কিরূপ বিপজ্জনক ছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পার। ভারথেমার, বিজয়নগরের কথাও বলিয়াছেন। সে সময়ে বিজয়নগরের ঐশ্বর্য্য ও গৌরব ছিল সারা পৃথিবী বিস্তৃত। পর্ত্তুগীজ ভ্রমণকারীদের মধ্যে অনেকেই বিজয়নগরের ঐশ্বর্য্য ও গৌরবে কথা বলিয়াছেন।

সে সকল ভ্রমণকারীদের মধ্যে নিকলো কোণ্টি নামক একজন ইটালীদেশের পর্য্যটকের নাম ও উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৪২০ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর আসিয়াছিলেন।

বিজয়নগরের রাজাদের মধ্যে নরসিংহ রাজা ও কৃষ্ণ রায় বিশেষ গুণবান্ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত এবং তেলেগু সাহিত্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অনেক পণ্ডিত ও কবি তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ২৬শে তারিখে ভাস্কো-ডি-গামা কালিকটে আসিয়া পৌঁছেন ;— তিনি বিজয়নগরের অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা জানিতেন।

আমরা দেখিতে পাইলাম যে ভাস্কো-ডি-গামার আসিবার কয়েক বৎসর পরেই ভারথেমা ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। এই হিসাবেও ভারথেমার এই ভ্রমণ কাহিনী বিশেষ ভাবে আদরণীয়। আপনার জীবনকে বিপন্ন করিয়া যে ভাবে তিনি দেশেদেশে ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয়। এইরূপ অসাধারণত্ব ছিল বলিয়াই এক সময়ে এই সব অভিযানকারী ব্যক্তিগণ দেশে-বিদেশে যশঃ ও সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের লিখিত বিবরণী হইতে আমরা অনেক কথা জানিতে পারিতেছি।

ট্রেজার আইল্যাণ্ড

[ট্রেজার আইল্যাণ্ড 'বা রত্নদ্বীপ' বিখ্যাত লেখক রবার্ট লুই ষ্টিভেনসনের লিখিত একটি উপন্যাস। ইহার বিষয় শিশু-ভারতীতে, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এ বইখানা প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন উহার নাম ছিল "The Sea-Cook এবং "Young Folk" নামক একখানা ছোটদের কাগজে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইহা পুস্তকাকারে ছাপা হয়। ট্রেজার আইল্যাণ্ড নাট্যরূপে রূপান্তরিত হইয়া ও বহুবার অভিনীত হইয়াছে।

সমুদ্রের ধারে ছোট্ট সরাইখানা। ঐ সরাইখানার মালিক ছিলেন একবৃদ্ধ। সংসারে তাঁহার আপনার বলিতে ছিল কেবল তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার দশ বারো বৎসরের একমাত্র ছেলে জিম্। তাঁহারা ঐ তিনজনে মিলিয়া সরাইখানার সমস্ত কাজকর্ম্ম করিতেন এবং তাহা হইতে অল্প স্বল্প যাহা কিছু পাইতেন তাঁহাদের ঐ তিনটি প্রাণীর সংসার বেশ সুখে সচ্ছন্দেই চলিয়া যাইত।

সরাইখানায় কত লোক আসে যায়। সকলেই যাইবার সময়ে সেই সরাইখানার মালিক ও তাঁহার স্ত্রীর ব্যবহারে অত্যন্ত মুগ্ধ হইত এবং তাহাদের সব দেনা পাওনা মিটাইয়া দিয়া খুশী মনে বিদায় লইত।

দিন যায়। একদিন এক সন্ধ্যাবেলায় একজন বুড়ো জাহাজের ক্যাপ্টেন নাম তার বিল বোন্ প্রকাণ্ড একটা সিন্দুকের মত বাক্স কাঁধে করিয়া বহিয়া লইয়া আসিয়া সেই সরাইখানায় উপস্থিত হইল। লোকটার চেহারা ছিল কেমন একরকম রুক্ষ গোঁয়ার গোবিন্দের মত। তাহার ড্যাবা-ড্যাবা গোল-গাল লাল টকটকে চোখ আর উৎকট মুখের দিকে চাহিতেই ভয় করিত। তাহার উপর লোকটার মেজাজও ছিল বেজায় গরম। সে যাহাকে তাহাকে যখন তখন হঠাৎ এমন ধমক দিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিত যে তাহাতে সেই সব লোকেরা আর দ্বিতীয়বার তাহার কাছে পর্য্যন্ত ঘেঁষিতে সাহস করিত না। লোকটায় আরও একটি দোষ ছিল। সে বেজায় মদ খাইত, আর মদ খাইয়া তাহার বকুনি ও হুঙ্কারের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইত।

এ-হেন লোক যত শীঘ্র সরাইখানা হইতে বিদায় হয় ততই ভাল। কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া গেল অথচ লোকটা আর সেখান হইতে নড়িবার নামটি পর্য্যন্ত করে না। শুধু কি তাহাই। একে ত তাহার ঐরকম চড়া মেজাজ তাহার উপর সে আবার সরাইখানার পাওনা টাকাকড়ির এক পয়সাও মিটাইয়া দিবার নামটি পর্য্যন্ত করিত না। ইহাতে সে গরীব বেচারী সরাইয়ের মালিকের চলিবে কি করিয়া? কাজে কাজেই

যখন অনেক পাওনা বাকী পড়িল তখন একদিন সেই সরাইখানার মালিক উহাকে তাহার পাওনা শোধ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিল। ইহাতে সেদিন সে লোকটা বিরক্ত হইয়া এমন দাঁতমুখ খিঁচাইয়া ধমক দিয়া উঠিয়াছিল যে ঘরের ভিতরকার সমস্ত লোকজন ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া গিয়াছিল। সে ঘটনার পর হইতে সরাইখানার সব লোকে তাহাকে একেবারে যমের মত ভয় করিত। ঐ লোকটার ত্রিসীমানায় কেহই যাইতে ভরসা পাইত না।

গিয়া তাহার চোখে একটা দূরবীন লাগাইয়া বসিয়া বসিয়া চারিদিক লক্ষ্য করিয়া সে কি যেন দেখিত।

সেই অদ্ভুত লোকটার পোষাক-পরিচ্ছদও ছিল একেবারে ছেঁড়া-খোঁড়া। একমাত্র টুপি আর রং ওঠা সাত্‌শো তালী মারা এক কোট প্যাণ্ট ছাড়া তাহার আর কোনও পোষাক ছিল না। আর সব সময়েই লোকটা তাহার সেই সিন্দুকের মত বাক্‌সটার উপর এমনি কড়া নজর রাখিত যে কেহ যেন ইহা কখনও ছুঁইতে পর্য্যন্ত না পারে।

বিল বোন্‌ মদ খাইলে তাহার হুঙ্কারের মাত্রাটা আরও বাড়িয়া যাইত

কিন্তু জিমের প্রতি সে বড় সদয় ছিল। কাজেই জিম তাহার কাছে ঘেঁষিতে পারিত। লোকটাও মাঝে মাঝে জিম্‌কে দু-চার পয়সা বখ্‌শিশ দিত আর বলিত, "দেখ বাবা। একটা একপেয়ে খালাসিকে যদি কোন দিন এই সরাই-খানার দিকে আস্‌তে দেখ তাহলে আমাকে তখনি জানাতে ভুলো না যেন।" লোকটার নিজেরও কাজের মধ্যে কাজ ছিল এই যে প্রায়ই সমুদ্রের ধারে

আর সে নিজে মাঝে মাঝে ঐ বাক্‌সটা খুলিয়া কি সব কতগুলা কাগজপত্র বাহির করিয়া খুব মনোযোগ দিয়া দেখিত।

এইভাবে মাসের পর মাস কাটিয়া যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে জিমের বাবা কয়েকদিন ধরিয়া অসুখ ভোগ করিয়া হঠাৎ একদিন মারা গেলেন। জিম্‌ ছেলেমানুষ, তাহার উপর তাহার মা তখন খুবই শোক পাইয়াছিলেন। ওদিকে

সেই ক্যাপ্টেন সরাইখানায় খায়-দায় থাকে, অথচ এক পয়সাও দিবার নাম পর্য্যন্ত করে না। কাজেই সেই অবস্থায় জিমেদের বড় বিপদ উপস্থিত হইল।

সেই অঞ্চলে ডাক্তার লিভ্‌জে নামে এক ভদ্রলোক বাস করিতেন। তিনি ছিলেন সেই অঞ্চলের ম্যাজিষ্ট্রেট্। সেই ভদ্রলোকটি জিম্ ও তাহার মাকে তাহাদের সেই বিপদের সময়ে দেখাশোনা করিতে লাগিলেন এবং তিনি তাহাদের আশ্বাস দিলেন যে শীঘ্রই তিনি ঐ ক্যাপ্টেনকে শাসাইয়া হউক বা যেমন করিয়াই হউক তাহার কাছ হইতে টাকাকড়ি আদায় করিয়া দিবেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই একটা ব্যাপার ঘটিল।

একদিন মাঘ মাসের সকালবেলায় খুব কুয়াসা হইয়া চারিদিক অন্ধকারে ঢাকিয়াছিল। এমন সময়ে সেই ক্যাপ্টেন নিত্যকার মত তাহার দুরবীনটা চোখে লাগাইয়া সমুদ্রের ধারে বসিয়া বসিয়া চারিদিক দেখিতেছিল। সেই অবসরে একজন খুব ঢেঙ্গা কিম্ভূত—কিমাকার লোক ধীরে ধীরে গিয়া সেই সরাইখানার দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল। ঢুকিয়াই সে লোকটা জিমকে ডাকিয়া বলিল, "দেখো বাবা! এখানে বিল্ বলিয়া একটা ক্যাপ্টেন থাকে? ঐ যে, যে লোকটা ভয়ানক মদ খায়?" লোকটার কথা শুনিয়া জিম্ ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তিনি এখন বেড়াতে বেরিয়েছেন।"

জিমের উত্তর শুনিয়া সেই অদ্ভুত লোকটা সরাইখানার সদর দরজার পার্শ্বে লুকাইয়া থাকিয়া ক্যাপ্টেনের ফিরিয়া আসার অপেক্ষায় রহিল। তাহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন একটা বিড়াল ইঁদুরের অপেক্ষায় ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে।

সমুদ্রের ধার হইতে শিষ্ দিতে দিতে বিল্ সরাইখানাতে ফিরিয়া আসিতেছিল। কিন্তু সে যেই দরজার ভিতরে পা দিয়াছে অমনি তাহার চোখ পড়িয়া গেল সেই দরজার পাশের নবাগত লোকটির প্রতি। অমনি তাহার মুখ-চোখ একেবারে শাদা ফ্যাকাসে হইয়া গেল। লোকটা ক্যাপ্টেনের কাছে আগাইয়া আসিয়া কি-সব বলিতে লাগিল। কথায় কথায় তাহাদের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া বাধিয়া গেল। ঝগড়া করিতে করিতে বিল্ তাহার ঘরে গিয়া ঢুকিল। তাহার পিছু পিছু সেই লোকটাও ঘরে ঢুকিয়া পড়িল এবং শেষকালে ঝগড়ার মাত্রা এত বাড়িয়া গেল যে দুজনে ভীষণ মারামারি বাঁধিয়া গেল। খানিক পরে হঠাৎ সেই নূতন লোকটা বিলের মাথায় একটা খালি মদের বোতল ছুঁড়িয়া মারিয়া তাহাকে আহত করিয়া পলাইয়া গেল।

আহত ক্যাপ্টেনকে লইয়া সরাইখানার সকলে ভীষণ ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ক্যাপ্টেনের আহত হওয়ার খবর পাইয়া ডাক্তার লিভ্‌জে আসিয়া ক্যাপ্টেনকে বলিলেন, "আপনার কোনও ভয় নাই। আপনি এক সপ্তাহের মধ্যে ভাল হয়ে উঠ্‌বেন নিশ্চয়।" এই কথা শুনিয়া ক্যাপ্টেন তাহার চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, "এক সপ্তাহ? সে যে অনেকদিন। অতদিন শুয়ে থাক্‌লে যে আমাকে সর্ব্বস্ব খোয়াতে হ'বে।" এই কথা বলিয়া সে জিম্‌কে তাহার কাছে ডাকিয়া চুপিচুপি বলিল, "দেখ বাবা! আমার সব সাঙ্গপাঙ্গর আমার খোঁজ পেয়ে গিয়েছে। তাই এখন ওরা আমার পিছু নিয়েছে আর আমার ঐ বড় লোহার সিন্ধুকটা হাতাবার চেষ্টায় আছে। আমি কিন্তু চোরের উপর বাটপাড়ি করবো সে তুমি দেখে নিও।" এই কথা বলিয়া বিল্ তাহার চোখ বুজিয়া বুজিয়া শুইয়া শুইয়া কি যেন আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।

ইহার পরে দিনকতক ধরিয়া ক্যাপ্টেন বিল্ সারাদিন ধরিয়া ভয়ানক মদ খাইতে লাগিল। আর নেশার ঘোরে সে সব সময়েই চোখ বুজিয়া ঝিমাইত। এমনি করিয়া সে তাহার মানসিক অশান্তি ও উদ্বিগ্নতাকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল।

বিলের মনে মনে এই ইচ্ছা ছিল যে একটু সুস্থ হইলেই সে তাহার সিন্দুক লইয়া ঐ সরাইখানা হইতে চম্পট দিবে। কারণ তাহার যথাসর্ব্বস্ব ছিল ঐ সিন্দুকে। কিন্তু তাহার মাথার আঘাত এত গুরুতর রকমের হইয়াছিল যে শীঘ্র করিয়া তাহার আর সারিবার সম্ভাবনা ছিল না।

একদিন বিকালবেলায় জিম্ সরাইখানার দরজায় চুপ্‌চাপ্ দাঁড়াইয়া ছিল। এম্নি সময়ে একজন কুঁজো অন্ধ লোক তাহার চোখে একটা সবুজ গগ্‌লস্ পরিয়া সরাইখানাটার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দয়া ক'রে এই অন্ধকে কেউ ব'লে দিবেন যে আমি কোন্‌খানে এসেছি?" জিম্ উহার কথা শুনিয়া বলিল, "আপনি বেন্‌বো সরাইখানার কাছে এসেছেন।"

এই কথা শুনিয়া সেই লোকটা একটু আগাইয়া আসিয়া জিমের হাত বেশ জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, "বাছাধন আমার। এইবার আমাকে তোমাদের সরাইখানার ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে চল ত। নইলে চাপের চোটে তোমার হাত আমি ভাঙ্গবো।"

ভয় পাইয়া জিম্ উহাকে আস্তে আস্তে ক্যাপ্টেনের কাছে লইয়া গেল। ক্যাপ্টেনের তখন একটু তন্দ্রা আসিতেছিল। সবুজ চশমা-পরা সেই কুঁজো লোকটা যখন বুঝিল যে, সে বিলের বিছানার কাছাকাছি আসিয়াছে তখন সে জিম্‌কে কানে কানে বলিল, "আমার হাতে ওর ডান হাতটা একেবারে ধরিয়ে দাও তো।" জিম্ তাহার কথামত কাজ করিতেই ঐ অন্ধ লোকটা কি এক টুক্‌রা কাগজ বিলের হাতে গুঁজিয়া দিয়া পলাইয়া গেল। লোকটার কাছ হইতে হঠাৎ ঐভাবে হাতের মধ্যে চিঠি পাওয়াতে ক্যাপ্টেন বিলের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। ভূত দেখিয়া মানুষ যেমন ভয় পায় ক্যাপ্টেন বিলও তেম্‌নি ধারা ভয় পাইয়া তড়াক্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া কাগজখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ হইতেই তাহার মুখ ছাইয়ের মত শাদা হইয়া গেল। সে বিড়্‌বিড়্ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওরা ভেবেছে যে রাত দশটার মধ্যে এসে ওরা আমাকে ধরে ফেল্‌বে, আর আমার কাছ থেকে আমার সিন্দুক আর যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নেবে। আমি ওদের সব আশা পণ্ড করছি, দাঁড়াও না।" এই কথা বলিয়া সে খাট হইতে নামিয়া পলাইতে গিয়া দুম্ করিয়া মেঝের উপরে পড়িয়া গেল আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। জিম্ উহার ঐ অবস্থা দেখিয়া গিয়া তাহার মাকে ডাকিয়া আনিল। মা আর ছেলে যখন দেখিল যে বিল্ মরিয়া গিয়াছে তখন তাহারা মহা বিপদেই পড়িল।

যাহা হউক, মা আর ছেলে ছুটিল গ্রামের লোকদের খবর দিতে। কিন্তু কেহই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে আসিল না। কারণ বিলের শত্রুপক্ষ আসিয়া পড়িয়া কি না জানি অনর্থ ঘটায় এই ভয়ে গ্রামের সকলে একেবারে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামের লোকেরা জিমেদের সঙ্গে গেল না বটে কিন্তু তাহাদিগকে পরামর্শ দিল যে "তোমরা সরাইখানার সব দামী দামী জিনিষপত্র আমাদের কারো বাড়ীতে আনিয়া লুকাও।" এই কথা বলিয়া তাহারা জিম্‌কে একটি গুলিভরা পিস্তল দিয়া বলিল, "যদি নেহাৎই পালাবার আগে বিপদে পড় তাহলে এই পিস্তলের সাহায্যে আত্মরক্ষা কোরো। জিম্ আর কি করে। সে ও তাহার মা অগত্যা সেই পিস্তলটা হাতের মুঠায় শক্ত করিয়া ধরিয়া তাহাদের সরাইখানায় ফিরিল। সরাইখানায় ফিরিয়া জিম্ আর তাহার মা দেখিল যে ক্যাপ্টেনের মৃতদেহ ঠিক তেমনিভাবেই মেঝের উপর পড়িয়া আছে। জিম্ তখন লক্ষ্য করিল যে, সেই মৃত ক্যাপ্টেনের গলায় একটা ফিতায় বাঁধা একটি চাবি ঝুলিতেছে। চাবিটা ক্যাপ্টেনের সেই বড়-আদরের সিন্দুকের চাবি।

ইহার আগে ক্যাপ্টেনের কথাবার্ত্তায় জিম্ বুঝিয়াছিল যে তাহার ঐ সিন্দুকটার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কোন গোপনীয় মূল্যবান্ জিনিষ লুকানো আছে যাহার উপর অনেকের বেশ লোভ আছে কাজেই সিন্দুকটার মধ্যে কি আছে তাহা জানিবার জন্য জিমের খুব ইচ্ছা ছিল। এইবার যখন নির্জ্জন ঘরে সে সুবিধা পাইল তখন সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া ক্যাপ্টেনের গলা হইতে সিন্দুকের চাবিটি খুলিয়া লইল। জিমের মাও তাঁহার ছেলের কানে কানে বলিলেন, "ডাকাতগুলো ত এখনই এসে নিয়ে যাবে। এদিকে আমাদের কত টাকা বাকী রেখে ক্যাপ্টেন ত মরলো। সে টাকা কি ক'রে আদায় হবে? এই বেলা বরং আমরা বাক্সটা খুলে দেখি। যদি ওর মধ্যে টাকাকড়ি পাই ত আমরা

আমাদের পাওনা টাকাকড়ি বার ক'রে নেবো। তারপর যা হয় হবে।"

জিম্ আর তাহার মা তাড়াতাড়ি করিয়া ক্যাপ্টেনের সিন্দুকটা খুলিয়া ফেলিল। সিন্দুকটা খুলিতেই তাহার উপরে কতকগুলা পোষাক-পরিচ্ছদ পাওয়া গেল। তাহার তলা হইতে বাহির হইয়া পড়িল কতকগুলা পিস্তল—খানিকটা তামাক আরও কত কি। সকলের তলায় পাওয়া গেল এক থলি গিনি আর অয়েলক্লথে জড়ানো কতকগুলি কাগজ-পত্র। কাগজ-পত্রের বাণ্ডিলটা যে সব চেয়ে দরকারী তাহা বুঝিতে পারিয়া জিম্ সেটিকে চটপট্ করিয়া তাহার বুকের মধ্যে জামার তলে লুকাইয়া ফেলিল। আর জিমের মা গুণিয়া গুণিয়া তাঁহার পাওনা টাকাকড়ি ঐ গিনির থলি হইতে বাহির করিয়া লইয়া থলিটি সিন্দুকের মধ্যেই রাখিয়া দিলেন। ঠিক সেই সময়ে কাহাদের যেন পায়ের আওয়াজ শোনা যাইতে লাগিল। আওয়াজ শুনিয়া জিম্ আর তাহার মা বাড়ীর পিছনের একটা খোলা জানালা দিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গিয়া বাড়ীর কাছাকাছি এমন এক জায়গায় লুকাইয়া রহিল যেখান হইতে বাড়ীর ভিতরের সব কথাবার্ত্তা শুনা যায়। কিন্তু ভয়ে জিমের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। সে ভাবিতেছিল যে যদি ঐ লোকগুলা তাহাদের খোঁজ পায় ত তাহাদিগকে আর আস্ত রাখিবে না।

ওদিকে প্রায় আট-দশ জন লোক প্রথমে আসিয়া বাড়ীটার কড়া নাড়িল। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া তাহারা ধাক্কা মারিয়া মারিয়া দরজাটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া হুড়মুড় করিয়া বাড়ীখানার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। লোকগুলা বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া হুড়াহুড়ি করিয়া এদিক্ ওদিক ছুটাছুটি করিতেছিল আর চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া এক বিষম কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়াছিল। ঠিক্ সেই সময়ে জিম্ দূর হইতে সেই গগ্‌লস্ পরা বুড়ো লোকটার গলা শুনিতে পাইল। সে বলিতে-ছিল, "বিল্ ম'রে প'ড়ে রয়েছে যে।" তখনই আর একজন কে বলিয়া উঠিল, 'তাড়াতাড়ি ওর সিন্দুকটা খুঁজে দেখ্ দেখি।"

তখন সবাই ছুটিল সিন্দুকটা খুঁজিতে। সিন্দুকটার ভিতর দেখিয়া তাহারা কয়জনে বলিল, "টাকাকড়ি সব আছে এতে, কিন্তু সেই ম্যাপটাই নেই।" এই কথা শুনিয়া সেই গগল্‌স্ পরা বুড়াটা একেবারে ভীষণ ক্ষেপিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, "এ কাজ আর কারুরই নয়। ম্যাপটা সরিয়েছে সেই ছোঁড়াটা। তোমরা সবাই বাড়ীটার আনাচ-কানাচ একেবারে তন্ন তন্ন ক'রে খুজে দেখো। সে ছোঁড়া নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে।" কিন্তু বহু খোঁজাখুজিতেও কোন ফল হইল না।

তাহারা যখন ঐ রকম খোঁজাখুজি করিতেছে এম্‌নি সময়ে নিকটেই হঠাৎ একটা পিস্তলের আওয়াজ শোনা গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল যে একখানা ঘোড়ার গাড়ী যেন প্রবল বেগে সেই বাড়ীখানির দিকে আগাইয়া আসিতেছে ঐ গাড়ীখানা পুলিশের গাড়ী—আর পিস্তলের আওয়াজ করিয়াছিল পুলিশের লোকেরা। গ্রাম-বাসীদের কাছ হইতে ডাক্তার লিভ্‌জে সরাইখানার ডাকাত পড়ার খবর পাইয়া তখনই একদল পুলিশ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

ডাকাতগুলা ত গাড়ীর আওয়াজ পাইয়া যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পলাইল। কিন্তু সেই গগল্‌স্ পরা বুড়াটা চোখে কম দেখিত। সে ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল, "ওরে তোরা বুড়ো মানুষকে ফেলে পালাস্‌নি। আমাকেও নিয়ে চল্—নইলে তোদের পাপ হবে।" বুড়োটা যখন এই ভাবে কাকুতি মিনতি করিতে করিতে পালাইতে যাইতে-ছিল সেই সময়ে অন্ধকারের মধ্যে পুলিশের গাড়ীটা আসিয়া পড়িল বুড়ার একেবারে ঘাড়ের উপরে। গাড়ীখানা থামাইতে না থামাইতে একখানা চাকা বুড়ার বুকের উপর দিয়া চলিয়া গেল। সে সেখানে মরিয়া পড়িয়া রহিল।

পুলিশেরা সেই বুড়া ও বিলের মৃতদেহ সেখান হইতে সরাইয়া ফেলিয়া ডাকাতগুলার খোঁজ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের কোনও পাত্তা পাইল না। তখন তাহারা ডাক্তার লিভ্‌জেকে খবর দিতে ছুটিল যে ডাকাতদল পালাইয়াছে।

ঠিক সেই সময়ে জিম্ আর তাহার মা গিয়া উপস্থিত হইল ডাক্তার লিভ্‌জের বাড়ীতে। তিনি

ত জিমকে ফিরিয়া পাইয়া খুব খুশী। খুশী হইয়া তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাকাতরা তোমাদের মার-ধর করেনি ত।" জিম্ ঘাড় নাড়িয়া হাসিমুখে জানাইল যে তাহারা এমন জায়গায় লুকাইয়াছিল যে ডাকাতগুলা তাহাদিগকে খুঁজিয়া পায় নাই। এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে ক্যাপ্টেন বিলের সিন্দুকের মত বাক্সটি হইতে পাওয়া অয়েলক্লথে জড়ানো কাগজপত্রগুলা এখানে লুকানো আছে। ঐ ম্যাপখানি কি, এবং কি করিয়া উহা ক্যাপ্টেন বিলের হস্তগত হইয়াছিল তাহা এখন বলিতেছি।

সেকালে একদল দুর্দ্দান্ত জলদস্যু ছিল। তাহারা জাহাজ লইয়া সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইত, আর সুযোগ পাইলেই অন্য জাহাজ আক্রমণ করিয়া টাকা-কড়ি ধন-রত্ন সব লুঠ করিত। ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট নামে একজন লোক এইরূপ একটি
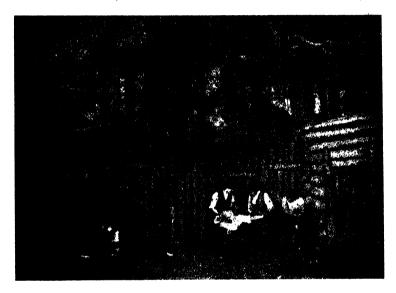
বিদ্রোহী নাবিকদলের আক্রমণ

ডাক্তার লিভজের সামনে মেলিয়া ধরিয়া জিম্ বলিল, "দেখুন ত এগুলো আমি কি পেয়েছি?" খুব কৌতূহলের সঙ্গে ডাক্তার লিভজে সেই কাগজের মোড়ক খুলিয়া দেখিলেন যে সেটি একখানি ম্যাপ। ম্যাপখানির উপরে লেখা ছিল—**রত্নদ্বীপের সন্ধান**। আর যে পথ ধরিয়া ঐ দ্বীপে পৌঁছাইতে হইবে সেই পথটিও বেশ পরিষ্কার করিয়া উহাতে আঁকা ছিল। এবং রত্নদ্বীপটির তিন জায়গায় লাল রঙের তিনটি ঢেরা-কাটা চিহ্ন ছিল, আর সেখানে লেখা ছিল যে—অসীম রত্নরাজী জলদস্যু দলের নেতা ছিল। তাহার দলটি ছিল এমন সেরা যে সে সময়কার আর কোনও দস্যুদল অত লুঠতরাজ করিতে পারে নাই। বিল্ এই ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টের দলে ছিল। মারা যাইবার পরে ফ্লিন্ট তাহার আগাধ ধনরত্ন একটা অজ্ঞাত দ্বীপে লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছিল। সেই দ্বীপের কথা কেহই জানিত না। শুধু জিমের খুঁজিয়া পাওয়া সেই ম্যাপটীর মধ্যে রত্নগুহাগুলির অবস্থান লাল ঢেরা টানিয়া টানিয়া চিহ্নিত করা ছিল।

ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
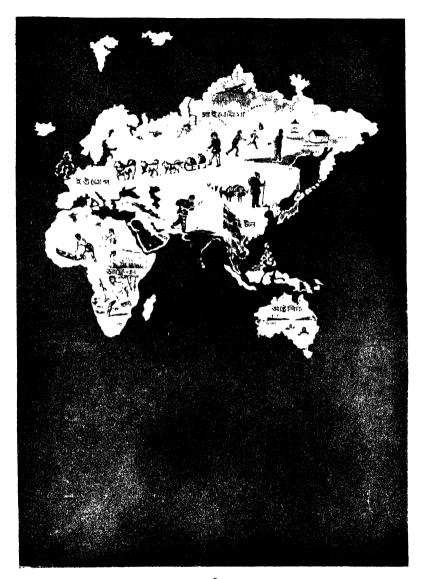
ক্যাপ্টেন বিল ঐ ম্যাপখানি গোপনে হস্তগত করিয়া লুকাইয়া পালাইয়াছিল। তাহার মতলব ছিল এই যে সে সুযোগ বুঝিয়া একখানা জাহাজ যোগাড় করিয়া ঐ রত্ন সব খুঁজিয়া বাহির করিয়া বড়লোক হইবে। ম্যাপখানি লইয়া বিল্ গা ঢাকা দিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া ফ্লিন্টের দলের অন্যান্য সব ডাকাতদের যত আক্রোশ ছিল তাহার উপরে এবং সেই জন্যই তাহারা বিলের অনুসন্ধানে ছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উহা তাহাদের হাত ফস্‌কাইয়া গিয়া পড়িল জিমের হাতে।

জিমের কাছ হইতে রত্নদ্বীপের ম্যাপখানি পাইয়া ডাক্তার লিভ্‌জে যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। ডাক্তার লিভ্‌জে এবং তাঁহার এক জমিদার বন্ধু এই দুইজনে মিলিয়া তখনই স্থির করিলেন যে শীঘ্রই তাঁহারা একখানি জাহাজে করিয়া সেই অজ্ঞাত রত্নদ্বীপের সন্ধানে বাহির হইবেন এবং সেখানকার সমস্ত লুকানো রত্ন উদ্ধার করিয়া আনিবেন। অগাধ ধনরত্ন পাইয়া শীঘ্র বড়লোক হইয়া যাইবেন এই আশায় তাঁহারা খুব উৎসাহিত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

এইবার খুব উৎসাহের সঙ্গে তাঁহারা তোড়জোড় আরম্ভ করিয়া দিলেন। জমিদারবাবু ত পর দিনই ছুটিলেন জাহাজ কিনিতে ও জাহাজের নাবিক প্রভৃতি লোকজন ঠিক করিতে। এদিকে ডাক্তার লিভ্‌জে অন্যান্য সব বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ঠিক হইল যে জিম্‌ও তাঁহাদের সঙ্গে যাইবে।

রত্নদ্বীপে যাইবার খবরটি গোপন রাখা প্রয়োজন ছিল। এইজন্য ডাক্তার লিভ্‌জে সেই জমিদার বন্ধুকে বারবার করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে রত্নদ্বীপে যাইবার খবরটি যেন কিছুতেই প্রকাশ না হয়। কিন্তু জমিদার ভদ্রলোকের একটী ভীষণ দোষ ছিল। তাঁহার পেটে কোন কথা থাকিত না। কাজেই তিনি অনেকের কাছেই বলিয়া ফেলিলেন যে তাঁহারা ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টের লুকানো ধনরত্নের সন্ধানে রওনা হইবার জন্য জাহাজ প্রভৃতি ঠিকঠাক করিতেছেন।

এই খবরটি ক্রমশঃ এম্‌নি ছড়াইয়া পড়িল যে শেষ পর্য্যন্ত ফ্লিন্টের দলের সেই সব জলদস্যুগুলার কাছেও এই সংবাদ গিয়া পৌছাইতে বিলম্ব হইল না। তাহারও সন্ধানে সন্ধানে ছিল যে কি করিয়া তাহারা সেই ম্যাপখানি পুনরায় হাতে আনিবে। খবর পাইয়া তাহারা দল পাকাইয়া দিব্য ভালমানুষ সাজিয়া আসিয়া জমিদার ভদ্রলোকের জাহাজে নাবিক প্রভৃতির চাকরী লইল। জমিদার মহাশয় অবশ্য যে লোকটিকে জাহাজের ক্যাপ্টেন নিয়োগ করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন বড় ভাল লোক তিনি সেই ডাকাতদের দলের ছিলেন না এবং তিনি তাহাদের বদ মতলবের কথা ঘুণাক্ষরও জানিতেন না।

ফ্লিন্টের দলের যে-সব জলদস্যুগুলা আসিয়া জাহাজে চাকরী লইয়াছিল তাহারা দলেও ছিল বেশ ভারী—প্রায় ষোল-সতেরো জন হইবে। উহারা দিব্যি ভিজা বিড়ালের মত শান্তশিষ্ট ভাবে অন্যান্য নাবিকদের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে রহিয়া গেল—জমিদারবাবু বা ক্যাপ্টেন কাহারও মনে এতটুকু সন্দেহ পর্য্যন্ত হয় নাই যে উহাদের পেটে পেটে দুষ্ট বুদ্ধি গজ্ গজ্ করিতেছে। এই জলদস্যুদের মধ্যে একজন খালাসী ছিল একপেয়ে। তাহার নাম ছিল জন্ সিল্‌ভার। এই লোকটা সবচেয়ে দুষ্টু আর কুটিল ছিল। গোপনে গোপনে যত ষড়যন্ত্র আর কুচক্রান্ত করিত এই লোকটি। বিল্ মারা যাইবার পূর্ব্বে ইহার কথাই জিমকে বলিয়াছিল—এই একপাওয়া খালাসীটাকেই জিম্ সব চেয়ে বেশী ভয় করিত। কিন্তু জন্ সিলভারের ব্যাহিক ব্যবহার আর কথাবার্ত্তা এত মিষ্টি ছিল যে তাহাকে ডাক্তার লিভজে জমিদার মহাশয় ও ক্যাপ্টেন প্রভৃতি সকলেই বড় ভালবাসিতেন। ইহা ভিন্ন, তাহার একটিমাত্র পা থাকা সত্ত্বেও সে জাহাজের এত কাজকর্ম্ম গোছাইত যে তাহা দেখিয়া সকলেই তাহার উপরে খুব খুশী হইলেন।

জিম্ প্রথমত এই জন সিল্‌ভার্‌কে মনে মনে বড় সন্দেহ করিয়া ভবিয়াছিল যে এই কি সেই একপেয়ে খালাসীটা—ইহার কথাই কি বিল্ তাহাকে বলিয়াছিল? কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই জিমের এই সন্দেহ দূর হইয়া গিয়াছিল। কারণ জন্ সিল্‌ভার প্রায়ই জিম্‌কে বেশ ভাল ভাল সমুদ্রের গল্প বলিত। জিম্ ইহাতে মোহিত

হইয়া জন্ সিল্ভারকে বেশ ভাল চোখেই দেখিতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহাদের জাহাজ "হিস্‌-প্যানিওলা" বন্দর ছাড়িয়া রত্নগুহা আবিষ্কারের উদ্দেশে সমুদ্র-বক্ষ দিয়া ভাসিয়া চলিতে লাগিল। জাহাজ যখন অসীম সমুদ্রবক্ষে পাড়ি দিয়া চলিতেছে তখন একদিন সিল্ভারের দলের কুমতলব ধরা পড়িল, আর তাহা ধরিল জিম্।

জিম্ একদিন খাইবার জন্য কয়েকটা আপেল আনিতে গিয়াছিল জাহাজের ডেকের উপরে। আপেল ছিল একটা বড় পিপার ভিতর। কিন্তু জিম্ সেখানে গিয়া দেখিল যে পিপার তলায় মাত্র দুই-চারিটি আপেল পড়িয়া আছে। ঐ আপেলগুলি কুড়াইয়া বাহির করিয়া আনিবার জন্য জিম্ সেই পিপার ভিতরে নামিল। ঠিক সেই সময় কেউ কোথাও নাই ভাবিয়া জন্ সিল্ভার তাহার দলবল লইয়া সেই পিপাটার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া নানা পরামর্শ আঁটিতে লাগিল। ওদিকে জিম্ লুকাইয়া পিপার আড়ালে থাকিয়া যাহা যাহা শুনিল তাহাতে ভয়ে তাহার রক্ত একেবারে জল হইয়া গেল। সে তাহাদের কথা শুনিয়া বুঝিল যে. উহারা সবাই সেই ক্যাপ্টেন ফ্লিণ্টের দলের জলদস্যু। ঐ দুষ্ট ডাকাত গুলি দাঁড়াইয়া সেখানে ষড়যন্ত্র করিতেছিল কি করিয়া তাহারা ডাক্তার লিভ্জে প্রভৃতিকে মারিয়া ফেলিয়া সেই রত্নদ্বীপের ম্যাপটি হস্তগত করিবে। জন্ সিল্ভার তাহার সঙ্গীদের বলিতে ছিল "ভাই! কোনরকমে একবার ডাঙ্গা পর্য্যন্ত এদের নিয়ে যাওয়া যাক্ তারপর ওরাই সেই রত্নগুহা খুঁজে বার করুক ম্যাপ দেখে দেখে। আমরা তখনও কিছু বল্‌বো না। তারপর যখন জাহাজ বোঝাই ধনরত্ন নিয়ে ওরা ফিরবে তখন মাঝ-রাস্তায় আমরা সব ধর্ম্মঘট করব আর বিদ্রোহী হ'য়ে ওই ক্যাপ্টেনটাকে আর ডাক্তার লিভজে প্রভৃতিকে একেবারে ব্যাং-খোঁচানো ক'রে মেরে ফেলে ওদের আনা সব ধনরত্ন হাত করবো।" জন্ সিল্ভারের সাঙ্গ-পাঙ্গরা তাহার এই প্রস্তাবে খুশী হইয়া বলিয়া উঠিল, "তথাস্তু।"

জন্ সিল্ভার আর তাহার সঙ্গীরা যখন তাহাদের কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া ডেক হইতে চলিয়া গেল তখন জিম্ সেই আপেলের পিপার ভিতর হইতে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া পড়িল। তারপর হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিয়া এই খবর দিল ডাক্তার লিভজেকে, জমিদার মহাশয়কে ও ক্যাপ্টেনকে। তাঁহারা ত জন সিলভারের মতলব বুঝিয়া একেবারে স্তম্ভিত। কিন্তু তখন আর কিছু করিবার উপায় নাই। জাহাজ তখন প্রায় রত্নদ্বীপের কাছাকাছি। কাজেই ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন যে আপাততঃ তাঁহারা চুপচাপ থাকিবেন, তারপর দ্বীপে পৌঁছিয়াই উহাদের যাহা হউক একটা ব্যবস্থা করিবেন।

ক্যাপটেন ও ডাঃ লিভজে প্রভৃতিরা যখন এইরূপে নানারকম জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন তখন জাহাজের নাবিকেরা হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "ডাঙ্গা দেখা যাচ্ছে—ডাঙ্গা দেখা যাচ্ছে।" কোলাহল শুনিয়া ক্যাপ্টেন তাঁহার কেবিন হইতে বাহিরে আসিয়া হুকুম দিলেন যে ঐ দ্বীপটির দক্ষিণদিকে জাহাজখানিকে নোঙ্গর করিতে হইবে পরদিন সকাল নাগাদ জাহাজখানি নোঙ্গর করা হইল।

এইবার ক্যাপ্টেন লক্ষ্য করিলেন যে কথায় কথায় জাহাজের সব নাবিকেরা যেন তাহাদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি মনে মনে একটু ভয় পাইয়া নাবিকদের মন রাখিবার জন্য বলিলেন, "তোমরা বরঞ্চ একবার ঐ দ্বীপটির মধ্যে গিয়ে. বেড়িয়ে এস।" জন সিলভারের দলের নাবিকগুলা ত তাহাই চায় তাহারা খুব উৎসাহিত হইয়া হৈ হৈ করিতে করিতে জাহাজের উপর হইতে দুই-তিনখানা নৌকা জলে ভাসাইল। তারপর জন্ সিলভারের পিছনে পিছনে জন-তের নাবিক গিয়া সেই নৌকায় চাপিয়া দাঁড় ধরিল। ঐ নাবিকগুলা মনে করিতে-ছিল যে দ্বীপে নামিলেই বুঝি সমস্ত ধনরত্ন তাহাদের হাতে আসিয়া পড়িবে।

জন্ সিলভার প্রভৃতিরা যখন নৌকায় করিয়া সেই দ্বীপে যাইবার তোড়জোড় করিতেছে সেই অবসরে জিমও চুপি চুপি গিয়া তাহাদের একখানা

নৌকার পিছনে লুকাইয়া রহিল। সেও আর তাহার কৌতুহল চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

কূলে গিয়া নৌকা ভিড়িতেই জিম্ ত তিন লাফে একেবারে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়া গা-ঢাকা দিল। তারপর ঊর্দ্ধশ্বাসে সে-তল্লাট হইতে এক দৌড়। এতক্ষণ জিম্ যে লুকাইয়া নৌকায় বসিয়াছিল তাহা কেহ টের পায় নাই। হঠাৎ তাহাকে এইভাবে লাফাইয়া নামিয়া যাইতে দেখিয়া সিল্‌ভারের মনে বেশ একটু ভয় হইল। কারণ সে ভাবিল যে জিম্ ত তাহা হইলে তাহাদের সকল মতলব শুনিয়া ফেলিয়াছে। এইজন্য জন্ সিল্‌ভার খুব চীৎকার করিয়া জিমকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। পিছন হইতে সিল্‌ভারের গুরুগম্ভীর গলার আওয়াজ জিমের কানে আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু কে তাহার ডাক শোনে? জিম ততক্ষণে সে-তল্লাট ছাড়িয়া একেবারে উধাও।

প্রাণপণে দৌড়াইয়া জিম্ যখন ক্লান্ত হইল তখন সে ভাবিল যে "আমি নিশ্চয়ই সিল্‌ভারের দলবলের কাছ থেকে বহুদূরে চলে এসেছি।" ইহা ভাবিয়া সে ধীরে ধীরে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই অজানা দ্বীপটিকে দেখিতে লাগিল। দ্বীপটি দেখিয়া সে বুঝিল যে সেখানে জন্তু-জানোয়ার ছাড়া কোন মানুষ কখনও বসবাস করে নাই।

ঘুরিতে ঘুরিতে খানিক পরেই একটা ঝোপের আড়াল হইতে সিলভারের গলার আওয়াজ শুনিয়া সে চমকাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আড়াল হইতে এইবারে সে যাহা দেখিল তাহাতে সিলভার লোকটি যে কি ভীষণ তাহা বুঝিতে তাহার আর বিলম্ব হইল না। জিম্ দেখিল যে টম্ বলিয়া একজন জাহাজের খালাসীর সঙ্গে সিলভারের ভীষণ বচসা বাধিয়াছে। টম্ সিলভারের ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে রাজি হইতেছিল না কিছুতেই। বেগতিক দেখিয়া সিলভার করিল কি একেবারে লাফাইয়া গিয়া টমের ঘাড়ের উপর পড়িয়া গলা টিপিয়া তাহাকে খুন করিয়া ফেলিল। সিলভারের এই কাণ্ড দেখিয়া জিম্ ত ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

প্রাণভয়ে জিম্ সেই ঝোপের ভিতর হইতে এক দৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল। জিম্ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া যাইতেছে এমন সময়ে তাহার পিছন হইতে একটা আওয়াজ পাইয়া দাঁড়াইল। ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া যাহা দেখিল তাহাতে সে ভূত দেখার মত ভয় পাইয়াছিল।—তাহার বুকের ভিতরটা টিপটিপ করিতে লাগিল। সে দেখিল যে কতকগুলি পাইন গাছের আড়াল হইতে ছেঁড়াখোঁড়া পোষাকপরা ও খুব লম্বা দাড়িওয়ালা একটা কাল কিম্ভূত কিমাকার লোক বাহির হইয়া তাহার দিকে আসিতেছে। রোদে রোদে ঘুরিয়া সেই লোকটার রং হইয়াছিল। কাল—পাকা দাড়ি গোঁফ তাহার বুক পর্য্যন্ত ঝুলিতেছিল। এককালে তাহার গায়ে জামা কাপড় ছিল, কিন্তু বহুকাল তাহা আর বদলানো হয় নাই বলিয়া সে-সব একেবারে ছেঁড়া-নেকড়া হইয়া তাহার পায়ে ঝুলিতেছিল। তাহার রোগশীর্ণ দেহ দেখিলে ভূত ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

ভয় পাইয়া জিম্ ত তাহার কোমর হইতে পিস্তল বাহির করিয়া সেই লোকটাকে গুলি করিতে যায় আর কি! কিন্তু লোকটা জিমের হাতে পিস্তল দেখিয়া বেজায় ভয় পাইয়াছিল। তাই সে তাড়াতাড়ি হাঁটু গাড়িয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়া হাত তুলিয়া জানাইল যে সে জিমের কোনও অনিষ্ট করিবে না। জিমের তখন যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। সে আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "কে তুমি আগে আমাকে বল।" সে উত্তর দিল, "আমি বেন গান্।" এই জনমানবহীন দ্বীপে আমি একমাত্র মানুষ বাস করিয়া আসিতেছি আর দ্বিতীয় মানুষ এখানে নেই।"

এই বেন্ গান্ ফ্লিন্টের দলেই জলদস্যু ছিল। জলদস্যুদের মধ্যে কেহ কোন অপরাধ করিলে তাহাকে নির্জ্জন দ্বীপে বনবাস দেওয়া হইত। সেইরকম একটি কারণে বেন্ গান্‌কে এই দ্বীপে কয়েক বৎসর আগে নির্ব্বাসন লাভ করিতে হইয়াছিল। নিজের জীবনের এই সব কথা বেন্ গান্ জিমকে বলিল।

ওদিকে জিম্‌কে খুঁজিয়া না পাইয়া ক্যাপ্টেন, জমিদার মহাশয় আর ডাক্তার লিভজে বড় চিন্তিত

হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া জিমের খোঁজে ঐ দ্বীপের দিকে রওনা হইলেন। যাইবার সময়ে তাঁহারা কয়েকজন বিশ্বাসী নাবিককে জাহাজে কড়া পাহারায় রাখিয়া দিয়া গেলেন। উহারা সিলভারের দলের যে সব লোক জাহাজে ছিল তাহাদের উপরে কড়া নজর রাখিতে লাগিল।

দ্বীপের মধ্যে ক্যাপ্টেন ফ্লিণ্টের সময় হইতেই একটি সুরক্ষিত কেল্লার মত জায়গা ছিল। ডাক্তার লিভজে ক্যাপ্টেন আর তাঁহাদের দলের

তাঁহারা কেল্লার ভিতর হইতে গুলি ছুঁড়িলেন। জন্ সিলভার আর বিদ্রোহী নাবিকেরাও গুলি ছুঁড়িতে লাগিল। এইভাবে দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কোথায় তাঁহারা জিমের খোঁজ করিতে বাহির হইবেন না হঠাৎ এইভাবে তাঁহাদিগকে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হইল।

জিম্ আর বেন্ গান্ দূর হইতে বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া বুঝিয়াছিল যে দুই দলে গোলমাল বাধিয়াছে। যেদিক হইতে গুলির আওয়াজ আসিতেছিল তাহারা তাড়াতাড়ি সেইদিকে

এক জায়গায় কয়েকটি নর কঙ্কাল আর মাথার খুলি দেখিতে পাইল

লোকেরা সেখানে গিয়া আশ্রয় লইলেন। তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গে দরকারী জিনিষপত্র আর অস্ত্র-শস্ত্র সবই আনিয়াছিলেন। কারণ যখন সিলভারের দলের সঙ্গে তাঁহাদের যুদ্ধ বাধে কে জানে।

সেই সুরক্ষিত কেল্লার ভিতরে ঢুকিয়া বাহিরে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে সিলভারের দল খবর পাইয়া তাহাদের আক্রমণ করিতে আসিতেছে। উহাদিগকে আসিতে দেখিয়া

ছুটিল। তারপর সেই কেল্লাটার পিছন দিকের একটি দরজায় ধাক্কা দিয়া জিম্ চীৎকার করিতে লাগিল, "ক্যাপ্টেন, ডাক্তার! তাড়াতাড়ি দরজা খুলুন। আমি জিম্।" জিম্ আসিয়াছে জানিয়া ক্যাপ্টেন তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া তাহাকে ভিতরে লইলেন এবং জিম্কে ফিরিয়া পাইয়া তাঁহারা খুবই খুশী হইলেন।

প্রায় তিন চারিদিন এইভাবে লড়াই চলিতে

লাগিল। জিমেরা কেল্লার ভিতরে আর জন্ সিল্‌ভারের দল বাহিরে। দুই দলেরই দুই চারজন আহত হইল দুই চারিজন মরিলও।

হঠাৎ একদিন জন্ সিলভার আসিল সন্ধির প্রস্তাব লইয়া। তাহার উদ্দেশ্য ছিল যে কোন-রকমে ভুলাইয়া সেই রত্ন-গুহার ম্যাপখানি সে হস্তগত করে। কিন্তু তাহাতে ক্যাপ্‌টেন বা ডাক্তার রাজি হন নাই। কাজেই লড়াই বাধিল। মাঝে মাঝে গুলি চলে মাঝে মাঝে সব নীরব হয় কিন্তু উভয় পক্ষই উভয় পক্ষের প্রতি বড় কড়া নজর রাখিতেছিল। এইভাবে অবরোধের মধ্যে ক্যাপটেন আর ডাক্তার লিভ্‌জেও জিম্ প্রভৃতির দিন কাটিতে লাগিল। কারণ জন্ সিলভারের দল বাহিরে কড়া পাহারায় ছিল।

অল্পদিনের মধ্যেই জিমেদের খাবার ফুরাইয়া আসিল। ইহাতে সকলেই খুব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে জিম এক অসমসাহসিক কাজ করিল।

একদিন রাত্রের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া সে বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল সে ঠিক করিয়াছিল যে জাহাজে গিয়া সে কিছু খাবার লইয়া আসিবে। কিন্তু কেল্লা হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া তাহার প্রধান সমস্যা হইল যে সে কেমন করিয়া জাহাজে যাইবে। জাহাজখানা ত গভীর জলে ডাঙ্গা হইতে দূরে ভাসিতেছে। সব নৌকাগুলিও ত আছে জন্ সিলভারের দলের কাছে' তখন রাত্রি কাজেই নৌকাগুলিতে হয়ত জন্ সিলভারের দলের লোকেরা ঘুমাইতেছে। এইসব আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে এমন সময় তাহার মনে পড়িল যে বেন্ গান্ তাহাকে বলিয়াছিল বটে যে তাহার একখানি নৌকা আছে সমুদ্রতীরের একটি ঝোপের আড়ালে লুকানো। সেই অন্ধকারে সে ঐ নৌকাখানিকে খুঁজিয়া বাহির করিল। তখন একে গভীর অন্ধকার তাহাতে সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ উঠিতেছিল। সুতরাং বহুকষ্টে দাঁড় চালাইয়া সে ঐ জাহাজে গিয়া পৌছিল। অত্যধিক পরিশ্রমে জিম্ তখন হাঁপাইতেছিল। কিন্তু নিজের ক্লান্তির কথা ভুলিয়া জিম্ তাড়াতাড়ি ছুরি দিয়া জাহাজের নোঙ্গরের কাছি কাটিতে আরম্ভ করিল। সব কাছি কাটা হইয়া গেলে পর জাহাজখানা স্রোতে ভাসিয়া দ্বীপটির অন্যদিকে যাইতে লাগিল।

ওদিকে জাহাজের মধ্যে সিল্‌ভারের দলের দুইজন পাহারা ছিল। তাহারা তখন মদ খাইয়া মাতাল হইয়া মারামারি করিতেছিল। উহারা যখন দেখিল যে জাহাজখানা চলিতেছে তখন বিপদ বুঝিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া জিম্‌কে দেখিল। জিম্‌কে দেখিয়া তাহারা তাহাকে মারিতে গেল। কিন্তু জিম্ তাহার পূর্ব্বেই তাহার কোমর হইতে পিস্তল টানিয়া বাহির করিয়া গুলি করিয়া উহাদের মারিয়া ফেলিল। জিম্ জাহাজ-খানিকে লইয়া গিয়া দ্বীপের পিছনে রাখিল—ইহাতে ডাক্তার লিভ্‌জে প্রভৃতির পালাইবার পথ হইল। অথচ দুষ্ট জন্ সিলভারদের পালাইবার পথ বন্ধ হইল। ক্লান্ত জিম্ জাহাজে শুইয়া বেশ একটু ঘুমাইয়া লইল। তারপর খুব ভোরে উঠিয়াই সে—মহা আনন্দে জাহাজ হইতে খাবার-দাবার লইয়া দুর্গের দিকে চলিল খবর দিতে যে জাহাজখানি নিরাপদ জায়গায় আছে আর সম্পূর্ণ তাহাদেরই হাতে।

কিন্তু দুর্গের ভিতরে ঢুকিয়া সে যাহা দেখিল তাহাতে সে একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। সে দেখিল যে ডাক্তার লিভজে প্রভৃতি ত দুর্গের ভিতরে নাই তাহাদের স্থানে রহিয়াছে জন্ সিল-ভারের দল। জিম্, জন্ সিল্‌ভারের দল দেখিয়া ভয় পাইয়া ভাবিল যে ডাক্তার লিভজে ক্যাপ্টেন প্রভৃতিকে কি তাহা হইলে সিল্‌ভারেরা মারিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই জানিল যে তাঁহারা নিজের ইচ্ছামতেই দুর্গ ছাড়িয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারা নিরাপদেই আছেন। জিম্ আরও জানিল যে রত্নগুহার সেই ম্যাপখানিও নাকি জন্ সিলভারের হাতে আসিয়াছে।

জন্ সিল্‌ভারের দলের অনেকেই জিম্‌কে দু' চক্ষের বিষের মত দেখিত। তাহারা জিম্‌কে খুন করিবার জন্য ছোরা খুলিয়া মারিতে গেল কিন্তু জন্ সিল্‌ভার তাহাদিগকে থামাইয়া বলিল,—যে জিমের গায়ে হাত তুলিবে তাহাকে আমি নিজের হাতে মারিয়া ফেলিব খবরদার! এখনি সরে এস।

জিম্ তখন হইতে জন্ সিল্‌ভারদের দলে রহিয়া গেল। সে যে নিরাপদে আছে এই খবর ডাক্তার লিভ্‌জে প্রভৃতির কাছে পৌঁছাইল। তাঁহারা ইহাতে কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

জিমকে লইয়া জন সিল্‌ভারেরা সেই রত্নগুহার খোঁজাখুঁজি করিতে লাগিল। একদিন তাহারা এক জায়গায় কয়েকটি নর-কঙ্কাল আর মড়ার মাথা দেখিতে পাইল। উহা দেখিয়া জন্ সিল্‌ভারের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে ঐখানে সেই রত্নগুহাটি আছে, আর ঐ নর-কঙ্কাল হইতেছে তাহাদের দলেরই জলদস্যু যাহারা ক্যাপ্টেন ফ্লিণ্টের কোপে পড়িয়া বহু পূর্ব্বে প্রাণ হারাইয়াছিল।

এইবার তাহারা গুহার সন্ধান পাইয়া গুহার মধ্যে রত্নের সন্ধানে ব্যস্ত হইল। কিন্তু দুই একটি মোহর এদিক ওদিক ছড়ানো ছাড়া রত্নের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না। ইহাতে তাহারা বুঝিল যে উহারা আসিবার পূর্ব্বেই কে যেন সেখানকার সমস্ত ধন-রত্ন সরাইয়াছে।

এই ব্যাপার দেখিয়া তাহারা সকলে অত্যন্ত হতাশ হইল। সিলভার তাহার দলের যে সব লোকেদের এতদিন পর্য্যন্ত আশা দিয়া রাখিয়াছিল যে উহারা প্রচুর ধন-রত্ন পাইবে তাহারা নিরাশ হইয়া মহা রাগিয়া সিলভারকে খুন করিতে উদ্যত হইল। ঠিক সেই সময় গুলির আওয়াজ হইল গুড়ুম্ গুড়ুম্। ডাক্তারেরা জিম্‌কে উদ্ধার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, এবং এই গুলির আওয়াজ তাঁহারাই করিয়াছিলেন। ডাক্তারদের সহিত জন্ সিলভারদের আবার যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে জন্ সিলভারের দল হারিল—শুধু হারিল না, তাহাদের দলের অনেকে প্রাণ হারাইল। কারণ, তখন তাহাদের মধ্যে কোনরূপ একতাই ছিল না। ঐ যুদ্ধে জন্ সিলভারের দল মাত্র দুইজন বাঁচিল। তাহারা ডাক্তারদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করিল।

অগাধ ধনরত্ন পাইয়া ডাক্তার, জিম, ক্যাপ্টেন প্রভৃতি খুব খুশী হইলেন

জিম্‌কে ফিরিয়া পাইয়া ডাক্তার লিভ্‌জে প্রভৃতি খুব খুশী হইলেন এবং তাঁহারা বলিতে

লাগিলেন যে জন্ সিলভারকে একটী নকল ম্যাপ দিয়া তাঁহারা ঠকাইয়াছিলেন এবং আসল ম্যাপটি দেখিয়া তাঁহারা বেন গানের সাহায্যে সমস্ত ধনরত্ন একটি গুহায় সরাইয়া ফেলিয়াছিলেন। দুর্ঘটনার কারণ ঘটিয়াছিল এইরূপে। সিলভার বিদ্রোহী দলকে কোনরূপে শান্ত করিতে না পারায়ই তাহার এইরূপ শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিল সিলভার তাহাদিগকে বার বার রত্নগুহার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিবার কথা বলিলেও তাহারা কেহই তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কেননা—জন সিলভার তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ এই আশ্বাস দিয়া আসিতেছিল যে—ঐ গুহার মধ্যে লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা সঞ্চিত রহিয়াছে, কাজেই তাহাদের শ্রম কোনরূপেই ব্যর্থ হইবে না। এই আশার কথায় ধনলুব্ধ নাবিকের দল তাহার অনুসরণ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল একটি গর্ত্তের কাছাকাছি। সেই গভীর খাতের কাছে এই নাবিকের দল ও সিলভার দেখিল যে সেই খাদের নিকটে একটি তক্তার গায়ে ফ্লিন্টের জাহাজ—"ওয়ালরাসের" নাম লেখা রহিয়াছে।

ইহা দেখিয়াই দস্যুদল বুঝিতে পারিল যে রত্নলাভ তাহাদের অদৃষ্টে নাই। নিশ্চয়ই তাহাদের পূর্ব্বে কেহ আসিয়া ঐ সমুদয় সঞ্চিত ধনরত্ন অপহরণ করিয়াছে। কিন্তু তবু তাহারা নিরাশ না হইয়া উন্মত্তের মত সেই গর্ত্তের চারিদিক খুঁড়িতে লাগিল, কিন্তু কোথাও কিছু মিলিল না, তাহার পর কি ঘটিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এদিকে তাহারা সেখানে আসিয়া রত্নের সন্ধান পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাঁহারা ভাবিতেও পারেন নাই যে ফ্লিন্টের দল নির্জ্জন দ্বীপের মধ্যস্থিত নিভৃত গুহার মধ্যে এইরূপ ধনরত্ন সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে।

জিমের অসাধারণ সাহস, বুদ্ধি ও কৌশলের জন্য তাঁহারা বিশেষ ভাবে তাহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। জিম্ যদি গোপনে ছদ্মবেশী দস্যু নাবিকদের কথা না শুনিত তাহা হইলে আজ তাহাদের প্রাণরক্ষাই দায় হইত। তারপর এ সমুদয় অশান্তি ও যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে জিম্ যে নির্ভীকতা এবং বুদ্ধি ও কৌশলের পরিচয় দিয়াছে তাহাও অতুলনীয়। এই জন্য সকলে জিমকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর সকলে সেই অতুলনীয় ধনরত্ন সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন।

অগাধ ধন রত্ন পাইয়া ডাক্তার, জিম্, ক্যাপ্টেন প্রভৃতি খুব খুশী হইলেন—এত ধন-রত্ন সেই গুহায় ছিল যে উহা জাহাজে তুলিতে তুলিতে তিন দিন লাগিয়া গেল। তারপর দেশে ফিরিয়া সেই ধনরত্ন ভাগ করিয়া লইয়া তাঁহারা তাঁহাদের বাকী জীবন অসীম ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সুখে কাটাইয়া দিলেন। জিম্ও ঐ ধন-রত্নের সমান ভাগ পাইয়াছিল। অসীম ধন-রত্ন লইয়া মনের আনন্দে সে তাহার মায়ের কাছে ফিরিয়া গেল।

ট্রেজার আইল্যাণ্ড গল্পটি যে কত বড় জনপ্রিয় এবং ছেলেমেয়েরা কিরূপ ভালবাসে তাহা নীচে যে সঙ্গীতটি তুলিয়া দিলাম তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবে

"Fifteen men on the Dead Man's
Chest—
Yo-ho-ho, and a bottle of rum!
Drink and the devil had done
for the rest—
Yo-ho-ho, and bottle of rum!!"

তোমরা এই বিখ্যাত বইখানা পড়িয়া ফেলিও। আমরা এখানে যে চারিখানি ছবি দিলাম, তাহা ট্রেজার আইল্যাণ্ডের অভিনয়-চিত্র। এ নাটকের অভিনয় দেখিতে ছেলেমেয়েরা খুব ভালবাসে। বইখানি বালকদের জন্য লেখা। এ বইয়ের নায়ক ও একটি বালক। জিমকে কাহার না ভাল লাগে! জিমের চরিত্র অতি সুন্দর—সৃষ্টি। আমরা যখন প্রথম সরাইখানাতে জিমকে দেখিতে পাই, তখন হইতেই তাহার—মিষ্টি ব্যবহার, চতুরতা এবং অসামান্য বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া থাকি। বালক জিমের সাহায্য না পাইলে রত্নদ্বীপের ধন-রত্ন সংগ্রহ করিয়া ডাক্তার লিভজে ও জমিদারকে ফিরিয়া আসিতে হইত না। ট্রেজার আইল্যাণ্ড বা রত্নদ্বীপ গল্পটিও একটি বালককে গল্প শুনাইবার উদ্দেশেই লিখিত হইয়াছিল। এই গল্পটি পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে। এবং গল্পটি ছেলে বুড়ো সকলেই ভালবাস এবং কেবল একবার নয় বহুবার পড়িয়াও কাহারও আকাঙ্ক্ষা মিটিতে চাহে না—এমনি চিত্তাকর্ষক গল্পের বাঁধুনি!

রোম

গ্রীসের বর্ত্তমান ইতিহাস

রাজা আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পরে রাজ্যমধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল। ভেনিজেলিষ্ট (Venizelist) এবং কনষ্টে-ণ্টনিয়ান (Con-st[illegible] s[illegible]a) দলের মধ্যে একটা কলহ আরম্ভ হইল। এই দ্বন্দ্বে ভেনিজেলিষ্ট দল পরাজিত হইল। এদিকে গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে স্মার্ণার অধিকার লইয়া যে কলহ চলিতেছিল, তাহাতে শক্তিরা আর গ্রীসের পক্ষে রহিলেন না। ফরাসীরা তুরস্কের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। গ্রীসের উপর হুকুমজারী করা হইল যে তাঁহারা কনষ্টাণ্টি-নোপল আক্রমণ করিতে পারিবেন না। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তুরস্কের স্মার্ণা (Smyrna) অধিকার করিল। কনষ্টেণ্টাইন দ্বিতীয়বার রাজ্য ত্যাগ করিলেন এবং পেলায়সোতে গমন করিলেন, সেখানে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার মৃত্যু হইল।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ নানারূপ বিপ্লব, বিদ্রোহ এবং অশান্তি চলিয়াছিল। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ্চ গ্রীস্ গণতন্ত্র রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইল। দেশে নামে মাত্র সুধু রাজা রহিলেন। কিন্তু উহাতেও দেশে শান্তি আসিল না। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নানারূপ অশান্তি চলিতেছিল।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজা কনষ্টেণ্টাইনের পুত্র রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জকে রাজপক্ষীয় দলেরা রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। দ্বিতীয় জর্জ্জকে রাজা করিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল যে দেশ মধ্যে যে অশান্তি চলিতেছে, যাহার ফলে গ্রীসের লোকেরা নানাভাবে নির্য্যাতন ভোগ করিতেছে যদি রাজকীয় শাসনে তাহা দূর হয়।

নূতন রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জ গ্রীসে আসিয়াই ঘোষণা করিলেন যে "অতীতের অশান্তি ও উপদ্রব দূর করিয়া তিনি রাজ্য মধ্যে জাতীয় ঐক্য আনিবেন এই জন্য তিনি সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহার

ডাকের অভিযান

তোমরা প্রতিদিন বাড়িতে বসিয়াই ডাকের চিঠি পাও। কিন্তু কি ভাবে পৃথিবীর নানা দেশে ডাকের চিঠির অভিযান চলে তাহা জাননা। এই ছবিতে দেখ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে কি ভাবে ডাক লইয়া যাওয়া হইতেছে। কিরূপ বেগে বরফের দেশে কিংবা দুর্গম মরু প্রান্তরে ডাকের অভিযান চলে তাহাই ছবিতে দেখিতে পাইবে।

এই ঘোষণা বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হইল না। জেনারেল কোনডিলিস্ (General Kondylis) ইহার প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু পরিশেষে রাজা অজস্র বিচক্ষণতার সহিত রাজ-বিরুদ্ধাচারী প্রজা-গণের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া রাজক্ষমা ঘোষণা করিয়া সাধারণ নির্ব্বাচন দ্বারা গ্রীস জনসাধারণ ঐক্য ভাবে উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়া যাহাতে সমুদয় কার্য্যাদি নির্ব্বাহের ব্যবস্থা হয় সেজন্য যত্নবান

প্রাচীন রোমের কোলসিয়াম

হইলেন। তাহারই ফলে গ্রীসদেশে আজ স্বাধীনতা ও শান্তির নূতন পথ উন্মুক্ত হইয়াছে এখন যদি গ্রীকেরা এইরূপ ভাবে চলে তাহা হইলে গ্রীসদেশ পূর্ব্বের ন্যায় ঐশ্বর্য্য ও সম্পদপূর্ণ হইতে পারে উহা অসম্ভব নহে।

রোম

ইটালির নাম তোমরা জান। ভূগোলে পড়িয়াছ, আর বর্ত্তমান সময়ে মুসোলিনির নামের সহিত, তাঁহার জীবনীর সহিত তোমরাত বিশেষ ভাবেই পরিচিত।

ইটালি দেশটি ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। বুটজুতার মত দ্বীপটি জুতার গোড়ালির মত। এই দেশের জলবায়ু, এই দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য, এই দেশের গ্রীষ্ম ও বসন্ত, এই দেশের 'দক্ষিণ হাওয়া' কবি-দের কাব্যে বিশেষ ভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে।

আল্পস পর্ব্বত এবং এপিনাইন পর্ব্বত এই উপদ্বীপটিকে বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিয়াছে। কোথাও পর্ব্বতের শ্যামল সৌন্দর্য্য, কোথাও তুষার-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ, কোথাও সবুজ উপত্যকা, কোথাও কুলুকুলু শব্দে নদী বহিয়া যাইতেছে কোথাও বিস্তৃত হ্রদ, চারিদিকে তার মনোরম শোভা। ইটালির প্রাকৃতিক শোভা সম্পদ সত্য সত্যই অপরূপ। এ-দেশের জলবায়ুও যেমন স্বাস্থ্যপ্রদ ও চমৎকার, তেমনি এ-দেশের

মাটিও উর্ব্বর। এ দেশের মাটিতে দ্রাক্ষা ফল ফলে অপর্য্যাপ্ত, কমলা ফলের শোভা এখানে চমৎকার, এখানকার লেবু, ডালিম, বাদাম, খুবানী, পিচ, কিসমিস, মনোক্কা, ডুমুর ফলে প্রচুর। এই সব সুন্দর সুন্দর ফলের জন্যও ইটালি দেশ-বিদেশে বিখ্যাত।

পৃথিবীর খুব কম দেশেই এ দেশের মত রাজনীতি-বিশারদ-পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রকর ও ভাস্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

দের পোষাক-পরিচ্ছদেও বৈচিত্র্য আছে। এক এক অঞ্চলে এক এক রকমের পোষাক। ইটালীর অধিবাসীরা ভদ্র, সদালাপী, বিনয়ী, উৎসাহী ও সুরুচিসম্পন্ন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আজ পর্য্যন্তও ইহারা নানারূপ দৈব মানিয়া চলে।

ইটালীর প্রত্যেকটি প্রসিদ্ধ নগরই জনপূর্ণ। এবং প্রত্যেকটি সহরেই দেখিতে পাইবে ভজনালয়গুলি অতি সুন্দর এবং অর্থব্যয় করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। কি সুন্দর সব বাড়ী ঘর,

ভিসেঞ্জা (Vicenza)—রোম

তোমরা 'শিশু-ভারতী'র পৃথিবীর চিত্রশালায় র্যাফায়েলের যে চিত্র দেখিয়াছ, সেই জগদ্বিখ্যাত চিত্রকর র্যাফায়েল এ দেশেরই অধিবাসী ছিলেন।

ইটালীর অধিবাসীরা দেখিতে সুশ্রী, কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশের লোকের মত তাহাদের গায়ের রং অত বেশী শাদা নহে। তাহা-

ও রাজপ্রাসাদ শ্বেত-মর্ম্মর-প্রস্তর দ্বারা সুগঠিত, জ্যোৎস্নার মতই শুভ্র ও মনোহারী, দেখিলেই বুঝিতে পারিবে এই সব ভজনালয়, এই বাড়ী-ঘর, মূর্ত্তি সব যদি তোমরা নিজের চোখে দেখ, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে ইহার প্রত্যেকটির মধ্যেই জাগিয়া রহিয়াছে অতীতের স্মৃতি।

ফ্লোরেন্স, রোম, নেপলস্, এবং ইটালীর
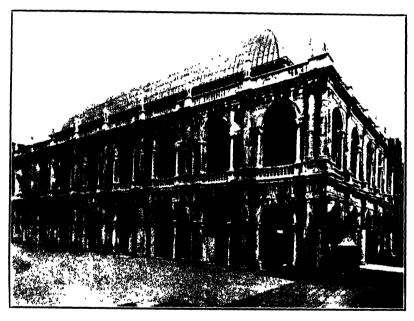
অন্যান্য প্রধান প্রধান নগরীতে চিত্রশালায় অপূর্ব্ব চিত্র সংগ্রহ, এবং অপরূপ সব প্রস্তর মূর্ত্তি দেখিলে মনে হইবে কত বড় শ্রেষ্ঠ শিল্পীর স্বপ্ন রাজ্য এই ইটালি। ঐ সব চিত্র যাঁহারা আঁকিয়াছেন, ঐ সব মূর্ত্তি যাঁহারা পাথরের গা খুদিয়া তৈরী করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ছিলেন জগদ্বিখ্যাত শিল্পী। এই সব শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই নানা যুগে নানা শতাব্দীতে জন্মিয়াছিলেন—সে দু'হাজার বৎসরের ইতিহাস। রোমের অনেক প্রাচীন-কীর্ত্তি—চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে রোমের সেণ্টপিটারের গীর্জ্জা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দর্শনীয় জিনিষ। ইহার গুম্বজটি পাঁচশত ফিট উচ্চ। তাহারই নিকটে পোপের বাসভবন ভ্যাটিকান (Vatican)।

যদি নেপলস বেড়াইতে যাও তাহা হইলে দেখিতে পাইবে নেপলস্ নগরের অনতিদূরে বিখ্যাত বিসুবিয়াস্ (Vesuveus) আগ্নেয়গিরি দাঁড়াইয়া
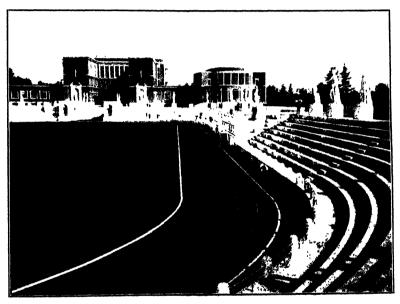
ফোরো মুসলিনি—মুসলিনির নামে নির্ম্মিত নূতন ষ্টেডিয়াম

কোন কোন প্রস্তর মূর্ত্তি গ্রীক্-শিল্পীদের নির্ম্মিত, সেই পেরিক্লেশের সময়ের।

ইটালির সব চেয়ে আশ্চর্য্য ও দেখিবার জিনিষ হইতেছে প্রাচীন রোমের ধ্বংসাবশেষ। বর্ত্তমান রোম নগরীর চারিদিকে এখনও রোমের প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীসের ও রোমের অতুলনীয় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের ন্যায় এই

। এখনও তাহার মুখ হইতে ধূম ও গলিত ধাতু-নিঃস্রাব বাহির হইয়া থাকে। এই বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতেই একদিন বিখ্যাত পম্পি নগরী ধ্বংস হইয়াছিল।

তুমি যদি সিসিলি দ্বীপে বেড়াইতে যাও, তাহা হইলে সেখানেও দেখিতে পাইবে—এত্না (Ætna) নামক আগ্নেয়গিরি'র শিখরদেশ হইতে ধূম, অগ্নি এবং ধাতু নিঃস্রাব হইতেছে। এত্নার

পাশে এখন গ্রামের পর গ্রাম বিরাজিত। প্রত্যেকটি গ্রাম জনবহুল। প্রত্যেকটি গ্রামের কাছেই ধানের ক্ষেত, দ্রাক্ষাকুঞ্জ, সুন্দর বাগান, ডুমুরের বাগ, কমলা ও জলপাইর শ্যামল উদ্যান। বাগানে বাগানে কমলার কমলা রং অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে।

এই যে ইটালি দেশটির কথা বলিলাম, এই যে বুট জুতার মত আকারের দেশটি ভূমধ্যসাগরের নীল জলের মধ্যে আপনাকে বিস্তার করিয়া দিয়াছে, এই দেশের প্রাচীন ইতিহাস ছিল বড়ই গরিমাময় বড়ই কীর্ত্তি-গৌরব রঞ্জিত।

ইটালি বলিতেই বুঝিতে হইবে **রোম**। রোমের ইতিহাসই ইটালির ইতিহাস। দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী রোমের ইতিহাস বলিবার আগে, সে দেশটি কেমন সে কথাই বলিয়া লইলাম।

রোমের ইতিহাস

এইবার রোমের ইতিহাস বলিতেছি। পৃথিবীর সব প্রাচীন দেশের ইতিহাসের সঙ্গেই যেমন নানারূপ জন প্রবাদ ও অলৌকিক সব গল্প ও কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। রোমের ইতিহাসের সহিতও তেমনি নানারূপ প্রাচীন কাহিনী ও কিংবদন্তী রহিয়াছে।

টাইবার (Tiber) নদীর তীরে বিখ্যাত রোম নগরী বিরাজিত। সমুদ্র হইতে মাত্র ষোল মাইল দূরে রোম নগরী অবস্থিত। ৭৫৩ খৃঃ পূঃ অব্দে রমুলাস্ (Romulus) নামক এক ব্যক্তি এই নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। রমুলাস্ লোকটি ছিলেন প্রায় তিন হাজার দস্যুদলের নেতা। রমুলাস্ ও তার দলের লোকেরা প্যালেটাইল (Palatil) নামক একটি পর্ব্বতের উপর কতকগুলি কুড়েঘর নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বাস করিতেন। তাহাদের ঘর বাড়ীর চারিদিক দিয়া তাহারা একটি প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ইহা হইল জগদ্বিখ্যাত রোম-নগরী সৃষ্টির প্রথম ইতিহাস। তোমরা সম্ভবতঃ কবির সেই বিখ্যাত উক্তিটি জান—'Rome was not built in a day' যে কত বড় সত্য তাহা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে।

রোমের চারিদিক বেড়িয়া যে দেওয়াল দেওয়া হইয়াছিল, সেই দেয়াল এত নীচু ছিল যে একদিন রেমাস্ (Remus) সেই প্রাচীর টপকাইয়া যাইয়া রমুলাসকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, তুমি কি এই দেয়ালকে নগর প্রাচীর বলতে চাও? রমুলাস্ ভাইয়ের এই বিদ্রূপে এতদূর উত্তেজিত হইলেন যে তিনি তৎক্ষণাৎ ভাইয়ের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। ভ্রাতৃরক্তেই রোমের প্রাচীর প্রথমে অনুরঞ্জিত হইল।

রমুলাস্ এবং তাহার অনুচরেরা ক্রমে ক্রমে যখন নগরীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন, সে সময়ে তাহারা বিশেষ অভাব অনুভব করিলেন স্ত্রীলোকেদের। সে সময়ে ইটালিতে নানা জাতীয় লোক বাস করিত। তাহাদের মধ্যে রোমের কাছাকাছি স্যাবাইন্ নামে একটি জাতির বাস ছিল। তাহারা তাহাদের মেয়েদের রোমকদের সঙ্গে বিবাহ দিতেন না। এজন্য রোমকেরা জোর করিয়া তাহাদের মেয়ে বিবাহ করিবার একটা ফন্দী আঁটিল।

রমুলাস্—একটা উৎসব উপলক্ষে স্যাবাইনদের পুরুষ ও স্ত্রীলোক; কুমারী কন্যা সকলের নিমন্ত্রণ করিল। স্যাবাইনরা মনেও করিতে পারে নাই যে ইহার ভিতরে কোন প্রকার কু-অভিপ্রায় আছে, কাজেই তাহারা প্রফুল্লচিত্তে দলে দলে এই উৎসবে যোগ দিতে আসিল। স্যাবাইনদের সঙ্গে তাহাদের কুমারী কন্যারাও সব আসিল।

রোমক যুবকদের ব্যবহারে এবং তাহাদের খেলা ধূলা ও ক্রীড়া-কৌতুক প্রভৃতি দেখিয়া স্যাবাইনেরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। খেলা ধূলা আমোদ-প্রমোদ ও উৎসবের আনন্দ পূর্ণভাবে চলিতেছে এমন সময় রমুলাস্ যেমন ইঙ্গিত করিলেন, সেই মুহূর্ত্তে রমুলাসের অনুচরেরা সকলে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে নিরীহ জনতার দিকে বেগে ছুটিয়া আসিল।

স্যাবাইন্‌রা এমন একটা অতর্কিত আক্রমণের প্রত্যাশা করে নাই। কাজেই তাহারা কোনরূপে ইহার বাধা দিতে পারিল না। প্রত্যেক রোমক যুবক স্যাবাইনদের সুন্দরী মেয়েদের বল পূর্ব্বক লইয়া গেল। এইভাবে এই রোমক তরুণগণ সকলেই মনোমত পত্নী লাভ করিল।

স্যাবাইনরা এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা এক বিরাট সৈন্য-দল গড়িয়া তুলিল রোমদিগকে আক্রমণ করিতে।

ভারতের দ্রাবিড়-পূর্ব্ব আদিম জাতিদের কথা

দ্রাবিড় পূর্ব্বজাতি

৩৩১৯ পৃষ্ঠার পর

ভারতে যে ছয়টি মূল জাতির নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাদের তালিকা "ভারতের মানুষের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে [শিশু-ভারতী ৩০৬৯ পৃষ্ঠা] তোমরা পাইয়াছ। আর "ভারতের কালো মানুষের কথা" নামক প্রবন্ধে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-প্রান্তের **কাডার, উরুলা,** প্রভৃতি কয়েকটি বন্য অসভ্য জাতির সামান্য পরিচয়ও পাইয়াছ। উহাদের ধমনীতে সম্ভবতঃ ভারতের প্রাথমিক অধিবাসী কৃষ্ণ-ত্বচ্, খর্ব্বকায়, অনুচ্চ নাসিকা-(থেবড়া নাক) বিশিষ্ট নেগ্রিটো-প্রায় জাতির সামান্য চিহ্ন বা আভাস বর্ত্তমান, একথাও তোমরা শুনিয়াছ। ভারতের সেই আদি-বাসী অধুনা-বিলুপ্ত নেগ্রিটো জাতির অব্যবহিত পরে ও ভূমধ্য-সাগর-উপকূলে উদ্ভূত মেডিটারেনিয়ান জাতীয় দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী সভ্য তামিল, তেলেগু প্রভৃতি জাতির পূর্ব্ব পুরুষদের ভারতে আগমনের বহু পূর্ব্বে, ককেসীয় জাতির যে অনুন্নত শাখা ভারতে প্রবেশ করিয়া এখানে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল এখন তাহাদের কথা তোমাদিগকে কিছু বলিব।

প্রোটো অষ্ট্রোলয়েড জাতি

এই "দ্রাবিড়-পূর্ব্ব" মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতিরা ভারতের ভূতপূর্ব্ব আদিম-নিবাসী নেগ্রিটো জাতিদিগকে আংশিক বিনাশ ও আংশিক গ্রাস করিয়া সুদীর্ঘকাল যাবৎ ভারতে আধিপত্য করে। এই দ্রাবিড়-পূর্ব্ব বা "প্রোটো-অষ্ট্রোলয়েড" জাতিদিগকে অধুনা অনেকে 'কোল' 'ধাঙ্গড়' প্রভৃতি নিন্দাত্মক আখ্যায় অভিহিত করেন। কিন্তু এই দ্রাবিড়-পূর্ব্ব এবং তাহাদের পরবর্ত্তী দ্রাবিড় জাতিগুলিই ভারতের বর্ত্তমান অধিবাসীদের মূলস্তবক (substratum)। মুণ্ডা প্রভৃতি এই সমস্ত জাতিদের রক্ত ও সংস্কৃতির

চেল্‌কী খাড়িয়া

বলিতে হয় এবং তাহা তোমাদের ভাল ও লাগিবে না। এই প্রবন্ধে ও ইহার পরবর্ত্তী প্রবন্ধে ভারতের দ্রাবিড়-পূর্ব্ব অসভ্য জাতিদের সামান্য পরিচয় দিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাদের শ্রেণী বিভাগের কথা বলিব এবং পরবর্ত্তী প্রবন্ধে উহাদের সংসার-যাত্রা ও অর্থনীতি, সামাজিক আচার ব্যবহার ও সংস্কারাদি, ধর্ম্মবিশ্বাস ও পূজা-পার্ব্বণ সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু বলিব।

দ্রাবিড় পূর্ব্বজাতির শ্রেণী বিভাগ

এই জাতিগুলির সংস্কৃতি বা সভ্যতার ধারা ও ক্রম অনুসারে ইহাদিগকে তিনটি বা চারিটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) মানবের জাতীয় জীবনের সেই প্রথম যুগে সম্ভবতঃ বন্য ফলমূল আহরণ (food-gathering) করিয়া মানুষ জীবন ধারণ করিত; কিন্তু অধুনা কোনও

খাড়িয়া পুরুষ

অসভ্য জাতিকেই একমাত্র কন্দ ফল মূলের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে দেখা যায় না। সবচেয়ে

দুধ্‌ খাড়িয়া বালক-বালিকাদের (তুইউ-মেরোম) ক্রীড়া

আধুনিক অসভ্য জাতিরাও ফল-মূলাদি আহরণ ও মৃগয়া দুইই একসঙ্গে করিয়া থাকে। সাধারণতঃ

তাহাদের স্ত্রীলোকেরা ফল মূল আহরণ করে এবং সুবিধামত মৎস্য আহরণও করে; এবং পুরুষেরা মৃগয়ায় ব্যাপৃত থাকে। তবে কোনও কোনও জাতি বৃহত্তর পশু শিকার করিতে পছন্দ করে; এবং কোনও কোনও জাতির প্রধান লক্ষ্য ক্ষুদ্র পশু-পক্ষী শিকার করা। সে যাহা হউক, দ্রাবিড়-পূর্ব্ব অসভ্য জাতিদের শ্রেণী বিভাগে সকলের নিম্নে স্থান ঐ সমস্ত যাযাবর জাতির, যাহারা দলবদ্ধ হইয়া বন্য ফলমূল আহরণ ও বন্য পশু-পক্ষী শিকার করিয়া বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায় ও কায়ক্লেশে কথঞ্চিৎ জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। ইহারা খাদ্য উৎপাদন (produce) করে না, স্বভাব-জাত খাদ্য সংগ্রহ (gather) করে মাত্র। এইজন্য ইহাদিগকে নৃতত্ত্ব-বিদ্‌গণ "খাদ্য-সংগ্রহ-কারী" (food-gatherers অথবা food-collectors) বলেন। ভারতের এই

উঁরাও যুগল তাহাদের গৃহের সম্মুখে

শ্রেণীর জাতিদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জাতির নাম বলিতেছি:— ছোট নাগপুরের **'উঠলু' বীরহোড় ও পড়িয়া** (পাহাড়িয়া) জাতি: মধ্য প্রদেশের জাশপুর ও সুরগুজা রাজ্যের পার্ব্বত্য **কোড়ায়া ও কোড়কু জাতি**; বম্বে প্রদেশের সাতপুরা গিরিমালার **নাহাল জাতি**; মাদ্রাজ প্রদেশের নীলগিরি পর্ব্বতের **ইরুলা জাতি** ও কোইম্বাটোর প্রভৃতি জেলার **শোলাগা জাতি**; এবং হায়দ্রাবাদ রাজ্যের **চেঞ্চু জাতি**।

যাযাবর মৃগয়াজীবি জাতিদের অপেক্ষা উচ্চতর স্তরে কয়েকটি যাযাবর পশুপালক (pastoral বা cattle breeding) জাতি ভারতেও দেখা যায়। ভারতবর্ষের পশু-পালক জাতিদের কথা বলিতে গেলেই প্রথমে মনে আসে মাদ্রাজ প্রদেশের নীল গিরি পর্ব্বতের **'টোডা'** জাতির এবং উড়িষ্যার

বীরহোড় রমণী উদুখলে ধান কুটিতেছে

বনাই, পাললহরা, প্রভৃতি কয়েকটি করদরাজ্যের 'গৌড় আহীর' জাতির কথা। কিন্তু এইসব জাতিকে 'দ্রাবিড় পূর্ব্ব' (Pre-Dravidian) জাতি ভুক্ত করা যায় না। বস্তুতঃ ভারতের অমিশ্র 'দ্রাবিড়-পূর্ব্ব' জাতিদের মধ্যে নিছক পশুপালক জাতি এখন দেখা যায় না।

শিকার ও পশুপালন

এই প্রসঙ্গে তোমাদিগকে একটি নূতন চিত্তাকর্ষক তথ্য বলিতেছি। নৃতত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিতেরা গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শিকারীর বৃত্তি হইতেই ক্রমে পশুপালনের উদ্ভব হয়। এখনও পৃথিবীর কোনও কোনও মৃগয়া-জীবি জাতি কোনও বিশেষ বিশেষ পশু-যূথের অনুসরণে বন হইতে বনান্তরে যায়: এবং এইরূপে ক্রমে সেই পশু-পালের

সহিত শিকারীদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। আজ পর্যন্ত সাইবিরিয়া প্রদেশের বলগা-হরিণ শিকারী (reindeer-hunters), ও উত্তর-আমেরিকার বাইসন নামক বন্য বৃষ শিকারী (bison-hunters) অসভ্যেরা এইরূপে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, ক্রমাগত বিশেষ কোনও পশুদলের (herd এর) পশ্চাদ্ধাবন করে। ইহা হইতে

নীলগিরির টোডা পুরুষ

অনুমান করা যায় যে কোনও কোনও আদিম মৃগয়াজীবি জাতি ক্রমে এইরূপে বিশেষ বিশেষ পশুপালের অনুবর্ত্তী হইয়া তাহাদের স্বভাব, প্রকৃতি, কার্য্যধারা ও আচরণের সহিত সুপরিচিত হয়; আর সেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে ঐ পশুপালের অভ্যাস ও স্বভাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নিজেদের গতিবিধি ও ব্যবহার নিয়মিত করে ও তাহাদের প্রতি যথোপযুক্ত প্রীতিকর আচরণের দ্বারা তাহাদিগকে ক্রমে বশীভূত করে বা পোষ মানায়; আহারার্থে ঐ পশুপালকে সমূলে বিনাশ করার পরিবর্ত্তে প্রধানতঃ তাহাদের দুগ্ধ পান ও দুগ্ধে প্রস্তুত খাদ্য আহার করিয়া (এবং কখনও কখনও জরাগ্রস্ত কিম্বা বাচ্চা পশু হনন করিয়া) ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত করে এবং মৃত পশুর চর্ম্ম ও মৃত এবং জীবিত পশুর লোমের দ্বারা দেহাবরণ প্রস্তুত করিয়া শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা করে।

নীলগিরির টোডা স্ত্রীলোক

পরে যখন ঐরূপ কোনও কোনও পশুপালক জাতির সহিত কোনও কোনও আদিম কৃষিজীবি জাতির সংমিশ্রণ কিংবা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটে, তখন ক্রমে বীজ বপনের জন্য খনিত্র বা খোন্তার ন্যায় আদিম অস্ত্রের অর্থাৎ ধারযুক্ত কাষ্ঠ ফলকের (digging-stick) কিম্বা লৌহফলকযুক্ত খোন্তার পরিবর্ত্তে পশু চালিত লাঙ্গলের উদ্ভব ও প্রচলন হয়।

কৃষিজীবি জাতি

(২) তারপর কৃষিজীবীদের কথা। এই সব স্থায়ী মৃগয়াজীবি পশুপালক জাতিদের উচ্চে, স্থায়ী

পাহাড়ী ভূঁইয়া কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করিতেছে

কৃষিজীবি জাতিদের স্থান। তাহার কারণ এই যে ইহারা খাদ্য উৎপাদন করে ও উদ্বৃত্ত খাদ্য সঞ্চয় করিয়া স্বচ্ছলতা লাভ করে; এবং অপেক্ষাকৃত অবসর (leisure) লাভ করিয়া মনের উৎকর্ষ সাধনের দিকে মনোনিবেশ করিবার ও শিল্প কলা-প্রভৃতির অনুশীলন করিবার সুযোগ পায়। যদিও দ্রাবিড়-পূর্ব্ব অসভ্য জাতিদের মধ্যে প্রধান জাতিগুলি বহুকাল যাবৎ কৃষি-কার্য্যের দ্বারা শস্যোৎপাদন করিয়া জীবিকা-অর্জ্জন করিতেছে, তথাপি তাহাদের মধ্যেও

কোনও কোনও জাতির সমস্ত শাখা এখনও সম্পূর্ণ ভাবে স্থায়ী কৃষিবৃত্তি (settled agriculture)

পাহাড়ী খাড়িয়া

অবলম্বন করিতে পারে নাই। আর ইহাদের কোনও কোনও জাতির নিম্নতর শাখা এখনও পাহাড়-পর্ব্বতে বাস করে ও বন্য-ফল-মূল আহরণ ও মৃগয়া দ্বারা জীবন ধারণ করে ; এবং অপর শাখা অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে বা উপত্যকায় বসবাস করিতেছে ও ভূমি কর্ষণ ও শস্যোৎপাদন তাহাদের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছোটনাগ-পুরের '**থানিয়া**' (অর্থাৎ একস্থানে অবস্থিত) বীরহোড় প্রভৃতি, জাতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই জাতির শাখা বা জাতি বিশেষ এখনও বনে-জঙ্গলে বন্য-ফল মূল ও মধু আহরণ করিয়া এবং মৃগয়ার সাহায্যে কায়ক্লেশে জীবিকা-অর্জ্জন করে ; কখনও কখনও শিকারের অভাবে একাধিক দিন অনশনে কাটাইতেও বাধ্য হয়। বানর ইহাদের প্রধান শিকার হইলেও ইহারা বানরের মাংস ভক্ষণ করে না ; বানরের বা বানর-চর্ম্মের বিনিময়ে চাউল প্রভৃতি সংগ্রহ করে ; এবং কচিৎ কেহ বানরকে পোষ মানাইয়াও আদব-কায়দা ও নৃত্য শিখায় এবং ঐরূপ বানরের ভাঁড়ামি (antics) প্রদর্শন করাইয়া আহার্য্য উপার্জ্জন করে। বীরহোড় জাতির এই যাযাবর শাখাকে উঠ্‌লু (অর্থাৎ ক্রমাগত একস্থান হইতে 'উঠিয়া' অপর স্থানে গমনশীল) বীরহোড় নাম দেওয়া হইয়া থাকে। ঐরূপ কোড়োয়া, কোড়কু, শবর, গদব প্রভৃতি জাতিদেরও একটি স্থিতিশীল (settled) ও আর একটি যাযাবর (migratory) শাখা আছে।

আবার, 'দ্রাবিড়-পূর্ব্ব' কয়েকটি কৃষি-জীবী জাতির মধ্যেও দুইটি বিভিন্ন শাখা দেখিতে পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শাখার লোকেরা লাঙ্গলের সাহায্যে রীতিমত স্থায়ী কৃষিকার্য্য (settled agriculture) করে না,—'ঝুম' বা 'দাহি' প্রথায় স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিবর্ত্তনশীল চাষ (shifting cultivation) করে। জঙ্গলের এক অংশে অগ্নিসংযোগ করিয়া তাহার ভস্মসারযুক্ত

সন্তান বহন

ভূমিতে সূক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠদণ্ড (digging stick) বা আদিম খোন্তা দ্বারা ভূমি অগভীর ভাবে কর্ষণ

করে ও তাহাতে বীজ বপন করে; আবার কয়েক বৎসর পরে ঐ জমি পরিত্যাগ করিয়া

রীবহোড় দড়ি পাকাইতেছে

জঙ্গলের অপর অংশ ঐ রীতিতে পোড়াইয়া ('ঝুম', 'দাহি' বা 'বেওরা' করিয়া) জমি প্রস্তুত করে ফসল উৎপাদন করে। আজকাল উহাদের মধ্যে কেহ কেহ হল সংযোগে ভূমি কর্ষণ করিয়া বীজ বপন করিতেছে।

অপেক্ষাকৃত উন্নত কৃষিজীবি জাতিরা একস্থানে গ্রাম স্থাপন করিয়া স্থায়ীভাবে পশু-চালিত লাঙ্গলের সাহায্যে কৃষিকার্য্য (settled agriculture) পরিচালনা করে। কোনও কোনও 'দ্রাবিড়-পূর্ব্ব' জাতির মধ্যে তিনটি শাখাও দেখা যায়;— একটি যাযাবর মৃগয়া-জীবি শাখা, একটি 'ঝুম'-চাষী শাখা, আর একটি স্থায়ী কৃষক-শাখা। দৃষ্টান্তস্বরূপ ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশের খাড়িয়া জাতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের যাযাবর মৃগয়া-জীবি শাখাকে পার্ব্বতীয়া বা পাহাড়ী খাড়িয়া বা 'শেড়ে' নামে অভিহিত করা হয়; "ঢেলকি" খাড়িয়া প্রধানতঃ 'ঝুম' চাষ করে; আর স্থায়ী কৃষি-জীবি শাখা "দুধ"-খাড়িয়া নামে পরিচিত। ভারতের "দ্রাবিড়-পূর্ব্ব" (Pre-Dravidian) প্রধান কৃষি-জীবি জাতিদের মধ্যে ছোটনাগপুরের মুণ্ডাভাষা-ভাষী মুণ্ডা, সাঁওতাল, ভূমিজ, হো, খাড়িয়া এবং দ্রাবিড়-ভাষা-ভাষী উরাঁও; উড়িষ্যা ও মধ্য-প্রদেশের দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী গন্দ বা গোঁড এবং খন্দ জাতি; এবং বম্বে ও মধ্যভারতের ভীল জাতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সাঁওতাল পরগণার 'দ্রাবিড়-পূর্ব্ব' পাহাড়িয়া জাতির 'মাল-পাহাড়ী' নামক শাখা অধুনা পাহাড়ের নিম্নস্থ সমতল ভূমিতে বাস করে এবং রীতিমত হল-চালন দ্বারা স্থায়ী কৃষিকার্য্য করে; কিন্তু ঐ পাহাড়িয়া জাতির দ্রাবিড়-ভাষা-ভাষী 'মালের' বা 'সৌরিয়া পাহাড়িয়া' শাখা সাধারণতঃ পাহাড়ের উপরে বাস করে এবং পাহাড়ের উপরে ও ক্রম-নিম্ন ঢালুতে সুক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠদণ্ড (digging-stick) অথবা কাস্তের (sickle) সাহায্যে ভূমি কথঞ্চিৎ উল্টাইয়া তাহাতে প্রধানতঃ ভুট্টা (maize) ও কখনও কখনও বাজরা (millet) বপন করে। আজকাল কোনও কোনও সৌরিয়া পাহাড়িয়া পাহাড়ের ঢালুর ও তলদেশের ভূমিতে গো-চালিত লাঙ্গলের সাহায্যে ধান্যাদি শস্য উৎপাদন করিতেছে। বস্তুতঃ ইদানীন্তন অনেক স্থলে জঙ্গলের পরিমাণ হ্রাস হওয়াতে অপচয়ী (wasteful)

দুধ খাড়িয়া বালিকাদের (চিল হোড়হোড়) ক্রীড়া

'ঝুম'-প্রথা স্বেচ্ছায় বর্জ্জিত কিংবা সরকারী আদেশে দিন দিনই রহিত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রম শিল্পজীবী

(৩) তৃতীয়তঃ, কয়েকটি 'দ্রাবিড়-পূর্ব্ব (Pre-Dravidian) জাতি মৃগয়া কিংবা কৃষিকার্য্যের পরিবর্ত্তে প্রধানতঃ বিভিন্ন অমার্জ্জিত হস্তশিল্প (rude handicrafts) ও শ্রম-শিল্প (industries) দ্বারা কোনও প্রকারে জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। উদাহরণ স্বরূপ ছোটনাগপুরের **অসুর বা আগোরিয়া** জাতির ও **তুরি বা মহলি** জাতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। আগোরিয়া জাতি এখনও আদিম প্রথার সাহায্যে প্রস্তর-মিশ্রিত সমল লৌহপিণ্ড গলাইয়া বিশুদ্ধ লৌহ নিষ্কাশিত করে। আর তুরি বা মাহলি জাতি জঙ্গলের বাঁশ চিরিয়া তাহার দ্বারা নানা প্রকারের ঝুড়ি প্রভৃতি ও মৎস্য ধরিবার যন্ত্র (fishing-baskets) নির্ম্মাণ করে। এইরূপে প্রস্তুত জিনিষ বিক্রয় করিয়া বা বিনিময় (barter) দ্বারা ইহারা খাদ্যাদির সংস্থান করে।

দাসপ্রথা

(৪) চতুর্থতঃ কতকগুলি 'দ্রাবিড়-পূর্ব্ব' আদিম জাতি জীবন-সংগ্রামে স্বীয় উদ্যমে যুঝিতে না পারিয়া, আত্ম-নির্ভরতা ও আত্ম সম্মান হারাইয়াছে; এবং ক্ষেত্র দাস (agrestic serf বা field-labourer) রূপে বা বিবিধ প্রকার উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা-সমস্যা কোনও উপায়ে সমাধান করিতেছে। দক্ষিণ ভারতের **পুলিঁয়া** জাতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

পরিশেষে, এই সম্পর্কে দুইটি প্রয়োজনীয় তথ্য স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, মনে রাখিও যে যদিও এইসব 'দ্রাবিড়-পূর্ব্ব' জাতিগুলিকে মৃগয়াজীবি, কৃষিজীবি, ও অনুন্নত শিল্পজীবি ও শ্রমজীবি বলিয়া মোটামুটি শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, তথাপি প্রকৃতপক্ষে ইহাদের বৃত্তি-বিভাগ (occupational differentiation) তেমন অনমনীয়, কঠোর, বা দৃঢ় নয়; কৃষিজীবি মুণ্ডা, উরাঁও, হো, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতিরাও অবসরমত পশু শিকার করে ও মৎস্য ধরে, ও কোনও কোনও কৃষিজীবি জাতিও অবান্তর (subsidiary) বৃত্তি হিসাবে কোনও প্রকার অমার্জ্জিত হস্তশিল্পের বা শ্রমশিল্পের অনুশীলন করিয়া থাকে। সেইরূপ হস্ত-শিল্পী বা শ্রমশিল্পী কোনও কোনও জাতির ব্যক্তিবিশেষ জমী হাসিল করিবার সুবিধা বা সুযোগ হইলে অবসরমত ভূমি-কর্ষণও করিয়া থাকে। আর তোমরা দেখিয়া থাকিবে যে কলিকাতার রাস্তায় ও নিকট-বর্ত্তী কলকারখানায় এবং আসাম ও দার্জ্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি প্রভৃতির চা বাগানে ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশের অনেক কুলি কাজ করে। ইহারা ক্ষেত্রের কৃষিকার্য্য হইতে অবসর মত ঐ সব অঞ্চলে গিয়া কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিবার প্রচেষ্টায় লাভজনক অবান্তর বৃত্তি (subsidiary occupation) হিসাবে এই সব কার্য্যে সাময়িকভাবে ব্যাপৃত হয়।

আর দ্বিতীয় অবধানযোগ্য তথ্য এই যে, বন্য ফল মূল আহরণ, মৃগয়া, পশুপালন, কৃষিকার্য্য, ও শ্রম-শিল্প প্রভৃতি সভ্যতার ক্রম-বিকাশের ধারাবাহিক অনিবার্য্য স্তর পরম্পরা (inevitable successive

দুধ খাড়িয়া বালকেরা (খাতি) খেলিতেছে

stages) নহে। যদিও সভ্যতার উন্মেষ-যুগে সকল জাতিরই পূর্ব্বজেরা বন্য ফলমূল আহরণ এবং মৃগয়া দ্বারা জীবিকা-অর্জ্জন করিত, তথাপি বৃত্তি হিসাবে পশু-পালন পূর্ব্বে সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না; অনেক জাতিই মৃগয়া বৃত্তি অনুসরণের পরেই কৃষিকার্য্য প্রধান বৃত্তি রূপে অবলম্বন করিয়াছে; কোনও কোনও জাতি মৃগয়া-বৃত্তি ছাড়িয়া হস্তশিল্প বা শ্রমশিল্প অবলম্বন করিয়াছে, পশুপালন বা কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হয় নাই; আর কোনও কোনও জাতি পশুপালনের পরে কৃষিকার্য্য অবলম্বন

করিয়াছে ; এবং কোনও জাতি হয়তো পুরাকালে কৃষিকার্য্য ছাড়িয়া পশুপালনই বৃত্তিরূপে অবলম্বন করিয়াছে। বর্ত্তমানকালে অনেকে কৃষিকার্য্য ছাড়িয়া ব্যবসায়, শ্রমশিল্প ও কলকারখানা প্রভৃতির কার্য্য অবলম্বন করিতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে সভ্যতার ক্রম-বিকাশ হিসাবে পশুপালন, কৃষিকার্য্য, শ্রমশিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতির নির্দ্দিষ্ট চিরস্থির পূর্ব্ব-বর্ত্তিতা ও পরবর্ত্তিতা ছিল না ও নাই। বস্তুতঃ প্রত্যেক জাতির স্ব স্ব নৈসর্গিক অবস্থা (geographical environment), সামাজিক বেষ্টনী (social environment), অপর জাতির ও সংস্কৃতির সহিত সংস্পর্শ (contact with other races and cultures) ও পূর্ব্বপুরুষাগত সংস্কার ও প্রবৃত্তি বা ঝোঁক (hereditary tradition and tendencies) প্রভৃতি নানাবিধ শক্তির সমবায়ের ফল-স্বরূপ তাহাদের স্ব স্ব বৃত্তি-নির্ব্বাচন নিয়মিত হয়।

খেলা-ধূলা ও আমোদ-প্রমোদ

খাড়িয়াদের মধ্যে নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ এবং খেলাধূলা প্রচলিত আছে। যে সকল খেলা-ধূলা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই বেশীর ভাগ খেলিয়া থাকে।

খাড়িয়া যুবক যুবতীদের নৃত্য অত্যন্ত প্রিয়। অবসর সময়ে তাহারা মনের আনন্দে নৃত্য করে। খেলা-ধূলা তাহারা অর্থাৎ তরুণ-তরুণীরা বড় একটা করেনা, নৃত্যই হইতেছে তাহাদের সব চেয়ে প্রিয় জিনিষ।

বয়স্ক ছেলেদের জন্যে ফোদা (Phoda) হকি খেলার মত একটি সুন্দর খেলা। ও একটি ক্রিকেটের অনুরূপ উহারা খেলা খেলে।

তীর ধনুকের খেলা ভেজা (Bheja) বালক-বালিকা ও যুবক সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রিয়। তাহারা প্রায় প্রতিদিন লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করে। লক্ষ্য-ভেদ কালে এক জনের পর আর একজন এইভাবে বেশ একটা শৃঙ্খলার সহিত তীর চালনা শিক্ষা করিয়া থাকে।

এই সব পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে অনেক কিছু খেলার প্রচলন আছে। সে সমুদয় খেলার কথা যদি তোমাদের কাছে বলিতে যাই তাহা হইলে একখানি পুঁথি হইয়া পড়ে।

পার্ব্বত্য অসভ্যজাতিদের প্রায় সকলেই ফুল ভালবাসে। খাড়িয়াদের ফুল-প্রীতি এত বেশী যে তাহা না দেখিলে সুধু বলিয়া বুঝান যাইতে পারে না। তাহাদের ফুলের উপর অনেক সুন্দর সুন্দর গান আছে। আমরা এখানে তাহার কয়েকটি অনুবাদ প্রকাশ করিলাম, উহা হইতেই তোমরা তাহাদের ফুলের প্রতি কত বড় গভীর ভালবাসা তাহা বুঝিতে পারিবে! "জলে শাদা পদ্ম ফুটেছে, কি তার সুন্দর শ্বেত শোভা। বাতাস দোলা দিয়ে মৃণালটিকে ভেঙ্গোনা, ঢেউ তাকে ভেঙ্গে ফেল না।

শাদা সুন্দর এই সব ফুল গুলি দিনের বেলা তারা ফুটে উঠে আর রাত্রির বেলা তারা মলিন হয়ে যায়।"

পুকুরের ধারে বা জলের ধারে লোহিত বর্ণের সুন্দর ফুল ফুটিতে দেখিলে বালক-বালিকাদের অত্যন্ত আনন্দ হয়, তাহারা আনন্দে গাহিয়া উঠে,—

"দেখ দেখ চেয়ে দেখ, নদীর পাড়ে কেমন রক্ত-রাঙা ফুল ফুটেছে। আমি দেখি কেবল চেয়ে চেয়ে দেখি, আর আনন্দে আমার হৃদয় লাফিয়ে উঠে। দেখে দেখে চোখ আর ফিরেনা। যাওত ছোট ভাইটি আমার, কিছু ফুল তুলে নিয়ে এস! আনন্দে যে আমার হৃদয় নেচে উঠেছে, কিছুতেই যে চোখ ফিরাতে পারছিনা। যাওত লক্ষ্মী ভাইটি আমার, অই রক্ত রাঙা ফুলগুলি তুলে নিয়ে এস ত!

গুলাঞ্চি ফুল খাড়িয়া জাতিদের অত্যন্ত প্রিয়। যখন গুলাঞ্চি ফুল বা গুলাইচি ফুল ফোটে তখন তাহারা সেই শাদা ফুলগুলির সৌন্দর্য্যেও যেমন মুগ্ধ হয়, তেমনি তাহারা সেই ফুল গুলি সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে।

ভগ্নী—দেখ দেখ ভাই, পাহাড়ের দিকে চেয়ে দেখ, পাহাড়ের গায়ে শাদা গুলাঞ্চি ফুল ফুটেছে। কি সুন্দর দেখতে আর কি তার মধুর সৌরভ! সৌরভে চারিদিক মধুময় করে তুলেছে।

ভাই। দিদি! তোর ছোট সাজিটা নিয়ে আয়, অই ফুলগুলি তুলে নিয়ে আসি।

ভগ্নী। বারে বা! কি মজাই না হবে, আমরা এই সুন্দর সুগন্ধি ফুলগুলি দিয়ে মালা গাঁথবো!

খাড়িয়া জাতির এমনি ফুলের প্রতি ভালবাসা।

উদ্ভিদ্-পরিচয়
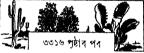
গাছের কথা বলিতে গেলেই তোমরা আম, জাম, কাঁটাল প্রভৃতি ফলের, গোলাপ, জবা, যুঁই, বেল, মল্লিকা প্রভৃতি ফুলের, আর না হয় ধান, যব, ভুট্টা, ছোলা, অরহর, মটর, মুগ প্রভৃতি গাছ যাহারা আমাদিগের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করে তাদের কথাই ভাব। ইহাদের সকলেই ফুল, ফল ও বীজ ধারণ করে এবং ইহাদের সকলেরই দেহ শিকড়, কাণ্ড, ডালপালা, পাতা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিভক্ত। কিন্তু ফুল, ফল ও বীজ হয় না, দেহে শিকড়, কাণ্ড, পাতা প্রভৃতি কিছুই নাই এমন গাছের সন্ধান তোমরা রাখ কি? ছোট, মাঝারি ও বড় গাছপালা তোমরা সর্ব্বদাই চোখে দেখিতেছ কিন্তু চক্ষুর অগোচর কত যে উদ্ভিদ্ আছে তাহা কি তোমরা জান? বোধ হয় জান না। আজ তোমাদিগকে উদ্ভিদ্-জগতের নানা প্রকার উদ্ভিদের সহিত সাধারণ ভাবে পরিচয় করাইয়া দিব।

উদ্ভিদ্ (plants) এবং প্রাণী (animals) উভয়েই জীব পর্য্যায়ভুক্ত (living beings); উভয়েরই প্রাণ বা জীবন আছে। এক দিকে মানুষ, গরু, ভেড়া, অন্য দিকে আম, জাম, কাঁটাল গাছ; ইহাদের মধ্যে কে প্রাণী, কে উদ্ভিদ তাহা তোমাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না কিন্তু এমন গাছ বা প্রাণী আছে যাহাদের মধ্যে কে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা আকৃতিগত পার্থক্য দেখিয়া বলা শক্ত। সুতরাং তোমাদিগকে প্রথমেই জানিতে হইবে উদ্ভিদের লক্ষণ কি কি?—

১। উদ্ভিদের দেহে সাধারণতঃ ক্লোরোফিল নামক সবুজ পদার্থ থাকে। ইহার জন্যই তাহার দেহের, বিশেষতঃ পাতার, বর্ণ সবুজ। এই সবুজ বর্ণের সাহায্যেই সে সূর্য্যকিরণ হইতে শক্তি আহরণ করিয়া সমস্ত জীব-জগতের জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে খাদ্য প্রস্তুত করে।

২। উদ্ভিদের খাদ্য-গ্রহণ প্রণালী, প্রাণীর এ ব্যাপার হইতে পৃথক। উদ্ভিদ্ তাহার শরীরের ত্বক দিয়া দ্রব অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য দেহাভ্যন্তরে গ্রহণ করে। প্রাণী মুখ দিয়া কিংবা অনুরূপ ব্যবস্থায় খাদ্যদ্রব্য শরীরের মধ্যে গ্রহণ করে।

৩। উদ্ভিদ্ প্রায়শঃই অচল, প্রাণী সচল। উদ্ভিদ্-দেহের প্রাণবস্তু একটি করিয়া সেলুলোজ (Cellulose) নামক পদার্থের প্রাচীর (Cell-wall)

দিয়া সুরক্ষিত; প্রাণীর দেহকোষে সেলুলোজ-প্রাচীর থাকে না।

সাধারণ ভাবে উপরোক্ত লক্ষণগুলি হইতেই প্রাণী ও উদ্ভিদ্ পৃথক করা যায়। অবশ্য ইহাদের অল্প বিস্তর ব্যতিক্রম যে হয় না তাহা নহে

সমস্ত উদ্ভিদ্-জগতের গাছপালাকে কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা হয়—

১। **সিজোফাইটা** (Schizophyta):—ইহারা সর্ব্বনিম্নের উদ্ভিদ। নীল-হরিৎ শৈবাল ও ব্যাকটিরিয়া এই ভাগের অন্তর্গত। ব্যাকটিরিয়া চক্ষুর অদৃশ্য এককোষ উদ্ভিদ্। নীল-হরিৎ শৈবালও এককোষ উদ্ভিদ্ কিন্তু অনেকগুলি মিলিয়া সূত্রদেহী (filamentous) হইতে পারে বা দল বাঁধিয়া (in groups) বাস করিতে পারে। ইহারা নিজেদের দেহ ভাগ করিয়া সন্তানোৎপাদন করে।

২। **থ্যালোফাইটা** (Thallophyta):—ইহাদের দেহ শিকড়, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত নহে। ইহারা ফুল ও ফল ধারণ করে না। ইহাদিগকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়:—

(ক) **অ্যাল্জী** (Algae):—ইহাদের দেহ এক কোষ বা বহু কোষ দিয়া তৈয়ারী হইতে পারে। ইহারা দেহে ক্লোরোফিল (chlorophyll) ধারণ করে বলিয়া নিজেদের খাদ্য ইহারা নিজেরাই প্রস্তুত করিতে পারে। পুকুর ঘাটের সবুজ শেওলা এই ভাগের অন্তর্গত।

(খ) **ফান্জাই** (Fungi):—ব্যাঙের-ছাতা, ছিতি, ছাতা এই ভাগের উদ্ভিদ্। ইহাদের দেহে ক্লোরোফিল থাকে না। কাজেই ইহারা হয় পরজীবী (parasite) অর্থাৎ পরের উপর খায়, আর না হয় মৃতজীবী (saprophyte) করে।

(গ) **লাইকেন্** (Lichen) গাছের গায়ে সবুজ-সাদা যে সব গোলাকার দাগের মত দেখা যায় সে ইহারাই; নারিকেল ও সুপারি গাছের উপর খুঁজিলেই ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে।

৩। **ব্রাইওফাইটা** (Bryophyta):—ইহাদের কাহারও কাহারও কাণ্ড ও সবুজ পাতা হয় কিন্তু শিকড় কখনই হয় না। দেহের জটিলতা হিসাবে ইহাদিগকেও দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—

(ক) **হেপাটিসি** (Hepaticae):—ইহাদের দেহে কাণ্ড ও পাতা হয় না, যেমন রিকিয়া, অ্যান্থোসেরস্।

(খ) **মস্** (Musci):—ইহাদের দেহে কাণ্ড ও পাতা থাকে, যেমন মস্।

৪। **টেরিডোফাইটা** (Pteridophyta)—ইহারা অবীজ উদ্ভিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ-শ্রেণীর গাছ। ইহাদের দেহ, কাণ্ড, পাতা, ও শিকড়ে বিভক্ত, যেমন, ফার্ণ, ঢেঁকিশাক, শুশ্নি শাক, সেলজিনেলা, লাইকোপোডিয়ম, ইকুইসিটাম্ প্রভৃতি।

৫। **স্পারমোফাইটা** (Spermophyta) ইহারা বীজ (seeds) ধারণ করে ও ইহাদের বংশধরগণ বীজ হইতে জন্মগ্রহণ করে। ইহাদিগকেও দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়, যথা—

(ক) **জিম্নোস্পারম্** (Gymnosperm) ইহাদের বীজ নগ্ন (naked), অর্থাৎ ইহাদের বীজ ফলের মধ্যে থাকে না। পাইন, ফার, সাইক্যাড্ ও সরল এই ভাগের অন্তর্গত।

৬। **এন্জিওস্পার্ম** (Angiosperm):—ইহাদের বীজ ফলের মধ্যে থাকে (enclosed); ইহাদেরই ফল হয়। ফুল বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি তাহা এই ভাগের গাছেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা আবার দুই প্রকারের, যথা—

(ক) **একবীজপত্রী** (Monocotyledon) অর্থাৎ, যাহাদের বীজে মাত্র একটি বীজপত্র (cotyledon) থাকে, যেমন ধান, যব, গম, তাল, নারিকেল, খেজুর, ঘাস, বাঁশ, ইক্ষু, কলা, রজনীগন্ধা, নলি, পেঁয়াজ, রসুন, প্রভৃতি।

(খ) **দ্বিবীজপত্রী** (Dicotyledon), অর্থাৎ যাহাদের বীজে দুইটী বীজপত্র থাকে, যেমন,

আম, কাঁটাল, লাউ, কুমড়া, শশা, আলু, পটোল, ঝিঙ্গে, গোলাপ, পদ্ম, চাঁপা প্রভৃতি।

এখন আমরা প্রত্যেক ভাগের দুই একটী উদ্ভিদের কথা একটু বিশদভাবে বলিব।

সিজোফাইটা—ব্যাকটিরিয়া ও নীল হরিৎ শৈবাল এই ভাগের অন্তর্গত। ব্যাকটিরিয়ার কথা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। ব্যাকটিরিয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এককোষ (unicellular) উদ্ভিদ। ইহাদের অনেককে আবার অণুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারাও দেখা যায় না। এক মিলিমিটর (১" ইঞ্চি-২৫৪ সেণ্টিমিটর—২৫৪ মিলিমিটর), এর হাজার ভাগের এক ভাগকে বলে মিউক্রণ (μ)। অনেক ব্যাকটিরিয়া ১০μ হইতে ০১μ মিউক্রণ হইতে পারে। ইহাদের দশলক্ষ একত্র করিলে বালির একটা মোটা দানার সমানও হয় না। কলেরা, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগ ইহাদের প্রকোপেই মানব শরীরে প্রকাশ পায়। ইহারা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি নিজেকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া বংশবৃদ্ধি করে। একটী কলেরা

ব্যাকটিরিয়া

ব্যাক্‌টিরিয়া অনুকূল ক্ষেত্রে ১২ ঘণ্টায় ভাগ হইয়া ৭০২৮,০০,০০,০০০টী ব্যাক্‌টিরিয়ায় পরিণত হয়। ইহাদের কয়েক জনের ছবি দেওয়া গেল। তোমরা মনে করিও না ব্যাকটিরিয়া মাত্রেই আমাদের শত্রু, মিত্র ব্যাক্‌টিরিয়াও অনেক

নসটক (Nostoc) নীলহরিৎ (Blue-green) শৈবাল। অনুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে ইহাদের মটর মালার মত দেহ বড় সুন্দর দেখায়। গঁদের মত হড়হড়ে জিনিষের মধ্যে ইহারা বাস
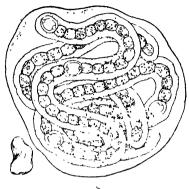
নসটক

করে। ব্যাকটিরিয়ার দেহ যেমন এককোষ দিয়া তৈয়ারী ইহাদের দেহ তেমনি বহুকোষ দিয়া প্রস্তুত। ইহারাও নিজের দেহ ভাগ করিয়া বংশবৃদ্ধি করে। ইহাদিগকে জলে কিংবা স্যাঁৎসেঁতে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

অ্যালজী—দেহের বর্ণবিন্যাস হিসাবে ইহাদিগকে তিন প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়, যথা সবুজ শৈবাল (Green algae), রক্ত শৈবাল (Red algae) এবং পিঙ্গল শৈবাল (Brown algae)। সবুজ শৈবাল মিঠা জলে এবং রক্ত ও পিঙ্গল শৈবাল সাধারণতঃ সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করে। সবুজ শেওলা তোমরা পুকুর ঘাটে, ডোবায়, খালে বিলে প্রচুর দেখিতে পাইবে ইহাদের দেহ এককোষ হইতে বহুকোষ দিয়া তৈয়ারী হইতে পারে। দালানের যে স্থান দিয়া ছাদ হইতে গা বহিয়া জল পড়ে সেইস্থান কয়েকদিন পরেই দেখিতে পাইবে সবুজ হইয়া গিয়াছে। সেই সবুজ পদার্থ খানিকটা তুলিয়া আনিয়া অনুবীক্ষণযন্ত্রের নীচে পরীক্ষা করিলেই দেখিতে পাইবে যে ইহা আর কিছুই

নহে কেবল এককোষী সবুজ শৈবালের সমষ্টি।

ডায়াটম্

ডায়াটম্ (Diatom) বলিয়া আর এক প্রকার পিঙ্গল শৈবাল যেখানে সেখানে জলের মধ্যে দেখা যায়। তাহাদের প্রকারও যত, দেহের গঠন পারিপাট্যও

স্পাইরোগাইরা

তেমনি সুন্দর। বহুকোষী **স্পাইরোগাইরার** (Spirogyra) ছবি দেওয়া গেল। ইহারা সাধারণতঃ বদ্ধ জলের উপর জন্মে। ইহাদের চুলের মত সরু সরু লম্বা দেহ একসঙ্গে বহু থাকে, এবং যেখানে জন্মে, সেখানে জলের উপর সকলে মিলিয়া একটা পুরু আস্তরণ বিস্তার করে।

ফান্‌জাই—ইহাদের দেহে ক্লোরোফিল বা পত্রহরিৎ থাকে না সুতরাং ইহারা নিজেদের খাদ্য নিজে তৈয়ারী করিতে পারে না। কাজেই ইহারা হয় পরের উপর খায়, আর না হয় পচা জিনিষ পত্র খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহারা বড় অত্যাচারী; তরি-তরকারি, ফলমূল, কাঠ, বাঁশ, মাছ, মাংস পচাইয়া ইহারা মানুষের প্রভূত অনিষ্টসাধন করে। ইহারা ১৮৮৫ সালে আয়রল্যাণ্ডে আলুর মড়ক ঘটাইয়া আলর ফসল প্রায় নিঃশেষ করিয়া দিয়াছিল। ইহাদের বীজরেণু (spore) বাতাসে সর্ব্বদাই মিশিয়া আছে। একখানা পাউরুটি ভিজাইয়া ফেলিয়া রাখিও, দেখিবে দুই দিনের মধ্যেই তাহার উপর ছাতা জন্মিয়াছে। ব্যাঙের-ছাতা তো বর্ষাকালে পচা কাঠ, বাঁশ, গোবর প্রভৃতির উপর জন্মিতে তোমরা সর্ব্বদাই দেখিয়া থাক।

ইহাদের কেহ কেহ আবার আমাদের উপকারও করে। **ঈষ্ট** (yeast) না হইলে পাউরুটি ফোলে না, মদও হয় না; কয়েক প্রকার **ব্যাঙের-ছাতা** তরকারি হিসাবে ফরাসী ও চীন দেশে চাষ করা হয়। পনির প্রস্তুত করিতে ইহাদের সাহায্য লইতে হয়।
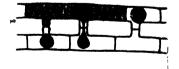
লাইকেন—সবুজ অ্যাল্‌জী ও সাদা ফাংগাস্

এলের স্বপ্ন

এই দুই প্রকার উদ্ভিদের সংমিশ্রণে উৎপন্ন উদ্ভিদ। ইহার দেহের সবুজ-সাদা বর্ণ উক্ত অ্যাল্‌জী ও
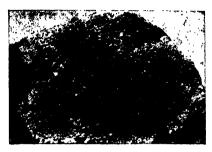
লাইকেন

ফাংগাসের দেহের বর্ণেরই জন্যই। সবুজ অ্যালজী সবুজ বর্ণের সাহায্যে খাবার তৈয়ারি করে, আর সাদা ফাংগাস জল প্রভৃতি সরবরাহ করে।

লাইকেন

এই প্রকার দুইজনে মিলিয়া পরস্পরের সাহায্যে জীবনযাত্রা সম্পাদন করে। এই রকম উদ্ভিদকে **অন্যোন্যনির্ভর** উদ্ভিদ্ বলে।

রিকিয়া

হেপাটিসি—গাছের তলায় ভিজা মাটিতে, না হয় স্যাঁৎসেতে জায়গায় দেখিতে পাইবে। ইহারা দেহের জটিলতা হিসাবে অ্যাল্‌জী ও মসের মাঝামাঝি। বর্ষাকালেই ইহাদিগকে দেখা যায়; এই সময় ইহাদের কেহ কেহ গাছের কাটা কাটা ছালের উপরেও জন্মে। হেপাটিসি ব্রাইওফাই-

ইকুইসিটাম পৃষ্ঠা ৩৩৯৮

টার অন্তর্গত হইলেও ইহাদের অনেকেরই পাতা ও ডাটা থাকে না। ইহাদের ছবি দেখিলেই তোমরা ইহাদিগকে চিনিতে পারিবে।

মস্—ভিজা দেওয়ালের উপর বর্ষার সময় ইহাদিগকে বিস্তৃত সবুজ মখমলের কার্পেটের মত বড় সুন্দর দেখায়। মসের দেহে কাণ্ড ও পাতা থাকে, শিকড় থাকে না মস্ খুব ছোট ছোট গাছ, আর এক সঙ্গে হাজার হাজার জন্মে, হাত দিয়া দেখিও কার্পেটের মতই ইহারা সুখস্পর্শ; বর্ষাকালে ভিজা স্থানেও ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে। শীতকালে মস্ একেবারে শুকাইয়া যায়। বর্ষা শেষ হইবার মুখে ইহাদের মাথা ছাড়িয়া একটি অঙ্গ উপরে

আসে। সেই অঙ্কুরের মাথায় বীজরেণুস্থলী থাকে। বীজরেণু (Spores) দিয়াই ইহারা বংশ রক্ষা ও বিস্তার করে।

মস্

ফার্ণ—অপুষ্পক গাছের মধ্যে ইহারা সকলের উপরের উদ্ভিদ্। ইহাদের দেহে কাণ্ড, পাতা ও শিকড় থাকে। সৌখীন লোকে টবে করিয়া ইহাদিগকে বাগানে কিংবা দালানের অলিন্দে রাখে। ফার্ণের ও ইহার জাত-ভাইদের পাতায় সৌন্দর্য্য বড় বেশী। দার্জ্জিলিং এবং চট্টগ্রাম সিলেটের পার্ব্বত্য অঞ্চলে ইহাদের এক জ্ঞাতি-ভাইকে বৃক্ষরূপে বিরাজ করিতে দেখিবে। বৃক্ষ-ফার্ণকে নারিকেল গাছ বলিয়া ভুল করিও না।

সৌন্দর্য্যে ইহারা পাম গাছকে হার মানাইয়া দেয়। সেই জন্য উৎসবের আসরে পাম ও ফার্ণ গাছকে টবে করিয়া পাশাপাশি সব সময়েই দেখিতে পাইবে।

জিমনোস্পার্মের—অন্তর্গত সাইকাড্, পাইন, অরোকেরিয়া প্রভৃতি গাছের বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের জন্যই বড় বড় বাগানে ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে। পাইন গাছকে আমাদের দেশে সরল, দেওদার প্রভৃতি বলে; ইহাদের জন্মস্থান পাহাড়ের উপর। শিবপুর কোম্পানীর বাগানে

সাইক্যাড্

অনেকগুলি পাইন গাছ আছে। অনেক সময় ইহাদিগকে সাধারণ ভাবে বিলাতি ঝাউও বল

পাইন্

হয়। ইহারা সপুষ্পক উদ্ভিদ্ হইলেও ইহাদে ফুলে পাপড়ি নাই, গন্ধও নাই, তোমরা ইহা

ফার্ণ—পৃষ্ঠা ৩৩৯৮

লাইকোপোডিয়ম্—পৃষ্ঠা ৩৩৯৮

ফুলকে ফুলই বলিবে না। ইহাদেরই একজনের কাছ থেকে আমরা তার্পিন পাই। পাইনের কাঠও খুব মূল্যবান্। দেরাদুনে পাইন গাছ সংরক্ষণ ও উহার উৎকর্ষ সাধনের জন্য সরকারের মস্ত অফিস আছে। এই জন্য সেখানে একটি স্কুলও আছে।

একবীজপত্রী—গাছের মধ্যে লিলি, রজনী-গন্ধা, সর্ব্বজয়া; আর্কিড, দোলনচাপা, তাল, নারিকেল, খেজুর, কলা আনারস, আদা, হলুদ, মান, কচু, ওল, ধান, যব, গম, ভুট্টা, আক, ঘাস, বাঁশের সহিত তোমাদের সকলেরই অল্প বিস্তর পরিচয় আছে। ইহাদের কাহারও ফুলের গন্ধ ও সৌন্দর্য্য অতি মনোরম ও তৃপ্তিদায়ক। উপরের তালিকা হইতে দেখিতে পাইবে, চিনি, গুড়, মিষ্টি ও উপাদেয় পানীয়, বাঁধিবার খড়, বাঁশ, খুঁটি প্রভৃতি একবীজপত্রী গাছ হইতে আমরা পাইয়া থাকি।

বাঁসগাছ

দ্বিবীজপত্রী—আম, জাম, কাঁঠাল, সাল, সেগুন, মেহগিনি, গোলাপ, জবা, বেল, মটর, ছোলা, অড়হর, পাট, শণ, কার্পাস, মূলা, গাজর, রাই, কপি, আলু প্রভৃতি সমস্তই দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ; ইহারা আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য প্রায় সমস্ত জিনিষই সরবরাহ করে। আমাদের পরণের কাপড়, জামা, জীবন-ধারণের আহার্য্য রোগের ঔষধ ও পথ্য বিলাস-ব্যসনের উপকরণ,ঘর-বাড়ী, যান-বাহন প্রভৃতি সকলপ্রকার প্রয়োজনীয় জিনিষের উপাদান সরবরাহ করিয়া থাকে।

সমস্ত গাছই একই ভাবে জীবন-যাপন করে না। জীবন-যাপনের ধারা ও প্রতিবেশ হিসাবে উদ্ভিদ্ নানাপ্রকারের হইতে পারে। তোমরা সবুজ গাছকে সাধারণতঃ স্থানেই জন্মিতে দেখ। ইহাদের শিকড় থাকে মাটির মধ্যে, আর কাণ্ড ডাল-পালা ও সবুজ পাতা থাকে মাটির উপরে, বাতাসের মধ্যে। এই প্রকার গাছ—মাটি হইতে শিকড়ের সাহায্যে দ্রব অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া সবুজ পাতায় আনে। সেইখানে সূর্য্য-কিরণের সাহায্যে খাদ্য প্রস্তত করিয়া নিজের দেহ ধারণ, পোষণ উদ্বৃত্ত খাদ্য ভবিষ্যতের জন্য নিজের দেহের নানাস্থানে সংগ্রহ করিয়া রাখে। ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্য কিছু খাদ্য সময় মত বীজেও সঞ্চয় করে। এইপ্রকার গাছকে **স্থলজ** গাছ বলে। ইহারা নিজেদের খাদ্যের জন্য কাহারও উপর নির্ভর করে না। আম, জাম, কাঁঠাল এই শ্রেণীর গাছ। বড় পানা, ক্ষুদে পানা, পদ্ম, শালুক কচুরী পানা, ঝাঁঝি প্রভৃতি গাছ জলে জন্মে, ইহারা

জল হইতে ইহাদের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে বলিয়া তোমরা দেখিয়াছ। ইহার সোণার বরণ দেহ
এই প্রকার গাছকে **জলজ** উদ্ভিদ্ বলে। স্বর্ণলতাকে হইতেই ইহার নাম হইয়াছে স্বর্ণলতা। অনেক

কচুরাপানা

স্বর্ণলতা

মানুষ আছে যাহারা পরের উপর বসিয়া খায়। ইহারাও সেইপ্রকার। ইহারা মানুষের অপেক্ষা অধম, যে গাছের রস খাইয়া ইহারা জীবনধারণ করে তাহাকে হত্যা না করিয়া ছাড়ে না। ইহাদিগকে **পরজীবী** উদ্ভিদ্ বলে। ইহাদেরই মত, কিন্তু ইহাদের অপেক্ষা একটু ভদ্রপ্রকৃতির পরজীবী গাছ তোমরা শিমুল, আম প্রভৃতি গাছের উপর দেখিতে পাইবে। ইহাদের সবুজ পাতা থাকে। সুতরাং খানিকটা খাদ্য ইহারা নিজেরাই তৈয়ারী করিতে পারে। শুধু জল ও খাদ্যদ্রব্য ইহারা আশ্রয়দাতার দেহ হইতে গ্রহণ করে।

রাস্না বা অর্কিড গাছ তোমরা হয়তো দেখিয়াছ। ইহারা আম গাছের উপর খুব হয়। বড় বড় গাছের উপর ফার্ণ গাছও দেখিতে পাইবে। এই

প্রকার গাছ অন্য গাছের উপর জন্মিতে দেখিলেও কার্য্যতঃ উহারা সেই সমস্ত গাছের উপর বাসাই

আর্কিড

বাঁধে, খাদ্য কিংবা খাদ্যদ্রব্য শোষণ করে না। ইহারা যে যে গাছের উপর বাসা বাঁধে তাহাদের দেহের কাটা কাটা বাকলের মধ্যে শিকড় চালাইয়া দিয়া শরীরকে তাহাদের সহিত শক্ত করিয়া আটকাইয়া রাখে এবং বাতাস হইতে বাতাসের মধ্যে যে ধুলামাটি জমে তাহা হইতে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া নিজের খাবার তৈয়ারী করে। ইহাদের মত গাছকে **পরা-** বলে।

তোমরা জান গাছপালা নিরীহ; তাহাদেরই মানুষ, গোরু, ভেড়া প্রভৃতি খাইয়া থাকে। কিন্তু উদ্ভিদ যে আবার প্রাণী ধরিয়া খায় সে কথা কি তোমরা জান? মানুষের মধ্যে যেমন নিরামিষাশী ও মাংসাশী আছে, উদ্ভিদের মধ্যেও কতকগুলি জাতি আছে যাহারা কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি ধরিয়া খায়। এই কীট-পতঙ্গ ধরিবার জন্য যে কৌশলে তাহারা ফাঁদ পাতিয়া বুদ্ধিশক্তির পরিচয় দেয় তাহা সত্যই অদ্ভুত। বাঙ্গালা দেশেই এই প্রকার দুই তিন রকম গাছ দেখিতে পাইবে। ইহাদিগকে **মাংসাশী** উদ্ভিদ্ বলে। ইহাদের কথা যদি জানিতে চাও ২৭২১ পৃষ্ঠা সপ্তম খণ্ড শিশুভারতী পড়িও। আর এক প্রকার গাছের কথা বলিয়াই উদ্ভিদ্-পরিচয় শেষ করিব, ইহাদিগকে **অন্যোন্যজীবী** উদ্ভিদ্ বলে। মটর, ছোলা, অড়হড়, মুগ, কলাই প্রভৃতি দালের গাছ এই জাতীয় উদ্ভিদ্। ইহাদের কাহারও একটু বড় দেখিয়া গাছের শিকড় টানিয়া উঠাইয়া দেখিও, উহার সারা গায়ে 'আবের' মত বহু গুটী দেখিতে পাইবে। এই গুটিগুলি শিকড়ের

ঝাঁঝি মাংসাশী উদ্ভিদ্)

দেহে একপ্রকার ব্যাক্‌টিরিয়ার বাসা। এই ব্যাক্‌টিরিয়াগুলির একটি বিশেষ ক্ষমতা এই যে, ইহারা বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিতে পারে। নাইট্রোজেন সমন্বিত লবণ গাছের একটি অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য। কিন্তু বাতাসে পাঁচভাগের চারভাগ অংশ মুক্ত নাইট্রোজেন থাকিলেই সবুজ গাছ উহা গ্রহণ করিতে পারে না। তাই জমির উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া গেলে জমিতে নাইট্রেট সার দেওয়া হয়। উপরোক্ত গাছগুলি তাহাদের শিকড়ে ব্যাক্‌টিরিয়া বাসা বাঁধিতে দেয়। এবং উহাদিগকে কার্ব্বোহাইড্রেট খাদ্য সরবরাহ করে। প্রতিদানে ব্যাকটিরিয়া কার্ব্বোহাইড্রেট খাদ্যের সহিত নাইট্রোজেন মিশাইয়া নাইট্রোজেন সমন্বিত খাদ্য প্রস্তুত করিয়া নিজে খায় তাহার ফলে যেমন তাহারা পুষ্ট হয় তেমনি আবার তাহারা উহা বাসায় সঞ্চয় করে এবং দালের গাছকে সরবরাহ করে। তারপর উপরোক্ত দালের গাছ যখন জমির উপর হইতে কাটিয়া লওয়া হয় তখন আবগুলি মাটির ভিতর পচিয়া জমির সারের কাজ করে। আমাদের দেশের চাষীরা জমীতে সার দেয় না, কিন্তু ধান কিংবা পাটের চাষ হইলেই তাহার পর সেই জমিতে দালের চাষ করে, ফলে জমিতে নাইট্রোজেন সার দেওয়ার কাজ হয়। এই রকমে একই জমিতে দালের ও অন্য শস্যের চাষ করাকে শস্যপর্য্যায় বলে। তোমরা জানিয়া রাখ এই আবিষ্কার দুই হাজার বৎসরের ও উপর আমাদের দেশেই সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিল। ইহা গৌরবের কথা নয় কি?

ঈষ্ট পৃষ্ঠা ৩৪০০

মটরশুঁটী জাতীয় গাছের শিকড় শিকড়ের গায়ে 'আব'গুলির মধ্যে নাইট্রোজেন ব্যাক্‌টিরিয়া বাসা বাঁধিয়াছে

ব্যাঙের ছাতা—পৃষ্ঠা ৩৪০০

প্রাচীন ভারতে দেহ চর্য্যা

৩২৬৭ পৃষ্ঠার পর

প্রাচীন ভারতে দেহ-চর্য্যার বিশেষ প্রচলন ছিল। তখনকার-দিনে রাজারা শত্রু জয় করিবার জন্য যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করা ও শারীরিক শক্তি সঞ্চয় করাই একমাত্র উপায় স্থির করিলেন; এবং জনসাধারণকে সংহত রাখিবার তাহাই সুষ্ঠু উপায়রূপে প্রবর্ত্তন করেন।

আত্মরক্ষা ও শত্রু দমন জন্য তখন ব্যবধানের মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধ করিবার একমাত্র অস্ত্র তীর-ধনুক উদ্ভাবিত হইল এবং সঙ্কীর্ণ-যুদ্ধের নিমিত্ত যুগপৎ বাহুযুদ্ধ ও গদাযুদ্ধ করিবার কল্পনা করিল, এবং তাহারই সাধনা করিতে একাগ্রচিত্তে প্রবৃত্ত হইল।

তীর ধনুক গদা ও মল্ল-যুদ্ধের বিবিধরূপ কৌশল অভ্যাসের ফলে, দেহের যে চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় তাহা তখনকার ক্রীড়াকুশলীদের দ্বারা যথেষ্ট প্রমাণিত হইয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে এ বিষয়ের বহু প্রমাণের উল্লেখ আছে। তোমরা ঐ সমুদয় গ্রন্থ হইতে তাহা জানিতে পারিবে।

এখানে সামান্য কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

"এক কুকুর একলব্যকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করায়, একলব্য আপনার অস্ত্রপ্রয়োগের লঘুতার পরীক্ষার্থ তাহার মুখমধ্যে এককালে সাতটি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা কুকুরের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট সাতটী লঘু শর নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং শর নিক্ষেপকারীর শব্দভেদী-শক্তি দর্শনে সকলেই আপনাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বোধে লজ্জিত হইয়া প্রয়োগকর্ত্তার অশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

* * *

দুর্য্যোধন ও ভীম উভয়ে দ্রোণের নিকট গদা, যুদ্ধ অভ্যাস করিয়াছিলেন। অশ্বত্থমা সর্ব্বরহস্যে পারদর্শী হইয়া যুদ্ধবিদ্যায় চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। নকুল ও সহদেব—ইঁহারা অসি-চর্য্যায় কুশলী হইয়াছিলেন। অর্জ্জুনই সমাগত রাজকুমারদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিয়াছিলেন।"

"ভীমসেন, ভগবান বলদেবের নিকট হইতে অসিচর্য্যা, গদাযুদ্ধ ও রথযুদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন।"

—মহাভারত—সভাপর্ব্ব

*

"বৃকোদর যখন গদা ঘূর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন উহা হইতে অগ্নিশিখা ও ধূম নির্গত হইয়াছিল।

ব্যায়ামের প্রথম অভ্যাস

দুর্য্যোধন ও বৃকোদর পরস্পর যুদ্ধ করিবার সময় তাহাদের গদার অভিঘাতে ভয়ঙ্কর শব্দ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়াছিল।"

—মহাভারত, শল্যপর্ব্ব

* * *
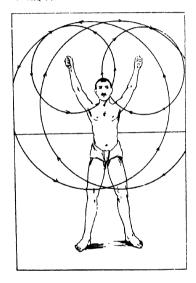
জরাসন্ধ ও ভীমসেন পরস্পর নিগ্রহ ও প্রগ্রহ দ্বারা ভয়ানকরূপ বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলেন।

—মহাভারত, জরাসন্ধবধ পর্ব্ব

*

শম্বর গদা ঘুরাইয়া মহাত্মা প্রদ্যুম্নের প্রতি নির্ঘাতের মত বেগে নিক্ষেপ করিয়া বজ্রের মত এক মহাশব্দ করিয়াছিল। ভগবান্ প্রদ্যুম্নও নিজের গদা দ্বারা সম্মুখে আগত সেই গদাকে চূর্ণ করিয়াছিলেন এবং ক্রোধে শব্দ করিয়া শত্রুর প্রতি গদা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

—শ্রীমদ্ভাগবতম, ১০ম স্ক, ৫৫অ।১৪

* * *

জাম্ববান ও শ্রীকৃষ্ণের মুষ্টির আঘাত সহ দ্বন্দ্বযুদ্ধ, অহর্নিশ, অবিশ্রান্ত অষ্টাবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত হইয়াছিল। পরে জাম্ববান, শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ়মুষ্টি আঘাতে বিশ্লথ অঙ্গবন্ধন, ক্ষীণবল ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

—শ্রীমদ্ভাগবতম, ১০ম স্ক, ৫৬অ ; ২৭।২৮

* * *

এই সকল বর্ণনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, পুরাকালে তীর-ধনুক, লাঠি, গদা, অসি, মল্লযুদ্ধ দ্বারা ব্যায়াম অভ্যাস করিত এবং প্রয়োজন হইলে, ঐ সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগের কৌশল দ্বারা যুদ্ধ করিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে ভীমসেনের সহিত জরাসন্ধের গদা লইয়া যে যুদ্ধ হইয়াছিল, সে গদা কৃষ্ণবর্ণ লৌহনির্ম্মিত ছিল।

তখনকার গদা বা মুগুর অতি গুরুভার এবং ইহার আকারও অনুরূপ বৃহৎকায় ছিল। এইরূপ গদা লইয়াই ব্যায়াম চর্চ্চা করিত।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে মুগুর ও ডন বৈঠক দ্বারা ব্যায়ামের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কতকগুলি কৌশল চিত্রসহ প্রদর্শিত হইল।

ভারতীয় দৈহিক চর্চ্চার বর্ত্তমান রূপ

মুগুর – ১

বর্ত্তমান যুগে মুগুরের নূতনরূপ ব্যায়াম করিবার জন্য বিজ্ঞানসম্মত বহু প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল প্রণালী অনুযায়ী মুগুর লইয়া ব্যায়াম করিলে, পেশীনিচয়ের সুন্দররূপ পুষ্টিসাধন হয়।

পূর্ব্বে গুরুভার মুগুর লইয়া ব্যায়াম করিবার প্রথা প্রচলন ছিল, এবং যে যত-অধিক গুরুভার

মুগুর ব্যবহার করিতে পারিত, সে তদনুরূপ সম্মানের অধিকারী হইতে পারিত।

মুগুর ধরিবার রীতি

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে সে ধারণা পরিত্যক্ত হইয়াছে। লঘুভার মুগুর লইয়া ব্যায়াম করিলে সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুন্দররূপ ক্রিয়ান্বিত হয়। গুরুভার মুগুর ব্যবহার করিলে, দুই চারি বার ঘুরাইয়া বাহুতঃ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়। ইহাতে আভ্যন্তরীণ শরীরযন্ত্রগুলি বিশেষরূপ ক্রিয়ান্বিত হইতে পারে না। অবশ্য, শক্তিমত্তার পরিচয় দিবার জন্য গুরুভার মুগুর লইয়া দুই একবার ঘুরাইয়া, দর্শকবৃন্দকে তাক্ লাগাইতে পারা যায়। ব্যায়ামের জন্য গুরুভার মুগুর সুবিধাজনক নহে। লঘুভার মুগুর একাধিকক্রমে দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া ঘুরাইতে পারা যায়; এবং তাহার জন্য, শরীরের আভ্যন্তরীণ ভাগ বিশেষরূপ ক্রিয়ান্বিত হয়, এবং তাহাই বিশেষ প্রয়োজন। এইজন্য বর্ত্তমান যুগে লঘুভার মুগুরের প্রচলন হইয়াছে।

বর্ত্তমানযুগে, মুগুরের যে প্রকার রূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বালক-বৃদ্ধ, সবল-দুর্ব্বল সকলেরই পক্ষে ঐ প্রকার মুগুর লইয়া ব্যায়াম করা সম্ভব। সবল বলিয়াই যে তাহাকে গুরুভার মুগুর লইয়া ব্যায়াম করিতে হইবে, আধুনিক যুগে এরূপ ধারণার কোন সার্থকতা নাই। সাধারণ সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে এক একটা মুগুরের ওজন দেড় সের হইতে দুই সের পর্য্যন্ত হইলেই যথেষ্ট।

মুগুর লইয়া ব্যায়ামের প্রক্রিয়া

নিম্নবর্ণিত উপায়ে মুগুর লইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করিলে, দেহের গঠন শোভনরূপ পেশীযুক্ত হইবে এবং আশানুরূপ শারীরিক ক্ষমতারও বৃদ্ধি হইবে।

মুগুর লইয়া ব্যায়াম করিবার সময় পদদ্বয় একেবারে জোড় করিয়া না রাখিয়া একটু ফাঁক করিয়া দাঁড়ান ভাল। নতুবা, শরীরের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিতে পারা যায় না।

ব্যায়াম করিবার উদ্দেশ্যে ভূমি হইতে মুগুর তুলিবার সময় হাতের মুঠি নীচের দিকে, অর্থাৎ

প্রথম শিক্ষা

বৃদ্ধাঙ্গুলি নীচের দিক করিয়া মুগুরের ঠিক মুঠির নিকট দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিতে হইবে। ঐ ভাবে

ধরিয়াই বুকের কাছে পর্য্যন্ত উঠাইতে হইবে। তারপর মুগুর সহ হাত সোজা করিয়া লইবে: অর্থাৎ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির দিক উপর করিয়া দিতে হইবে এবং কনুয়ের নিকট হাত সমকোণী হইবে।

মাথার উপর মুগুর করা।

ব্যায়ামের পর বিশ্রাম করিবার জন্য মুগুর তুলিবার বিপরীত পদ্ধতিতে জমিতে নামাইবে।

ব্যায়াম-প্রণালী -১

প্রথমে দুই হাতে মুগুর ধরিয়া হাত সমকোণী করিয়া দাড়াও। তারপর দক্ষিণ হস্ত সম্মুখের বাম স্কন্ধের দিক দিয়া এবং মাথার পিছন দিক দিয়া ঘুরাইয়া পূর্ব্বাবস্থায় ফিরাইয়া আন। এইবার বামহস্ত সম্মুখের দক্ষিণ স্কন্ধের দিকে মাথার পিছন দিক্ দিয়া ঘুরাইয়া পূর্ব্বাবস্থায় লইয়া আইস। এইরূপ পর পর ক্লান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, করিতে থাক।

পিছন দিকে লইয়া যাইবার সময়, হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির দিক্ নীচের দিকে থাকিবে। মুগুর দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিবে।

মন্তব্য—এইরূপ ব্যায়ামে স্কন্ধের, বুকের ও বাহুর পেশী পুষ্ট হয়।

ব্যায়াম-প্রণালী -২

পূর্ব্ববর্ণিত নিয়মানুযায়ী জমি হইতে মুগুর তুলিয়া হস্তদ্বয় সমকোণী কর। এইবার, বাম ও দক্ষিণ হস্ত এর নম্বর চিত্রের মত, পর পর না করিয়া একসঙ্গে ঘুরাইতে থাক। ঘুরাইবার সময় মাথার ঠিক ঠিক পিছনে হাত ও মুগুরের ভঙ্গী ঠিক এইরূপ দেখাতে হইবে।

দুই হস্তে পর পর মুগুর ঘুরান

মন্তব্য—ইহাতে বুকের প্রসার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ব্যায়াম-প্রণালী-৩

দুই নম্বরের চিত্রের মত করিয়াই দুই হস্ত সোজা অবস্থায় নীচের দিকে বিপরীত দিক দিয়া অর্থাৎ দক্ষিণহস্ত বামদিক হইতে এবং বাম হস্ত দক্ষিণ দিক্ হইতে ঘুরাইয়া হস্তদ্বয় সমকোণী কর এবং না থামিয়া পরক্ষণেই মাথার পিছন দিকে আন। এইভাবে, পরিশ্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত করিতে থাক।

মাথাব পিছন দিকে ঘুবাইবাব সময় বাম হস্তেব উপর দক্ষিণ হস্ত এবং নীচেব দিকে নামাইবাব সময় দক্ষিণ হস্তেব উপব বাম হস্ত বহিবে।

মন্তব্য বুকের প্রসার বৃদ্ধি।

ব্যায়াম-প্রণালী -৪

বাম হস্তেব মুগুব বামদিকে জমিব সহিত সমান্তরাল কব, আব ঠিক সেই সময়, দক্ষিণ হস্ত বাম স্কন্ধেব দিকে সম্মুখ হইতে পিছন দিকে মাথা

ব্যায়াম-প্রণালী—৪

ঘুবাইয়া লইয়া আইস। এই সময়, ঘাড বাঁ দিকে ঘুবাইবে। তারপব দক্ষিণ হস্ত মাথা ঘুবাইয়া আনিয়া দক্ষিণ দিকে লইয়া যাও এবং জমিব সহিত সমান্তবাল কব। আর, বাম হস্ত সোজা অবস্থায় বাখিয়া সম্মুখেব নীচেব দিকে এবং দক্ষিণ পার্শ্বের দিকে লইয়া যাও, এই সময় ঘাড দক্ষিণ দিকে ঘুবাইতে হইবে। তাবপব বামহস্ত দক্ষিণ স্কন্ধেব দিকে মাথাব পশ্চাৎ দিব ঘুবাইয়া বাম দিকে লইয়া যাও এবং জমিব সহিত সমান্তবাল কব।

মন্তব্য—এই ব্যায়ামেব দ্বাবা ঘাডেব পেশী পুষ্ট হয়।

ব্যায়াম-প্রণালী—৫

প্রথমে দুইহাত সমকোণী করিয়া দাড়াও। দক্ষিণ হস্ত বাম স্কন্ধেব দিক হইতে পশ্চাৎদিকে
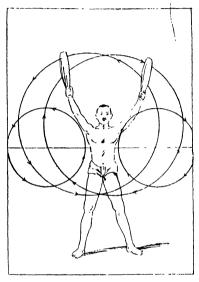
ব্যায়াম-প্রণালী—৫

ঘুরাইয়া মুখেব সম্মুখ দিক্ দিয়া বাম স্কন্ধেব দিকে লইয়া যাও এবং না থামিয়া নীচেব দিকে হাত সোজা করিয়া দক্ষিণ দিকে ঘুরাইয়া পুনরায় পূর্ব্বের মত মাথাব পশ্চাৎ দিকে ঘুবাও। হাত মাথার উপব পর্য্যন্ত সোজা করিয়া উঠাইয়া, তাহার পর কনুই বাঁকাইয়া মাথার পিছন দিকে যথারীতি ঘুবাইতে হইবে। দক্ষিণ হস্ত যে সময় নীচের দিকে ঘুবিবে, বামহস্ত সে সময় দক্ষিণ স্কন্ধেব দিক হইয়া মাথাব পিছন দিকে ঘুরিয়া আসিবে, এবং দক্ষিণ হস্ত যখন মাথার পশ্চাৎ দিকে ঘুরিতে থাকিবে, বামহস্ত সে সময় সোজা অবস্থায় সম্মুখের দক্ষিণ দিক দিয়া নীচের দিকে নামিতে থাকিবে এবং বাম দিকে জমির সহিত সমান্তরাল অবস্থা

হইতে মাথার উপর উঠিতে থাকিবে। হাত একেবারে মাথার উপর উঠিলে মাথার পিছন দিকে দক্ষিণ হইতে বামে ঘুরাইয়া লইয়া আইস। এই-বার একাদিক্রমে এইরূপ দুই হস্ত এক সঙ্গে বার বার করিতে থাক।

মন্তব্য -ইহাতে পৃষ্ঠদেশের পেশী পুষ্ট হয়।

ব্যায়াম-প্রণালী—৬

দুই হাত সমকোণা অর্থাৎ "প্রস্তুত"—অবস্থায় দাঁড়াও। এই চিত্রের মত ব্যায়াম করিবার সময় পদদ্বয় পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিদধিক ফাঁক করিয়া দাঁড়াইতে হয়।

দুই হাত পাশাপাশি রাখিয়া এক সঙ্গে বাম স্কন্ধের দিকে লইয়া যাও; এবং না থামিয়া হাত সোজা করিয়া নীচের দিকে বাম হইতে দক্ষিণে লইয়া যাও। ঐ সঙ্গে দক্ষিণ দিকে শরীর ঘুরাইতে হইবে, আর বামপদ সোজা রাখিয়া দক্ষিণপদ একটু বাঁকাইয়া সম্মুখ দিকে ঝুঁকিতে হইবে। দাঁড়াইবার স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পাইবে না। কোমর হইতে উপর দিক যেন না বাঁকিয়া যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

দুই হাত মাথার উপর পর্য্যন্ত উঠিলে দ্বিতীয় চিত্রের মত কর এবং না থামিয়া হস্তদ্বয় ও মুগুর ঐ দিকে জমির সহিত সমান্তরাল করার পরই, নীচের দিকে নামাইয়া হাত সোজা করিয়া বাম দিকে লইয়া যাও। আর সঙ্গে সঙ্গেই বাম দিকে শরীর ঘুরাও। এই সময়, দক্ষিণপদ সোজা থাকিবে—আর বামপদের হাঁটু একটু বাঁকাইয়া সম্মুখে ঝুঁকিবে। হাত, মাথার উপর উঠিলে পর মুগুর দ্বিতীয় চিত্রের মত ঘুরাইবে। না থামিয়া, এইরূপ দুই দিকে পরিশ্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, ব্যায়াম করিতে থাক।

মন্তব্য—বুকের প্রসার বৃদ্ধি এবং স্কন্ধের বাহুর ও পদদ্বয়ের পেশী পুষ্টতা লাভ করে।

ব্যায়াম-প্রণালী—৭

মুগুর লইয়া "প্রস্তুত"—অবস্থায় (অর্থাৎ, হাত সমকোণী করিয়া) দাঁড়াও। এইবার দুই হাতের মুগুর এক সঙ্গে পিছন দিক্ হইতে সম্মুখদিকে ঘুরাইয়া আন এবং পুনরায় "প্রস্তুত"—অবস্থার মত হও। না থামিয়া, পরিশ্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত

ব্যায়াম প্রণালী ৭

এইরূপ বার বার করিতে থাক। এই ব্যায়াম করিবার সময় হাত বরাবরই "প্রস্তুত" অবস্থায় রহিবে। কেবল মুগুরই ঘুরিতে থাকিবে।

মন্তব্য- বাহু ও হাতের পেশী পুষ্ট হয়।

ব্যায়াম-প্রণালী—৮

মুগুর লইয়া "প্রস্তুত" অবস্থায় দাঁড়াও। বাম হাত সম্মুখ দিকে আগাইয়া জমির সহিত সমান্তরাল কর। কিন্তু, মুগুর "প্রস্তুত"—অবস্থায় ধরিয়া রাখার মত থাকিবে। এইবার দক্ষিণ হস্ত সম্মুখের বাম স্কন্ধের দিক হইতে মাথার পিছন দিকে ঘুরাইয়া সম্মুখ দিকে লইয়া আইস এবং বাম হস্তের মত সম্মুখ দিকে জমির সহিত সমান্তরাল কর। আর সেই সঙ্গে বাম হস্ত সম্মুখের দক্ষিণ স্কন্ধের দিক্ হইতে মাথার পিছন দিকে ঘুরাইয়া সম্মুখ দিকে লইয়া আইস এবং পূর্ব্বের মত জমির সহিত সমান্তরাল কর। এইভাবে, দুই হাতের ব্যায়াম এক সঙ্গে চলিতে থাকিবে।

এইরূপ ব্যায়াম করিবার সময়, শরীর বাঁকাইবে না।

মন্তব্য—বাহু, স্কন্ধ ও বুকের উপরকার পেশী পুষ্ট হয়।

ডন-পরিচয়—২

অতি প্রাচীন যুগ হইতেই ভারতবর্ষে ডন-ব্যায়ামের প্রচলন আছে। ডনের দ্বারা সমস্ত শরীরের সুন্দররূপ ব্যায়াম হয়। এই ব্যায়াম করিতে কোনওরূপ অর্থ ব্যয় হয় না। যে কোন স্থানে নিজের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্যায়াম করা সম্ভব হয়।

নিম্নে কতকগুলি ডনের প্রণালী এবং তাহার ভঙ্গিমার চিত্র দেওয়া হইল।

সাধারণ ডন (ক)—১

হাত ও পা জমিতে রাখিয়া চতুষ্পদ জন্তুর আকার ধারণ কর। হাত ও পা না বাঁকাইয়া এবং স্থানচ্যুত না করিয়া, যতদূর সম্ভব, পিছন দিকে হেলিয়া যাও। অর্থাৎ, হাত হইতে কোমর পর্য্যন্ত ক্রমশঃ উচু এবং কোমর হইতে পায়ের নিম্নাংশ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ নীচু হইয়া থাকিবে। ধরা যাক, এই অবস্থার নাম—**এক**। কনুই বাঁকাইয়া নীচের দিকে জমি স্পর্শ করিবার পূর্ব্ব অবস্থা মত করিয়া সম্মুখ দিকে যতদূর সম্ভব আগাইয়া যাও (হাত ও পা যেন স্থানচ্যুত না হয়) এবং কনুই সোজা কর। ঐ সঙ্গে, সম্মুখ দিকে তাকাও। এই সময় মাথা হইতে পদদ্বয়ের নিম্নাংশ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ঢালু রহিবে।

এই অবস্থার নাম হইল—**দুই**। নিজের ক্ষমতা বুঝিয়া যতক্ষণ সম্ভব, এই ডনের পুনঃপুনঃ "এক" হইতে "দুই" অবস্থায় আসিবার মত প্রক্রিয়া করিতে থাক।

মন্তব্য—এইরূপ ব্যায়াম দ্বারা বুকের প্রসার বৃদ্ধি এবং ঘাড় ও বাহুর পেশী পুষ্ট হয়।

সাধারণ ডন (খ)—২

পায়ের পাঞ্জার উপর বসিয়া, হস্তদ্বয় যতদূর সম্ভব, সম্মুখ দিকে আগাইয়া জমির উপর রাখ। এই অবস্থার নাম হইল—এক।

তারপর পদদ্বয় সোজা করিয়া "সাধারণ ডন (ক)"এর "দুই" অবস্থার মত কর।—দুই।

ইহার কোনও অবস্থায় হস্ত ও পদদ্বয়ের স্থান পরিবর্ত্তন ঘটাইবেনা।

মন্তব্য—বুকের প্রসার বৃদ্ধি এবং বাহু, ঘাড় ও পায়ের পেশী পুষ্ট হয়।

ব্যাঙ-চলা ডন—৩

উবুড় হইয়া লম্বাভাবে শুইবার মত কর। সমস্ত শরীরটা জমির ২।৩ ইঞ্চি উপরে রাখিবে। কেবল হাত ও পা জমিতে ঠেকিয়া রহিবে। ঐ অবস্থায় রহিয়া ও পায়ের সাহায্যে লাফাইয়া লাফাইয়া সম্মুখের দিকে আট বার আগাইয়া চল; আবার পিছন দিকে আট বার পিছাইয়া ফিরিয়া আইস। এই রকম ক্লান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত করিতে থাক।

মন্তব্য—কব্জী ও বাহুর বল বৃদ্ধি।

শরীর বাঁকান ডন—৪

ব্যাঙ্-চলা ডনের মত উবুড় হইয়া শোও। তাহার পর, বাম পদ দক্ষিণ পদের উপর দিকে আনিয়া, পাছা সংলগ্ন করিয়া জমিতে ঠেকাও, এবং বাম হাতে দক্ষিণ পদের অঙ্গুলি স্পর্শ কর। এইরূপ বিপরীত দিকেও কর। ক্লান্ত হইয়া না পড়া পর্য্যন্ত, এই রকম করিতে থাক।

মন্তব্য—মেরুদণ্ড ও বাহুর বলবৃদ্ধি।

বৃত্তাকারে পা-ঘোরান ডন—৫

সাধারণ ডন (খ) এর মত বস। তারপর বাম পদ সম্মুখ দিকে সোজা কর এবং হস্তদ্বয়ের ফাঁক দিয়া (পদদ্বয় ঘুরাইবার সময় হস্তদ্বয় জমি হইতে দরকার মত তুলিবে; সেই অবসরে ঐ ফাঁক দিয়া পদদ্বয় পার করাইয়া লইবে। পদদ্বয় পার হইয়া গেলে, হস্তদ্বয় পুনরায় যথাস্থানে স্থাপন করিয়া ঘুরাইয়া আন এবং একটা ডন্ দিয়া পূর্ব্বের মত বস। ডাইন দিকেও এইরূপ কর।

ক্লান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, একবার ডাইন দিকে আর একবার বামদিকে করিতে থাক।

মন্তব্য—পদদ্বয় ও হস্তদ্বয়ের শক্তি বৃদ্ধি হয়।

তালি ডন—৬

ব্যাঙ-চলা ডনের মত উবুড় হইয়া লম্বাভাবে শুইবার মত কর। কেবল হাত ও পা জমিতে ঠেকিয়া থাকিবে। হাত দিয়া জমিতে ধাক্কা দিয়া শরীরটা উপর দিকে তুলিয়া দাও, আর সেই অবসরে হাত-তালি দাও। হাত-তালি দিয়াই, হাত দিয়া জমিতে পুনরায় ধাক্কা দাও এবং শরীর উপরদিকে উঠিবার সময় হাত-তালি দাও। এইরূপ বার বার করিতে থাক।

মন্তব্য—বাহুদ্বয়ের শক্তি বৃদ্ধি।

একপায়ে ডন—৭

সাধারণ (খ) এর মত। কিন্তু ডন করিবার সময় এক পা সম্ভব মত উপর দিকে তুলিয়া ডন করিতে হইবে। বাঁ পা তুলিয়া যতবার ডন করিবে ডান পা তুলিয়াও ঠিক ততবার ডন করিতে হইবে।

মন্তব্য—বাহুর পেশী ও বুকের প্রসার বৃদ্ধি।

একহাতে ডন—৮

সাধারণ (ক) এর মত। কিন্তু ডন করিবার সময়, এক হাত কোমরের উপর রাখিতে হইবে। ডন করিবার সময় যে-দিকের হাত জমিতে থাকিবে, সেই দিকে শরীরও একটু কাৎভাব হইবে। বাঁ হাত তুলিয়া যতবার ডন করিবে, ডান হাত তুলিয়া ঠিক ততবার ডন করিতে হইবে।

মন্তব্য—ঘাড় ও বাহুর পেশী এবং বুকের প্রসার বৃদ্ধি।

পা পরিবর্ত্তন করিয়া ডন—৯

সাধারণ (খ) এর মত প্রথমে বস। একটু লাফাইয়া বাঁ পা সোজা করিয়া দাও এবং ডান পায়ের হাঁটু বুকের কাছে লইয়া আসিয়া ডন দাও এবং হাত সোজা কর। (কোন সময়েই হাত স্থানচ্যুত হইবে না) এইবার আবার লাফাইয়া পা পরিবর্ত্তন করিয়া লও; অর্থাৎ বা পায়ের হাঁটু বুকের কাছে আসিবে, আর ডান পা সোজা করিয়া ছড়াইয়া দিবে।

এইরূপ ক্লান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, পর পর করিতে থাক।

মন্তব্য—পা, হাতের পেশী ও বুকের প্রসার বৃদ্ধি।

স্থির ডন—১০

হস্তদ্বয় জমিতে রাখিয়া পদদ্বয় পিছন দিকে ছড়াইয়া দাও। মাথা হইতে পদদ্বয়ের নিম্নাংশ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ঢালু হইবে। এইবার কনুই ভাঁজ করিয়া জমির সহিত সমান্তরাল হইয়া যাইবে। (হস্ত ও পদদ্বয় ব্যতীত, শরীরের কোনও জমি স্পর্শ করিবে না) আবার হস্তদ্বয় সোজা কর। কোনও সময়ে, হস্ত ব্যতীত শরীরের কোনও অংশ বাঁকিবে না, সমস্ত শরীর স্থির ভাবে রাখিতে হইবে।

মন্তব্য—বাহুর পিছন দিকের পেশী পুষ্ট হয়।

কসরৎ ডন—১১

স্থির ডন করিবার মত হাত ও পা জমিতে রাখ। তারপর একবার ডন দিয়া হস্তদ্বয়ের মধ্য দিয়া সম্মুখদিকে পদদ্বয় আগাইয়া দাও। আবার, সঙ্গে সঙ্গে পিছনদিকে লইয়া গিয়া প্রথম অবস্থার মত কর। এইরূপ বার বার করিতে থাক।

আগাইবার বা পিছাইবার সময় পদদ্বয় মধ্য-পথে জমি স্পর্শ করিবে না।

মন্তব্য—ক্ষিপ্রকারিতা এবং বাহুদ্বয়ের পেশী বৃদ্ধি।

"রকিং" ডন—১২

প্রথমে সাধারণ ডন (ক) এর "এক" অবস্থার মত হও, কিন্তু হাতের ও পায়ের আঙ্গুলের উপর শরীরের ভর রাখিতে হইবে। ধরা যাক, এই অবস্থার নাম—**এক**।

এইবার কনুই হইতে হাতের তালুর সমস্ত অংশ জমির সহিত স্পর্শ করাও; কিন্তু পা সোজা এবং কোমর উঁচু হইয়াই রহিবে। অবস্থা- **দুই**!

হাতের পূর্ব্বাবস্থা পরিবর্ত্তন কর (অবশ্য নির্দ্দিষ্ট স্থানচ্যুত হইবে না) এবং কনুই বাঁকাইয়া নীচের দিকে জমি স্পর্শ করিবার পূর্ব্ব অবস্থামত কর এবং শরীরের সমস্ত ভার হাতের উপর রাখিয়া সম্মুখ দিকে যতদূর সম্ভব, আগাইয়া যাও এবং

কনুই সোজা কর। এই সঙ্গে আকাশের দিকে মুখ তোল। অবস্থা—**তিন।**

ক্লান্তি না আসা পর্য্যন্ত এইরূপ করিতে থাক।

মন্তব্য—বুকের, হাতের, কাঁধের, পেটের এবং পিঠের পেশী পুষ্ট হয়। যাহাদের কোষ্ঠকাঠিন্য আছে, তাহারা এই ব্যায়ামে উপকার পায়।

বৈঠক—৩

সাধারণতঃ পায়ের ব্যায়াম করিবার জন্যই বৈঠক করা হয়। বৈঠকের কয়েকটি বিভিন্ন প্রণালী লিপিবদ্ধ করা হইল।

সাধারণ বৈঠক (ক) ১

সাধারণভাবে পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াও। হাতের কনুই একটু বাঁকাইয়া পশ্চাৎ দিকে লইয়া যাও। এইবার গোড়ালি তুলিয়া পায়ের অঙ্গুলির উপর বস এবং গোড়ালির উপর পাছা ঠেকাইবা মাত্রই হস্তদ্বয় সম্মুখদিকে তুলিয়া দাঁড়াও। ইহার মধ্যে যেন গতি এবং তালের সমন্বয় থাকে।

ক্লান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত করিতে থাকিবে।

মন্তব্য—পায়ের সকল পেশীই পুষ্ট হয়।

সাধারণ বৈঠক (খ)—২

সাধারণভাবে পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াও, গোড়ালি তুলিয়া বস ; আর সেই সঙ্গে হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কাঁধ স্পর্শ করিবার চেষ্টা কর। বসিবার সময়, সম্ভবমত শরীর খাড়া রাখিবে। গোড়ালিতে পাছা ঠেকিবা মাত্রই উঠিয়া দাঁড়াও। দাঁড়াইবার সময় হাত সহজ অবস্থা করিবে। আর, গোড়ালি জমি স্পর্শ করিবে।

ক্লান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ করিতে থাক।

মন্তব্য—বুকের প্রসার বৃদ্ধি এবং হাত ও পায়ের পেশী পুষ্ট হয়।

লাফান বৈঠক—৩

সাধারণ (ক) এর অনুরূপ। কিন্তু বসিবার সময় সম্মুখদিকে প্রায় এক হাত আন্দাজ লাফাইয়া বস এবং উঠিয়া দাঁড়াইবার সময় পূর্ব্বস্থানে পিছাইয়া আইস।

মন্তব্য—পায়ের সকল পেশীই পুষ্ট হয়।

ফাঁক-পা বৈঠক—৪

যতদূর সম্ভব পা ফাঁক কর। কোমরে হাত দিয়া বা পায়ের উপর বস। শরীর সম্মুখ-দিকে যেন ঝুঁকিয়া না পড়ে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। উঠিয়া দাঁড়াও এবং ডান পায়ের উপর বস। যে পায়ের উপর বসিবে, সেই পায়ের গোড়ালি তোলা থাকিবে এবং অপর পা একেবারে সোজাভাবে ছড়ান থাকিবে। পদদ্বয়ের স্থানচ্যুতি যেন না হয়।

মন্তব্য—পায়ের সকল পেশীই পুষ্ট হয়।

চেয়ার বৈঠক ৫

অঙ্গুলের দিকে অঙ্গুল রাখিয়া হাত সম্মুখের দিকে জমির সহিত সমান্তরাল কর। হাতের তালু বাহিরের দিকে থাকিবে। হাঁটু বাঁকাইয়া শরীরকে ঠিক চেয়ারের মত কর। এইবার ঊর্দ্ধাংশ বামদিকে ঘোর, আবার সম্মুখে আইস। এইবার সোজা হইয়া দাঁড়াও। ঐরূপ ডান দিকে কর।

মন্তব্য—জঙ্ঘার পেশী পুষ্ট হয়।

চতুষ্পদ বৈঠক—৬

দুই হাত, পায়ের নিকট জমিতে রাখ। এই সময় যেন হাঁটু বাঁকিয়া না যায়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই অবস্থায় থাকিয়া একবার বসিতে হইবে, আর একবার ঐ অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে হইবে। বসিবার সময়, গোড়ালি তুলিয়া বসিতে হইবে।

মন্তব্য—জঙ্ঘার পশ্চাৎ দিকের পেশী পুষ্ট হয়।

হাঁটু-ধরা বৈঠক—৭

এই বৈঠক, ঠিক চতুষ্পদ বৈঠকের অনুরূপ। তবে, এই বৈঠক করিবার সময় হস্তদ্বয় হাঁটুর উপর রহিবে। পা কোমরের নিকট শরীর কতকটা সমকোণী হইবে। পদদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান থাকিবে মাত্র দেড়ফুট ১৮" ইঞ্চি। বসিবার সময়, গোড়ালি তুলিয়া গোড়ালির উপর বসিতে হইবে।

মন্তব্য—জঙ্ঘার পেশী বৃদ্ধি হয়।

সেণ্ট সিসিলা

খলিফাদের কথা

মুস্তাইন্ ৮৮২—৮৬৬ খ্রীঃ অঃ

৩২১৬ পৃষ্ঠার পর

মুন্‌তাসীরের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র মুস্তাইন্ খলিফার পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার সময়ে তুর্কীদের নৌ-বহর বিশেষ শক্তিশালী হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে গ্রীকেরা এসিয়ামাইনরের অনেকটা স্থান দখল করে।

মুতাজ্ ৮৬৬—৮৬৯ (খ্রীঃ অঃ)

মুস্তাইন্‌কে (Mustain) হত্যা করিয়া মুতাজ্ খলিফা হইলেন। তিনি খলিফা হইয়াই তুর্কী সৈন্যাধ্যক্ষ ওয়াশিক (Wasiq) এবং বোঘা (Bogha)র ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারা নিহত হইলেন। তখন মুতাজ আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিয়া রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ফল ঘটিল বিপরীত; শীঘ্রই রাজ্যমধ্যে নানা অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজরক্ষীদলের মধ্যে যে সকল পারসিক, আফ্রিকার অধিবাসী এবং তুর্কী ছিল তাহারা সকলে দলবদ্ধ হইয়া খলিফাকে জানাইল যে তাঁহাদের মাহিয়ানা অনেক বাকী পড়িয়াছে সেই সকল পরিশোধ করিতে হইবে। দেখা গেল যে রাজসরকারের নিকট তাহাদের প্রাপ্য প্রায় বিশকোটি দিরাম বাকী পড়িয়াছে। খলিফা কোথা হইতে এত টাকা দিবেন? ইহা যে তাঁহার রাজস্বের প্রায় দ্বিগুণ। খলিফা তাহা দিতে পারিলেন না। কাজেই অশান্তির সৃষ্টি হইল।

এদিকে সিস্তানের শাসনকর্তা ইয়াকুব এবং আহম্মদ তাঁহাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। ইঁহারা তুলুনের পুত্র।

তুলুন বংশ

তুলুন বংশীয়েরা সাতাইশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। কিন্তু ইঁহাদের প্রভাব মিশরে অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল।

মুহ্তাদি ৮৬৯—৮৭০ (খ্রীঃ অঃ)

তুর্কী সৈনিকেরা মুহ্‌তাদিগকে খলিফার পদে বরণ করেন। তিনি তুর্কী নেতাদের প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াও সফল-কাম হইতে পারেন নাই। তিনি মাত্র এক বৎসর কাল রাজত্ব করেন। এক বৎসর রাজত্ব করিবার পরেই তিনি তুর্কীদের হাতে নিহত হইয়াছিলেন।

মুতামিদ্ ৮৭০—৮৯২ (খ্রীঃ অঃ)

৮৭০ খৃষ্টাব্দে মুতামিদ্ খলিফা হইলেন। মুতামিদ দুর্বল প্রকৃতির এবং বিশেষ বিলাসী ছিলেন। আমোদ প্রমোদের মধ্য দিয়াই তাঁহার বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত হইত।

৮৭৩ খৃষ্টাব্দে খোরাশানের ইয়াকুব নিশাপুর অধিকার করেন। তিনিই স্যাফারিদ (Saffarid) বংশের প্রতিষ্ঠাতা। খলিফা ইয়াকুবকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া স্বীকার করিলেন, কিন্তু ইয়াকুব ইহাতে তৃপ্ত হইলেন না। তিনি ইরাক ও খলিফার বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হইল, সেই যুদ্ধে খলিফা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন।

এইভাবে ইয়াকুব নিজ বাহুবলে অসাধারণ শক্তিশালী হইয়াও রাজ্যভার তিনি তাঁহার ভ্রাতা আমিরের হাতে অর্পণ করিলেন। ইহার তিন বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হইল।

স্যাফারিদ বংশের প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য খলিফা স্যামানিদ (Samaned) বংশের সর্দার ইস্মাইলের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। স্যামানিদেরা খলিফা মামুনের সময় হইতে বরাবর ট্র্যানসোক্সিয়ানার (Transoxiana) শাসনকর্তা-রূপে কাজ করিতেছিলেন।

ইস্মাইল কৃতী যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার নিকট স্যাফারিদ-বংশীয়েরা পরাজিত হইলেন। এই-বার স্যামানিদেরা খোরাশানের উপরও প্রভুত্ব লাভ করিলেন। ৮৭৪-৯৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্যামানিদ-বংশীয়েরা ট্র্যানসোক্সিয়ানার উপরে প্রভুত্ব বিস্তার করেন।

মুতামিদের রাজত্বকালে, তুলুনের পুত্র আহম্মদ মিশরে আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন (৮৭৮ খ্রীঃ অঃ)। তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত তুলুন বংশ ৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিল। এবং তাঁহাদের সাম্রাজ্য পূর্ব্বদিকে সিরিয়া এবং মেসোপোটেমিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

খলিফা মুতামিদ্ এক সময়ে মিশরে যাইয়া তুলুন বংশীয়দের রক্ষণাধীনে থাকিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন। কিন্তু মুতামিদের তুর্কী উজীর ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন এবং পরে তুলুন ও আব্বাসবংশীয়দের মিলিত করিতে পারিয়াছিলেন।

মুতাজিদ্ ৮৯২—৯০২ (খ্রীঃ অঃ)

আব্বাসিদ বংশীয়দের মধ্যে মুতাজিদ বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। একদিকে যেমন তিনি দক্ষ শাসনকর্ত্তা ছিলেন অপর দিকে সেনানী ছিলেন রণ-নিপুণ সৈন্যাধ্যক্ষ। তাঁহার রাজত্বকালেই মেসোপোটেমিয়ার খারিজিয়েরা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এ সময়ে আর্মেনিয়ার তুর্কী শাসন-কর্ত্তা ও আজেরবাইজানের (Azerbaijan) শাসন কর্ত্তা সিরিয়া এবং মিশর আক্রমণ করিবার কল্পনা করিতেছিলেন। মুতাজিদ কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতেই ব্যর্থ করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। ঐ সময়ে একদল নিগ্রো ক্রীতদাস বাসরা ও ক্যারমানিয়াতে বিদ্রোহী হইয়া ক্রমশঃ বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ৯০১ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্রোহী দল পরাজিত হয়।

মুক্তাফি ৯০২ - ৯০৭ (খ্রীঃ অঃ)

মুতাজিদের পর তাঁহার পুত্র মুক্তাফি খলিফা হইয়াছিলেন। পিতার ন্যায় ইনিও বিশেষ গুণবান্ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের অনেকটা সময় ক্যারমানিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহেই অতিবাহিত হইয়াছিল। ৯০৬ খৃষ্টাব্দে ক্যার-মানিয়েরা প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রায় ২০,০০০ হাজার নিরীহ হজযাত্রীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। এই নৃশংস হত্যার দরুন সমুদয় ইস্লাম-জগতে ক্যারমানিয়াদের বিরুদ্ধে একটা ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাদের নেতা নিহত হইল। খলিফার উপযুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ মুহম্মদ সিরিয়ায় ক্যারমানিয়-দের পরাজিত করিবার পর মিশরের তুলুন-বংশীয়দিগকে দমন করিবার জন্য অভিযান করিলেন। মুহম্মদের পুত্র ঈশা সেখানকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। (৯০৫ খ্রীঃ অঃ)। এই বৎসরই গ্রীকেরা এলিপো পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন, কিন্তু মুস্লিম নৌবহরের নিকট তাঁহারা পরাজিত হইলেন। মুসলমান-শক্তি আইকোনিয়াম্ (Ico-nium) পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহার পর গ্রীক্

সম্রাট খলিফার নিকট দূত পাঠাইয়া সন্ধি করিলেন। এইভাবে মুক্তাফির রাজত্বকালে আব্বাসীদবংশীয় খলিফাদের প্রভাব আবার দেশে-বিদেশে বিস্তার লাভ করিয়া মুসলিম গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মুক্তাফির রাজত্বকালের শেষ কয়েক বৎসরেই ইসলামের প্রভাব চারিদিকে প্রসার লাভ করে। মুক্তাফির মৃত্যুর পর, তাঁহার বালকপুত্র খলিফা হইলেন।

মুক্তাফির ৯০৭- -৯৩২ (খ্রীঃ অঃ)

মুক্তাফির বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয় পর্যন্ত তাঁহার মাতা, পুত্রের প্রতিভূস্বরূপ রাজ্যশাসন করেন। এ সময় পুনরায় আব্বাসীয়দের ক্ষমতা হ্রাস পাইতে থাকে। ইতিমধ্যে মিশরে ফাতিমিদিয়দের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ইঁহারা প্রায় ৩০০ বৎসরকাল পর্যন্ত বিশেষ প্রভাবের সহিত রাজত্ব করেন। ফাতিমিদ বংশীয়েরা ইদ্রিশ্ এবং আঘলাব বংশীয়দের প্রভাব বিলুপ্ত করেন।

এ সময়ে কারামিয়ানরাও তাঁহাদের নষ্ট প্রভাব পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল।

কাহির ৯৩২- ৯৩৪ (খ্রীঃ অঃ)

মুক্তাফিরের মৃত্যুর পর কাহির সিংহাসনে বসিলেন। তিনি সুরাপায়ী এবং চরিত্রহীন ব্যক্তি ছিলেন। জলের ন্যায় অনাবশ্যকরূপে অর্থের অপব্যয় করিতেন। এইরূপ অত্যাচার ও অবিচারের জন্য তাঁহাকে ৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত হইতে হইল।

রাজি ৯৩৪ ৯৪০ (খ্রীঃ অঃ)

কাহিরের পর রাজি (Razi) ৯৩৪—৯৪০ খ্রীঃ অঃ খলিফা হইলেন। তাঁহার শাসনকালে খোরাশান এবং ট্রান্সোয়ানীয়েরা স্যামানিদের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। কিরমান্ (Kirman) এবং মেদিয়ার লোকেরা এ সময়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এদিকে এ্যাজেরবাইজিন্ (Azerbaijin) এবং আর্মেনিয়া স্যামানীদবংশীয়দের অধিকারে আসিল। মিশর অধিকার করিল ইক্সিদেরা (Ikshid)। আমির-উল-উমারা বা খলিফা এই সময়ে এতদূর হীনবল হইয়াছিলেন যে তিনি মক্কাতে হজ করিতে যাইবার নিমিত্ত ক্যারমানিয়ানদের সহিত সন্ধি করিলেন। আবার অন্যদিকে কনস্তান্তিনোপলের বাইজানটাইন সম্রাটেরা ইস্লামের অধিকৃত অনেক দেশ ধীরে ধীরে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কাজেই খলিফা সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। এ সময়ে আব্বাসীদবংশীয় খলিফাদের রাজ্য সীমা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছিল এবং কেবলমাত্র বোগদাদের নিকটবর্তী স্থান সমূহে প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল।

ব্যাজি ৯৩৪—৯৪০ (খ্রীঃ অঃ)

কাহিরের পর ব্যাজি সাত বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে আব্বাসীদ বংশীয় খলিফাদের প্রভাব বিশেষ ভাবে হ্রাস পাইয়াছিল এবং হ্রাস পাইতে পাইতে শুধু বোগদাদের সীমানার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

মুক্তাফি ৯৪০—৯৪৪ (খ্রীঃ অঃ)

ব্যাজির পরে রাজত্ব করেন। তাঁহার শাসনকালে তুরস্ক সেনাপতি আমির-উল-উমারার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আমির-উল-উমারার মৃত্যুর পরে **ব্যারিদি** (Baridi)নামে বসোরার একজন অধিবাসী বোগদাদ আক্রমণ করেন। খলিফা মুক্তাফি বিপন্ন হইয়া হ্যামাদান (Hamadan) বংশীয় মোশলের রাজা নাশিরুদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করেন। নাশির ব্যারিদিদিকে পরাজিত করিয়া নিজে আমির-উল-উমারার পদ গ্রহণ করেন। এ সময়ে তুরস্কের সেনাপতির প্রভাবে খলিফা মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন এবং তুর্কী সেনাপতি তুলুন **মুস্তাক্ফিকে** খলিফার পদে বরণ করিলেন।

এ সময়ে জিরাক (Zirak) আমির-উল উমারার পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহার অত্যাচারে বোগদাদবাসী বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বিপন্ন বোগদাদবাসী পারস্য নৃপতির সাহায্যপ্রার্থী হইল। পারস্যের রাজা আহমদ বোগদাদ জয় করিলেন। খলিফা পদচ্যুত হইলেন এবং আহমদ নিজে বোগদাদের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। এই ভাবে আব্বাসাদবংশীয় খলিফাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। এ বিষয়ে তোমাদিগকে পরে বলিতেছি। সে ইতিহাস বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

দর্শন

দেকার্তের মতবাদ

নূতন যুগের দার্শনিকদের মধ্যে বেকন প্রথম হলেও আধুনিক দর্শনের সুরু এবং গুরু দেকার্ত।

আগুনের কথা তোমাদের আগেই বলেছি—অমনি আরো হাজারো যোগ রয়েছে প্রকৃতির মধ্যে তাদের খোঁজা,

বেকন বিজ্ঞানের নতুন একটা পথ দেখিয়ে গেলেন, বল্লেন যে কেবলমাত্র বসে বসে গুটী-পোকার মতন পেট থেকে তথ্য বের করলে চলবে না—চোখ মেলে দেখতে হবে, শুনতে হবে, শিখতে হবে। কেবল তাই নয়। অ্যারিষ্টটলের সময় থেকেই তর্কশাস্ত্রদিয়ে মানুষ কেবল প্রমাণই করত, নতুন তথ্য আর আবিষ্কার করত না। মানুষ মরে, রহিম মানুষ, কাজেই রহিম ও মরবে—এই ছিল তর্কশাস্ত্রের পরিধি। বেকন বল্লেন, মানুষ যে মরে সেকথা যদি সত্যিই জানি তবে এ কথাও জানি যে রাম ও মরবে, রহিম ও মরবে—কাজেই এখন আর তর্ক দিয়ে নূতন কিছু শেখা হ'ল কই; তাই তিনি বল্লেন যে তর্কশাস্ত্রের কাজতো তা নয়—যে কথা জানাই আছে তার দ্বিরুক্তি করে বিজ্ঞান ও এগোয় না, দর্শনের ও গৌরব বাড়ে না। অনেক দেখা শোনার ফলে বিজ্ঞান নতুন তথ্য আবিষ্কার করে—সেই আবিষ্কার কেমন করে সম্ভবপর তাই হ'ল দর্শনের বিচারের বিষয়। অক্সিজেন ও

তাদের আবিষ্কার করবার রীতি ঠিক করাই দর্শনের লক্ষ্য।

দেকার্ত ও নিজে বৈজ্ঞানিক ছিলেন—অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর অনেক-অনেক আবিষ্কার আছে। জ্যামিতি তোমরা তো সবাই পড়, কিন্তু তার সঙ্গে পাটীগণিত বা বীজগণিতের যে যোগ আছে, সেকথা কি তোমাদের সহসা মনে হয়? সেই যোগ দেকার্তই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। এবং আজ পর্য্যন্ত গণিতজ্ঞদের মধ্যে তাঁর স্থান খুবই উঁচু।

রাজনীতি নিয়েও দেকার্ত এককালে নাড়াচাড়া করেছিলেন—তোমরা হয়তো ভাবছ দার্শনিক আবার-গণিতজ্ঞ, রাজনীতিবিদ হ'ল কেমন করে? কিন্তু আসলে দেখবে যে যাঁরাই বড় দার্শনিক, তাঁরাই কেবলমাত্র দার্শনিক নন। প্লেটো আদর্শ রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন—সিরাকিউজে গিয়ে সে দেশের রাজাকে শিষ্য করে নতুন নিয়ম নতুন আইন-কানুন বানাতে

চেয়েছিলেন। সক্রেটীশ ছিলেন সাহসী যোদ্ধা, অ্যারিষ্টটলের শিষ্য দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার শাহ। বেকন ছিলেন বিলেতের লর্ড চ্যান্সেলর এবং পরেও দেখবে লাইবনিৎজ, লক্ এরা সবাই নানাদিকে নিজের প্রতিভা প্রকাশ করে গেছেন। কান্টের বিষয় বলা হয় যে ইয়োরোপের সব চেয়ে বড় দার্শনিক না হলে তিনি হতেন ইয়োরোপের সব চেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক—আর তাঁর প্রথম জীবনে, প্রায় ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পদার্থবিদ্ হিসাবেই তাঁর নাম ছিল বেশী।

দেকার্তও ছিলেন নানাদিকে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, কিন্তু তাঁর বিদ্যা তাঁকে তৃপ্ত না করে অতৃপ্তিই বাড়াচ্ছিল। তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে মানুষের জ্ঞান বাড়াবার কোন পরিচয় তো সেখানে নেই—কেবলমাত্র রয়েছে কথার কাটাকাটি। এমন কি গণিতেও পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা কই? আমাদের অভিজ্ঞতার উপরেও নির্ভর করা চলে না, কারণ—প্রায়ই তো আমরা দেখি যে নাক চোখ মুখ আমাদের বারে বারে ঠকায়। জলের খোঁজে মরীচিকা দেখে যখন যাত্রীরা মরুভূমিতে মরে, তখন তো তারা দেখাকে বিশ্বেস করেই মরে। কেবল তাই নয় —যদি চোখ নাক আমাদের না ও ঠকায়, তবু তাদের উপর বিশ্বাস কেমন করে টিকবে? স্বপ্নেও তো আমরা কত কিছুই দেখি, কত দেশে বেড়াতে যাই, কত রকম জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করি—কিন্তু সেগুলি কি সত্যি? অথচ স্বপ্নের মধ্যে কি একবারও তাদের মিথ্যা বলে মনে হয়? স্বপ্নকে আমরা স্বপ্ন বলে জানি না—কেবল জানি যখন স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়—কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় যা দেখছি বা দেখছি বলে ভাবছি তাও যে স্বপ্ন নয়, সে কথা জানব কেমন করে? এমনি বহু আলোচনা বহু তর্কের ফলে দেকার্ত দেখলেন যে সব কিছুরই বিষয় সন্দেহ করা চলে, কিন্তু আমি যে সন্দেহ করছি সে বিষয়ে আর সন্দেহ করা চলে না। তার বিষয়েও যদি সন্দেহ করতে চাই, তবুও আমাকে সন্দেহ তো করতেই হবে? সন্দেহ করাও তো এক রকমের ভাবা—তাই দুনিয়ার সব জিনিষকে উড়িয়ে দিলেও আমি যে ভাবি, সে কথাটিকে আর ওড়ানো চলে না।

কিন্তু এ কথা জানবার সঙ্গে সঙ্গে আমি যে রয়েছি, সে কথাও জানি, কারণ—আমিই যদি না থাকি, তবে ভাববে কে? ফলে দাঁড়ালো এই যে দুনিয়ার সব কিছু সন্দেহ করা চলে, কিন্তু আমি যে রয়েছি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ চলে না।

কাজে কাজেই আমি রয়েছি—এই একটা চরম সত্য পাওয়া গেল। কিন্তু আমি যে রয়েছি—এ কথারই বা মানে কি? কেবল শরীর নিয়ে আমি নই—কারণ হাতপা শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাদ দিলেও আমি আমিই থাকব। কাল যদি

মরুভূমে-মরীচিকা

আমার হাত কাটা যায় বা চোখ নষ্ট হয়—তবে কি আর আমি, আমি থাকব না? সমস্ত শরীরকে বাদ দিয়েও আমি নিজের কথা ভাবতে পারি, কারণ আমি এখন রয়েছি হিমালয়ের মধ্যে লুকোনো বিনসারে, কিন্তু স্বচ্ছন্দে কলকাতায় রয়েছি সে কথা মনে করতে পারি। দেকার্ত তাই বল্লেন যে আমি অর্থ আমার মন—আমার আত্মা।

মন বা আত্মা নিয়েও দেকার্ত অনেক ভেবেছেন। আমি যে ভাবি সে ভাবনার মধ্যে কোন

ফাঁক নেই—আমিই ভাবি, আর কেউ ভাবে না। অথচ যার মধ্যে বস্তু আছে তাকেই ভাগ করা চলে, তাই আত্মাকে ভাগ ও করা চলে না, আত্মার বস্তুও নেই। শরীর কিন্তু বস্তুরই তৈরী—কাজেই আর এক সমস্যা ওঠে যে শরীরের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ কি? আত্মার সঙ্গে বস্তুর কারবার চলে কেমন করে?

এ সমস্যা দেকার্তের সাময়িক প্রায় সমস্ত দার্শনিককেই ভাবিয়ে তুলেছিল। একদিকে তখন নতুন বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সুরু হয়েছে। মধ্যযুগের ইয়োরোপে যে কুসংস্কার ও গোঁড়ামি, আরবদের সংস্পর্শে এসে তা ভাঙতে সুরু করে, সে-কথা তোমরা শুনেছ। স্পেনদেশে আরব রাজ্যে তখন বিজ্ঞানের খুবই চর্চা ছিল—এমনকি নবম শতাব্দীতে কাসিম আব্বাস বলে কর্ডোভার একজন বৈজ্ঞানিক উড়বার একটা যন্ত্রও আবিষ্কার করেছিলেন—তা দিয়ে তিনি খানিকটা উড়ে যেতে পারতেন। ফার্ডিনাণ্ড যখন স্পেন জয় করে আরবরাজ্য ধ্বংস করলেন, তখন স্পেনে ইহুদি এবং মুসলমান যত পণ্ডিত, যত বৈজ্ঞানিক, তারা ইউরোপের নানাদেশে ছড়িয়ে পড়েন।

ইয়োরোপের নানাদেশে তখন আবার নতুন করে বিজ্ঞানের চর্চা সুরু হয়—বিশেষ করে ইটালি এবং হল্যাণ্ডদেশে নানারকম নতুন শিল্প গড়ে উঠে। কলকব্জার ইটালি দেশে বিশেষ উন্নতি হয়েছিল এবং বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারে মানুষের মন বস্তু জগতের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তাই বস্তু জগৎকে নিয়ে পণ্ডিতেরা ভাবতে সুরু করেন—কেউ কেউ চেষ্টা করেন সমস্ত বিশ্ব-সৃষ্টিকে বিজ্ঞান দিয়েই বুঝবেন।

দেকার্ত নিজেও বৈজ্ঞানিক ছিলেন, তাই বিজ্ঞানের এ চেষ্টা তাঁরও মনে জেগেছিল। কিন্তু আগেই তোমাদের বলেছি যে তিনি বিচার করে দেখলেন যে নিশ্চয়তা বিজ্ঞানের মধ্যেও নেই—অথচ কিছু নিশ্চিত না জানলে তাকে জানা বলা চলে কেমন করে? তাই নিশ্চয় কিছু জানবার সন্ধানে তিনি খুঁজে খুঁজে আত্মাকে পেলেন - বল্লেন যে আর যাই সন্দেহ করি না কেন, আত্মা যে রয়েছে সে কথায় সন্দেহ করা যায় না।

বস্তু ও আত্মা নিয়ে এ সমস্ত তর্কবিতর্কের ফলে শেষে দেকার্ত বল্লেন যে সমস্ত বিশ্বসৃষ্টিতে দু'রকমের জিনিষ রয়েছে। এক বস্তু—তা চারদিকে প্রসারিত, তাকে ভাগ করা চলে, তাকে ছোঁওয়া যায়। আর আত্মা—তার কোন প্রসার নেই, তাকে ভাগ করা যায় না, কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে তাকে গ্রহণ করাও চলে না। রং ও স্বাদ, প্রভৃতি গুণকে কিন্তু দেকার্ত বস্তুর নিজস্ব মনে করতে পারেন নি—তাঁর ধারণা যে রং, স্বাদ প্রভৃতি মন বা আত্মারই প্রভাবের ফল।

রং জিনিষটাকে দেকার্ত মানসিক মনে করেছিলেন কেন জান? তোমরা সকলেই মেঘধনু (ইন্দ্রধনু) দেখেছ—দেখেছ যে একটু সরে দাঁড়ালে

বরফের দেশে আগুন পোয়ানো

মেঘধনুর রং গুলোও বদলে যায়। হলদের পাশে কালো আর নীলের পাশে কালোও আলাদা তাই দেকার্ত বল্লেন যে বস্তুর কোনই রং নেই—রং যে দেখে তার চোখে। গরম ঠাণ্ডার বেলায়ও ঠিক একই ব্যাপার। খুব ঠাণ্ডার সময় আগুনের ঠিক উপরেও হাত রাখা যায়, কিন্তু বাঙ্গলাদেশের গরমে যদি তা করতে যাও, তবে কেবল হাত পোড়াই সার হবে।

দেকার্তের মতবাদ

মন এবং বস্তু দুটো জিনিস তো হ'ল, কিন্তু তাদের সম্বন্ধ বোঝা যায় কেমন করে? অথচ সম্বন্ধ যে রয়েছে সে কথা অস্বীকার করবারও উপায় নেই। দেকার্ত তাই বল্লেন যে তাদের যে সম্বন্ধ রয়েছে এ কথা যেমন সত্য, সে সম্বন্ধ যে বোঝা যায় না, তাও ঠিক সমানই সত্য। তাদের সম্বন্ধের দেকার্ত দুটো উদাহরণ দিয়েছিলেন। ইন্দ্রিয় দিয়ে যা গ্রহণ করি, তাকে সংবেদনা বলা হয়। যেমন চোখ দিয়ে দেখি, হাত দিয়ে ছুঁই, কান দিয়ে শুনি সব গুলিই ভিন্ন ভিন্ন রকমের সংবেদনা। সংবেদনায় বস্তু এসে মনের উপর ছাপ ফেলে—কারণ বস্তু না থাকলে তো আর সংবেদনা হোত না। কাজেই সংবেদনায় বস্তুর সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধের একটা দৃষ্টান্ত মেলে।

তাদের সম্বন্ধের অন্য দৃষ্টান্ত মেলে—যখন আমাদের ইচ্ছা মত হাত পা নাড়ি, চলি ফিরি। হাত পা সবই তো বস্তু, তার প্রসার আছে, তাকে দেখা ছোঁওয়া যায়, তাকে ভাগ করা যায়। অথচ ইচ্ছা করলেই আমরা শরীরকে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছে চালাতে পারি। ইচ্ছা হ'ল মনের কাজ— ইচ্ছাকে কেউ কখনো দেখেছো, ছুঁয়েছো? কাজেই মন এখানে শরীরকে চালাচ্ছে, আত্মার সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধ না থাকলে তা সম্ভব হ'ল কেমন করে?

দেকার্ত

বস্তু এবং আত্মা দুইই তাই দেকার্তের মতে আদিম ও অনন্ত, কিন্তু তবু তাদের সম্বন্ধ বোঝাবার জন্য দেকার্তকে বলতে হ'ল যে তারা দুইই ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশ্বরের সৃষ্টি বলেই এই দুই আদিম এবং অনন্ত জিনিষের মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে, তা নইলে দুটো জিনিষ অনন্ত হবে কেমন করে? অনন্ত মানে যে তার কোন সীমা নেই, তার কোন সুরুও নেই, শেষও নেই, কিন্তু যে জিনিষের সীমা নেই, সুরু নেই, শেষ নেই— তা তো কখনো দুটো হতে পারে না। দুটো হওয়া মানেই যে একটা অন্যটার সীমানা বেঁধে দিল, অর্থাৎ কোনটাই অসীম বা অনন্ত রইল না। তাই অসীম বা অনন্ত ভাবতে হ'লে তাকে অদ্বিতীয় ভাবতে হয়—দেকার্ত ও বল্লেন যে ঈশ্বরই সে অর্থে অসীম, অনন্ত ও অদ্বিতীয়, তবে বস্তু এবং আত্মাকেও এক অর্থে অসীম ও অনন্ত বলা চলে।

আত্মাকে অসীম ও অনন্ত বলা হল - কিন্তু সে কার আত্মা? তোমার মন বা আত্মা তো অসীম নয়— এমনকি অসীমের কথাও আমরা ভাবতে পারিনে। অথচ তোমার আমার মন বা আত্মা যদি অনন্ত অসীম না হয়; তবে কার আত্মাকে অনন্ত অসীম বলব?

আর এক মুস্কিল হ'ল এই যে আত্মা আর বস্তুর সম্বন্ধের জন্য তো ঈশ্বর দায়ী, কিন্তু সে কোন্ সম্বন্ধ? প্রত্যেকবার আমি যখন হাত তুলি, তখন কি নতুন করে ঈশ্বর বস্তু এবং আত্মার মধ্যে সম্বন্ধ করে দেন।

শেষ পর্য্যন্ত তো একা ঈশ্বরই রইলেন অসীম, অনন্ত, অদ্বিতীয়। কিন্তু তাঁর কথাই বা আমরা জানব কেমন করে? তার উত্তর দেকার্ত ভারী বাহাদুরীর সাথে দিয়েছেন। তিনি বল্লেন যে আমরা যাই সন্দেহ করি না কেন, নিজের অস্তিত্বকে আর সন্দেহ করতে পারিনে। কাজেই প্রত্যেকে নিজের অস্তিত্বের কথা জানি। সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানি যে আমরা বারে বারে ঠকি— চোখ দিয়ে যা দেখি, তা হয় মরীচিকা, কান দিয়ে যা শুনি, তাও দাঁড়ায় কল্পনা। কাজেই আমাদের জানা পুরোপুরি জানা নয়—তার মধ্যে অনেকখানিই থাকে অজানা। নিজেদের অসম্পূর্ণ বলে জানলাম কি করে? অন্ধের কাছে রঙের কথা বলে কোন লাভ নেই— যে দেখতে পায় সেই রঙের সঙ্গে রঙের তফাৎ বুঝতে পারে। তেমনি পুরোপুরি জানবার কথা যদি আমাদের মনের মধ্যে না থাকত, তবে আমাদের জানা যে অসম্পূর্ণ, সেকথাও জানতাম না। কাজেই পূর্ণতা বা সর্বজ্ঞতার ধারণা আমাদের মনে রয়েছে, এবং সর্বজ্ঞতার কথা ভাবলেই তবে অসীম এবং অনন্ত ভাবতে হয়, অসীম এবং অনন্ত হলেই তা অদ্বিতীয়। —— **এক কথায় সমস্ত জ্ঞানের মূলে ঈশ্বর।**

আফ্রিকা

ম্যাদাগাস্কার ও কয়েকটি দ্বীপের কথা

আফ্রিকা মহাদেশের কাছাকাছি যে দ্বীপটি তাহার নাম ম্যাদাগাস্কার। ম্যাদাগাস্কার একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ। বোর্ণিয়ো এবং নিউগিনির পরেই ম্যাদাগাস্কার আকারে বৃহৎ। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় হাজার মাইল এবং প্রস্থে হইবে প্রায় তিন শত মাইল। ক্ষেত্রফল প্রায় ২ লক্ষ ২৮ হাজার বর্গ মাইল। মোজাম্বিক-চ্যানেল দ্বারা ইহা আফ্রিকা মহাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন।

ম্যাদাগাস্কার দ্বীপের তটভূমি ঘন বনে-জঙ্গলে ঢাকা। আবার কোথাওকোন তরু-গুল্ম-লতা কিছুই নাই। এই বৃহৎ দ্বীপের উত্তর সীমা হইতে দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত একটি পর্ব্বত লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে। সমতলভূমি সাধারণতঃ ৩০০ ফিট হইতে ৫০০০ ফিট উচ্চ। এইরূপ উচ্চ ভূখণ্ড যেখানে, সেখানকার জল বায়ু ও বেশ ভাল। দেশটি সাধারণতঃ অস্বাস্থ্যকর এবং ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব এখানে খুবই বেশী। নিম্নভূমির ম্যালেরিয়ার প্রভাব সময় সময় উচ্চভূমিতেও যাইয়া সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি করে।

ম্যাদাগাস্কারের সাধারণ দৃশ্য আফ্রিকার বিষুব-রেখার অন্তর্ভূত প্রদেশের ন্যায়। বিশেষ করিয়া বনে ও জঙ্গলের দিকে। সেখানে বড় বড় সব গাছের সারি, লতায়-লতায়, শাখায়-শাখায় জড়াজড়ি করিয়া মাথা তুলিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। কেমন করিয়া আলো ও বাতাস পাইবে তাহারই সন্ধানে। বনভূমের নিম্নভাগ—বাঁশবন, মেহগিনি, সেগুন প্রভৃতি মূল্যবান্ তরুশ্রেণীতে সুশোভিত। এই দ্বীপের তরুশ্রেণীর মধ্যে একটি তরুর নাম হইতেছে **"পান্থপাদপ"** (Traveller's Tree)। এই গাছের মত অদ্ভুত গাছ পৃথিবীর আর কোথাও নাই। এই গাছের গোড়ার দিকের গর্ত্তে জল সঞ্চিত থাকে। পাতাগুলি পাখার ন্যায় বড় ও বিস্তৃত।
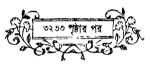
এই দ্বীপের মধ্যে অনেক জলাভূমি রহিয়াছে। সেই সব জলাভূমিতে এমন সব বড় বড় পদ্মফুল ফোটে যে তাহার এক একটি মানুষের চেয়েও উচ্চতায় বড় হয়। এই সব পদ্মফুলের বীজ খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। আম, পেয়ারা, কমলা, ইক্ষু, আদা, আনারস, প্রভৃতি এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ম্যাদাগাস্কার দ্বীপটি বেশ উর্ব্বর,—কিন্তু এত বড় দ্বীপের অনেকটা অংশ এখনও চাষ হয় নাই। দ্বীপের যে দিকের ভূমি উচ্চ সেখানকার জমির উর্ব্বরতার প্রধান কারণ সেখানে জলের

অভাব নাই। প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম উভয় প্রকারের জলই সেখানে প্রচুর পরিমাণে মিলে, এজন্য

বনের দৃশ্য—ম্যাদাগাস্কার

ধানের চাষ, ভুট্টার চাষ খুব বেশী হইয়া থাকে। এ অঞ্চলের বাড়ী ঘরগুলি বেশীর ভাগই ইষ্টক-

ধানের চাষ

নির্ম্মিত। প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখেই ফলের বাগান। গোলআলু প্রভৃতি বিদেশী উদ্ভিদেরও এখন চাষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং বেশ সফলতা লাভ করিয়াছে। কার্পাস, কফি, কোকোয়া, ভেনিলা তামাক ও শণের চাষও বেশ ভাল হয়। ইহা অপেক্ষা অনুর্ব্বর প্রদেশগুলিতে গোরু, ছাগল ও ভেড়ার জন্য গোচারণ-ক্ষেত্র রহিয়াছে। এখানকার লোকেরা পশুপালনের দ্বারা বেশ দু'পয়সা লাভ করিয়া থাকে। রেশমের চাষ ও এদেশের লোকের অর্থাগমের একটি প্রধান উপায়।

জীবজন্তুর দিক দিয়া দেখিতে গেলে মনে হয়, আফ্রিকার সহিত এই দ্বীপের বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়াছে অনেক কাল পূর্ব্বে। কুমীরেরা দলে দলে ম্যাদাগাস্কারের নদীর বুকে বিচরণ করিয়া থাকে। হিপোর ত কথাই নাই। কিন্তু এই দ্বীপে সিংহ, হস্তী, চিতাবাঘ, বড় বানর এবং আফ্রিকা মহাদেশে যেরূপ নানাজাতীয় মৃগ দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে তাহাদিগকে দেখা যায় না। এখানে লেমুরদের (Lemur) সংখ্যা খুবই বেশী।

ম্যাদাগাস্কার দ্বীপে পক্ষী, সরীসৃপ, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে এক প্রকার পক্ষী আছে যাহাদের আকার উট-পক্ষীর (Ostrich) প্রায় দ্বিগুণ হইবে। এই জাতীয় পক্ষী পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না।

ম্যাদাগাস্কারের রাজধানীর নাম আন্টানানারিভো (Antanarivo)। রাজধানী আন্টানানারিভো দেখিতে অতি সুন্দর। সহরের বাড়ীগুলি পোড়া ইটের তৈরী এবং উপরে টালির ছাদ। কোন কোন বাড়ী দ্বিতল ও ত্রিতল আছে। এখানকার অধিবাসীরা বেশ ভদ্র ও অনেকেই শিক্ষিত এবং ধনী। সহরটি দেখিতে ঠিক যেন পাশ্চাত্যদেশের কোন একটি সহর। তেমনি প্রশস্ত রাজপথ, তেমনি পরিচ্ছন্নতা, তেমনি বাড়ী-ঘর। পোষাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়াও এ-দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে অনেকটা পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে। সকলেই ইউরোপীয় পোষাকের পক্ষপাতী। রাজধানী আন্টানানারিভোর জনসংখ্যা ৭০,৮৪৭। ইহা প্রায় ৫০০০ ফিট উচ্চ একটি মালভূমির উপর অধিষ্ঠিত।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা এই দ্বীপ অধিকার

করিয়া তাহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছে। ফরাসীদের অধিকারে আসার পর হইতে এই দ্বীপের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে এই দ্বীপে চলাচলের জন্য পথ-ঘাট ছিল না বলিলেই চলে কিন্তু ফরাসীদের হাতে আসিয়া এই দ্বীপে অনেক সুন্দর সুন্দর রাজপথ প্রস্তুত হইয়াছে, সেই পথ দিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত মোটর গাড়ী চলাচল করিতে পারে।

রাজধানীর পাল্কী-বাহক

এদেশের প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে নানা-জাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে হোবারাই (Hovas) প্রধান। হোবারা বেশ সাদাসিধে ধরণের লোক, তাহারা বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া কোথাও বড় একটা যাইতে চাহে না। দিব্য আরামে শান্তিতে থাকিতে ভালবাসে এক কথায় আরামপ্রিয়। কোনরূপ ঝঞ্ঝাটের মধ্যে তাহারা যাইতে চাহে না। হোবারা খৃষ্টান ধর্ম্ম-যাজকদের প্রভাবে বেশীর ভাগই প্রোটেষ্টাণ্ট-মতাবলম্বী খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। খৃষ্টান হইলেও তাহারা চিরপ্রচলিত প্রাচীন রীতি-নীতি ও সংস্কারের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই।

রাজধানী আন্টানানারিভো ব্যতীত এই দ্বীপের আর একটি প্রসিদ্ধ সহর আছে তাহার নাম হইতেছে—ফিয়ানারান্ট্সোয়া (Fianarantsoa)। সহরে বেট্‌সিলিয়ো (Betsileo) জাতির লোকেরাই অধিক সংখ্যায় বাস করিয়া থাকে।

ম্যাদাগাস্কার দ্বীপের প্রধান বন্দরের নাম—ট্যামাটাভি (Tamatave)। এই বন্দরের অধিবাসিগণের মধ্যে বিদেশী বণিকগণের সংখ্যাই অধিক। এখানে নানা দেশ বিদেশের শ্রমজীবীদের দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ভারতীয়, চীনা, ক্রিয়োলেস্ এবং মরিসিয়াস্ দ্বীপের লোকই বেশী। মোজাম্বিক (Mozambique) চ্যানেলের উপর-মাজুমগা (Majumga) বন্দর। ম্যাদাগাস্কারের প্রায় ৫০০ শত মাইল দীর্ঘ নদীর মুখের উপর এই বন্দরটি অবস্থিত। আর যে দুই একটি বন্দর আছে তাহা তেমন প্রসিদ্ধও নহে।

ম্যাদাগাস্কার হইতে প্রায় ১০০ মাইল উত্তরে কতকগুলি প্রবাল-দ্বীপ রহিয়াছে।

১৫০০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম দিয়াজ (Diaz) নামে একজন পর্ত্তুগীজ অভিযানকারী এ-দ্বীপে পদার্পণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনও ইউরোপীয় এখানে আসেন নাই।

এই পর্ত্তুগীজ ভ্রমণকারী এই দ্বীপে পদার্পণ করিবার পর তিনি দেশে ফিরিয়া যখন উহার কথা প্রচার করিলেন, তখন ইউরোপের সব দেশের লোকেরাই এই নূতন দ্বীপের বিষয় অবগত হইয়া এখানে আসিতে আরম্ভ করিল এবং সকলেই এইখানে আপন আপন প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও লোকজন-সহ এই দ্বীপে আসিতে আরম্ভ করিল, তাহারই ফলে ক্রমশঃ এই দ্বীপে বৃটেন, ফরাসী ও পর্ত্তুগীজ সকলেই আসিয়া অধিকার করিতে লাগিলেন। এই ভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশের অধিবাসিগণ আসিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বারা আপনাদের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

মরিসিয়াস্ দ্বীপ

এই দ্বীপটি ভারত-মহাসাগরে অবস্থিত এবং ম্যাদাগাস্কার দ্বীপ হইতে একশত মাইল পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। মরিসিয়াস্ (Mauritius), রোড্রিগেজ (Rodriguez) এবং রিইউনিয়ান (Reunion) এই তিনটি দ্বীপ সম্মিলিত ভাবে ম্যাসক্যারিন্ দ্বীপপুঞ্জ (Mascarene) নামে পরিচিত। ইহাদের সকলেরই প্রকৃতিগত গঠন প্রায় এক প্রকারের।

এই দ্বীপটি ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইউরোপীয়-দের কাছেও পরিচিত ছিল না।

আগ্নেয়গিরি পরিবেষ্টিত এই দ্বীপটি বহুদিন পর্য্যন্ত জনশূন্য ছিল। দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদ সাধনের পর হইতে এখানে ভারতীয়, চীনা প্রভৃতি নানা দেশের লোকেরা আসিয়া বাস করিতেছে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর, মহামারীর আকারে দেখা দেয় তাহার ফলে

পিটারবোন্ পর্ব্বতচূড়া—মরিসিয়াস্

এই দ্বীপটি একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল।

মরিসিয়াস্ দ্বীপটি প্রাকৃতিক শোভা-সম্পদে পূর্ণ। ম্যাদাগাস্কার দ্বীপের ন্যায় এখানেও নানা বিভিন্ন জাতীয় তরুশ্রেণী জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া রিজিয়া (Victoria regia) ও এখানে জন্মে।

অন্যান্য জীব-জন্তু যেমন ম্যাদাগাস্কারে আছে, এখানেও তেমনি রহিয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই দ্বীপে সাপ নাই বলিলেই চলে। দ্বীপের কাছাকাছি অনেকগুলি ছোট ছোট প্রবাল দ্বীপ রহিয়াছে।

এই দ্বীপের প্রধান সহর হইতেছে,—পোর্ট লুই (Port Louis)। পোর্ট লুই হইতেছে এই দ্বীপের রাজধানী। গ্র্যাণ্ডিপোর্টবা, ম্যাহেলবোর হইতেছে দ্বীপের দক্ষিণ ভাগের একটি বন্দর। পোর্ট লুইয়ের বন্দরের দিক্ দিয়াও বিশেষ প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে। মরিসিয়াস্ হইতে চিনি, সোনামাছ, চামড়া, নারিকেল তেল, মাংগুড় প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে দেশে-বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

১৫০৫ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষ পেড্রো-ম্যাসকারেনাস্ (Pedro muscarenhus) এই দ্বীপটি আবিষ্কার করেন। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা এখানে একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহারা এই দ্বীপকে পছন্দ করিলেন না। ঔপনিবেশিকেরা এস্থান হইতে দেশে চলিয়া গেলেন।

১৭২১ খৃষ্টাব্দে ফরাসীজাতি এখানে স্থায়ীভাবে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপ ব্রিটিশদের অধিকারে আসিয়াছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে মরিসিয়াস্ দ্বীপ চিনির কারবারে জগৎ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

এই দ্বীপের পরিমাণফল ৭২০ বর্গ মাইল। জন সংখ্যা ৪০১,০০০। এখানে হিন্দু শ্রমজীবী ও ব্যবসায়ীদের সংখ্যাও হইবে প্রায় ২৭০,০০০।

রোড্রিগেজ্ দ্বীপটি মরিসিয়াস্ হইতে ৩০০ শত মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। জনসংখ্যা তেমন বেশী নাই বড় জোর চার পাঁচ হাজার।

মোটের উপরে মরিসিয়াস্ দ্বীপের জলবায়ু বেশ ভাল।

ম্যাদাগাস্কার ও মরিসিয়াস দ্বীপ প্রভৃতির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও বিবিধ প্রকার জীবজন্তুর জন্য নানাদেশের পর্য্যটকেরা এই দুইটি স্থানে বেড়াইতে আসেন। বর্ত্তমান সময়ে এই দুই দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম-যাজকগণ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেখানে চিত্র-বিদ্যা, ছুতারের কাজ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আদিম অধিবাসীরা তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে আগ্রহান্বিত। ছেলেমেয়েরাও বেশ চতুরও বুদ্ধিমান। তাহারাও অল্প দিনের মধ্যেই শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতেছে।

মহারাজ পৃথু

এক

বহু কালের পুরাণ কথা। যে সময়ে গ্রাম, নগর প্রভৃতি কিছুই ছিল না, চাষ-আবাদও লোকে জানিত না বলিলেই হয়; এখানে কতকগুলি ওখানে কতকগুলি মানুষ বাস করিত, আর যেমন তেমন করিয়া নিজেদের ক্ষুধা নিবারণ করিত। লোকে ভাল মন্দের বড় একটা বিচার করিতনা; কাহারও একটী ভাল জিনিষ থাকিলে অন্যে সেটির প্রতি লোভ করিত, এবং সুবিধা পাইলেই চুরি করিত। সামান্য কারণে তখনকার লোকে মারামারি খুনোখুনি পর্য্যন্ত করিত। তাহারা ধর্ম্ম-কর্ম্মের ধার ধারিত না, কাজেই পাপ পুণ্যের ভয়ও ছিলনা। দেশে তখন রাজা ছিলেননা, তাই কোনও বিধানের ভয় বা শাসনের ভয় কেহ করিতনা। দেশে ধর্ম্ম নাই, রাজা নাই কাজেই লোকে শান্তিহীন ও বলহীন হইয়া পড়িল।

৩৯৪২ পৃষ্ঠার পর

এই সময়ে সরস্বতী নদীর তীরে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া কয়েক জন ঋষি বাস করিতেছিলেন। সরস্বতী এখন আর নাই—রাজপুতানার মরুভূমির বুকে কোথায় সে লোপ পাইয়াছে। তখন কিন্তু সরস্বতী খুব বড় নদী ছিল, হিমালয় হইতে বাহির হইয়া রাজপুতানার ভিতর দিয়া বহিয়া গিয়া সিন্ধু নদের সহিত মিলিত হইত।

একদিন সকাল বেলায় ঋষিরা দেখিতে পাইলেন—দূরে এমন ধূলা উড়িতে লাগিল যে, আকাশ প্রায় ঢাকা পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে একটা গোলমাল তাহারা শুনিতে পাইলেন—যেন এক সঙ্গে বহু লোক কাতর ভাবে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। ঋষিরা বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, চোরেরা গৃহস্থের দ্রব্যাদি চুরি করিয়া পলাইতেছে, আর গৃহস্থেরা হাহাকার করিতে করিতে তাহাদের পিছনে পিছনে যাইতেছে। দেশের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা মহা চিন্তিত ও বিষণ্ণ হইলেন। এখন তাঁহাদের কি করা উচিত।

ঋষিরা ভাবিলেন,—"ব্রাহ্মণ আমরা, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মলাভের জন্য তপস্যা করা—ইহা আমাদের আদর্শ হইলেও দীন-দুঃখীর প্রতি,

উৎপীড়িতের প্রতি উপেক্ষা দেখান'ত আমাদের উচিত নয়। শাস্ত্রে বলে যে, 'ভাই' জলের কলসী ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন সমস্ত জল আশ্রয় শূন্য হইয়া বাহির হইয়া পড়ে ও নষ্ট হইয়া যায়, তেমনই যে ব্রাহ্মণ দীনের প্রতি উদাসীন—গরীব-দুঃখীর দুঃখ-কষ্ট যে ব্রাহ্মণ দেখিয়াও দেখেননা, তিনি শান্ত ও সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইলেও তাঁহার সকল তপস্যা নিষ্ফল হয়। সুতরাং এখন যাহা করিলে দেশ, সমাজ ও ধর্ম্মের রক্ষা হয়, তাহার জন্য অন্য কেহ চেষ্টা না করুক, আমাদেরই করিতে হইবে।" এইরূপ আলোচনা করিয়া ঋষিরা স্থির করিলেন, সকল অশান্তির মূল কারণ দূর করিতে হইলে প্রথমেই চাই **একজন রাজা**। তাই তাঁহারা রাজার সন্ধানে আশ্রম হইতে বাহির হইলেন।

দুই

ঋষিগণ নানা দিকে নানা স্থানে রাজা হইবার উপযুক্ত লোকের সন্ধান করিতে করিতে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই নদীর মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে যে দেশ, সেই দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে এই দেশে ধ্রুব রাজত্ব করিতেন। সেই ধ্রুব হইতে গণনা করিয়া তাঁহার বংশের নবম পুরুষের নাম ছিল **বেণ**। বেণ ছিলেন একজন দুর্দান্ত রাজা। বেণের মৃত্যুর পর আর কেহ রাজা হন নাই, তাই দেশ অরাজক হইয়াছিল।

বেণের এক পুত্র ছিলেন, তাঁহার নাম **পৃথু**। তাঁহার যেমন চেহারা তেমনই রূপ, আর তেমনই শরীরের বল। আবার তাঁহার অশেষ সদ্গুণ ছিল। তিনি অন্যায়সহী, নিয়মপরায়ণ, সত্যবাদী, বিনয়ী, ব্রাহ্মণ-ভক্ত, গুরুজনের সেবক ও শরণাগত পালক। আর দীন-দুঃখীর প্রতি দয়ায় তাঁহার বিশাল বুক-খানি সদাই ভরিয়া থাকিত। পৃথুর পত্নীর নাম ছিল **অর্চ্চি**। তিনি সকল বিষয়েই স্বামীর মত ছিলেন এবং তাঁহার সদ্ অনুষ্ঠানের সহায় ছিলেন।

ঋষিরা পৃথুকে দেখিয়া এবং তাঁহার নানাবিধ সদ্গুণের কথা শুনিয়া স্থির করিলেন,—হাঁ, ইঁহাকেই রাজা করিতে হইবে, পৃথুই রাজা হইবার উপযুক্ত লোক। ঋষিদের অভিলাষ শুনিয়া সকলেই আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তার-পর পৃথুর অভিষেকের জন্য আয়োজন হইতে লাগিল।

ঋষিদের আজ্ঞায় অভিষেকের জন্য লোকেরা নানা দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিল। তারপর জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ পৃথুকে ভাল কাপড় ও সুন্দর অলঙ্কার পরাইয়া আসনে বসাইলেন এবং যথা-নিয়মে তাঁহার অভিষেক করিলেন। অভিষেক শেষ হইলে ব্রাহ্মণেরা পৃথুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"নিজের সন্তানের ন্যায় প্রজাগণের পালন কর"। আর, প্রজারা যাহার যেটি ভাল জিনিষ ছিল তাহাই রাজাকে উপহার দিল।

তারপর স্তুতি-পাঠকেরা রাজার গুণগান করিতে আরম্ভ করিবা মাত্র পৃথু বিনয়ের সহিত বলিলেন, "তোমরা কি জন্য আমার গুণগান করিতেছ? আমি ত এখনও তোমাদের কাহারও কোন উপকার করিতে পারি নাই। যতদিন না নিজের কর্ম্মের দ্বারা তোমাদের দুঃখ-মোচন ও সুখ বিধান করিতে পারি, ততদিন তোমাদের স্তুতিবাদ শুনিবার আমার অধিকার নাই। আর, অযথা গুণগান শুনিলে অনেক সময় অহঙ্কার বাড়িয়া যায়,—নিজের কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইতে হয়। অতএব তোমরা আর স্তবপাঠ করিওনা।" বিনয়ী রাজার এই কথা শুনিয়া সকল লোকেই "সাধু" "সাধু" বলিতে লাগিল।

তিন

পৃথু রাজা হইয়া বিষম ভাবনায় পড়িলেন। ভাবিলেন "রাজা ত হইলাম, কিন্তু এই বিশৃঙ্খল রাজ্যে কেমন করিয়া আবার শৃঙ্খলা আনিব, সমাজ কেমন করিয়া গঠন করিব, মানুষে মানুষে প্রীতি, ভালবাসা কেমন করিয়া বাড়াইয়া তুলিব, কি হইলে আমার প্রজারা শান্তিতে বাস করিবে, দেশের ধন কি করিয়া বৃদ্ধি করিব, কি করিলে প্রজাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আড়াআড়ি কমিয়া গিয়া তাহাদের মনে মেলামেশার ভাব, সহযোগিতা একসঙ্গে কাজ করিবার প্রবৃত্তি বাড়িবে?" ইত্যাদি মহা ভাবনায় পৃথু বিব্রত।

এমন সময়ে কতকগুলি প্রজা আসিয়া পৃথুর সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাদের দেহ শীর্ণ,

চক্ষু কোটরগত, শরীর বলহীন, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ—তাহারা অন্নাভাবে মরিতেছে—দুর্ভিক্ষ-পীড়িত। পৃথু রাজা হইয়াছেন শুনিয়া এই মরণমুখী প্রজারা তাঁহার কাছে আসিয়া বলিতে লাগিল,—"আমরা পেটের জ্বালায় অস্থির; দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন আমাদের জুটেনা। আপনি আমাদের রাজা, পিতা বৃত্তিদাতা; আমরা আপনার সন্তান। যাহাতে আমরা একেবারে লোপ না হই, দয়া করিয়া তাহার ব্যবস্থা করুন। আমরা মরিতে বসিয়াছি, এখনও আমাদিগকে বাঁচাইতে পারেন; দয়া করুন, বাঁচান, দোহাই আপনার।

দয়া করুন—বাঁচান, দোহাই আপনার

প্রজাদের করুণ-কাহিনী শুনিয়া রাজার প্রাণ গলিয়া গেল; তিনি তাহাদের দুঃখ অন্তরে-অন্তরে অনুভব করিলেন। পরে তাহাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া রাজা তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পৃথু ভাবিলেন,—"দু'চা'র জন প্রজা আসিল, বলিল, 'খাইতে পাইনা', আমিও যেন তাহাদের খাবার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম; কিন্তু ইহাতে সকল প্রজার কোন স্থায়ী উপকারত হইলনা। দেখা যাক্, প্রজার অন্নকষ্ট ও অর্থকষ্ট দূর করিতে হইলে কি কি চাই? তিনটি জিনিষ আবশ্যক, (১) **যথেষ্ট পরিমাণে শস্যের উৎপাদন,** (২) **যথেষ্ট ধনাগম,** (৩) **পরস্পর সহযোগিতা**—মিলিয়া মিশিয়া এক সঙ্গে কাজ করা ও সাহায্য করা—কিন্তু এই তিনটি কাজইত প্রজারা করিতে পারে। তবে তাহারা নিজেরাই এইগুলির ব্যবস্থা করুক—এই ভাবিয়াই কি আমি নিশ্চিন্ত থাকিব? না তাহা হইবে না—এই তিনটি বিষয়ের ব্যবস্থার ভার লইয়া আমি নিজেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিব।

চার

পৃথু প্রথমে শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থায় হাত দিলেন। তিনি দেখিলেন জমি বা মাটি শস্য উৎপাদনের প্রথম ও প্রধান ক্ষেত্র। তিনি জমিকে শুধু মাটি দেখিলেন না, দেখিলেন, **মাটি** এ আমাদের **মা**। মা-টি তাহার অনন্ত বক্ষের উপরে অসংখ্য সন্তানকে ধরিয়া আছেন, বুকের মাঝে সন্তানদের উপযোগী তাহাদের সমস্ত খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন,—কেবল চেষ্টা করিয়া মাটির কাছে চাহিয়া সেই খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। আর, এই চেষ্টা কি করিয়া করিতে হয়, তাহা আমাদের ঋষিরাই শাস্ত্রে দেখাইয়া দিয়াছেন। যাহাতে সকল জীবের মঙ্গল হয়, জগতে সুখও সমৃদ্ধি বাড়ে এবং পরলোকে কল্যাণ হয়, তাহার উপায়ও ঋষিরাই নির্দেশ করিয়াছেন। তবে আর চিন্তা কি? এই ভাবিয়া রাজা পৃথু, ঋষি-প্রদর্শিত পথে কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি দেখিলেন যে, চাষের জমি বড় উচু-নীচু সমতল নহে, আর মাঝে মাঝে পাহাড়, মালভূমি, বন-জঙ্গলও আছে। কাজেই এইরূপ জমি চাষের উপযুক্ত নহে। তাই পৃথু জমিকে সমতল করিতে লাগিয়া গেলেন। পৃথুর প্রজারা জানিতনা কি করিলে জমি ঠিকমত তৈয়ার হয়, আর তাহারা কাজ না করিয়া ক্রমেই অলস হইয়া পড়িয়াছিল। এখন তাহারা দেখিল, তাহাদের রাজা স্বয়ং যন্ত্রাদি লইয়া পাহাড় কাটিতেছেন, বন কাটিতেছেন, জঙ্গল পরিষ্কার করিতেছেন, খানা—ডোবা ভরাট করিতেছেন। তাহারাও সকলে মহা উৎসাহে তাঁহার সহিত কাজে লাগিয়া গেল; দেখিতে দেখিতে অল্প দিনের মধ্যেই জমি প্রায়—সমতল হইয়া আসিল। তারপর পৃথু ভাল রকম চাষ-আবাদ করিবার ব্যবস্থা বলিয়া দিলেন,—প্রচুর শস্য জন্মাইল প্রজারা পেট

ভরিয়া খাইতে পাইয়া রাজার জয় গান করিতে লাগিল।

এইবার ধনাগমের ব্যবস্থা। দেশে শুধু ভাল করিয়া চাষ চালালেই দেশে টাকা আসিবেনা, চাষের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় এবং বাণিজ্যও চালাইতে হইবে। পৃথু আবার আমাদের মা'টির দিকে চাহিয়া দেখিলেন; **মা'টি আমাদের কামধেনু** —যাহা চাওয়া যায়, তাহাই দিয়া থাকেন; তবে বুদ্ধি খাটাইয়া, হিসাব করিয়া, কৌশল করিয়া চাহিয়া লইতে হয়। কোন্ পাহাড়-পর্ব্বতে কোন্ ধাতু পাওয়া যায়, কোন্ স্থানের মাটির নীচে কোন্

রাজা নিজে পাহাড় কাটিতে লাগিলেন

জিনিষের খনি আছে, কোন্ জঙ্গলে কোন্ কোন্ ভাল ভাল দামী কাঠের গাছ আছে, পৃথু এই সকল তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন এবং এই সব সংগ্রহ করিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। প্রজাদের সুখের ও সমৃদ্ধির মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল দেখিয়া তাহারা 'ধন্য পৃথু' 'ধন্য পৃথু' রাজার গুণগান করিতে লাগিল।

দেশের সকল বিষয়েই বিশৃঙ্খল ছিল। চাষ আবাদ ও ব্যবসায় বাণিজ্যের ব্যবস্থা করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই পৃথু দেশে শৃঙ্খলা আনিবার উপায় করিলেন। শৃঙ্খলা ও শান্তি আনিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি বা জীবিকার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। সকলেইত কোদাল পাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞান বা দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চা পর্য্যন্ত সকল কাজ করিতে পারে না। এই সকল কথা আলোচনা করিয়া পৃথু লোকের শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিলেন:—কাহারা রাজধানীতে থাকিবে, কাহারা নগরের বাহিরে বাস করিবে ইত্যাদি সকল ব্যবস্থাও পৃথু করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামও নগর গড়িয়া উঠিল। এই ভাবে প্রজাদের বসবাসের, চাষ-আবাদের, ব্যবসায়-বাণিজ্যের সকল ব্যবস্থাই পৃথু করিয়া দিলেন। দেশের চারিদিকে শৃঙ্খলা ও শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

পাঁচ

এখন পৃথুর আর এক ভাবনা হইল।—যদি বাহিরের শত্রু আসিয়া উৎপাত করে, তবেত প্রজাদের সকল সুখ শান্তি নষ্ট হইবে। তাই বাহিরের শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ ও প্রজাদের রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে পৃথু দুর্গ ও কেল্লা নির্ম্মাণ করাইলেন। কত রকমের কেল্লা, কত প্রকারের দুর্গ—কোনটী জলের মধ্যে, কোনটী জলের ধারে, কোনটী পর্ব্বতের উপর, কোনটী বা বৃক্ষ দিয়া ঘেরা, কোনটীবা খোলা মাঠের মধ্যে তৈয়ার হইল। এই সকল দুর্গে সেনা ও যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র রাখা হইল। আর যেখানে-যেখানে বহুমূল্য রত্নাদির খনি ছিল, সেই সব স্থানের নিকটেই সেনানিবাস হইল।

পৃথু দেখিলেন,—সাধারণ মানুষের খাইবার পরিবার ও সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিবার সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছে। এখন নিজের শক্তি বৃদ্ধির দিকে মন দেওয়া দরকার। রাজার ক্ষমতা-বৃদ্ধি প্রজাদেরই মঙ্গলের জন্য। পৃথু ভাবিলেন,—"অন্যান্য ছোটখাট রাজারা যাঁহারা যেখানে আছেন' তাঁহাদের সকলকে যদি নিজের অধীন করিতে পারি, তবে তাঁহাদের দ্বারা আমার প্রজাদের মঙ্গল সাধন করাইতে পারিব এবং তাঁহারাও আমার রাজ্যে প্রচলিত আইন-কানুন, বিধি-ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া নিজেদের প্রজারাও সুখ বিধান করিতে পারিবেন।" এই ভাবিয়া পৃথু অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ধীরে ধীরে পৃথুর প্রভাব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, সকলেই তাঁহাকে **সার্ব্বভৌম** সম্রাট বলিয়া স্বীকার

করিলেন। একটি একটি করিয়া নিরানব্বইটি যজ্ঞ শেষ হইলে তিনি শততম অশ্বমেধ আরম্ভ করিলেন। এই যজ্ঞ-সম্পন্ন হইলেই তিনি স্বর্গেরও অধিকার লাভ করিতে পারেন—ইন্দ্র হইতে পারেন।

ছয়

ব্রহ্মাবর্ত্তে নিরানব্বইটি যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল, সেইস্থানেই শততম যজ্ঞ আরম্ভ হইল। এই যজ্ঞে বিষ্ণু স্বয়ং যজ্ঞপতি হইলেন, আর তাঁহার সঙ্গে আসিলেন ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি দেবতাগণ, কপিল, নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ, সুনন্দ, নন্দ প্রভৃতি ভগবানের সহচরগণ, সিদ্ধগণ বিদ্যাধরগণ, দৈত্যদানবগণ,—কেহই বাকি থাকিলেন না। যজ্ঞ চলিতে লাগিল, হঠাৎ ইন্দ্র যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করিয়া পলাইলেন। পৃথুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজিতাশ্ব যুদ্ধে ইন্দ্রকে হারাইয়া দিয়া অশ্ব ফিরাইয়া আনিলেন। আবার যজ্ঞ চলিতে লাগিল। কিন্তু আবার ইন্দ্র অশ্ব লইয়া পলায়ন করিলেন। পৃথু ক্রুদ্ধ লইয়া ইন্দ্রকে বধ করিবার জন্য ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিলেন। তখন ঋত্বিকগণ পৃথুকে বলিলেন, "মহারাজ আপনি যজ্ঞে দীক্ষিত, এ সময়ে যজ্ঞের বলি ভিন্ন ভিন্ন অন্য কোন জীবকে আপনি বধ করিতে পারেন না। আপনি নিরস্ত হোন্ আমরা ইন্দ্রের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিতেছি"। এই বলিয়া ঋত্বিকগণ ইন্দ্রের অকল্যাণ কামনায় আহুতি দিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

রক্ষা কর। রক্ষা কর! ইন্দ্রকে বধ করিও না।

ব্রহ্মাদি দেবগণ দেখিলেন, সর্ব্বনাশ। পৃথুত ইন্দ্রেরই সমান। ইন্দ্রকে বধ করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিলে তাহার আর অধিক লাভ কি হইবে? পৃথু স্বর্গে রাজত্ব করিতে গেলে বরং পৃথিবীরই ক্ষতি হইবে—এমন একজন ভাল রাজা পৃথিবী হারাইবে। তাই ব্রহ্মা বলিয়া উঠিলেন,—"রক্ষা কর, রক্ষা কর, ইন্দ্রকে বধ করিওনা। তুমি পৃথিবীর রাজা, ইন্দ্র স্বর্গের রাজা; তোমাদের কি বিরোধ করা ভাল? নিরস্ত হও। তুমি নিরানব্বইটি যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট; একশত পূরা করিয়া তোমার এমন কি বেশী লাভ হইবে? সর্ব্বজীবের কল্যাণ তোমার অভিপ্রেত, সেই কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিলেই তুমি ভগবানের পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইবে। শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে স্বর্গলাভ হয়, সেই স্বর্গ লইয়াই

তুমি কি করিবে? অতএব যজ্ঞ বন্ধ কর।" ব্রহ্মা এইরূপ আদেশ করিলে পৃথু যজ্ঞ বন্ধ করিয়া দিলেন এবং যজ্ঞের ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণাদি দিয়া তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন।

ভগবান বিষ্ণু এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া সকল ব্যাপার দেখিতেছিলেন। এইবার তিনি ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া পৃথুর নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি ইন্দ্রকে ক্ষমা কর। মনে আর ক্রোধ না রাখিয়া অন্তরের সহিত ইন্দ্রকে ক্ষমা কর। তুমি রাজা, সকল লোকের পালক, অনুরাগ বা দ্বেষবুদ্ধি তোমাতে থাকা উচিত নহে। যে নিজের কর্ত্তব্য পালন করে, সে ব্রাহ্মণ হোক বা চণ্ডাল হোক ধনী হোক বা নির্ধন হোক, গৃহস্থ হোক বা সন্ন্যাসী হোক —আমি তাহারই উপর প্রীত হইয়া থাকি। আমাকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে রাগ-দ্বেষ শূন্য হইয়া নিজের কর্ত্তব্য করিতে হয়। তোমার কার্য্যে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর।"

বর প্রদান করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন এবং দেবতা, ঋষি, মুনি সকলে স্ব স্ব স্থানে গেলেন। তখন পৃথু আপনার রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। ধীরে ধীরে, নম্রভাবে, শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে করিতে করযোড়ে উদ্দেশে ভগবান্‌কে প্রণাম করিতে করিতে রাজা প্রধান ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নহবৎ বাজিয়া উঠিল, ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, চারিদিকে শঙ্খ ও দুন্দুভি বাজিতে লাগিল, কুমারীগণ রাজার মাথার উপর ফুল ও খৈ বর্ষণ করিল। পুরবাসিগণ ও জনপদ-বাসিগণ রাজাকে বিবিধ উপহার প্রদান করিল। রাজা বলিলেন,--"স্বস্তি," সকলের মঙ্গল হোক। প্রজাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরিচয়ে ভগবানেরই কৃপার নিদর্শন দেখিয়া রাজার নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। সকল প্রজাই রাজার মুখের বাণী শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে দিন তিনি এতই অভিভূত যে, তাহাদিগকে কিছুই বলিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

সাত

অন্য একদিন বিরাট এক **সমাজ** (সভা) বসিল। এই সমাজে বা সভায় ব্রহ্মর্ষি, দেবতা, ব্রাহ্মণ-সজ্জন, অমাত্য, প্রধান প্রধান প্রজা সকলেই উপস্থিত থাকিল। সকলে উপস্থিত হইলে পৃথু সভার মধ্যে দাঁড়াইয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"আপনারা আমাকে রাজা করিয়াছেন, আমিও আপনাদের রক্ষার ভার বৃত্তি বিধানের ভার ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছি। এখন আমার প্রধান কাজ আপনাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এই শিক্ষার মধ্যে প্রধান শিক্ষা হইবে **ধর্ম্মশিক্ষা।** যে রাজা প্রজাদিগের ধর্ম্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন, সে রাজার ধর্ম্মহীন প্রজারা যে সকল পাপ কাজ করে সে সকল পাপই রাজা নিজে ভোগ করেন, আর তাঁহার নিজের পুণ্যও নষ্ট হইয়া যায়। অনেকে ধর্ম্মের প্রয়োজন স্বীকার করেননা; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে হইলে **ধর্ম্ম ভিন্ন** অন্য কোনও **উপায় নাই।** অন্য কোন কিছু অবলম্বন করিয়া ঐক্য স্থাপন করিলে সে ঐক্য চিরস্থায়ী হইতে পারে না।"

"আমাদের সকলেরই **একজন** সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা আছেন; তিনি আবার সকলের মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন: তাঁহার সঙ্গে আমাদের সকলের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য,--সে বাঁধন ছিঁড়িবার নহে: এই যে **জ্ঞান** এবং এই জ্ঞান অনুসারে আমাদের সকল কর্ম্ম নিয়মিত করিয়া যাওয়া এই যে **ক্রিয়া;** এই দুইটির মিলিত নাম **ধর্ম্ম।** এই ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা লভ্য ভগবান্‌ই আমাদের সকলের মধ্যে ঐক্যের একমাত্র কারণ। এইভাবে প্রাপ্ত ঐক্য সনাতন, চিরস্থায়ী। ধর্ম্মকে বাদ দিলে সংসার থাকেনা।

"আপনাদের কাছে আমি একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছি। শ্রীভগবান্ অদৃশ্য ভাবে সর্ব্বত্র অবস্থিত আপনারা এই কথা স্মরণ রাখিয়া পরস্পর হিংসা দ্বেষ না করিয়া **সহযোগিতা** পূর্ব্বক, মিলিয়া নিজ নিজ **স্বধর্ম্ম** পালন করুন ইহাই আপনাদের নিকট আমার প্রার্থনা। ইহাই একমাত্র আকাঙ্খা।

ইন্দ্র পৃথুর পদতলে পড়িয়া তাঁহার পা'দুখানি ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। **যে মানুষ নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া শ্রীভগবান্‌কে প্রীত করিতে পারে সমস্ত বিশ্ব তাহার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়ে।** পৃথু ইন্দ্রকে তাড়াতাড়ি হাত ধরিয়া পরম সমাদরে তুলিয়া লইলেন এবং সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ভাই ইন্দ্র, তোমাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া ক্ষমা করিলাম। আমার শত অশ্বমেধ পূর্ণ নাই বা হইল ? সমস্ত যজ্ঞের যিনি অধীশ্বর, সেই শ্রীভগবান্ বিষ্ণুকে আজ আমি সম্মুখে দেখিতেছি,—সকল কর্ম্মের ইহাইত চরম ফল! তুমি শত যজ্ঞ শেষ করিয়াছ, তাই—তোমাকে 'শতক্রতু' বলে আমি নিরানব্বইটি যজ্ঞ পূর্ণ করিয়াছি—আমাকে না হয় 'এক-কম শতক্রতু বলিবে। তবুও যে ভাই আমারই জিত।" ইন্দ্র পৃথুর বিনয় ও জ্ঞান দেখিয়া স্তব্ধ।

এদিকে ভগবান্ পৃথুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাকে দেখিয়া পৃথুর নয়ন হইতে ভক্তি, কৃতজ্ঞতা ও প্রেমের অশ্রু গড়াইতেছে! এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটিল, তারপর পৃথু ভগবান্‌কে বলিলেন,—"ঠাকুর, বর যদি দিতেই ইচ্ছা থাকে, তবে এই বর দিন, যেন আমার অযুত কর্ণ হয়। বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থ অনবরত আপনার যে যশোগান করিতেছে আপনার বরে অযুত কর্ণ পাইয়া সেই যশোগান যেন নিয়ত প্রাণ মন ভরিয়া শুনিতে পাই। আর অন্য বর কি চাহিব ? বালক কি জানে যে, কি পাইলে তাহার পরম লাভ হইবে ? পিতা, আপনি যাহা পাইলে আপনার সন্তানের **পরম লাভ** হয় তাহাই আমাকে দিন।

শ্রী-ভগবান্ যেন কিছু গোলে পড়িলেন। বালক যদি একটী খেলনা চায়, আর সেটী পাইলেই যদি ভুলিয়া থাকে, তবে সেই খেলনা দিতে পিতার কোন ভাবনা চিন্তা করিতে হয় না ; কিন্তু যদি বালক বলে যে, 'আমি কি চাহিব জানিনা, যাহা পাইলে আমার ভাল হয়, তাহাই আমাকে দিন,' তবেই পিতাকে গোলে পড়িতে হয়,—এখন ত আর যা'তা' দিয়া ছেলেকে ভুলান যায় না ; অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, বিচার করিয়া বালকের প্রকৃত কল্যাণকর জিনিষই দিতে হয়। ভগবান্‌ও এখন এই গোলে পড়িয়া গেলেন ; কিন্তু একটু পরেই হাসি মুখে পৃথুকে বলিলেন,—**"হে রাজন্ আমাতে তোমার ভক্তি হো'ক।"** সকলে 'ধন্য,' 'ধন্য' বলিয়া উঠিল। মহারাজ পৃথু নিজেও নিজেকে ধন্য মনে করিলেন।

মহারাজ পৃথু এই বলিয়া আসন গ্রহণ করিলে চতুর্দ্দিক হইতে সকলে এক সঙ্গে 'সাধু সাধু!' বলিয়া উঠিল। মুনিরা বলিলেন—"ধন্য পৃথু! তোমার পিতা বেণ অন্যায় আচরণ করিয়া অধোগতি লাভ করিয়াছিলেন ; তোমার পুণ্যে তাঁহার মুক্তি হইল। পুত্রের কর্ত্তব্য প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া সেই পুণ্যের জোরে পিতার পাপ নাশ করা ও তাঁহাকে স্বর্গে প্রেরণ করা। ধন্য তোমার পিতৃ-ভক্তি!" প্রধান প্রধান প্রজারা বলিল,—"আমরা ধন্য যে, এমন রাজা পাইয়াছি। মহারাজের প্রদর্শিত প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আমরা শ্রীভগবান্‌কে ও পাইতে পারিব —এ বিশ্বাস আমাদের হইয়াছে। আমাদের মহারাজের জয় হোক্।"

আট

মহারাজ পৃথু এইরূপে রাজ্যশাসন ও প্রজা-পালন করিতে লাগিলেন। সকল প্রজাই তাঁহার ছেলের মত হইল। রাজ্যে চাষ আবাদ, শিল্প-বাণিজ্য অধ্যয়ন-অধ্যাপন, যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-হোম সুন্দর ভাবে চলিতে লাগিল। দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগ, দুর্ভিক্ষ, অকাল-মৃত্যু এই সকল কাহাকে বলে পৃথুর প্রজারা ধারণা করিতে পারিত না।

এই ভাবে কিছুদিন যায়। একদিন সনৎকুমার নামে একজন মুক্তপুরুষ পৃথুর ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; তাঁহার সঙ্গে ছিলেন আর তিনটি ভাই। তাঁহাদের সকলেরই নামে 'সন' কথাটি আছে সনক, সনন্দন ও সনাতন। সকল মানুষকেই ঠিক পথে চালনা করিয়া তাহাদের কল্যাণ করিবার জন্য এই 'চারিটি সন' বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়া বেড়ান। আজ তাঁহারা পৃথুর ভবনে উপস্থিত।

মহারাজ পৃথু ভক্তি ভরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন, নিজে তাঁহাদের পা ধুইয়া দিয়া সেই জল দ্বারা নিজের দীর্ঘ কেশ মার্জ্জনা করিলেন, তার পর সোনার আসনে তাঁহাদিগকে বসাইয়া

ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনারা দয়া করিয়া বলুন, কিরূপ কাজ করিলে আমাদের সহজে সকল রকম মঙ্গল হয়?"

সনৎকুমার প্রীত হইয়া উত্তর দিলেন,—"মহারাজ যাহা কিছু **ভাল লাগে**, অর্থাৎ চক্ষুর, কর্ণের, নাসিকার বা হাতের, পায়ের অথবা মনের ভাল লাগে, তাহার সঙ্গে বেশী মাখামাখি না করিয়া জোর করিয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে—যাহা আমাদের **প্রকৃত ভাল**। **নিজের** ভাল চেষ্টা করিতে হইবে, আর **পরের** সঙ্গে ভাব কমাইতে হইবে, ও ক্রমে আড়ি দিতে হইবে। কিন্তু এই **নিজ** আর **পর** এই দুইটি কথার বিশেষ অর্থ প্রথমেই বুঝিয়া লওয়া চাই। আমরা সাধারণতঃ যেটিকে নিজ বলি, **সেটি কিন্তু আসল পর এবং যেটিকে পর বলি সেইটিই 'নিজ'**। ইহার মানে,—আমি ভাল থাকিব, ভাল খাইব, ভাল পরিব, অন্যের মন্দ হয় হোক আমার ভাল হইলেই হইল, অন্যের খাইবার কিছু থাকুক বা না থাকুক, আমি ভাল খাইতে পাইলেই হইল—এইরূপ মনের ভাব ও প্রবৃত্তির নাম **পর**; এই পরের সঙ্গে আড়ি দিতে হইবে। আর সবাই ভাল থাকুক,—সবাই ভাল খাইতে পারুক, ভাল পরিতে পারুক, নীরোগ থাকুক,—আমার অনিষ্ট হইলেও যদি অনেকের সুখ হয়, তবে আমার অনিষ্টই হোক্ সকলের মঙ্গল হইলেই আমার মঙ্গল—এইরূপ যে মনের ভাব ও প্রবৃত্তি তাহার নাম **নিজ**; এই নিজের সঙ্গে বেশী করিয়া ভাব করিতে হইবে। কিন্তু এই আড়ি ও ভাব ভাল রকম করিবার ইচ্ছা থাকিলে সকল কাজ নিয়মমত করিতে হইবে, ভাল ভাল লোকের সঙ্গে মিশিতে হইবে, পরনিন্দা বন্ধ করিতে হইবে, আর সকল সময়ে মনে রাখিতে হইবে,—আমরা সকলেই ভগবানের ভিতর হইতে আসিয়াছি, তাঁহার ভিতরেই বাস করিতেছি, আবার কিছুকাল পরে তাঁহার কাছেই ফিরিয়া যাইব।

এই বলিয়া সনৎকুমারেরা চারি ভাই চলিয়া গেলেন। পৃথু তাঁহাদের উপদেশ মত নিজের সমস্ত শক্তি সকলের কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করিলেন এবং তাঁহার রাজ্য সুখময় ও শান্তিময় করিয়া তুলিলেন। তাঁহার প্রজারা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে প্রজারঞ্জন দেখিয়া বুঝিল—যথার্থ 'রাজা' কাহাকে বলে। তাহারা আরও দেখিল—তিনি পৃথিবীর মত সহিষ্ণু, সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্রগামী; তিনি প্রজাবাৎসল্যে মনুর তুল্য, বিদ্যায় বৃহস্পতির সদৃশ এবং ইন্দ্রিয়-জয়ে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর সমান। আর, গো, বিপ্র এবং গুরুজনের প্রতি ভক্তিতে,—ভগবদ্ভক্ত-গণের প্রতি শ্রদ্ধায়, বিনয়ে, নম্রতায় ও পরের কার্য্য সাধনে তাঁহার তুলনা ছিলনা।

সেই অতি প্রাচীনকালের একজন রাজা দেশে ও সমাজ সম্বন্ধে কিরূপ চিন্তা করিতেন, কিরূপ ভাবে প্রজার মঙ্গলের জন্য আত্ম-নিয়োগ করিতেন

অর্চ্চি সহমরণ যাইতেছে

এই গল্পটি হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছ। সেকালের রাজারা দীর্ঘকাল রাজত্ব করিবার পর বনে গমন করিয়া তপস্যা করিতেন। মহারাজা পৃথুও অবশেষে পুত্রের উপর রাজ্য ভার সমর্পণ করিয়া মহারাণী অর্চ্চির সহিত বনে গমন করিয়া গভীর তপস্যায় মগ্ন হইলেন।—তারপর একদিন শুভ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে তাঁহার প্রার্থিত মৃত্যু আসিল। মহারাজা পৃথু হাসি মুখে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইলেন।

ভারতের নদী

ব্রহ্মপুত্র

৩০৯৫ পৃষ্ঠার পর

ব্রহ্মপুত্রের উৎস—সন্ধানের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদ হিমালয়ের বুকের ভিতর দিয়া সমান্তরাল ভাবে তিব্বতের মধ্য দিয়া বহিয়া আসিয়াছে। তোমরা ভারতবর্ষের মানচিত্রখানির প্রতি লক্ষ্য কর, দেখিতে পাইবে ব্রহ্মপুত্র কেমন আঁকিয়া-বাঁকিয়া হিমালয়ের পর্ব্বত-শিখরের মধ্য দিয়া নাচিতে নাচিতে আসামের উত্তর-পূর্ব্ব কোণ দিয়া আসিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাহার নাম হইতেছে ডিহঙ্গ।

ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি স্থান মানসসরোবর। অনেকে এখন ভিন্ন মত ও পোষণ করেন। তিব্বতের নানা প্রদেশে ব্রহ্মপুত্রের নানা বিচিত্ররূপ। কোনও দুই তিনটি নদী আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে, কোথাও বা দুইটি। এইরূপ সঙ্গম স্থান দেখিতে অতি মনোহর। যে স্থানে গিআমদা (Gyamda) নদী এবং সেলা জোঙ্গ (Tsela Dzong) নদী আসিয়া স্যাম্পো বা ব্রহ্মপুত্রনদের সহিত মিশিয়াছে সেখানকার দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব। ঐ স্থানের উচ্চতা প্রায় ১০,৫০০ ফিট। চারিদিকে নীল গিরি-শ্রেণী আর তাহারই বুকে বুকে সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে ব্রহ্মপুত্র বহিয়া চলিয়াছে। আসামের উত্তর দিকে হিমালয় পর্ব্বতের শিখরে শিখরে ব্রহ্মপুত্র নদের এই বিচিত্র দৃশ্য অতুলনীয়। কবি সত্যই গাহিয়াছেন :

বহে গঙ্গা জটা হ'তে, ব্রহ্মপুত্র ধেয়ে নেচে চলে ;
শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা শ্যামল অঞ্চল খানি দোলে।

আসামের উত্তর-পূর্ব্ব কোণ দিয়া ব্রহ্মপুত্র ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সমতল ক্ষেত্র দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমাভি-মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র আসামের সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া আসিবার পর ইহার তটভূমে **সদিয়া** প্রথম সহর। ভারতে নামিয়া আসিয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত সদিয়া সহরেরই প্রথম সাক্ষাৎ। আসামের বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে একে একে ডিব্রুগড, তেজপুর, গৌহাটি কামাখ্যা-ধাম, গোয়ালপাড়া, ধুবড়া প্রভৃতি জনপূর্ণ নগর-নগরীর মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র বহিয়া চলিয়াছে। এই ভাবে আসাম প্রদেশ অতিক্রম করিবার পর, ব্রহ্ম-পুত্র দুইটি প্রকাণ্ড শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। একটি

তিস্তা বা ত্রিস্রোতা নদী

ঈস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের সৌজন্যে
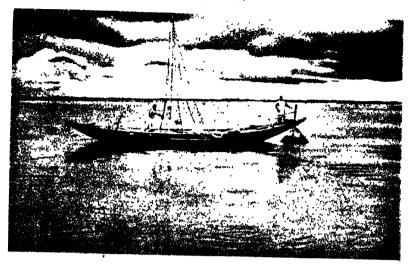
ব্রহ্মপুত্র—ময়মনসিংহ সহরের সন্নিকটে

ঈস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের সৌজন্যে

আমিনগাঁও—ব্রহ্মপুত্র

ঈস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের সৌজন্যে

ব্রহ্মপুত্রের বিস্তার

ঈস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের সৌজন্যে

শাখা ময়মনসিংহ জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত। সেইটিই পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা ছিল এবং তাহাই ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত।

ব্রহ্মপুত্রের অপর শাখাটির নাম যমুনা। যমুনা এক সময়ে শীর্ণকায়া নদী ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যমুনা আর শীর্ণকায়া নাই তাহার আকার

ব্রহ্মপুত্র নদের দৈর্ঘ্য প্রায় ১,৮০০ মাইল। এই নদের অধিকাংশ ধারাই ভারতবর্ষের বাহিরে তিব্বতে অবস্থিত। সিন্ধু ও গঙ্গার যেমন নানা উপনদী আছে তেমনি কোন বৃহৎ উপনদী নাই। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ উপকূলের উপনদী সমূহের মধ্যে সুবর্ণশ্রী (সুবর্ণসিরি) মানস ও তিস্তা এবং উপনদী সমূহের

আসাম-গৌহাটি সহরের নিকটে ব্রহ্মপুত্রের দৃশ্য—দূরে উমানন্দ ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলের সৌজন্যে

বাড়িয়াছে—যমুনা এখন বিপুলকলেবরা বৃহৎ আকারের নদী। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র মৃতপ্রায়, এখন যমুনাই ব্রহ্মপুত্রের সলিল রাশি বহন করিয়া গোয়ালন্দের নিকট পদ্মা-গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। পদ্মা ও যমুনা—চাঁদপুরের নিকট যেখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে তাহার একটু পূর্ব্ব হইতেই সম্মিলিত পদ্মা ও যমুনার নাম **মেঘনা**। মেঘনা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরের বুকে যাইয়া ধীরে ধীরে আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছে। মেঘনার জল কৃষ্ণবর্ণ।

মধ্যে ডিহিঙ্গ, ধনাসিরি বা ধনশ্রী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ব্রহ্মপুত্রের তটভূমি আসাম অঞ্চলের দিকে বিশেষ জঙ্গলাকীর্ণ এবং স্থানে স্থানে ভয়াবহ। ঐ সব বনে বনে হস্তী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্র জন্তু বিচরণ করে। ব্রহ্মপুত্রের দুইদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর।

সিন্ধু নদ

উত্তর ভারতেরই শুধু নয়—সমগ্র ভারতেই সিন্ধু

বৃহত্তম নদ। কৈলাস পর্ব্বতের (তিব্বত) শ্রেণীর মধ্যে মানস সরোবরের নিকট ইহার উৎপত্তি স্থান। ব্রহ্মপুত্র, শতদ্রু এবং গোগ্‌রা নদীর উৎপত্তি স্থান ও ইহার কাছাকাছি। সমুদ্র তটরেখা হইতে উৎপত্তি স্থানের উচ্চতা প্রায় ৬,০০০ ফুট হইবে।

প্রায় ৫০০ শত ফিট উচ্চ পর্ব্বতের উপর দিয়া এই নদটি উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। তিব্বতের মালভূমি, কাশ্মীর, লাডাক প্রভৃতি পার্ব্বত্য অঞ্চল দিয়া ইহা সমতলভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে। উপরের দিকে সিবক্ হইতেছে সিন্ধু নদের প্রধান শাখা নদী। কাশ্মীর হইতে পঞ্জাবের সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়া সিন্ধু নদ ও কুয়ামের সহিত মিলিত হইয়া শেষটায় আটকের কাছাকাছি সিন্ধুতে যাইয়া পড়িয়াছে।

পঞ্জাবের কথা তোমরা জান। সেই যে :—

'পঞ্চ নদীর তীরে,
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠিল শিখ
নির্মম নির্ভীক !

এই সেই পঞ্চনদ,—এই পঞ্জাব প্রদেশ। এই প্রদেশের ভিতর দিয়া শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী ও বিতস্তা এই পাচটি নদী বহিয়া গিয়াছে। এই জন্যই এই পঞ্চনদ বিধৌত দেশ **পঞ্জাব** নামে পরিচিত।

বিপাশা শতদ্রুর উপনদী। চন্দ্রভাগার উপনদী

কামাখ্যা পাহাড়ের নিকট ব্রহ্মপুত্র

ঈসটার্ণ বেঙ্গল রেলের সৌজন্যে

হইতেছে ইরাবতী ও বিতস্তা। শতদ্রুর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই শতদ্রু নদী সিন্ধুর উৎপত্তি স্থানের নিকট জন্মগ্রহণ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের মধ্য দিয়া আসিয়া পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াছে। **বিপাশা, বিতস্তা, ইরাবতী** ও **চন্দ্রভাগা** সকলেরই উৎপত্তি স্থান হইতেছে—হিমালয় পর্ব্বত।

বিতস্তা নদী আবার কাশ্মীরের উলার হ্রদের ভিতর দিয়া বহিয়া আসিয়া পরে চন্দ্রভাগার সহিত মিশিয়াছে। বিতস্তার জন্যই কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য এইরূপভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উহাকে ভূ-স্বর্গে পরিণত করিয়াছে। বিতস্তার উৎপত্তি স্থানের নাম অনন্তনাগ। কাশ্মীরের নামগুলিও সুন্দর।

দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত। পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে নামিবার সঙ্গে সঙ্গে **আটকের** নিকট পঞ্জাবে আসিয়া সিন্ধু কাবুল নদীর সহিত মিশিয়াছে। ক্রমে রাজপুতনা ও সিন্ধুদেশ অতিক্রম করিয়া আরব সাগরে যাইয়া পড়িয়াছে।

সিন্ধু নদের মোহনায় যে **ব** দ্বীপ আছে, ঐ স্থানে করাচি বন্দর অবস্থিত। এই নদের দক্ষিণ তটদেশে উত্তর-পশ্চিমের সীমান্ত পার্ব্বত্যপ্রদেশ। ঐ ঘন-বন-পরিবেষ্টিত পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে যে সকল নদী আসিয়া সিন্ধুর সহিত মিশিয়াছে—তাহাদের মধ্যে **কাবুল, কুয়াম, গোমাল** প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কাবুল নদী সোয়াট

সোনাব, লিদর প্রভৃতি উপত্যকার নাম। কাশ্মীরের সৌন্দর্য্যের ভিতর যে গাম্ভীর্য্য রহিয়াছে তাহা অতুলনীয়। সে কথা বলিয়া বুঝান চলে না।

বিপাশা, বিতস্তা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও শতদ্রু এই সম্মিলিত পাঁচটি নদীই পঞ্চনদ নামে অভিহিত। এই পঞ্চনদ মিঠনকোট নামক স্থানে সিন্ধুনদের সহিত যাইয়া মিলিত হইয়াছে।

সিন্ধু নদের দৈর্ঘ্য প্রায় ১,৮০০ মাইল প্রথমতঃ ৮০০ শত মাইল পর্য্যন্ত এই নদ কাশ্মীর ও তিব্বতের গিরিসঙ্কট দিয়া উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে।

সিন্ধুর সম্বন্ধে এখানে একটা কথা তোমরা বিশেষ করিয়া মনে রাখিবে। তাহা এই যে এই মোহানা হইতে আটক পর্য্যন্ত নৌ—চলাচলের উপযুক্ত। সিন্ধুনদের ব দ্বীপটি প্রায় ১২৫ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ব দ্বীপের মধ্যে সিন্ধু নদ নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া অবশেষে আরব-সাগরে যাইয়া মিশিয়াছে। সিন্ধু উপত্যকা প্রদেশে বৎসরে গড়ে ১০ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টি হয় না। সিন্ধুনদ হইতে আজকাল অনেক বড় বড় খাল কাটিয়া সিন্ধু দেশের মরুপ্রদেশকে শস্য-শ্যামল করিয়াছে।

সিন্ধুনদ বিধৌত দেশের—প্রাচীন সভ্যতা

সিন্ধুনদের তীরে একদিন ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। কয়েক বৎসর হইল সিন্ধু দেশের মোহেন-জো-দেড়ো এবং পঞ্জাবের হারপ্পা নামক স্থানে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে বহুকাল পূর্ব্বের প্রাচীন সহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। সকলের চেয়ে আধুনিক নগরটিও আনুমানিক পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বের। অতএব প্রাচীন কাল হইতেই এখানে এক উন্নত ও সভ্যজাতি বাস করিত বলিয়া স্থির হইয়াছে। তথা হইতে ভারতের এক প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। মোহেন-জো-দেড়ো শব্দের অর্থ হইতেছে উঁচু স্তূপ বা ঢিবি। এখানে ভিন্ন ভিন্ন যুগের তিনটি সহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের তীরে—আমিন গাঁও ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলের সৌজন্যে

সুয়েজ খালের বিস্তৃতি কত ?

৩৩৬ পৃষ্ঠার পর

সুয়েজ খাল ১৪৭ ফিট প্রশস্ত। কিন্তু যেখানে বিটার হ্রদের ভিতর দিয়া বহিয়া গিয়াছে সেখানে চওড়া অনেক বেশী। এই খালের দৈর্ঘ্য ১৩৪ৡ মাইল। প্যানামা খাল ৫০ মাইল দীর্ঘ। কাজেই সুয়েজ খাল প্যানামা খালের প্রায় তিনগুণ। এই খাল সাধারণতঃ ৩০ ফিট গভীর। সুয়েজ খালের একদিক হইতে অন্য দিকে যাইতে এক একখানি জাহাজের ১৫ ঘণ্টা সময় লাগে। বড় বড় জাহাজও এই খাল দিয়া যাইতে পারে, পারে না শুধু আটলাণ্টিক সমুদ্র পারাপারের বড় বড় জাহাজগুলি। এই খাল খনন করিতে ২৯,৭২৫,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। এই খাল প্রবহমান রাখিবার জন্য বরাবরই তলদেশ কর্ষণ করিতে হয়। প্রতিবৎসর সুয়েজ খালের ভিতর দিয়া ৬,০০০ জাহাজ যাতায়াত করে। সংখ্যায় ইংরাজের জাহাজই বেশী।

প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা হয় কেন ?

তোমরা গ্রীষ্মকালে এটা বোধহয় লক্ষ্য করিয়াছ যে সকালবেলা ও বিকালবেলা দুপুরবেলা হইতে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হয়। ইহার কারণ এই যে দুপুরের সময় সূর্য্যের কিরণ ঋজুভাবে পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, আর সকাল ও সন্ধ্যায় হেলানোভাবে আসে, এই জন্য দুপুরের সময় সোজা-সুজিভাবে সূর্য্যের কিরণ কেন্দ্রীভূত হইয়া পৃথিবীর উপর আসে এবং অল্প পরিসরের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয় বলিয়া অধিকতর গরম বোধ হয়। কিন্তু সকাল ও সন্ধ্যায় হেলানোভাবে অনেকটা দূর স্থান হইতে আসিয়া পড়ে বলিয়া সেরূপ প্রখর থাকে না।

আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত কে আবিষ্কার করেন ?

সকলেই জানেন যে জ্যাম্বেসী (Zambesi) নদীর বিখ্যাত জলপ্রপাত ডাঃ লিভিংষ্টোন তাঁহার প্রথমবারের আফ্রিকা অভিযানে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল পণ্ডিতেরা বলেন যে ডাঃ লিভিংষ্টোন ঐ জল প্রপাতটীর পুনরায় আবিষ্কার করেন মাত্র। তাঁহার পূর্ব্বে ফরাসী ও পর্ত্তুগীজ পর্য্যটকেরা সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের সন্ধান জানিতেন। কেন না তাঁহাদের অঙ্কিত মানচিত্রে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের বিষয় বিশেষরূপে চিহ্নিত আছে।

'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি—**বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**

জন্ম ১২৪৫ সাল ১৩ আষাঢ়
১৮৩৮ খ্রী. ২৭শে জুন

মৃত্যু ২৬শে চৈত্র
১৮৯৪ ৮ই এপ্রিল

বঙ্কিমচন্দ্র

৩৩২৯ পৃষ্ঠার পর

১৯৩৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের একশত বৎসর পূর্ণ হইয়া যাওয়ায় সমস্ত বাঙ্গলা দেশ জুড়িয়া তাঁহার জন্মের 'শতবার্ষিকী' অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে আমাদের সাহিত্যে কি ভাবে অনেক নূতন পথের সন্ধান দিয়াছেন অনেকে তাহার কথা বলিয়াছেন। রামমোহন রায়ের পর ও বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা বাহির হওয়ার পূর্ব্বে যে প্রায় ত্রিশ বৎসর অন্তর, তাহার মধ্যে আমাদের দেশের কয়েকজন পণ্ডিত গদ্যে বহু পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম সকলেরই জানা,তাঁহার দয়ার কথা ও পাণ্ডিত্যের কথা আমরা কত শুনিয়াছি। কিন্তু তিনি শুধু পণ্ডিত বা দয়ালু ছিলেন না, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্য ভাল ভাল বইও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তখনকার কালে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য পড়ার বই ভাল ছিল না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ইংরেজ কর্ম্মচারীদের বাংলা শিখাইবার একটা ব্যবস্থা ছিল বটে, প্রথম যাহারা বাংলা ভাষা শিখিবে তাহাদের জন্য বইও লেখা হইত, কিন্তু আমাদের দেশের অর্থাৎ বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের প্রথম পড়ার বই অতি অল্পই ছিল। তাহাদের ক, খ পরিচয় করাইবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বর্ণ-পরিচয়' লিখিলেন প্রথম ভাগ, পরে সংযুক্ত বর্ণ শিখাইবার জন্য লিখিলেন দ্বিতীয় ভাগ। কথার ছলে নীতি শিক্ষা দিবার জন্য তিনি 'কথামালা' লিখিলেন, এবং তাহার পর আর একটু বড় হইলে তাহাদের মনে যাহাতে বোধের উদয় হয় সেজন্য লিখিলেন 'বোধোদয়'। অমর কবি কালিদাসের নাটক 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' হইতে তিনি 'শকুন্তলা' নাম দিয়া গদ্য কথা রচনা

করেন, ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত' হইতে লেখেন 'সীতার বনবাস'। এই দুইখানি পুস্তকও বিদ্যালয়ে পড়ান হইত, ইহাদের ভাষা, সরলতা ও কথার মাধুর্য্য পাঠকদের মুগ্ধ করিত। ইহা ভিন্ন বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরা যাহাতে সহজে সংস্কৃত শিখিতে পারে তাহার জন্য বিদ্যাসাগর বিস্তর বই লিখিয়াছিলেন, আমরা এখনও তাহার কিছু কিছু পড়ি ও পড়াই। আজকাল আমাদের দেশে কত সুন্দর সুন্দর বই ছেলেদের জন্য লেখা হইতেছে, কত চমৎকার ছবি, কত সুন্দর কাগজে ছাপা, কেমন তাহার বাঁধাই, কিন্তু একশত বৎসর পূর্ব্বে কি ছিল, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। এই সব পরিবর্ত্তনের গোড়া পত্তন করিয়া যান বিদ্যাসাগর মহাশয়।

অক্ষয়কুমার দত্ত

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আরও এক জনের নাম করিতে হয়, তিনি হইলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁহার লেখা পড়িয়াও আমাদের দেশে বহু লোক বাংলা ভাষা শিখিয়াছে। আগ্নেয়গিরি, ধূমকেতু, পুরুভুজ—নানা বিষয়ে তিনি আমাদের মনে কৌতূহল জাগাইয়া দিয়াছেন; বিদ্যা শিখিলে যে কি লাভ, সদ্‌গুণের অধিকারী হইলে যে কি আনন্দ, তাহা তাঁহার উপদেশের মধ্যে সুন্দর ভাবে দেখান হইয়াছে। তাঁহার ভাষার মধ্যে অবশ্য এমন শব্দের এমন প্রয়োগ পাওয়া যায়, যাহা কি না আমরা সচরাচর অন্যত্র দেখি না। তাহা হইলেও উহা পড়িতে বেশ লাগে, গল্পের ভাব থাকিলে তো আর কথাই নাই। যেমন, "এইরূপ সুস্নিগ্ধ সময়ে আমি তথায় এক পাষাণ খণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া, আকাশমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে জগতের আদি-অন্ত, কার্য্য-কারণ, সুখ-দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুদায় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে জল কল্লোলের কল-কল-ধ্বনি, বৃক্ষ-পত্রের শরশর শব্দ ও সুশীতল সমীরণের সুন্দর হিল্লোল দ্বারা আমার পরম সুখানুভব হইয়া, মনোবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল, এবং এই অবসরে নিদ্রা আমার অজ্ঞাতসারে নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া, আমাকে অভিভূত করিল। আমার বোধ হইল যেন এক বিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। তন্মধ্যে কোন কোন স্থানে কেবল নবীন-দূর্ব্বাদল-পরিপূর্ণ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র, কুত্রাপি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুরাতন বৃক্ষসমূহ, কোথাও নদী বা নির্ঝর। তীরস্থ মনোহর কুসুমোদ্যান দর্শন করিয়া অপর্য্যাপ্ত আনন্দলাভ করিলাম। কৌতূহল-রূপ দীপ্ত হুতাশন ক্রমশঃ প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল; এবং তদনুসারে দিগ্বিদিক্ বিবেচনা না করিয়া যতদূর দৃষ্ট হইল, ততদূরই মহোৎসাহে ও পরমসুখে পর্য্যটন করিতে লাগিলাম।"

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা লিখিতে গিয়া

তাহার সম্পূর্ণ একটা নূতন দিক খুলিয়া দিলেন। তাঁহার জন্ম ১৮৩৮ সালে, একথা আজকালকার সকলেরই মনে থাকিবে। তাঁহার যখন হাতে-খড়ি, তখন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশ, এই পত্রিকায় অক্ষয় বাবু একজন প্রধান লেখক ছিলেন; আর তাহার অল্প-কাল পরেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' বাহির হয়। নানা জাতীয় পত্রিকা তখন বাংলায় প্রকাশিত হইতেছে, নাটক লিখিবার চেষ্টাও চলিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র সে সময় ছাত্র। খেলাধূলা, দৌড়-ধাপের মধ্যে তিনি তেমন ছিলেন না, সঙ্গীর সংখ্যাও যে বেশি ছিল তাহা নয়; তবে লেখাপড়ায় তিনি ক্ষমতার পরিচয় যথেষ্ট দিয়া-ছিলেন। তখনও এণ্ট্রান্স বা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার আরম্ভ হয় নাই, জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা ও সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা তখন চলিতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র উভয় পরীক্ষাতেই প্রথম হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন প্রথম সূত্রপাত হইতেছে। সিপাহী হাঙ্গামার বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইল। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাঁহারা প্রথম বি. এ. পাশ করেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের একজন। বি. এ. পাশের ফল দেখিয়া তাঁহাকে ডিপুটিগিরি দেওয়া হয়।

কিন্তু পরীক্ষায় ভাল করা বা বড় চাকুরি করা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের বড় কথা নয় তিনি যে আমাদের সাহিত্যকে নূতন রূপ দিয়া-ছেন তাহাই আমাদের ইতিহাসে চিরকাল সোনার অক্ষরে লেখা থাকিবে। প্রথমে তিনি ইংরাজিতে উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহার পরে বাংলায় তাঁহার উপন্যাস বাহির হইতে থাকে। দুর্গেশনন্দিনী, কপাল-কুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, রজনী, রাধারাণী, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, রাজসিংহ, সীতারাম, দেবী-চৌধুরাণী—এই সকল রচনা পর পর বাহির হইয়া কথাসাহিত্যে তাঁহার স্থান অন্য সকলের চেয়ে বড় করিয়া তুলিল। তাহার পর বঙ্গদর্শন মাসিকপত্র বাহির করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নানা বিষয়ে বাঙ্গালীর ঔৎসুক্য জাগাইয়া দিলেন; তাঁহার সরস ও তেজস্বী ভাব ও রচনার ধরণ দেখিয়া, যে সকল শিক্ষিত বাঙ্গালী এতকাল ইংরাজিতেই বই পড়িতে ভাল-বাসিত তাহারাও বাংলা শিখিতে আরম্ভ করিল। তখনকার দিনে ছেলেদের দল যে কিরূপ আগ্রহের সহিত বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা পড়িত, তাহাদের কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন,—তিনিও তখন বালক, বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের সময় তাঁহার বয়স ছিল বারো বৎসর।

"অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় একেবারে লুট্ করিয়া লইল। একে ত তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড় দলে পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরো বেশি দুঃসহ হইত। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর এখন যে খুসি সেই অনায়াসে একেবারে একগ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘ-কালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া, তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেক দিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর কেহ পাইবে না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে, তাঁহার প্রথম বাংলা উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার প্রায় আট বৎসর পূর্বে, আর একজন লেখক বাংলায় উপন্যাস

প্রকাশ করেন। ইঁহার আসল নাম ছিল প্যারীচাঁদ মিত্র, কিন্তু তিনি নিজের নামে বই ছাপান নাই, বইয়ের উপর নাম ছিল 'টেকচাঁদ ঠাকুর'। তাঁহার এই প্রথম উপন্যাসের নাম 'আলালের ঘরের দুলাল।' বড়

বঙ্কিমচন্দ্র

লোকের ঘরে জন্মিয়া বেশি আদরে বাড়িয়া উঠিলে, এবং প্রকৃত শিক্ষা না পাইলে, যে কিরূপ ক্ষতি হইতে পারে, কিরূপ কুফল হয়, তাহা দেখানই ছিল টেকচাঁদের উদ্দেশ্য। অত্যন্ত সহজ ও চলিত ভাষায় সমাজের খুঁটিনাটি অনেক ব্যাপার তিনি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী বাবু ও তাঁহার সমাজের ছবি সে বর্ণনায় অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তখনকার বাবুদের চাল চলনের কথাও তিনি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পড়িলে হাসি সামলান দায়। "বাবুরা সকলেই সর্ব্বদা ফিটফাট, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, দাঁতে মিসি, সিপাইপেড়ে ঢাকাই ধুতি পরা, বুটোদার এক্লাই ও গাজের মেরজাই গায়, মাথায় জরির তাজ, হাতে আতরের ভুরভুরে রেসমের হাতরুমাল ও এক এক ছড়ি, পায়ে রূপার বগ্লসওয়ালা ইংরাজী জুতা। ভাত খাইবার অবকাশ নাই, কিন্তু খাস্তার কচুরি, খাসা গোল্লা, বরফি, নিখুতি, মনোহরা ও গোলাপি খিলি সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে।" এখনকার বাবুদের সঙ্গে এই বর্ণনার মিল কোথায়? তাহা হইলেও টেকচাঁদ যেমন যেমন দেখিয়াছিলেন তেমন তেমনই বর্ণনা করিয়াছিলেন, বাবু ও কুঠিয়াল, ধার্মিক ও বয়াটে, নিরীহ কবিরাজ ও দুর্দান্ত ছোক্রা—তখনকার বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্র তাঁহার গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু প্রথমে যে বাংলা উপন্যাস লিখিলেন তাহা একেবারে সম্পূর্ণ নূতন জিনিস। তাঁহার সময়কার ছবি না দিয়া তিনি আঁকিলেন, একেবারে সাড়ে তিনশত বৎসর আগেকার ছবি। নামের মধ্যেও নূতনত্ব ছিল। নাম রাখিলেন 'দুর্গেশনন্দিনী'। মোগলসম্রাট আকবর তখন দিল্লীর বাদশাহ; উড়িষ্যার পাঠানেরা কতলুখাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করিলে তিনি রাজপুতবীর মানসিংহকে তাহা দমনের জন্য পাঠাইলেন। মানসিংহ শত্রুদের সংবাদ লইবার ভার তাঁহার প্রিয়তম পুত্র জগৎ-সিংহের উপর দিলেন, সঙ্গে একশত সৈন্যও পাঠাইলেন। জগৎসিংহ শত্রুর সন্ধান করিতে করিতে আসিতেছেন এমন সময় একদিন পথে ঝড়, বৃষ্টি হওয়ায় তাঁহাকে এক মন্দিরে আশ্রয় লইতে হইল। সেই সময় সেই মন্দিরে দুইজন রমণী ছিলেন। দুর্দ্দৈব দেখিয়া তাঁহারাও সেখানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইঁহাদের একজনের বয়স কম, তাঁহার নাম তিলোত্তমা, তিনিই 'দুর্গেশনন্দিনী,' গড়মান্দারনের মালিক বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা। তিলোত্তমাকে দেখিয়া

জগৎসিংহ মুগ্ধ হইলেন, তাঁহার ইচ্ছা হইল এই সুন্দরীকে তিনি বিবাহ করেন। কিন্তু তিনি আসিয়াছেন শত্রুসৈন্যের সংবাদ লইতে, যুদ্ধের সময় বিবাহের চিন্তা অনুচিত, তাই তিনি সে চিন্তাকে আমল দিলেন না। তবু আব একদিন দুর্গেশনন্দিনীর সহিত দেখা করিতে গিয়া যেমনই দুর্গমধ্যে পা দিয়াছেন অমনই পাঠানেরা দুর্গ আক্রমণ করিল। জগৎসিংহ একা আসিয়াছিলেন, কত জনের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন, আহত হইয়া বন্দী হইলেন। পাঠানদেব সেনাপতি ছিলেন ওসমান খাঁ, তিনি আবাব কতলুখাঁব ভ্রাতুষ্পুত্র। পাঠানেরা দুর্গজয় করিয়া দুর্গস্বামী বীরেন্দ্রসিংহকে বন্দী করিল; ইহার পবে কতলুখাঁব আদেশে তিনি নিহত হইলেন। এদিকে পাঠান শিবিবে আহত জগৎ-সিংহের শুশ্রূষার ভার লইলেন—স্বয়ং আয়েসা কতলুখাঁর একমাত্র কন্যা। ওসমান নিজে আয়েসাকে ভালবাসিতেন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিযাছিলেন, এখন জগৎসিংহের প্রতি আয়েসার যত্ন দেখিযা তাঁহার মনে হিংসা হইল। তিনি বুঝিতে পাবিযাছিলেন যে আয়েসা কুমার জগৎসিংহকে ভালবাসিয়াছে, আর তিনি আয়েসার ভালবাসা পাইবেন না। কিন্তু জগৎসিংহকে বেশি দিন বন্দী থাকিতে হইল না, দুর্গজয়ের উৎসবের মধ্যে কতলু-খাঁ নিহত হইলেন, মৃত্যুর পূর্বে রাজপুত সেনাপতিকে ডাকিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। মোগলে পাঠানে সন্ধি হইল, কিন্তু পাঠানেরা যেটুকু লাভ করিয়াছিল, তাহা হারাইল। তিলোত্তমা দুর্গ ফিরিয়া পাইলেন, এবং জগৎসিংহের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল,—সুতরাং সব দিক দিয়া দুর্গেশ-নন্দিনীরই জয় হইল। জগৎসিংহের বিবাহে আয়েসা আসিয়াছিলেন এবং উৎসবে যোগও দিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর—আকাশে লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলিতেছে, বাতাসে রাত্রির অন্ধকারে গাছেব পাতায় পাতায় মর্মরধ্বনি, দুর্গশিখর হইতে মাঝে মাঝে পেঁচকের ডাক শোনা যাইতেছে, দুর্গপরিখার জলে আকাশের ছাযা পড়িযাছে, বাতায়নে দাঁড়াইয়া আযেসা জীবন বাখিবেন কি বিসর্জ্জন দিবেন এই কথা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতেছেন, এই যে ছবি দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বইখানি শেষ করিয়াছেন, তাহা বহুদিন ধবিয়া পাঠকেব মনে আঁকা থাকে, সহজে মুছিয়া ফেলা যায় না।

ইহাব দুই বৎসর পরেই কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হয়। কপালকুণ্ডলাকে বাল্যকালে দস্যুরা চুবি করিয়া নৌকায় লইয়া যাইতেছিল, নৌকা ভাঙ্গিয়া যাওযায় সমুদ্রতীরে ফেলিযা যায়। তাহাব পর এক কাপালিক তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। নবকুমার গঙ্গাসাগরে তীর্থ করিতে গিয়াছিলেন, দৈবঘটনায় তাঁহাকে সমুদ্রতীরে রাখিযাই সঙ্গীরা দেশে ফিবিয়া যায়। পথ হারাইয়া নবকুমাব আসিয়া পড়িলেন সেই কাপালিকের নিকট; কাপালিক তাঁহাকে কালীর নিকট বলি দিবার সঙ্কল্প করিলেন। কপালকুণ্ডলা তাঁহাকে এই দারুণ সঙ্কট হইতে বাঁচাইলেন, বন্দিদশা হইতে মুক্ত করিয়া পলায়নের পথ দেখাইয়া দিলেন, সঙ্গে করিয়া এক মন্দির পর্য্যন্ত লইয়া আসিলেন, সেখানে কিন্তু মন্দিরের অধিকারী নবকুমারের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া দিলেন ও উভয়ের দেশে ফিরিবার ব্যবস্থাও করিয়া দিলেন। কিন্তু এ বিবাহে কপালকুণ্ডলা সুখী হইতে পারিলেন না; সমুদ্রের ধারে নির্জন উপকূলে থাকিয়া যিনি বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি কি মানুষের সঙ্গে মানুষের মধ্যে দশজনের মত জীবন কাটাইতে পারেন? এদিকে নবকুমার পূর্বের্ব এক বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার

সেই স্ত্রীর নাম ছিল পদ্মাবতী, তিনি দেশে থাকিতেন না, পিতার সঙ্গে বিদেশে থাকিতেন পিতা রাজানুগ্রহের নিমিত্ত মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করায় কন্যাও মুসলমানী হন এবং লুৎফউন্নিসা এই মুসলমানী নাম গ্রহণ করিয়া বাদশাহের দরবারে আমোদ-প্রমোদে সময় অতিবাহিত করিতেন ; যখন নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিতেছিলেন, তখন পথে ইনি তাঁহাদের দেখা পান, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, নবকুমার তাঁহারই স্বামী। তখন হইতে তাঁহার চেষ্টা হইল, কি করিয়া কপালকুণ্ডলাকে দূর করেন। এদিকে কাপালিক পলাতক নবকুমারের খোঁজ করিতে গিয়া বালির পাহাড় হইতে হঠাৎ পড়িয়া যান, এত সাংঘাতিক আঘাত পান যে তাহার পর সারিতে অনেক দিন লাগে। তিনি বহু কষ্টে উহাদের খোঁজ পাইলেন, নবকুমারের পূর্বপত্নী আসিয়া তাঁহার সঙ্গে জুটিলেন। কপালকুণ্ডলার এক ননদ ছিলেন, শ্যামাসুন্দরী ; রাত্রে গাছ গাছড়া তুলিয়া ঔষধ তৈয়ার করিলে তাঁহার উপকার হয়, কিন্তু অত রাত্রে বনে কে যায় ? কপালকুণ্ডলা তাঁহার উপকারের জন্য গেলেন, কিন্তু ঔষধ পাইলেন না। সেই সময়ে পদ্মাবতী ও কাপালিক তাঁহাকে বনে দেখিতে পাইলেন। কাপালিক তাঁহার পিছনে ছুটিয়াও ধরিতে পারিলেন না, তখন কৌশলে নবকুমারের মনে সন্দেহ জন্মাইয়া দেওয়া হইল যে কপালকুণ্ডলা বুঝি অন্য কাহাকে ভালবাসে। এই সন্দেহই কাল হইল ; কাপালিকের কথায়, ব্রাহ্মণবেশী পদ্মাবতীর পরামর্শে, নবকুমারের বিশ্বাস হইল যে বাস্তবিক কপালকুণ্ডলা বুঝি অন্য কাহাকেও ভালবাসে। সুতরাং তাহার শাস্তি হইবে শ্মশানে তাহাকে বলি দেওয়া। সেই দিন নির্জন রাত্রে কপালকুণ্ডলা যখন বাহির হইলেন, তখন নবকুমার ও কাপালিক তাঁহাকে শ্মশানে লইয়া চলিলেন। ইহাতে কপালকুণ্ডলার মধ্যে কোনও বিকার বা পরিবর্ত্তনের চিহ্ন দেখা গেল না। কাপালিক পূজা শেষ করিয়া নবকুমারকে বলিলেন, কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইয়া আন। স্নান করাইতে গিয়া নবকুমার প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, কপালকুণ্ডলার কোনই দোষ নাই—তাঁহার সন্দেহ নিতান্তই অমূলক ইহার পর কপালকুণ্ডলা আর ঘরে ফিরিতে চাহিলেন না সেই সময় যেখানে দাঁড়াইয়া তাঁহারা কথা কহিতেছিলেন, নদীর এক প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া সেখান হইতে কপালকুণ্ডলাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। নবকুমার তাঁহাকে উঠাইবার জন্য জলে ঝাঁপ দিলেন, কিন্তু পারিলেননা, নিজেও আর উঠিলেন না।

কপালকুণ্ডলার কি হইল ? বঙ্কিমচন্দ্রও এই প্রশ্ন করিয়া উপন্যাস শেষ করিয়াছেন। "সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল ?"

দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলা পড়িয়া লোকে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় পাইল, তখন হইতে ক্রমে ক্রমে বহু উপন্যাস লিখিয়া তিনি বাঙ্গালীর চিত্ত জয় করিলেন, তাই লোকে তাঁহাকে 'সাহিত্যসম্রাট' এই নাম দিয়াছে। কিন্তু যে উপন্যাসখানির জন্য তাঁহার কথা আমরা আজও বিশেষ করিয়া স্মরণ করি, তাহার নাম 'আনন্দমঠ'। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশের লোকে যখন পেট ভরিয়া খাইতে পাইল না, ক্ষুধার জ্বালায় প্রথমে ভিক্ষা, পরে উপবাস, পরে ঘরবাড়ী জোতজমা জিনিসপত্র বেচিয়াও রেহাই পাইল না, গাছের পাতা, ঘাস, আগাছা খাইতে লাগিল, না খাইয়া রোগে ভুগিয়া মরিতে

লাগিল, তখনকার কথা লইয়া তিনি এই উপন্যাস রচনা করেন। দেশের এই দুর্দ্দশার সময় একদল লোক দেশমাতাকে রক্ষা করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল, যেমন করিয়াই হউক তাহারা দেশকে রক্ষা করিবে, তাহারা ইহা স্থির করিল। তাহাদের অধিনায়ক ছিলেন স্বামী সত্যানন্দ। স্বামী সত্যানন্দ একা নহেন, মায়ের পূজায় তাঁহার সহায় অনেক জুটিল সকলেই মায়ের 'সন্তান'। কী সাহস সেই সত্যানন্দের কী দুর্জ্জয় সাধনা, কী অটল ভক্তি! সন্তানদের মাতাপিতা, স্ত্রী-পুত্র, ভাই ভগ্নী থাকিয়াও নাই— যতদিন না দেশের সুসময় আসে ততদিন তাহারা ঘরের প্রতি চাহিয়া দেখিবে না, এই ছিল তাহাদের সঙ্কল্প। চারিদিকে নিরানন্দ, কিন্তু দেশের মধ্যে আনন্দমঠ জাগিয়া আছে, দেশের মধ্যে শক্তি ও সাহস ছড়াইয়া দিতেছে। সন্তানের শক্তি, শিক্ষা ও সাহসের সম্মুখে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য? তখনকার আমলে মুসলমান ফৌজদার তাল সামলাইতে পারিলেন না, ওয়ারেন হেষ্টিংসের আদেশে বিদ্রোহীদের দমন করিবার জন্য দেশী সিপাহী ও গোরা সৈন্য পাঠান হইল, তাহারাও হার মানিল, সকলের মনে হইল এবার সন্তানদের অধিকারে আসিবে, কিন্তু মহাপুরুষের আদেশে সন্তান-দল উঠিয়া গেল এ মহাপুরুষ যে সত্যানন্দেরও গুরু, তাঁহার আদেশ

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতের লেখা

না মানিয়া উপায় নাই। কেন অস্ত্র ত্যাগ করিব? শত্রু পরাজিত, দেশ স্বাধীন করিবার এইতো উপযুক্ত অবসর! এ প্রশ্নের উত্তরে মহাপুরুষ বলিলেন, এখনও সময় আসে নাই, আমাদের শিক্ষা হয় নাই আমাদের দেশে বহির্বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য এখন ইংরাজের সংসর্গ আমাদের কাম্য। কারণ তাহাতে আমাদের স্থায়ী উন্নতি হইবে।

বলিয়াছি তো, আনন্দমঠের ঘটনার সময় দেশময় হাহাকার, খাইতে না পাইয়া মানুষ আর মানুষ ছিল না, তাহার কাণ্ডজ্ঞান সব চলিয়া গিয়াছিল, তবু সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যেও সন্তান তাহার মাকে ভুলে নাই, মর্মঘাতী আর্ত্তনাদের মধ্যে সে গাহিয়া উঠিল—

বন্দে মাতরম্

চারিদিকে কৃশকায় অস্থিচর্মসার লোকজনের দিকে সে তাকাইয়া দেখিল না, দেশের পূর্ণ ঐশ্বর্য্যের ছবি তাঁহার মনে গাঁথা আছে, দুর্ভিক্ষ বা বন্যায় তাহা নষ্ট হইবার নহে তাই সে বন্দনা করিল—

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

তাহার কথায় তখন সংস্কৃত ও বাংলা মিশাইয়া গিয়াছে, সে বলিতেছে—

সপ্তকোটি-কণ্ঠ-কলকল-নিনাদ-করালে,
দ্বিসপ্তকোটি-ভুজৈর্ধৃত-খর করবালে
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদল বারিণীং মাতরম্।

মা তখন আর শুধু দেশের মাটির মধ্যে, শোভা সৌন্দর্য্যের মধ্যে আবদ্ধ নাই, সন্তানের হৃদয়ে তাঁহার আসন, সন্তানের বাহুতে তাঁহার শক্তি, তাহার মনে তিনিই ভক্তি, সন্তান তাঁহাকে নিজের হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে পারে না—

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে॥

সকল দেবতার মধ্যে দেশমাতাই আছেন, দেবতাকে তুষ্ট করিলে যে ফল, মায়ের প্রসাদেও সেই ফলই পাওয়া যাইবে, তাই সন্তানের শেষ কথা:—

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদল-বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।
বন্দে মাতরম্॥

সন্তানের সাধনার ছবিতে, মাতৃবন্দনার অপূর্ব ঝঙ্কারে, 'বন্দেমাতরম্' এই ধ্বনিতে আনন্দমঠ বঙ্কিমচন্দ্রের অভিনব সৃষ্টি। যাহারা বঙ্কিমের অন্য কোনও উপন্যাস বা অন্য কোনও রচনার কথা শোনে নাই, তাহারাও আনন্দমঠের কথা শুনিয়াছে, 'বন্দেমাতরম্' যে বঙ্কিমেরই দেওয়া মন্ত্র সে কথা তাহারা জানে।

শুধু উপন্যাস লিখিয়াই যে বঙ্কিমচন্দ্র সকলের প্রশংসা পাইয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহাকে 'সাহিত্যসম্রাট' বলা হয়; তিনি সাহিত্যের অন্য বিষয়েও বিস্তর লিখিয়াছিলেন। কথায় কথায় যেমন লোককে হাসাইতে

পারিতেন, খুব গম্ভীর রচনায়ও তাঁহার তেমনই শক্তি ছিল। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ তিনি কমলাকান্তের নামে নানা বিষয়ে নানা কথা বলিয়া গিয়াছেন। 'টেকচাঁদ' উপন্যাসের মধ্যে বাবুর যে ছবি দিয়াছেন, বঙ্কিম তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন বাবু কাহাকে বলে তাহা বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন, "যাঁহারা বিনা উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিবেন, সঞ্চয়ের জন্য উপার্জ্জন করিবেন, উপার্জ্জনের জন্য বিদ্যাধ্যয়ন করিবেন, বিদ্যাধ্যয়নের জন্য প্রশ্ন চুরি করিবেন, তাঁহারাই বাবু।" যাহারা ইংরাজের স্তব করে, অনুকরণ করে তাহাদের লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "তুমি কলিকালে গৌরাঙ্গাবতার, তাহার সন্দেহ নাই। হ্যাট তোমার সেই গোপবেশের চূড়া, পেণ্টলুন সেই ধড়া, আর হুইপ সেই মোহন মুরলী—অতএব হে গোপী বল্লভ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। হে সর্বদ! আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশঃ দাও;—সর্ববাসনা সিদ্ধ কর। আমাকে বড় চাকরি দাও, রাজা কর, রায়-বাহাদুর কর, কৌন্সিলের মেম্বর কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। তখনকার 'বাবু'দের তিনি এইভাবে উপহাস করিতেন হিন্দুধর্ম্মের কথা তিনি অনেক আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইহাই জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, এবং কৃষ্ণের চরিত্র আদর্শ। কারণ কৃষ্ণ শুধু এক বিষয়ে বড় নহেন, সকল বিষয়ে তিনি বড়, যেমন জ্ঞানে তেমনই কর্ম্মে, যেমন ভক্তিতে তেমনই লোকহিতে, সকল বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র আদর্শ-স্থানীয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও ধর্ম্মের কথা আলোচনা করিতে গিয়া ইতিহাস বা চাষবাস বা বিজ্ঞানর কথা ভুলেন নাই। বাংলা দেশের ইতিহাস কি করিয়া লিখিতে হইবে, চাষাদের দুঃখদুর্দশার কারণ ও তাহার প্রতিকার কোথায়, সেসব কথা আলোচনা করিয়াছেন। আকাশে কত তারা আছে, ধূলা নষ্ট হয় কোন উপায়ে, মানুষ কি আকাশে উড়িতে পারে, চন্দ্রের মধ্যে পাহাড় আছে না সুধা আছে, এসব প্রশ্নও তাঁহার রচনার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। বিজ্ঞান-রহস্য, ধর্মতত্ত্ব, লোক চরিত্র কিছুই বাদ পড়ে নাই।

তাঁহার অনেক লেখা বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছিল, প্রথম কয় বৎসর তাঁহারই যত্নে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইত, তিনিই ছিলেন সম্পাদক। এই কাজে তাঁহার অনেক সময়, অনেক শক্তি লাগিত। কারণ তিনি সম্পূর্ণ নূতন ভাব লইয়া কাগজ বাহির করিতে চাহিয়াছিলেন। যাঁহারা সুশিক্ষিত অর্থাৎ ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত তাঁহারা বাঙ্গালা রচনা পড়িতে চাহিতেন না, তাঁহাদের পড়িবার উপযুক্ত প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে যাহাতে বাহির হয় সেজন্য তিনি চেষ্টা করিলেন। সুশিক্ষিত বাঙ্গালী এই মাসিকপত্র শুধু না পড়িয়া নিজেও সাহিত্য রচনায় মন দেন ইহা ছিল তাঁহার আর এক উদ্দেশ্য। এইভাবে এক দিকে তিনি লেখক, অন্যদিকে পাঠক দুই-ই তৈয়ারী করিতে চাহিয়াছিলেন। আর শিক্ষিতদের লক্ষ্য করিয়া কাগজ বাহির করিলেও তাঁহার সর্ব্বদাই ইচ্ছা ছিল যে, সাধারণের ইহাতে উপকার হয়, সাধারণে ইহা পড়িতে আরম্ভ করে, এবং যাহাদের বয়স অল্প তাহারা প্রাচীনের অভিজ্ঞতা হইতে কিছু কিছু শিখিতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সাহিত্যকে কতখানি বড় করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার সমস্ত রচনা না পড়িলে তাহা ঠিক বোঝা যায় না। পদ্যসাহিত্য ও নাট্যসাহিত্য বাদ দিলে যাহা কিছু বাকি থাকে তাহার সমস্তই তাঁহার গ্রন্থাদির মধ্যে পাওয়া যাইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে আমরা এক সম্পূর্ণ নূতন যুগের পরিচয় পাই।

অষ্ট্রেলিয়া

৩৪২৭ পৃষ্ঠার পর

পৃথিবীর যাবতীয় দ্বীপের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া বৃহৎ। এশিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্ব নিরক্ষরেখার দক্ষিণে এই দ্বীপ অবস্থিত এবং ইহার আকার অতি বৃহৎ দেখিয়া মহাদেশ বলা হয়। পৃথিবীর ইহা ক্ষুদ্রতম মহাদেশ এবং মকর-ক্রান্তির দ্বারা বিভক্ত। অষ্ট্রেলিয়ার আয়তন ৩০ লক্ষ বর্গমাইল এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ২৪০০ মাইল, উত্তর দক্ষিণ ২২০০ মাইল। এই মহাদেশের দক্ষিণে-দক্ষিণ মহাসাগর, পশ্চিমে ভারত মহাসাগর, পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগরের কিয়দংশ ও উত্তর ভারত মহাসাগর প্রভৃতি। অষ্ট্রেলিয়া আকারে আমাদের ভারতবর্ষের প্রায় দ্বিগুণ।

অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যদেশে মকর-ক্রান্তি থাকায় ঐ দেশে গ্রীষ্মকালে অতিশয় গরম অনুভূত হয়। সময়ে সময়ে এখানে গ্রীষ্মের প্রখরতা এইরূপ বৃদ্ধি পায় যে তখন লক্ষ লক্ষ জীব-জন্তু মারা যায়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়ায় যে অনাবৃষ্টি হইয়াছিল তাহার জন্য ঐ দেশে এত বেশী গরম পড়িয়াছিল যে অন্যান্য জীব-জন্তুর কথা ছাড়িয়া দিলেও কেবলমাত্র ভেড়া মারা যায় প্রায় এক লক্ষ।

আদিম অধিবাসী

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা অসভ্য। ইহারা দেখিতে অতিশয় কাল ও দীর্ঘাকার। তাহাদের গোঁফ, দাড়ি এমন কি চুলগুলিও খুব লম্বা ও বড় হইয়া থাকে। ইহারা "মারে জাতির" বংশধর এবং বর্শা, বুমেরাং, ওয়াডি, তোমাহক নামীয় রকমের অস্ত্র ব্যবহার করে। ওপোসাম, ক্যাঙ্গারু, খরগোস অথবা অন্যান্য জানোয়ার উহারা উহাদের 'মি-মি'তে শিকার করিয়া আনিয়া থাকে। ঐ 'মি-মি' বা কুঁড়ে ঘর বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা দিয়া অতি সাধারণ ভাবেই তৈয়ার করা হয়। উহাদের "লুব্রা" বা স্ত্রী দুইটী প্রস্তরে আঘাত করিয়া অগ্নি উৎপাদন করে এবং জঙ্গল হইতে মারিয়া আনা বন্য জন্তু উহাতে ঝল্‌সাইয়া সকলকে খাইতে দেয়। পুরুষেরা যুদ্ধের সময় অদ্ভুত ভাবে সজ্জিত হইয়া শত্রু মারিতে যায় এবং যখন যুদ্ধ বা শিকার করিতে হয় না তখন "করোবোরি" নৃত্য করিয়া কালক্ষেপ করে।

ইহারা শিকারে বিশেষ দক্ষ বলিয়া ইহাদের প্রায়ই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না। ইহাদের স্ত্রী-পুরুষে গাছের ছালের তৈয়ারী ডোঙ্গা চড়িয়া মৎস্য

ধরিতে যায় এবং জলের গতি দেখিয়া মৎস্যের অবস্থান বুঝিতে পারে। বুমেরাং অস্ত্র দিয়া ঐ সময়, দূর হইতে, উহারা মৎস্যকে বিঁধিয়া ফেলিতে সক্ষম হয়।

শত্রুকে নিজহস্তে মারিয়া তাহার মুণ্ড গলায় পরা একটী বিশেষ সম্মানের কাজ বলিয়া উহারা মনে করে। জামা-কাপড় পরিবার প্রথা ইহাদের মধ্যে নাই; কখন কখন বন্য পশুদের চর্ম্ম ইহারা পরিধান করে। ভূত ও প্রেতের ভয় ও বিশ্বাস অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে অতিশয় প্রবল এবং এইজন্য কেহ মারা গেল অথবা কোনরূপ বিপদে পড়িলে ভূত-প্রেতকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহারা নানারূপ চেষ্টা করিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে কোন আইন-কানুন অথবা ধর্ম্মের প্রভাব দৃষ্ট হয় না। বাটীর কর্ত্তার আদেশই আইন এবং পরিবারস্থ সকলেই তাহা পালন করিতে বাধ্য। ইহাদের দলভুক্ত কোন ব্যক্তি বৃদ্ধ, দুর্ব্বল কিংবা রুগ্ন হইলে ইহারা নির্দ্দয়ভাবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে কিঞ্চিৎমাত্রও দ্বিধা বোধ করে না। উহারা জন্তু-জানোয়ারের মাংস, জঙ্গলের ফল, মৎস্য, গিরগিটি, সর্প, ব্যাঙ, পোকা-মাকড়, পিপীলিকার শাবক ও ডিম্ব, বোলতা ও মৌমাছির বাসা বা চাক, পালক বিহীন পতঙ্গের মত বোলতার ছানা প্রভৃতি খাইতে ভালবাসে।
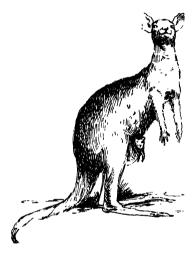
ক্যাঙ্গারু

জীব-জন্তু

অষ্ট্রেলিয়া যেন ঈশ্বরের প্রাকৃতিক পশুশালা এবং এইজন্যই বোধ হয় এদেশে এত রকমের জীব-জন্তু দেখা যায়। ভারতবর্ষ অথবা অন্যান্য দেশের মত অষ্ট্রেলিয়ায় হস্তী, গণ্ডার, গোরু, হরিণ, ভল্লুক, নেকড়েবাঘ, কাঠ-বিড়াল, সজারু প্রভৃতি পাওয়া না গেলেও, যে সমস্ত জীব-জন্তু আছে তাহা পৃথিবীর আর কোথাও বিশেষ পাওয়া যায় না। ঐ দেশের ক্যাঙ্গারু, ফ্লায়িং-ফক্স, ফ্যালেঞ্জার, ওপোষাম, উম্বাট, ফ্লায়িং-মাউস, টারপিস, কোয়ালা, এ্যাণ্ট-ইটার, প্লটিপাস প্রভৃতি দেখিলে সত্য সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। অষ্ট্রেলিয়ার বন্য বিড়াল, খরগোস, এঙ্গোরা, ছাগ, মেরিনো-মেষ, উষ্ট্র, বন্য-কুকুর, ডিঙ্গো প্রভৃতি প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

অষ্ট্রেলিয়ার বড় ক্যাঙ্গারু ব্যতীত আরও তিন জাতের ক্যাঙ্গারু—ওয়ালেবি, হেয়ার-ক্যাঙ্গারু ও র‍্যাট্-ক্যাঙ্গারু—উদরের সহিত সংযুক্ত একটি চর্ম্মের থলিতে শাবককে লুকাইয়া রাখিয়া বনে বনে ভ্রমণ করে।

খ্যাঁক্-শিয়ালের মত মুখ লইয়া ফ্লায়িং-ফক্স বা বাদুড়, বেলুনের 'প্যারাচুটের' মত লাঙ্গুলবিশিষ্ট এবং কাঠ-বিড়ালের মত দেখিতে ফ্যালেঞ্জারের বাসায় চতুর্দ্দিকে রাত্রিতে উড়িয়া বেড়ায়। বিড়ালের অপেক্ষা বৃহৎ এবং দেখিতে ইঁদুরের মত, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুই তিন জাতের ওপোষাম অষ্ট্রেলিয়ায় আছে। তাহারা তাহাদের খুব দীর্ঘ ও কুণ্ডলীকৃত লাঙ্গুলের সাহায্যে জ্যোৎস্না রাত্রিতে যখন বৃক্ষের শাখায় দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে তখন তাহা দেখিলে কেহই না হাসিয়া থাকিতে পারে না।

শাবক-বাহী থলিযুক্ত ও তিন ফিট্ দীর্ঘ উম্বাট রাত্রিতে যখন মৃত্তিকার ভিতরের সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইয়া ফ্লাটিং-মাউথ্ বা দ্রুতগামী বৃক্ষ-ইন্দুরের এবং দুই ফিট্ দীর্ঘ ও ধূসর বর্ণের ঘন লোমাবৃত কোয়ালার অনুসরণ করে তখন মনে কত কথাই না উদয় হয়। আবার যখন বৃহৎ ইন্দুরের আকৃতির মধুভুক্ টারপিস্

প্রায় কাঠ-বিড়ালের মত ও শ্বেতবর্ণের ডোরাযুক্ত এ্যাণ্ট-ইটার বা পিপীলিকাভুকের সহিত খাদ্যান্বেষণে বাহির হয় তখন অষ্ট্রেলিয়ার নিজস্ব চতুষ্পদ ও ডিম্ব প্রসবকারী জন্তু প্লটিপাস এবং একিড্‌নার কথা যেন বিস্মৃত হইতে হয়।

ও-দেশের এঙ্গোরা ছাগলের রেশমের মত কেশ এবং মেরিনো মেষের লোম বিক্রয় করিয়া ব্যবসায়ীরা প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। একবার মেলবোর্ণ কৃষি প্রদর্শনীতে একটী মেরিনো মেষ ১১৫০ গিনিতে বিক্রয় হয়।

মধ্যে মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ায় বন্য খরগোসের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে বলিয়া ক্ষেত্রের শস্য এবং প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া যায়। ঐগুলি বিদেশে চালান দিয়া ঐ দেশের লোকেরা প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে।

অষ্ট্রেলিয়ায় প্রায় ১৪০ জাতের সরীসৃপ আছে। ঐ দেশের ইলাপাইডি বা কৃষ্ণসর্প অতিশয় প্রসিদ্ধ; ইহারা প্রায় ৫ হইতে ৮ ফিট্ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার নিজস্ব ২০ হইতে ৩৮ ফিট্ দীর্ঘ এবং ভীষণ কোপন স্বভাবযুক্ত ও নিষ্ঠুর বৃহৎ ড্রাগন এবং সাধারণ গিরগিটির মত দীর্ঘ ও নিরীহ স্বভাবপ্রিয় তিন জাতের ক্ষুদ্র ড্রাগন—ফ্রিঞ্জড্, তিজ্ঞ ও আমিয়িডা—বিশ্বের চক্ষু বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই ড্রাগনগুলি অষ্ট্রেলিয়া ব্যতীত
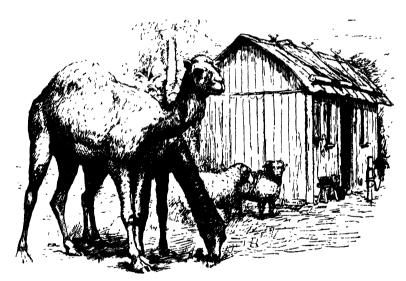
অষ্ট্রেলিয়ার উট

লতাপাতার যথেষ্ট অনিষ্ট হয়। উহাদের নিধনের জন্য একবার একটা স্বতন্ত্র আইন করিয়া কেবল মাত্র নিউসাউথ ওয়েল্‌সেই দুই হাজার ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইহার ফলে ১৮৯১ সালে মেলবোর্ণ হইতে ৫৮,০০,০০০ খরগোসের চর্ম্ম রপ্তানী হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার সমুদ্রে ডিউগং, সিন্ধু-ঘোটক, সীল, হোয়েল বা তিমি, কড্ মৎস্য, কুম্ভীর, হাঙ্গর, কচ্ছপ পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে পাওয়া যায় না। এ-দেশের বিষাক্ত টিক্‌টিকি এন্‌জোনা হেলোডারম্, কুৎসিত ও কদর্য্য শরীরযুক্ত মলোক, ষ্টাম্প-টেল্‌ড লিজার্ড বা বেঁড়ে টিক্‌টিকি, স্লিপি লিজার্ড বা গিরগিটি বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

সমুদ্রের মৎস্য স্কেলিটন্ শ্রিম্প বা অস্থিসার চিংড়ী, কোপায়িনা, বুলহেড্, চিক্‌লিড্, ম্যাকরেল প্রভৃতি

প্রসিদ্ধ। স্কেলিটন ব্রিম্পের বক্সিন্ লড়াই বা মুষ্টিযুদ্ধ, ডিম্ব রক্ষার জন্য চিরশত্রু কাঁকড়ার সহিত বুল্হেডের যুদ্ধ এবং চিক্লিড্ মৎস্যের সন্তান-সন্ততি পালন সত্য সত্যই দেখিবার ও শিখিবার মত বস্তু!

পক্ষী

অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষীসমূহ দেখিলে মনে হয় যেন প্রকৃতি রাণী উহাদের গাত্রে রং ফলাইতে গিয়া রংয়ের বাক্সের সমস্ত রং নিঃশেষ করিয়াছেন। তাহার হস্তের কার্য্য যে কিরূপ মূল্যবান্ তাহা ইহাদের গাত্রে দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

এই দেশের পক্ষীগুলি নানা বর্ণ ও বিভিন্ন আকারের হইয়া থাকে। তাহারা দেখিতে অতিশয় সুশ্রী এবং পালকগুলি নানাবিধ কারুকার্য্য বিশিষ্ট। অষ্ট্রেলিয়ায় টিয়া, কাকাতুয়া, রিজেন্ট-বার্ড বা সোনালী রাজপক্ষী, রাইফেল-বার্ড বা পিঙ্গল বর্ণের মখ্মল্ পক্ষী, লায়ার-বার্ড বা বাজনা পক্ষী, মিলিফেগাইডি বা মধুভুক্, ট্রিকোগ্লসিডি বা ঝোপের শুক, মিগা-পোডাইডি বা বন্য টাকি, এটিকিডি বা ক্ষুদ্র ঝোপবাসী, পোডারগি বা বিশালবদনা, পিপিং ক্রো বা সুরের পক্ষী, মাগ্পাই বা হরবোলা, সেটিন-বার্ড বা কুঞ্জের চড়াই, লাফিং জ্যাকাস্ হা হাস্যকারী পক্ষী, ঈগল, এমু, ক্যাসোয়ারী প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই দেশে যে সকল পক্ষী আছে তাহাদের অধিকাংশই পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। কেবল

অষ্ট্রেলিয়ার টিয়া পাখী

মাত্র অষ্ট্রেলিয়াতেই ৬৫০ জাতের পক্ষী আছে, কিন্তু সমগ্র ইউরোপে ৫০০ জাতের অধিক দৃষ্ট হয় না। ভারতবর্ষে প্রায় ১৬১৭ জাতের পক্ষী আছে; উহাদের মধ্যে প্রায় ১৩৩৬ জাত ঋতু-পরিবর্ত্তনের সহিত নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়।

মণি-রত্ন ও খনিজ-ধাতু

অষ্ট্রেলিয়ায় প্রায় সমস্ত রকমের খনিজ ধাতু, তৈল বহুমূল্য রত্ন ও মণি-মাণিক্য পাওয়া যায়। এইজন্য বর্ত্তমানে সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইয়াছে। ঐ দেশের খনি হইতে বহুমূল্য পাথর —হীরা, পান্না, নীলা, চুণি, স্ফটিক, ওপেল, পোখরাজ এবং মূল্যবান্ ধাতু—স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, সীসা, বিস্মাথ্, টিন, এণ্টিমনি, কয়লা প্রভৃতি প্রতি দিন প্রচুর পরিমাণে বাহির করা হইতেছে। এমন কি, দুষ্প্রাপ্য ধাতু প্লাটিনাম ও ইরিডিয়ম বাদ যায় নাই। সমুদ্রে প্রবাল ও মুক্তা প্রচুর জন্মিয়া থাকে। ইংরাজী ১৮৮৪ সালে ১৬০০ ব্যক্তি ২৭০ খানি নৌকা লইয়া কেবল মাত্র থার্স-ডে দ্বীপের পার্শ্বস্থিত সমুদ্র হইতে প্রায় ১৪,১০,০০০৲ টাকার মুক্তা উত্তোলন করিয়াছিল।

অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত ভিক্টোরিয়া, কুইন্সল্যাণ্ড ও নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের খনিসমূহ যেন অফুরন্ত ভাণ্ডার। একমাত্র নিউ সাউথ ওয়েল্‌সেই ১৮৮৫ সাল পর্য্যন্ত ১৬,০০০ খানি হীরা পাওয়া গিয়াছিল এবং তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় হীরাটির ওজন প্রায় ১১ রতি হয়। ইং ১৮৫১ হইতে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত ঐ হইতে ৬৭৪০০০৮৪১০৲ টাকার সোনা উত্তোলন করা হয়। বিশ্ববিখ্যাত ভূ-তত্ত্ববিদ্ স্যার্ রোডারিক মারচিসন্ অষ্ট্রেলিয়ার প্রস্তর পরীক্ষা করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন যে কালে এ-দেশ সোনার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইয়া উঠিবে। তাঁহার বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া পরে সকলে জানিতে পারিয়াছে। নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের খনিগুলি আবিষ্কার হইবার কিছু দিন পরেই অর্থাৎ ইং ১৮৮৫ সালের মার্চ্চ হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ভিক্টোরিয়ার খনিগুলি একে একে আবিষ্কৃত হইতে থাকে। ভিক্টোরিয়ার স্বর্ণ-তোরণ ভিক্টোরিয়াবাসীর অতুল স্বর্ণ-সম্পদের অমর-কীর্ত্তি। ঐ-তোরণে প্রায় সাড়ে একুশ কোটী টাকারও অধিক মূল্যের স্বর্ণ আছে।

গাছ-পালা

উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্‌গণ অষ্ট্রেলিয়ার নানারকমের গাছ-পালা সংগ্রহ করিয়া ঠিক করিয়াছেন যে ঐ দেশে দশ হাজার রকমের গাছ আছে।

সমুদ্র পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশসমূহে অনেক গাছ-পালা থাকায় এ-দেশের প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয়। অষ্ট্রেলিয়ার প্রায় সকল স্থানেই ঝোপ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারা গাছে পূর্ণ। ঐ সমস্ত গাছের ফুল খুব রঙ্গীন ও সুগন্ধযুক্ত। "মেললিউকা" প্রায় ৫০ জাতের "বাক্সিয়া" এবং "টেলোপিয়া স্পোসিওসিমা" গাছ ও-দেশে অধিক দৃষ্ট হয়। এই টেলোপিয়া স্পেসিওসিমা গাছের ফুলকে অষ্ট্রেলিয়ার 'জাতীয় পুষ্প' বলা হয়।

ইউক্যালিপ্‌টাস্ বৃক্ষ অষ্ট্রেলিয়ার একটা বিশেষ আয়ের সামগ্রী। ঐ দেশের প্রায় সকল স্থানেই এই বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। 'ডানডেনঙ্গ' পর্ব্বতের এই বৃক্ষগুলি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪২০ হইতে ৪৮০ ফিট্ এবং প্রস্থে প্রায় ১২ হইতে ২০ ফিট্ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইউক্যালিপ্‌টাস্ বৃক্ষ হইতে 'ইউক্যালিপ্‌টাস্ অয়েল' বা তৈল, আঠা ও গঁদ বাহির করা হয় এবং ইহার কাষ্ঠ খুব শক্ত হওয়ায় নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্ব সমভূমিতে ও পশ্চিম উপকূলের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে অতিরিক্ত লতা ও ঘাস জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় গম এবং উত্তরাংশে ভূট্টা ইক্ষু, ধান্য, তূলা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ঐ দেশের নদী তীরস্থ স্থানগুলিতে প্রায় ২ হইতে ১০ ফিট্ উচ্চ 'জাম্বোরিয়া' বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। প্রায় ৩০০ জাতের বাবলা বৃক্ষ এখানে দৃষ্ট হয়। অষ্ট্রেলিয়ায় হিভিয়া, ঝাউ, ডুমুর, রবার ও তাল জাতীয় বৃক্ষ অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। হিভিয়া বৃক্ষের আঠা হইতে রবার প্রস্তুত হয়।

বর্ত্তমান অষ্ট্রেলিয়া

অষ্ট্রেলিয়া পূর্ব্বে একটি জংলি দেশ ছিল বলিয়া ইহার অধিবাসীরাও অসভ্য ও বন্য জাতি ছিল। উহারা কোল, ভিল, সাঁওতালদিগের মত ঝলসান মাংস খাইত এবং বনে-জঙ্গলে বাস করিত। ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ হইতে সুসভ্য জাতি গিয়া ঐ দেশে

বাস করিতে আরম্ভ করায় এখন উহার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সুন্দর ও সুদৃশ্য ঘর-বাড়ী তৈয়ার করা হইয়াছে। পথ-ঘাট, রেল, ষ্টীমার প্রভৃতি করিয়া অধিবাসীরা অষ্ট্রেলিয়াকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতই সভ্যদেশ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের ব্যবস্থা, ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শিখিবার জন্য ভাল ভাল স্কুল, কলেজ এবং চিকিৎসার জন্য ডাক্তারখানা, হাঁসপাতাল প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ কৃষি-তত্ত্ববিদ্ মিষ্টার এইচ, ডবল্, পট্স সর্ব্বপ্রথম নিউ সাউথ ওয়েল্‌সে "হকস্‌বেরী এগ্রিকালচার কলেজ" এবং তাহার পর নরফোকে "অষ্ট্রেলিয়ান ফারমস্ ট্রেনিং কলেজ" বলিয়া দুইটী কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় দুইটীর কৃষি শিক্ষার ফলে অষ্ট্রেলিয়া এখন নন্দনকাননে পরিণত হইয়াছে। এখন খেলা-ধূলায়, শিক্ষা-দীক্ষায়, শিল্পে-বাণিজ্যে এ-দেশ পৃথিবীর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার "ক্রিকেট টিম" এবং তাহার "ব্যাটস্-ম্যান" মিঃ ব্রাড্‌ম্যানের নাম কেনা জানে? মিঃ ব্রাড্‌ম্যান পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন।

ঐ দেশের লিন্‌ফোড হল এবং তাহার সংলগ্ন বাগান দেখিলে মনে হয় যেন কুবেরের ভাণ্ডারের সমস্ত ধন-দৌলত সেখানে ব্যয় করা হইয়াছে। সেই সুপ্রসিদ্ধ অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে সুন্দর বাগান, কৃত্রিম হ্রদ, পরিষ্কার পথ ও মখ্‌মলের মত সবুজ ঘাসের ক্ষেত্রে নানাবর্ণের নানারূপ ফল-ফুলেরবৃক্ষ দিয়া কিরূপ সুন্দরভাবে সজ্জিত; দেখিলে সত্য সত্যই মনে হয় যেন উহা নন্দন-কানন।

অষ্ট্রেলিয়ায় যে প্রচুর স্বর্ণ পাওয়া যায় সে-কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঐ দেশের স্বর্ণ দিয়া "ম্যাক্ রবার্টসন্ কাপ্" নামক একটী ৯৭৫০৲ টাকা মূল্যের কারুকার্য্য খচিত কাপ, ইংলণ্ডের সাফোক্ প্রদেশের মিণ্ডেন হল্ বিমান-ঘাঁটি হইতে অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত ভিক্টোরিয়া প্রদেশের মেলবোর্ণ সহর পর্য্যন্ত প্রায় ১২,০০০ মাইল দূরস্থ "আন্তর্জাতিক উড়ো জাহাজ দৌড়" প্রতিযোগিতায় জয়ী ইংরাজ পুরুষদ্বয় মিঃ স্কট ও মিঃ ক্যাম্‌বেল ব্লাককে উপহার দেওয়া হয়। ঐ কাপটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২২" "ইঞ্চি এবং "মেলবোর্ণ সেণ্টিনারি সেলিব্রেসান্‌স" বা মেলবোর্ণের শত বার্ষিক উৎসবের স্মরণের জন্য দেওয়া হয়। স্কট ও ব্লাকের ইংলণ্ড হইতে মেলবোর্ণ পৌঁছাইতে ৬৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৯ সেকেণ্ড সময় লাগিয়াছিল।
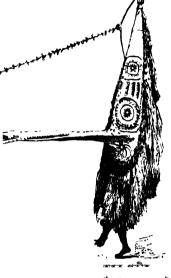
অষ্ট্রেলিয়ানরা নিজেদের দেশের জীব-জন্তুকে এরূপ ভালবাসে যে ঐ দেশের ডাক-টিকিটে এবং ফুটবল বা ক্রিকেট খেলার 'ইউনিফরমে' উহারা ক্যাঙ্গারুর আকৃতি দিয়া থাকে।

অষ্ট্রেলিয়ায় দেশস্থ গাভী না থাকিলেও আজকাল বিদেশ হইতে বহু গাভী আমদানী করা হইয়াছে। ঐ সকল গাভীর দুগ্ধ, চিজ্ ও বাটার বা মাখন খুব সুস্বাদু এবং প্রচুর উৎপন্ন হয়। ঐগুলি বিদেশে পাঠাইয়া অষ্ট্রেলিয়ানরা বহু অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়া বর্ত্তমানে একটি সভ্য উন্নত মহাদেশ।

ক্রীড়া-জগৎ

ক্রীড়া জগৎ

সাঁতারে—বিপদ

৩০৮৫ পৃষ্ঠার পর

সন্তরণ করিতে করিতে অপটু সন্তরণকারীর নাকে জল ঢুকিয়া যায়। ফলে শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবার মত সে অস্বস্তি অনুভব করে এবং ক্রমে দম আটকাইয়া ডুবিয়া যায়।

আবার সময় সময় সন্তরণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া সে অক্ষমতার জন্য ভয় পায়। সেই জন্য নির্ব্বিঘ্নে সহজভাবে সন্তরণ করিতে পারে না। তখন সে হাত তুলিয়া অপরের নিকট সাহায্যার্থে ছট্‌ফট্‌ ও চীৎকার করিতে থাকে। তাহার ফলে, সে অতিরিক্ত জল খাইয়া ডুবিয়া যায়। তাহার পর পুনরায় জলের উপর ভাসিয়া উঠে; কিন্তু আকস্মিক আতঙ্কের নিমিত্ত সাময়িক বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া সে সাহায্যের জন্য পুনরায়, এইবার সম্ভবতঃ হাত তুলিয়াই শেষ ডুবা ডুবিয়া যায়।

আবার যাহারা সন্তরণে একবারে অনভিজ্ঞ, এরূপ নর-নারী বা বালক-বালিকাগণ, দৈবঘটনা বা অসাবধানতাবশতঃ গভীর জলে বা স্রোতের মুখে পড়িয়া মগ্ন হইয়া যায়। তাহাদেরও ডুবিয়া যাইবার হেতু প্রায়ই এইরূপ।

ভাসিয়া থাকিবার সামান্য জ্ঞানের অভাবেই সচরাচর এই সমস্ত অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্ব বর্ণিত সাঁতার জলে খাড়া সাঁতার এত সহজ যে, ঐরূপ প্রণালীতে অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্যও নিরাপদের সহিত ভাসিয়া থাকা সম্ভব হয়। সেই সময়ের মধ্যে কোন সন্তরণপটু ব্যক্তি আসিয়া সাহায্য করিতে পারে। যাহাদের মস্তিষ্ক দুর্ব্বল, সাধারণতঃ এই লোকদেরই ডুবিবার সংখ্যা বেশী দেখা যায় এবং উদ্ধার করিতে গেলেও তাহারাই উদ্ধারকারীকে জড়াইয়া ধরিয়া বিপদ ঘটায় বেশী। যাহাদের মস্তিষ্ক স্থির তাহারা উদ্ধার কর্ত্তাকে বিশেষ কোন বেগ বা কষ্ট দেয় না।

উদ্ধার

প্রত্যেক সন্তরণকারীর জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার কৌশল জানা একান্ত দরকার।

অপরকে উদ্ধার করিতে যাইবার পূর্ব্বে নিজে খুব সতর্ক হওয়া উচিত। সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া হঠাৎ উদ্ধার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সন্তরণ করিবার সময় নানাবিধ অসুবিধা বা অক্ষমতার জন্য প্রায়ই জলে ডুবিয়া যাইতে হয়। সুতরাং কাহাকেও উদ্ধার করিতে যাইবার পূর্ব্বেই অতিরিক্ত পোষাক পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলা উচিত। পোষাক খুলিবার সময় সর্ব্বাগ্রে জুতা, পরে গাত্রাবরণ মুক্ত করা উচিত। কারণ গাত্রাবরণ অপেক্ষা পাদুকা মুক্ত করাই বিশেষ প্রয়োজন। কেননা উহা অত্যন্ত ভারি হয়।

নিম্নলিখিত বিষয় গুলির প্রতি উদ্ধারকারীর বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক :—

১। মজ্জমান ব্যক্তির নিকট দ্রুত পৌছান,

২। অতি অল্প সময়ের মধ্যে জুতা, কোট প্রভৃতি বাহিরের অতিরিক্ত গাত্রাবরণ খুলিয়া ফেলা।

৩। মজ্জমান ব্যক্তির অজ্ঞাতে, পশ্চাৎ দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে ধরিয়া উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা ; কারণ পশ্চাৎ দিকে ধরাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ।

৪। মজ্জমান ব্যক্তি নিস্তব্ধ থাকুক বা সাময়িক মস্তিষ্ক বিকারের জন্য চঞ্চল হইয়াই থাকুক তাহার অবস্থানুযায়ী সত্বর ব্যবস্থা করিয়া উদ্ধার করা।

৫। মজ্জমান ব্যক্তিকে উদ্ধার করার পরও যদি না সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে কৃত্রিম উপায়ে তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার ব্যবস্থা করা।

৬। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার জন্য সাধারণতঃ যেরূপ প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

মজ্জমান ব্যক্তির আক্রমণ

ব্যক্তি সাধারণতঃ প্রাণনাশের ভয়ে অত্যধিক পরিমাণে ভীত হইয়া পড়ে। সেজন্য প্রায়ই সাময়িক ভাবে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়। ফলে, সে যে নিজেও ডুবিতেছে ও তাহার উদ্ধারকর্ত্তাকেও ধরিয়া ডুবাইবার চেষ্টা করিতেছে এই বোধ বা বিবেচনা শক্তি তখন তাহার মোটেই থাকে না।

সাধারণতঃ মজ্জমান ব্যক্তি প্রাণনাশের ভয়ে উদ্ধারকামীকে এমন অসুবিধায় ফেলিয়া কঠিন ভাবে জড়াইয়া ধরে যে, সে সহজে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি পরিচালনা করিবার সুযোগ হইতে একেবারে বঞ্চিত হয়।

এইরূপ কঠিন ভাবে জড়াইয়া ধরিলে, উদ্ধার-কামী ব্যক্তিকে যে-কোন উপায় অবলম্বন করিয়া নিজেকে মুক্ত হইতে হইবে এবং জলমগ্ন ব্যক্তির উদ্ধার সাধন করিতে হইবে।

এইরূপ আক্রমণ পরিহার করিবার একটী উত্তম উপায় হইতেছে যে—পা সম্মুখে তুলিয়া জোরে ধাক্কা মারিয়া মজ্জমান ব্যক্তিকে দূরে সরাইয়া দেওয়া, অথচ তাহার বুকে পা রাখিয়া বা তাহাকে কোন উপায়ে পিছন ফিরাইয়া নৌকার গুণ টানার মত খুব সহজেই উদ্ধার করিয়া তীরে আনা।

মজ্জমান ব্যক্তি উদ্ধারকামীর কব্জী ধরিয়া ফেলিলে :—

উদ্ধার করিবার সময় মজ্জমান ব্যক্তি যদি উদ্ধার-কর্ত্তার **দুই হাতের** কব্জীতে চাপিয়া ধরে, তাহা হইলে উদ্ধারকর্ত্তাকে উভয়েরই জোড়বদ্ধ **দুইটী** হাতেই কাঁধের উপরে তুলিতে হইবে। তাহার **পর,** জোরে দুইটী হাতই কোমর পর্যান্ত বাহির মুখে ঝাঁকা মারিলেই, হাত সহজেই মুক্ত হইয়া যাইবে।

মজ্জমান ব্যক্তি যদি **এক হাতের** কব্জী চাপিয়া ধরে, তাহা হইলে, তাহার বুকে পা রাখিয়া ধাক্কা দিতে হইবে এবং হাত উল্টা দিকে ঘুরাইয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া ফেলিতে হইবে।

জলমগ্ন ব্যক্তি উদ্ধারকামীর গলা জড়াইয়া ধরিলে :-

জলমগ্ন ব্যক্তি যদি তাহার উদ্ধারকামীর গলা জড়াইয়া ধরে, তাহা হইলে সে বাম হস্তের দ্বারা তাহার কোমর ধরিয়া নিজের কোলের দিকে টানিতে থাকিবে, দক্ষিণ হস্তের তেলো, জলমগ্ন ব্যক্তির বাম হস্তের ভিতর দিয়া আনিয়া তাহার থুৎনিতে ধাক্কা দিবে এবং অঙ্গুলি দিয়া তাহার নাকে চিমটী কাটিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে সে মুখ হাঁ করিয়া প্রচুর জল খাইতে আরম্ভ করিবে। তখন নিজেকে তাহার কবল হইতে মুক্ত করা সহজ হইবে।

উদ্ধারকামীর সমস্ত শরীর জড়াইয়া ধরিলে :—

মজ্জমান ব্যক্তি যদি উদ্ধারকামীর সমস্ত শরীর জড়াইয়া ধরে, তাহা হইলে সে পূর্ব্বের মত দক্ষিণ হস্তের তেলো দিয়া মজ্জমান ব্যক্তির থুৎনিতে ধাক্কা দিবে। বাম হস্ত মজ্জমান ব্যক্তির দক্ষিণ স্কন্ধের উপরে রাখিবে। তাহার পর দক্ষিণ হাঁটু দিয়া ও দক্ষিণ হস্ত দিয়া যথাশক্তি ধাক্কা দিতে থাকিবে এবং বাম হস্ত দিয়া তাহাকে নিজের কোলের দিকে খুব জোরের সহিত টানিতে থাকিবে।

এইরূপ করিলেই মজ্জমান ব্যক্তির বজ্রমুষ্টি শিথিল হইয়া যাইবে।

মজ্জমান ব্যক্তি অপেক্ষা উদ্ধারকামী

মজ্জমান ব্যক্তি যদি উদ্ধারকামী অপেক্ষা শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে কি উপায় বা কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে উদ্ধারকামীর, উদ্ধার করিতে যাইবার পূর্ব্বেই একটু ভাবিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া উচিত।

মজ্জমান ব্যক্তি অধিকতর বলবান হইলেও, সেই সময় সে অধিকক্ষণ তাহার শক্তি রক্ষা করিতে পারিবে না। সুতরাং; মজ্জমান ব্যক্তি উদ্ধারকামীকে ধরিয়া ফেলিলেও বিঘ্ন হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। তবে তাহার চঞ্চলতা একটু কমিয়া গেলে, ধরিতে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। অবশ্য এইরূপ ক্ষেত্রে উদ্ধারকামীর উদ্ধার করিবার কৌশল-বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস থাকা আবশ্যক।

জলমগ্ন ব্যক্তিকে টানিয়া তুলিবার প্রণালী :—

জলমগ্ন ব্যক্তিকে তীরে টানিয়া তুলিবার প্রণালী অনেক রকম আছে। তাহার মধ্যে 'চিৎ-সন্তরণ' প্রণালী সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'কাৎ-সন্তরণ' "বুকে ভর দিয়া সন্তরণ" এমন কি "ছামা টানার" মত সন্তরণ ও ব্যবহার করিতে পারা যায়। কিন্তু "চিৎ-সন্তরণই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কার্য্যকারী।"

উদ্ধার করিবার সময় কেবল পায়ের সাহায্যেই "চিৎ সন্তরণ" কৌশলে সন্তরণ করিতে হয়। প্রতি-যোগিতা সময়ের মত পায়ে করিয়া ধাক্কা দিলে', এখানে বিশেষ কোন ফল হইবে না।

জলমগ্ন ব্যক্তিকে টানিয়া আনিবার সময় সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে তাহার মাথা যেন জলের উপরে উঁচু হইয়া থাকে।

সংজ্ঞাহীন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার প্রণালী

মজ্জমান ব্যক্তি যদি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে হাতের তেলো চেপ্টা করিয়া তাহার মুখের পাশে কান ঢাকা দিয়া জোরে ধরিতে হয়। তাহার মুখ উপর দিকে করিয়া উদ্ধারকামীকে "চিৎ-সাঁতার" কাটিয়া তাহাকে লইয়া আসিতে হইবে।

আবার এক হাতে তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া আনাও কিছু অসম্ভব নয়। এই কৌশল অবলম্বন করিলে দুই পায়ে ও এক হাতে "কাৎ-সন্তরণ" কৌশলে সন্তরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা সন্তোষজনক কৌশল নয়। তবে, যেখানে একেবারে বিপদের সম্ভাবনা নাই, সেই খানে এই কৌশল ব্যবহার করা যাইতে পারে।

মজ্জমান চঞ্চল ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার প্রণালী

জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার কৌশল পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহাই উৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি ভয় পাইয়া বেশী ছুটাপুটি করিতে থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ব বর্ণিত প্রণালীগুলি অবলম্বন করিলে বিশেষ সুবিধা হইবে না। এরূপ স্থলে তাহার মাথা না ধরিয়া তাহার বাহু দুইটিকে কনুইয়ের উপরে দৃঢ় ভাবে ধরিয়া তাহাকে টানিয়া আনিতে হইবে। টানিয়া আনিবার সময়—তাহার বাহু যত দূর সম্ভব উঁচু করিয়া রাখিবে। বাহু যত উঁচু করিবে তাহার ফুসফুসের ভিতরে তত বেশী বায়ু প্রবেশ করিয়া তাহার দেহভার লঘু করিবে।

যদি দেখ, সে বড়ই ছুটাপুটি করিতেছে এবং ধরিয়া রাখা বড়ই কষ্টকর হইতেছে তাহা হইলে তাহার বাহু তুলিয়া ধরিবে এবং তাহার নীচ দিয়া তোমার বাহু প্রবেশ করাইয়া তাহার বুকের উপর তোমার হাতের তেলো রাখিবে।. হাতের তেলো এমন ভাবে ছড়াইয়া রাখিবে যেন, তোমার বৃদ্ধাঙ্গুলি দুইটি তাহার স্কন্ধে গিয়া ঠেকে। এই সময় যদি তাহার বাহুদ্বয় বেশ উচু করিয়া তাহার দেহ তোমার খুব নিকটে ঘেষাইয়া রাখিতে পার, তাহা হইলে সে ছুটাপুটি করিয়া বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। ইহাতে কিন্তু একটা বড় অসুবিধা আছে সেই ব্যক্তির দেহ নিকটে থাকাতে উদ্ধারকামীর সাঁতার দিবার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিবে ও তোমার মাথা অধিকাংশ সময় জলে ডুবিয়া থাকিবে।

কিন্তু যেখানে ছুটাপুটির কোন সম্ভাবনা নাই সেখানে ব্যবস্থা এইরূপ অবলম্বন করাই সর্ব্বাপেক্ষা

ভাল। জলমগ্ন ব্যক্তিকে বলিতে হইবে সে যেন উদ্ধার-কামীর স্কন্ধে হাত দিয়া স্থির ভাবে উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকে। তাহার উপর উদ্ধারকামী বুকে ভর দিয়া সাঁতার কাটিয়া তাহাকে তীরে লইয়া আসিবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জলমগ্ন ব্যক্তি তাহার উদ্ধারকামীকে কোনরূপে ধরিতে পরিলেই বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। সেই জন্য তাহাকে পশ্চাৎ দিক হইতে ধরিয়া উদ্ধার করিতে হয়।

কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা—

কোন ব্যক্তি জলে ডুবিয়া যাইলে পূর্ব্ব বর্ণিত সুবিধামত যে কোন উপায়ে প্রথমে তাহাকে তীরে লইয়া আসিতে হইবে। তাহার পর তাহাকে উপুড় করিয়া শোয়াইতে হইবে। শোয়াইবার সময় মুখ ডানদিকে ঘুরাইয়া দিবে। বুকের সঙ্কীর্ণতা নিবারণের জন্য হাত মাথার উপরদিকে সহজ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিবে। কাপড়, জামা, ইত্যাদি আল্গা করিয়া দিবে।

বালিস, তোসক ইত্যাদি কোন জিনিষ তাহার নীচে দিবে না। জিহ্বা ভিতর দিকে ঢুকিয়া গেলেও তাহা বাহির করিবার জন্য ব্যস্ত হইবার কোন কারণ নাই।

হাঁটু পাতিয়া তাহার পাশে বসিতে হইবে। তোমার হাত দুইটি তাহার কোমরের ঠিক উপরে রাখিতে হইবে। তাহার পর একটু সম্মুখে ঝুকিয়া হাত নীচের দিকে সোজা করিয়া নিজের সমস্ত ভার তাহার উপরে দিতে হইবে। ইহাতে জমির উপর তাহার পেটে চাপ পড়িবে। তাহার জন্য বক্ষস্থল ও উদরের মধ্যবর্ত্তী (diaphragm) উপর দিকে উঠিয়া ফুসফুস হইতে সমস্ত বায়ু বাহির হইয়া যাইবে। এইবার তাহাকে উপর চাপ না দিয়া পিছাইয়া আসিয়া বসিতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বদা তাহার গায়ে হাত লাগিয়াই থাকিবে। এই রূপ করিলে বক্ষস্থল ও উদরের মধ্যবর্ত্তী পর্দ্দা নীচে নামিয়া যাইবে এবং ফুস্ফুসের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিবে। প্রতি মিনিটে ১২ হইতে ১৫ বার চাপ দেওয়া উচিত। এইরূপ ধীরভাবে ও শীঘ্র বারবার কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত না তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি স্বাভাবিক হয়, বা ডাক্তারের উপদেশ না পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই ভাবে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার ব্যবস্থা চালাইতে হইবে।

বিছানায় শোয়াইবার পূর্ব্বে রক্ত চলাচলের জন্য তাহার শরীরের নীচে হইতে উপর দিকে (হৃদ-যন্ত্রের দিকে) রিক্ত হস্তে মর্দ্দন করিয়া তাহার শরীর গরম করিয়া দেওয়া আবশ্যক। এই ভাবে সেবা ও শুশ্রূষার দ্বারা অনেক সময়েই জলে ডোবা ব্যক্তিদের প্রাণ রক্ষা হইয়া থাকে। আবার অনেক সময়েই হয় না। জলমগ্ন ব্যক্তিদিগকে বাঁচাইতে হইলে নিজ নিজ শক্তি ও সাধ্যানুযায়ী যেমন সাহায্য করা দরকার, তেমনি অবিলম্বে চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

এ সমুদয় বিষয়ে কেবল মাত্র উপদেশ দিলেই কোন কাজ হয় না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার একান্ত আবশ্যক। তারপর এ সমুদয় বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট হইতে এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ না করিলে চলিতে পারে না।

সন্তরণোপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদ

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে সন্তরণের প্রতি লোকের আগ্রহ অতি অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার ফলে কি ভাবে কেমন করিয়া সাঁতারের সময় সন্তরণকারী নিরাপদে সন্তরণ করিতে পারে, তদুপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদ ও প্রস্তুত হইয়াছে। এখানে তাহার কয়েকটি নাম করিতেছি,—(১) সন্তরণকারী টুপি, (২) পেটি (৩) জীবনরক্ষক তোষক (৪) বায়ুপূর্ণ বালিস, (৫) সাঁতারের পোষাক, (৬) ভাসমান সাঁতারী পোষাক, (৭) ভাসিবার জামা (৮) জলে ভাসিবার যন্ত্রাদি, (৯) জলে ভাসা চেয়ার (১০) জীবন রক্ষী বয়া (১১) জলের উপর বসিবার উপায় (১২) মোটর যন্ত্র সাহায্যে জলক্রীড়া (১৩) পৃষ্ঠ বিলম্বিত সন্তরণ যন্ত্র (১৪) ভাসমান শিকারি। (১৫) জলের উপর শিকার (১৬) সন্তরণোপযোগী 'বয়া' প্রভৃতি।

রোম

হোরাশি এবং কিউরাশির যুদ্ধ

রোমিউলাসের মৃত্যুর পর কে রোমের রাজা হইবে তাহা লইয়া একটু গোল হইয়াছিল। স্যাবাইনরা চাহিতেছিল তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে রাজা করিতে আর রোমানরা চাহিতেছিল তাহাদের একজনকে সিংহাসনে বসাইতে। শেষটায় সিনেটের (Senate) নির্দ্ধারণে **নিউমা পম্পিলিয়াস্** (Numa Pompilius) নামে একজন স্যাবাইন্‌কে সিংহাসনে বসানো হইল।

নিউমা বড় ভাল রাজা ছিলেন—যেমন ছিলেন ধাম্মিক তেমন ছিলেন তিনি শান্তিপ্রিয়। তেতাল্লিশ বৎসর কাল তিনি রাজত্ব করেন, এই সময়ের মধ্যে তিনি সুন্দর সুন্দর বিধি ব্যবস্থা, কৃষিকার্য্যের নানা উন্নতি এবং নানারূপ ললিতকলার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। গরীব প্রজাদের উপর তাঁহার ছিল অত্যন্ত ভালবাসা। রোমিউলাস্ যে সকল ভূ-খণ্ড জয় করিয়াছিলেন সে জমি সকল তিনি গরীব প্রজাদের মধ্যে বিলি করিয়া দিয়াছিলেন। রোমান্ ও স্যাবাইন্‌দের মধ্যে তিনি কোনরূপ বিভিন্নতা রাখেন নাই। সেকালে যে সকল মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে বেশ শিল্পনৈপুণ্য দেখা যায়। আশী বৎসর বয়সে নিউমার মৃত্যু হয়। সে সময়ে রোমানদের মধ্যে রীতি ছিল শবদেহ দাহ করা কিন্তু নিউমা তাঁহার দেহের সমাধি দিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। নিউমার পরে যিনি রাজা হইলেন তাঁহার নাম **টিউলাস্ হস্‌টিলিয়াস্** (Tulus Hostilius)। ইনি ছিলেন রণপ্রিয় নৃপতি। তাঁহার রাজত্বকালে রোমের সঙ্গে এল্‌বান্‌দের যুদ্ধ হয়। এল্‌বানরা রোমের কাছেই বাস করিতেন।

এই যুদ্ধে যখন রোমের ও এলবানের সৈন্যেরা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে এমন সময় এল্‌বান্‌দের সেনাপতি একটি প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন দুই পক্ষের তিনজন তিনজন করিয়া বাছাই যোদ্ধারা পরস্পর যুদ্ধ করিলেই যুদ্ধ-বিজয়ের মীমাংসা হইয়া যাইবে।

যে দলের তিনজন জিতিবে সেদলই বিজয়ী হইবে। দৈবক্রমে দুই দলেই তিনজন তিনজন করিয়া ভাই ছিল। রোমান্‌দের দলে ছিল যে তিন ভাই তাহাদিগকে বলিত হোরাসী (Horatii) আর পিছনে রোমান্‌রা এবং এল্‌বান্‌ সৈনিকেরা অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রথমটা মনে হইল যে কিউরিয়াসীরাই যুদ্ধে জিতিবে, কেননা হোরাশীদের দুই ভাই নিহত হইয়াছিল একজন মাত্র

রোমের প্রাচীন যুগের বাণিজ্য-তরণী

এল্‌বান্‌দের তিন ভাইকে বলিত কিউরিয়াসী (Curiatii)। এইরূপ স্থির হওয়ার পরে

সেকালের সাবানের কারখানা

হোরাসী ও কিউরিয়াসীরা মিলিত হইল। একটা খোলা ময়দানে দুই দলের যুদ্ধ চলিল। ইহাদের বাঁচিয়াছিল আর কিউরিয়াসীদের তিন ভাই আহত হইলেও কাহারও মৃত্যু হয় নাই। এদিকে শোন, হোরাসীদের যে ভাই বাঁচিয়াছিল সে মনে করিল তাহার অন্য দুই ভাইয়ের মত কখনও যুদ্ধে সে নিহত হইবে না যেমন করিয়াই হউক তাহার যুদ্ধে জয়ী হইতে হইবে। সে এক কৌশল করিল—হঠাৎ রণক্ষেত্র হইতে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল, রোমানেরা তাহাকে পালাইতে দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং লজ্জায় ও ঘৃণায় হৈ-চৈ করিতে লাগিল। যদি তাহারা হারিয়া যায় তাহা হইলে ভয়ানক বিপদের কথা—রোমানদের কিনা তাহা হইলে এল্‌বান্‌দের ক্রীতদাস হইতে হইবে। পলায়নের পর হোরাশীকে দৌড়াইতে দেখিয়া আহত কিউরিয়াসী তিন ভাইয়েরা তাহাকে ধরিবার জন্য পিছু পিছু ছুটিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা তিনজনেই আহত হওয়ায় অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই কিউরিয়াসী তিনজন হোরাশীর অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। হোরাশী ও তাহাই চাহিতেছিল কেননা তাহার দেহেও এমন শক্তি ছিল না যে তিন জনের সঙ্গে একা লড়িতে পারে—কিন্তু একজনের সঙ্গে যুঝিবার মত তাহার দেহে প্রচুর শক্তি ছিল। এইবার সে ভয়ানক সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল। একে একে সে তিনজনকেই মারিয়া ফেলিল। এলবানরা তাহাদের পরাজয়ের জন্য

হাতের অস্ত্রশস্ত্র সব ফেলিয়া দিল। তাহাদের স্বাধীনতা লোপ পাইল।

রোমানরা হোরেশিয়াসের বিজয়ে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল।—সকলে বিজয় উৎসব করিতে করিতে রাজধানী রোম নগরের দিকে চলিল। তাহারা যখন রোমে আসিয়া প্রবেশ করিল তখন দেখা গেল নগরবাসীরা মহা উৎসাহের সহিত বীর হোরাসীকে অভিনন্দিত করিতে আসিয়াছে। কেবল একজন সুন্দরী তরুণী কাঁদিতেছিল—এই নারী তাহার ভগিনী। হোরাশীর ভগিনী হোরাশীকে অতি নির্দ্দয় ভাবে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল কেন সে কিউরিয়াসীদের হত্যা করিয়াছে। ইহার কারণ ছিল এই যে, হোরাশীর ভগিনী কিউরিয়াসীদের এক ভাইকে ভালবাসিত তাহাকে হত্যা করার জন্যই তাহার ভগিনীর এইরূপ ক্রোধের কারণ।

তখনও হোরাশীর হাতে রক্তাক্ত তরোয়ালখানি ছিল। যুদ্ধের উন্মাদনায় তাহার চিত্ত তখন পর্য্যন্ত

সেকালের মুচির দোকান

শান্ত হয় নাই—ভগিনীর ভর্ৎসনায় তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল—সে যুদ্ধে জয়ী হইয়া আসিয়াছে, শত্রুরা নিহত—রোমবাসীরা সকলে তাহার এ জয়ে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, আর সে কিনা এমন দিনে নিহত ভ্রাতাদের জন্যও দুঃখ প্রকাশ করিল না আর শত্রুদের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে! এ অপমান তাহার প্রাণে বড়ই বাজিল। সে কোনরূপ চিন্তা ভাবনা না করিয়া পলক মধ্যে সেই রুধিরসিক্ত তরবারীখানি ভগিনীর বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল।

হোরেশিয়াসের এই নিদারুণ হত্যার জন্য তাহার উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল কিন্তু শেসটায় তাহার সাহস ও রোমের গৌরব রক্ষা করার জন্য তাহাকে ক্ষমা করা হয়।

দাম্ভিক নৃপতি টারকুইনিয়াস্

টিউলাস্ হোস্‌টিডিয়াসের পর রাজা হইলেন এ্যানকাস্ মার্শিয়াস্ (Ancus Martius)। ইনি রোমে অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ী-ঘর নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পরে টারকুইন দি এলডার রাজা হইলেন। ইঁহার পিতা একজন ধনী বণিক ছিলেন। টারকুইনের পরে রাজা হইলেন **সার্ভিয়াস্ টিউলাস্** (Servius Tullus)। ইনি প্রায় ৪৪ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। ইঁহার জামাতা টারকুইনিয়াস্ প্রিস্‌কাস (Tarquinius Priscus) তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজা হইলেন। এই টারকুইনিয়াস সম্বন্ধে অনেক গল্প-গুজব প্রচলিত আছে। ইনি কোরিন্থ (Corinth)-এর অধিবাসী ছিলেন। ধনাঢ্য বণিকরূপে সেখানে তাঁহার বেশ প্রসিদ্ধি ছিল। স্ত্রীর অনুরোধে তিনি রোমে বাস করিতে আসেন। গল্প আছে, যেদিন তিনি রোমে প্রবেশ করিলেন সে সময়ে একটা ঈগল পাখী আকাশ হইতে উড়িয়া আসিয়া তাঁহার মাথার টুপীটা লইয়া গিয়াছিল এবং কতদূর পর্য্যন্ত তাঁহার গাড়ীর সহিত উড়িয়া উড়িয়া—অবশেষে টুপীটা তাঁহার মাথায় পরাইয়া দিয়াছিল। সেদিন হইতে তাঁহার স্ত্রীর মনে হইয়াছিল যে, একদিন সে রোমের রাণী হইবে। টারকুইনিয়াস্ মৃত নৃপতির সন্তান-সন্ততিদের উপর অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিতে থাকেন এবং কৌশলক্রমে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া নিজের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করেন।

টারকুইনিয়াসের স্ত্রী রাজা সার্ভিয়াসের কন্যা এতদূর নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন যে, যখন জানিতে পারিলেন তাহার পিতাকে টারকুইনিয়াস্ হত্যা করিয়াছেন তখন তাহার আনন্দের অবধি রহিল না।

তিনি স্বামীকে অভিনন্দিত করিবার জন্য গাড়ী চড়িয়া যে রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন সেই রাজপথেই হতভাগ্য নৃপতির শবদেহ পড়িয়াছিল, শকট-চালক উহা দেখিতে পাইয়া গাড়ী ফিরাইবার উপক্রম করিলে দুষ্ট প্রকৃতির নারী টুলিয়া (Tullia) চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"চালাও, চালাও, এই পথেই গাড়ী চালাও।" গাড়ী চলিল—ছোট গলি—মৃতদেহের উপর দিয়া গাড়ী চলিয়া গেল, রক্তে চাকাগুলি রঞ্জিত হইল, টুলিয়া কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও মৃত পিতার জন্য শোক প্রকাশ করিল না। টুলিয়ার মনোবাঞ্ছা এইরূপে পূর্ণ হইয়াছিল।

টারকুইনিয়াসের রাজত্বের প্রথম দিকটা বেশ শান্তিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষটায় নানারূপ গোলযোগের সৃষ্টি হয়। স্তেবাইনরা আবার বিদ্রোহ করে। টারকুইনিয়াস্ তাহাদিগকে দমন করেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রশমিত হইলে পর তিনি নাগরিক সমৃদ্ধি বিধানের জন্য সুন্দর সুন্দর বাড়ীঘর নির্ম্মাণে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তবে টারকুইনিয়াস্ একেবারেই জনপ্রিয় ছিলেন না। রোমানেরা তাঁহাকে ভাল চোখে দেখিত না। তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রজাসাধারণকে নানা কার্য্যের ভিতর লিপ্ত রাখা—হয় যুদ্ধে কিংবা সাধারণের কাজে। কেহ যেন কোনওরূপেই এমন সুযোগ পায়না যাহাতে সিংহাসন লাভ করিবার দিকে মনোযোগ দিতে পারে।

একটি দোকান

একটী পুরাতন কাহিনী বলিতেছি। একদিন টারকুইনিয়াস্ নির্জ্জনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটি অপরিচিতা স্ত্রীলোক নয় খানি খুব বড় বড় পুঁথি বিক্রয় করিবার জন্য তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্ত্রীলোকটী রাজাকে বলিল যে এই পুঁথি নয়খানি তাহার নিজের রচিত, রাজাকে ঐ বই কয়খানি ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করিল। সে বইএর এমন একটা চড়া দাম হাঁকিল যে, টারকুইনিয়াস্ তাহা কিনিতে চাহিলেন না। এই স্ত্রীলোকটা কে, কোথা হইতে আসিয়াছে, এবং বই কয়খানির ভিতরই বা কি আছে তাহা কেহই জানিতনা। রাজা যখন কিনিতে চাহিলেন না তখন স্ত্রীলোকটী বাহিরে চলিয়া গেল এবং তিনখানি বই পোড়াইয়া ফেলিয়া বাকি ছয়খানি লইয়া পুনরায়

সার্বিয়াস টিউলাসের নির্ম্মিত প্রাচীর

রাজার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রাজাকে সেই ছয়খানি বই কিনিবার জন্য অনুরোধ করিল, দাম কিন্তু পূর্ব্বের নয়খানি বইএর জন্য যাহা চাহিয়াছিল তাহাই চাহিল। রাজা এইবারও বই কিনিতে অস্বীকার করায় সে চলিয়া গেল এবং শেষটায় তিন খানা বই লইয়া আবার রাজার কাছে আসিল, এইবার কিন্তু রাজা স্ত্রীলোকটি প্রথমবার যে চড়াদাম হাঁকিয়াছিল সেই দামেই বই তিনখানি কিনিয়া লইলেন। কথিত আছে, এ বই তিন খানি সিবিল্ (Sibyl) নাম্নী একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা মহিলার রচিত। অনেক কাল পর্য্যন্ত এই বই তিনখানি রোমে বিশেষ যত্নসহকারে রক্ষিত ছিল। যখন কোনও বিষয়ে কোনওরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইত তখনই এই বইএর ভিতরে তাহার মীমাংসার উপযুক্ত উত্তর মিলিত। ইহা যে নিছক কাহিনী সে তোমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছ।

টারকুইনিয়াস্‌কে লোকে নাম দিয়াছিল Tarquin the Proud বা দাম্ভিক রাজা টারকুইন্। তাঁহার পূর্ব্বের রাজা ক্যাপিটল (Capitol) নামক বিখ্যাত অট্টালিকার নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

টারকুইনিয়াসের রাজত্বকালে এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়।

এদিকে এমন একটী ঘটনা ঘটিয়া গেল যে জন্য রাজা টারকুইনিয়াসকে সপরিবারে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল। টারকুইনিয়াসের পুত্র সেক্সটাস্ (sextas) এমন একটী গর্হিত কার্য্য করেন যেজন্য রোমের একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই মহিলার স্বামীর নাম ছিল কোলাটিনাস্ (Collatinus)। টারকুইনিয়াস্ ৫০৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে রোম হইতে নির্ব্বাসিত হন। তাহার পরে রোমে আর রাজতন্ত্র রহিল না। প্রজাসাধারণ কোলাটিয়াস্ এবং জুনিয়াস্ ব্রুটাসের (Junius Brutus) নেতৃত্বাধীনে গণতন্ত্র শাসন-প্রণালীর সৃষ্টি করিলেন। ব্রুটাস্ একজন ন্যায়পরায়ণ ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। সেকালে রোমের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদের মধ্যে বিলাসের স্রোত বিশেষভাবে প্রবাহিত ছিল। রাজা টারকুইনিয়াস্ এবিষয়ে অগ্রণী ছিলেন, এই জন্য সম্ভ্রান্ত বংশীয় বিলাসী যুবকেরা টারকুইনিয়াস্‌কে পুনরায় সিংহাসনে অভিষিক্ত করবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিল, এমন কি, ব্রুটাসের দুই পুত্রও ঐ ষড়যন্ত্র-কারীদের দলে যোগদান করে। ইহারা যখন ষড়যন্ত্রের জন্য অন্যান্য অপরাধীদের সহিত ধৃত হইয়া বিচারের জন্য আনীত হয় তখন ব্রুটাস্ অন্যান্য অপরাধীদের ন্যায় আপনার পুত্রদ্বয়কেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

নৃপতি পোর্শানারের মহত্ত্ব

সেকালে রোমের বীরত্বের কাহিনী পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ও প্রচারিত ছিল। মিউটিয়াস্কেভোলা (Mutius Scaevola) নামক একজন যুবক তাঁহার বীরত্বের জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। টাস্কানি (Tuscany) বা ইট্রুরিয়ার (Etruria) রাজার সহিত যখন রোমের যুদ্ধ চলিতেছিল সে সময়ে মিউটিয়াস শত্রুর হাতে ধরা পড়েন। মিউটিয়াসের উপর ভার ছিল যে তিনি টাস্কানির রাজাকে গুপ্তভাবে হত্যা করিবেন। কিন্তু তিনি তাহা পারেন নাই। মিউটিয়াস্ একজন কৃষকের ছদ্মবেশে রাজার শিবিরে প্রবেশ করেন। সেখানে রাজা এবং তাঁহার একজন কর্ম্মচারী বসিয়াছিলেন। মিউটিয়াস সেই কর্ম্মচারীকে রাজা ভাবিয়া হত্যা করেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই ধরা পড়েন। নৃপতি পোর্শানা (Porsanna) তাহার এইরূপ গর্হিত কার্য্য করিবার কারণ কি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে মিউটিয়াস নির্ভীক ভাবে উত্তর করিল—"আমি আপনাকে হত্যা করিতে আসিয়াছিলাম।" এবং সেই মুহূর্ত্তে শিবিরের মধ্যস্থিত প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে হাত রাখিয়া মিউটিয়াস্ বলিয়া উঠিলেন—"এই দেখ রোমানরা তোমাদের হাতে অপমানিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুকে কত সহজে বরণ করিয়া লইতে পারে।"

প্রাচীন রোমের দোয়াত কলম ও কাগজ

রাজা পোর্শানা এই যুবকের সাহসিকতায় মুগ্ধ হইলেন এবং তিনি সেই মুহূর্ত্তে মিউটিয়াস্‌কে মুক্ত করিয়া দিয়া কহিলেন :—"তুমি মুক্ত, তুমি নিরাপদে রোমে ফিরিয়া যাও।" এইরূপ ব্যবহার দ্বারা রাজা হত্যাকারীর প্রতি যেরূপ মহত্ত্ব প্রদর্শন করিলেন তাহা মিউটিয়াসের বীরত্ব অপেক্ষা অনেক বড়। শুধু তাহাই নহে তিনি রোমের সহিত বেশ সুবিধা-জনক সর্ত্তে সন্ধি করিলেন। এইরূপে আমরা দেখিতে পাইলাম সেকালের রোমের ইতিহাসে একদিকে যেমন অনেক বড় বড় বীরের কথা এবং মহৎ কার্য্যাবলীর কথা আছে তেমনই বহু কাপুরুষ ও অত্যাচারী লোকের পরিচয় ও রহিয়াছে।

ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা

ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাকে প্রধানতঃ এই কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:- (১) দি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, (২) দি ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, (৩) বিদেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক, (৪) ইউরোপীয় প্রথায় পরিচালিত জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক, (৫) খাঁটী স্বদেশী ব্যাঙ্ক, যেমন শ্রফ্, চেট্টি, সুবর্ণবণিক, মারওয়াড়ী, প্রভৃতি। এইগুলি ছাড়া সমবায় ব্যাঙ্ক, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, লোন-কোম্পানী প্রভৃতিও আছে।

স্বদেশী ব্যাঙ্ক

বৈদিক যুগ হইতে ভারতে ব্যাঙ্কিং প্রচলিত আছে; তবে সে যুগের শাস্ত্রকারেরা সুদের হার কিরূপ হইবে, কাহাকে টাকা ধার দেওয়া হইবে এ-সব বিষয়ে নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে উচ্চ জাতি ধার-কর্জ্জ দিতে পারিত না। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়দের সুদ্ লইয়া কর্জ্জ দেওয়া নিষেধ ছিল। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, "যে সস্তায় বিষয় খরিদ করিয়া উচ্চহারে বিক্রয় করে তাহাকে সুদখোর বলে এবং যাঁহারা বেদ্ পাঠ করেন তাঁহারা তাহার নিন্দা করেন।" কিভাবে ভারতে ব্যাঙ্কিংএর প্রসার হইয়াছিল সে-সম্বন্ধে কোন নির্ভুল ঐতিহাসিক বিবরণ দেওয়া যায় না, তবে বলা যায় যে মধ্যযুগেও ভারতে ব্যাঙ্কিং বেশ উঠিয়াছিল। ফিরোজ শার সময়ে (১৩৫১-৮৮) সারস্বতির ব্যাঙ্কাররা রাজাকে বহু টাকা ধার দিয়াছিলেন। মুঘল বাদশাদের আমলে স্বদেশী ব্যাঙ্ক বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ঔরঙ্গজেব মাণিক-চাঁদকে শেঠ উপাধি দিয়াছিলেন এবং মাণিকচাঁদের ভাগিনেয় ফতেচাঁদ পাইয়াছিলেন জগৎ শেঠ উপাধি।
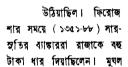
মুঘল সম্রাটদের দরবারে এই সব স্বদেশী ব্যাঙ্কারদের বিশেষ প্রতাপ ছিল। দক্ষিণ ভারতে মাদুরার শেঠগণও কম প্রতিপত্তিশালী ছিলেন না। যুদ্ধের সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতিদের টাকা কর্জ্জ দিয়া ইঁহারা সাহায্য করিতেন।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের পর হইতে ইউরোপীয় বণিকদের হাতে বহির্বাণিজ্য গিয়া পড়ে। ভারতের অন্তর্বাণিজ্যে টাকার যোগান দেওয়াই তখন হইতে স্বদেশী ব্যাঙ্কগুলির একমাত্র কাজ।

বিভিন্ন নাম :—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই দেশীয় ব্যাঙ্কারদের নাম বিভিন্ন—প্রধানতঃ সাহুকার, সুবর্ণবণিক, চেট্টি, মহাজন ও শ্রফ্ নামেই ইহারা পরিচিত। ব্যাঙ্কিং ইহাদের প্রধানতঃ পারিবারিক ব্যবসায়। পিতার অবর্ত্তমানে পুত্রই সেই ব্যবসায় চালায়। তাই একটা বিশেষ শ্রেণীর মধ্যেই এই ব্যবসায়

সীমাবদ্ধ। কোন নূতন রীতি ইহারা গ্রহণ করিতে চাহেন না। চিরাচরিত প্রথায় ব্যবসায় চলে তাই ঝুঁকিও কম সহিতে হয়। এক একজনে লক্ষ টাকার মালিক —গত মহাযুদ্ধের সময় ভারত-সরকার যে কর্জ্জ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে ইঁহারাই দিয়াছিলেন মোটা টাকা। অনেক সহরে ইঁহারা একটা প্রাইভেট্ পার্টনারশিপ কায়েম করিয়া ব্যবসায় চালান— জয়েণ্ট ষ্টক প্রথায় ব্যবসায় চালাইবার পক্ষপাতী ইহারা মোটেই নহেন। ব্যবসায়-গত হিসাবপত্রও খুব গোপনে রাখেন। এই প্রথার মুস্কিল এই যে, যিনি ব্যবসায় সূত্রপাত করিয়াছেন তিনি হয়ত বিচক্ষণ ব্যাঙ্কার কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার সন্তানও যে অনুরূপ পারদর্শী হইবেন এরূপ কোন কথা নাই। পারিবারিক ব্যবসার দোষ এইখানে, সেইজন্যই স্বদেশী ব্যাঙ্কারদের স্থান ক্রমশঃ জয়েণ্ট ষ্টক্ ব্যাঙ্ক অধিকার করিতেছে।

জয়েণ্ট-ষ্টক বা যৌথ-প্রথায় পরিচালিত কারবারের সুবিধা এই যে, একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারীর অবর্ত্তমানে আবার একজন নূতন সুযোগ্য কর্ম্মচারী নিয়োগ করা যায়। ইউরোপে জয়েণ্ট-ষ্টক ব্যাঙ্ক প্রাইভেট্ ব্যাঙ্কারদের যতটা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, আমাদের দেশে তাহা সম্ভব হয় নাই, তাহার কারণ গ্রামে জয়েণ্ট-ষ্টক্ ব্যাঙ্কের শাখা-প্রশাখা বিশেষ বিস্তার লাভ করে নাই। তবে সমবায় ঋণদান-সমিতিগুলি মহাজনদের বিশেষ বেগ দিয়াছে। বড় বড় মহাজন বা সাহুকার অন্তর্প্রদেশের বাণিজ্য কেন্দ্র গুলিতে নিজেদের প্রতিনিধি রাখেন; এই সব প্রতিনিধিকে **"গোমস্তা"** বা **"মুনিম্"** বলে। মাহিনা মাসিক ৩০ টাকা হইতে ৬০ টাকার মধ্যে হইলেও "মুনিম্"রা সচারাচর বিশ্বাসঘাতক হয় না। মনিব মাঝে মাঝে আসিয়া হিসাবের খাতা-পত্র দেখিয়া যান। সেজন্য ব্যবসায় বেশ স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হয়।

স্বদেশী ব্যাঙ্কারের কাজ ঃ— ইঁহাদের প্রধান কাজ টাকা কর্জ্জ দেওয়া। শুধু লোক দেখেই ইঁহারা টাকা ধার দেন না, সামাজিক ক্রিয়া-কলাপের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে লোকে সাধারণতঃ এঁদের কাছে ধার করে; এই কর্জ্জকরা টাকাটা সম্পূর্ণ অনুৎপাদক কাজে খরচা হয়। ব্যাঙ্কারেরা সেটা বোঝেন বলিয়া বন্ধকী না রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দেন না; সুদের টাকাটা কর্জ্জ দিবার সময় আসল হইতে কাটিয়া রাখেন; ধার দেওয়া টাকাটা মাসিক কিস্তিতে আদায় করেন। সুদের হারও বেশ চড়া; তবে ইদানিং নানাকারণে কিছু কমিয়াছে। যে ধরণের বাজে মাল প্রতিভূ (বন্ধকী) রাখিয়া টাকা ধার দিতে হয় এবং টাকা আদায় করাও যেরূপ কষ্টসাধ্য তাহাতে তাঁহাদের বেশী সুদ দাবী করাই স্বাভাবিক। চাষী টাকা ধার করে বীজ কিনে জমি চাষ করার সুবিধার জন্য; সুতরাং মহাজনদের ব্যবসায় জোরসে চলে চাষ আবাদের সময়টায়। বছরের বাকী সময়টা টাকা সিন্দুকেই থাকে। সমস্ত বছরের আয়টা এই কয়মাসে পোষাইয়া লইতে হয় বলিয়া সুদের হারও চড়া।

ইউরোপীয় ব্যাঙ্কিং প্রথার সহিত তুলনা ঃ— ইউরোপের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দায় মিয়াদে কখনও টাকা কর্জ্জ দেয় না, বা এমন সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেয় না যাহা সহজেই টাকায় রূপান্তরিত করা যায় না। কিন্তু স্বদেশী ব্যাঙ্কগুলি এ নিয়ম মানিয়া চলে না, যে-কোনরূপ প্রতিভূ (বন্ধকী) রাখিয়া ইহারা টাকা কর্জ্জ দেয়; তবে প্রধানতঃ সিকিউরিটি হিসাবে জমি, সম্পত্তি বা গহনা-পত্র জমা রাখে। কর্জ্জ দিবার টাকাটা মহাজনের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া আমানৎকারীদের দাবি মিটাইতে গিয়া দেউলিয়া হইতে হয় না।

ইউরোপীয় ব্যাঙ্কার প্রত্যেকটা ঋণ ওজন করিয়া ধার দেন অর্থাৎ প্রয়োজন বোধ করিলে "কোল্যাটারাল্ সিকিউরিটি"-ও গ্রহণ করেন। কিন্তু দেশী মহাজনরা অত দেখেন না, তাঁহারা যেখানে বেশী ঝুঁকি সেখানে বেশী সুদ দাবী করেন (অবশ্য জমানৎ যে না রাখেন তা নহে)। কাজেই অনেক ক্ষেত্রে অনাদায়ী-ঋণ হিসাবের খাতা হইতে কাটিয়া দিতে হয়। ইউরোপীয় ব্যাঙ্কারদের প্রায় তাহা করিতে হয় না।

দেশী মহাজনদের ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্যও সব সময়ে মহৎ নয়। ঋণগ্রহীতাকে কর্জ্জ দিয়া দিয়া একেবারে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলে, ফলে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করা ছাড়া ঋণ-গ্রহীতার উপায় থাকে না। অবশ্য সব মহাজনদের এ দোষ দেওয়া যায় না।

দেশীমহাজন ও খাতকদের মধ্যে একটা

ব্যক্তিগত যোগ থাকে—মহাজন জানে তাহার খাতকের আয় কত, আয় হয় কোথা হইতে, কি ভাবে টাকা ব্যয় করে ইত্যাদি; কাজেই বেশী ঠকিতে হয় না।

ইউরোপীয় ব্যাঙ্কার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা তহবিলে জমা করিয়া রাখে; টাকা সেই পরিমাণের অধিক তহবিলে জমিলে অতিরিক্ত টাকা খাটাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। তখন বাট্টার হার কম করিয়া দিয়াও অধিকতর কর্জ্জ দিয়া সেই মজুত টাকা খাটাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু দেশী মহাজনেরা এ পথে চলেন না; তাঁহাদের নিকট সুদের হারটাই আসল। তাই সুদের হার কম করিয়া যে টাকা কর্জ্জ দিবেন সে চেষ্টা করেন না, তাহা অপেক্ষা তহবিলে টাকা অনুৎপাদক ভাবে পড়িয়া থাকা তাঁহারা পছন্দ করেন।

পূর্ব্বে ভারতে নানা ধরণের টাকা চলিত। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে সোনার তৈরী ১০০ বিভিন্ন মুদ্রা, রূপার তৈরী ৩০০ এবং তামার তৈরী ৫০টি বিভিন্ন মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এই সব বিভিন্ন টাকাকড়ি অদলবদল করার জন্য একদল ব্যাঙ্কার বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছিলেন—তাঁহাদের **পোদ্দার** বলা হইত। ব্রিটীশ আমলে এ ব্যবসায় প্রায় লোপ পাইয়াছে।

আমানৎঃ—ইউরোপীয় ব্যাঙ্কারকে ঋণ-দাতা না বলিয়া ঋণ গৃহীতাই বলা চলে। ব্যাঙ্ক, লোকের টাকা আমানৎ রাখে; আবার সেই আমানতী টাকাই লোককে ধার দেয়। ব্যাঙ্ক বিল, হুণ্ডী প্রভৃতি ভাঙ্গাইয়া নগদ টাকা না দিয়া ভবিষ্যতে ইচ্ছামত টাকা উঠাইবার ক্ষমতা দেয়। ইউরোপীয় প্রথায় আমানৎ আসে তিন উপায়ে (১) নগদ টাকা গচ্ছিত রাখা; (২) খরিদ্দারকে ব্যাঙ্ক যে-টাকাটা ঋণ দিয়াছে, সে টাকাটা খরিদ্দার উঠাইয়া না লইয়া ব্যাঙ্কেই আমানৎ রাখিতে পারেন; (৩) বিল, হুণ্ডী প্রভৃতি ক্রেডিট্ পত্র ভাঙ্গাইয়া দিয়াও আমানৎ আসিতে পারে। ব্যাঙ্ক আসলে "পরের টাকায় পোদ্দারী" করে।

স্বদেশী ব্যাঙ্কগুলি এ ভাবে আমানৎ গ্রহণ করে না। গরীব লোকেরা কখন কখন মহাজনের কাছে টাকা গচ্ছিত রাখে বটে, কিন্তু মহাজন আমানৎ বাড়াইবার চেষ্টা মোটেই করেন না। ব্যবসায় প্রথম সুরু করিবার সময় কেহ কেহ আমানৎ গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু কিছু পুঁজি সঞ্চয় হইলে আর সে পথ মাড়ান না। আমানৎ রাখা তাঁহারা বিপজ্জনক বলিয়াই মনে করেন। আবার কোন কোন মহাজন বন্ধুর টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারেন বটে কিন্তু ব্যবসায়ীর টাকা আমানৎ রাখিতে একেবারেই নারাজ। আমানতের কাঙাল নয় বলিয়া বিজ্ঞাপনাদিতে টাকাও ব্যয় করেন না। প্রধানতঃ তাঁহারা নিজের পুঁজির উপরই নির্ভর করেন, কখন যদি টাকার টান পড়ে তাহা হইলে অপর মহাজনের কাছ হইতে ২% হইতে ৬% পর্য্যন্ত সুদে টাকা কর্জ্জ করেন। নেহাৎ দায়ে না ঠেকিলে জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হন না।

ব্যাঙ্কিং অভ্যাস (ব্যাঙ্কিং হ্যাবিট্)ঃ—সেভিংস্ ব্যাঙ্কের অভাব, সঞ্চয়ের অন্য কোন উপায় না থাকা, ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব, লোকের দারিদ্র্য .... এই সব নানা কারণে এদেশের লোকের মধ্যে ব্যাঙ্কের সহিত লেন-দেন বৃদ্ধি পায় নাই। তবে দেশে নূতন নূতন ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠার জন্য ক্রমশঃ আমানতের পরিমাণ বাড়িতেছে। নীচের হিসাব দেখ—

বৎসর	প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কার	একচেঞ্জ ব্যাঙ্ক	জয়েন্ট-ষ্টক্ ব্যাঙ্ক	মোট
১৮৮৭	১১ কোটী	৪ কোটী	১ কোটী	১৬ কোটী
১৮৯৭	১২ „	৯ „	৬ „	২৭ „
১৯০৭	৩১ „	১৯ „	১৪ „	৬৪ „
১৯১৭	৭৫ „	৫৩ „	৩২ „	১৬১ „

হুণ্ডিঃ—ভারতের অন্তর্প্রদেশে ব্যাঙ্কিং কারবার প্রধানতঃ বণিকদের হাতেই আছে। তাঁহারা এক স্থান হইতে আর একস্থানে টাকা হেরফের করেন এই হুণ্ডির সাহায্যেই। ইংরাজী 'বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ' এর অনুরূপ পত্র এই 'হুণ্ডি'। বারাণসীতে হুণ্ডির মিয়াদ ৪১ দিন, বোম্বাই মির্জাপুর ও লক্ষ্ণৌতেও তাই, ফতেগড় ও ফারুকাবাদে ৬১ দিন এবং লাহোর ও মলতানে ১২১ দিন। দেখা যাইতেছে হুণ্ডির মিয়াদ থাকে একটা বিজোড় দিন। হুণ্ডি আবার নানা রকমের হইয়া থাকে। কোন কোন হুণ্ডি হাজির করিলেই টাকা মিটাইয়া দিতে হয়—তাহাদের বলে দর্শনী-হুণ্ডি; তিন কেতা হুণ্ডি একসঙ্গে লেখা হয়—প্রথমটীকে বলে 'খোকা' 'দ্বিতীয়টীকে 'পেষ্ঠ' ও

তৃতীয়টিকে 'পরপেষ্ট'। হুণ্ডির হারকে **হুণ্ডিয়ানা** বলে। হুণ্ডীয়ানা বাজার হিসাবে বাড়ে-কমে। বোম্বাইয়ের মুলতানী ব্যাঙ্কারদের প্রধান কাজই হইতেছে হুণ্ডির কারবার এবং ইহাতে বহু লক্ষ টাকা তাঁহারা উপার্জ্জন করেন। বিল অফ্ এক্স্চেঞ্জের মত হুণ্ডিও হাত হইতে হাতে ঘুরিয়া বেড়ায়। হুণ্ডির টাকা মিটাইয়া দিতে অস্বীকার করিতে কদাচ দেখা যায়। রেল-পথ বিস্তারের পূর্ব্বে দূরদেশে টাকা পাঠাইবার জন্য হুণ্ডির বহুল প্রচলন ছিল এবং ব্যাঙ্কারগণ এই হুণ্ডি ব্যবসায়ে বহু টাকা লাভ করিতেন। আজকাল টাকা পাঠাইবার নানা সুবিধা হওয়ায় আর ততটা লাভ নাই।

অন্তর্বাণিজ্যে টাকা যোগানের ভার আজকাল অনেকটা সরকারের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। প্রতি জেলা সাব্‌ডিভিসন্ প্রভৃতিতে **গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারী** আছে ; এই সব ট্রেজারীতে নগদ টাকা মজুত থাকে ; পাট-চাষের সময় এখান হইতেই টাকা পাওয়া যায়। অধিকন্তু, কলিকাতায় কারেন্সী রিজার্ভে টাকা জমা দিয়া চট্টগ্রামে গিয়া ট্রেজারী হইতে সেই টাকা লওয়া যায় ; সুতরাং টাকা চলাচলে ট্রেজারী কম সুযোগ করিয়া দেয় না।

অন্তর্বাণিজ্যের পরিমাণের উপর হুণ্ডির পরিমাণ নির্ভর করে। ই-এম্-কুক্ (এক সময়ে কণ্ট্রোলার ছিলেন) বলেন 'ভারতের অন্তর্বাণিজ্য, বহির্বাণিজ্যের প্রায় পনর গুণ।" আমাদের দেশের ব্যাঙ্কারেরা পৃথিবীর যে-কোন দেশের উপর হুণ্ডি দিয়া থাকেন। তবে এরূপ ক্রেডিট্ পত্র দিবার পূর্ব্বে বিদেশস্থ প্রতিনিধিকে সে-বিষয়ে পূর্ব্বেই জানাইয়া রাখেন, যাহাতে সেই প্রতিনিধি পাওনা মিটানোর সময় দায় অস্বীকার না করেন।

বাট্টা :—এদেশের মহাজনেরা (বা প্রাইভেট্ ব্যাঙ্কার) ব্যবসায়ীদের হুণ্ডি, চড়া বাট্টা লইয়া ভাঙ্গাইয়া দেন ; মহাজনের নিজের যখন টাকায় টান ধরে তখন তিনি আবার এই সব ক্রীত-হুণ্ডি জয়েণ্ট ষ্টক্ ব্যাঙ্কে বা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে গিয়া ভাঙ্গাইয়া লয়েন। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক জানেন যে, যে-হুণ্ডিতে মহাজনের সহি আছে, সে হুণ্ডি সম্পর্কে ভয়ের কোন কারণ নাই, কারণ মহাজন নিজে সে-বিষয় খোঁজ খবর না লইয়া হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়া দেন নাই। লণ্ডন টাকার বাজারে 'বিল-ব্রোকার' যে কাজ করে এদেশের মহাজনেরাও সেই কাজই করেন। তফাতের মধ্যে লণ্ডন বিল-ব্রোকারদের টাকার জন্য নির্ভর করিতে হয় ব্যাঙ্কের উপর, আর এদেশের হুণ্ডির দালাল বা মহাজন নির্ভর করেন নিজস্ব টাকার উপর। লণ্ডনে বিল বা হুণ্ডি বাট্টার হার সকলের কাছেই একই রকম, কিন্তু এ-দেশে স্থানীয় বাট্টার হারের মধ্যে তফাৎ দেখা যায়।

বোম্বাই-এ দু-রকমের স্বদেশী ব্যাঙ্কার আছে—(১) মুলতানী ব্যাঙ্কার ও (২) মারওয়াড়ী ব্যাঙ্কার। মুলতানী ব্যাঙ্কার—বাট্টার কাজ, টাকা কর্জ্জ দেওয়া প্রভৃতি খাঁটী ব্যাঙ্কিং কাজই করিয়া থাকেন ; কিন্তু মারওয়াড়ী ব্যাঙ্কারগণ ব্যাঙ্কিং কারবারে সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচ রকম কাজ করেন। ২৷১ মাসের মিয়াদ সম্পন্ন হুণ্ডি মুলতানী ব্যাঙ্কার খরিদ করেন এবং তাহার জন্য শতকরা ৬ টাকা হইতে ৯ টাকা পর্য্যন্ত বাট্টা লয়েন। ইঁহারা আবার এই সব হুণ্ডি ভাঙ্গান ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কাছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বাট্টার হারের সঙ্গে ইঁহাদের বাট্টার হারের যে তফাৎ তাহাই হইল ইহাদের লাভ। মহাজন যদি কোন হুণ্ডি সাকরিয়া না দেন তাহা হইলে সেই হুণ্ডি, ব্যবসায়ীর পক্ষে ভাঙ্গান শক্ত ; তাই ব্যবসায়ীকে মোটা বাট্টা দণ্ড দিয়াই হুণ্ডী মহাজনের কাছে ভাঙ্গাইতে হয়। দুইজন সাকরিয়া না দিলে (যথা ব্যবসায়ী ও মহাজন) ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সে হুণ্ডি গ্রহণ করেন না।

মুলতানী ব্যাঙ্কারদের নিজেদের একটী সঙ্ঘ আছে ; এই সঙ্ঘ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বাট্টার হারের ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বাট্টার হারও বাড়ান-কমান।

ব্যাঙ্কিং ছাড়া অন্য কাজ :—পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে খাঁটী ব্যাঙ্কিং কাজ লইয়াই পড়িয়া আছেন এমন মহাজন এদেশে নাই ; ব্যাঙ্কিং কারবারের সঙ্গে আর ২৷১টা কারবার জুড়িয়া রাখেন। তাড়াতাড়ি বড়লোক হইবার জন্য ফট্‌কা খেলিতেও ছাড়েন না ; বন্ধকী কারবার করেন বলিয়া মাম্‌লা-মোকদ্দমাও করিতে হয়।

গ্রামাঞ্চলে মহাজনেরা একসঙ্গে চার রকম কাজ করিয়া থাকেন :— (১) গ্রামের উৎপন্ন পণ্য

খরিদ করেন, (২) ইউরোপীয় বণিকদের স্থানীয় প্রতিনিধির কাজ করেন, (৩) গ্রামের দোকানদারও তাঁহারা—আবার (৪) টাকা কর্জ্জ দিতেও তাঁহারা।

সুতরাং বোঝা যাইতেছে যে স্বদেশী ব্যাঙ্কার বা মহাজন শুধু ব্যাঙ্কিং কারবার করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না। তাঁহারা একাধারে ব্যাঙ্কিং, এজেন্সি, কমিশন, দালালী, ফড়িয়া-গিরি করিয়া থাকেন।

সঙ্ঘ :—যে-কোন বাণিজ্য-কেন্দ্রে কয়েকজন এদেশী ব্যাঙ্কার একত্র মিলিয়াছেন, তাঁহারা সেখানেই নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থ একটা সঙ্ঘ খাড়া করিয়াছেন। কোন বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে আদালতে না গিয়া এই সঙ্ঘের স্মরণ নেন এবং সঙ্ঘের বিচার বিনা তর্কে মানিয়া লয়েন। প্রাচীনকালে এরূপ সঙ্ঘের জোর ছিল আরও বেশী— যিনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ তিনিই সকল প্রকার বিচার করিতেন, যদি কেহ তাঁহার বিচার না মানিত তাহা হইলে বাজারের কেহই আর তাহার সহিত কারবার করিত না। প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তবেই তিনি পুনরায় বাজারে প্রবেশাধিকার পাইতেন।

দোষ :— স্বদেশী ব্যাঙ্কারদের একটা দোষ এই যে তাঁহারা ক্রেডিট বাড়াইবার চেষ্টা কখন করেন নাই; হুণ্ডি তাঁহারা চালান বটে কিন্তু নোট ছাড়িয়া যে ক্রেডিটের প্রসার করিবেন তাহা করেন নাই। কল কারখানা স্থাপনে টাকা দিয়াও বিশেষ সাহায্য করেন নাই। ক্রেডিট্ লইয়া কারবার করাই ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। লোকের টাকা গচ্ছিত রাখিয়া নোটের প্রচলন করাই ব্যাঙ্কের ধান্ধা; স্বদেশী ব্যাঙ্কাররা এ-কাজ মোটেই করেন নাই।

ব্যাঙ্ক, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সমাজের কল্যাণ করে; যাদের টাকার প্রয়োজন, তাদের টাকা কর্জ্জ দেওয়া ব্যাঙ্কের কাজ···ব্যাঙ্ক শাখা স্থাপন করিয়া এ-বিষয়ে সমাজকে সাহায্য করিতে পারে। এদেশের মহাজনদের হুণ্ডী সমাজের কিছু কল্যাণ করিলেও, বৈদেশিক ব্যাঙ্ক গুলির তুলনায় কিছু নয়।

বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে ব্যাঙ্কিং কারবার চালাইতে হইলে, ফট্‌কা খেলা, কি পণ্য কেনা-বেচা বেশী চলে না, এ দেশের ব্যাঙ্কারগণ সে-কথা জানেন না।

বাজহট বলিয়াছেন "রথ্‌স্‌চাইল্‌ড্‌রা শক্তিশালী পুঁজিপতি হ'তে পারেন, কিন্তু ব্যাঙ্কার নয়" (the Rothschilds are great capitalists but not Bankers); এদেশের ব্যাঙ্কারদেরও পুঁজিপতি বলাই যায়, ব্যাঙ্কার বলা চলে না। একটা শিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্য যে সাহায্য আবশ্যক পাশ্চাত্য ব্যাঙ্কারগণ তাহা দিতে কার্পণ্য করেন না, কিন্তু এদেশের মহাজনদের নিকট হইতে ঠিক্ সেরূপ সাহায্য পাইবার জো নাই, তাঁহারা টাকা লইয়া বসিয়া আছেন, উপযুক্তরূপ বন্ধকী রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দিতে পারেন, কিন্তু শিল্প গঠনে উৎসাহ দিতে জানেন না।

ইউরোপীয় ঢঙে ব্যাঙ্কিং

কলিকাতায় যে সব এজেন্সি হাউস্ ছিল, তাহারা ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ব্যাঙ্কিং কারবারও করিত। মেসার্স অ্যালেকজাণ্ডার অ্যাণ্ড কোং, ব্যাঙ্ক অফ্ হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠা করেন, বোধ হয় ইউরোপীয় ঢঙে প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক এইটাই প্রথম। ১৮২৯-৩২ খৃষ্টাব্দে যে আর্থিকসঙ্কট উপস্থিত হয়, তাহাতে এজেন্সি হাউস্‌গুলি ফেল হয়, তাহাদের ভস্মের উপর ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠে, ১৮৪৮ খৃঃ তাও নষ্ট হয়। সসীম দায় বিশিষ্ট যৌথ কারবারের প্রচলন হয় ১৮৬০ খৃঃ এবং তখন আবার ব্যাঙ্কিং জাঁকিয়া উঠিতে থাকে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ১৯০৫ খৃঃ পর ব্যাঙ্কিংয়ের উন্নতি দ্রুত হইতে থাকে। দুঃখের বিষয় অনেক ক্ষেত্রে আনাড়ী, অনভিজ্ঞ লোকের হাতে পড়িয়া ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দের ব্যাঙ্কিং সঙ্কটের সময় অনেক নতুন ব্যাঙ্ক উঠিয়া যায়। তাহার পর আসিল ইউরোপীয় মহাসমর; ব্যাঙ্কিং জাঁকিয়া উঠিল এবং এ শিক্ষাও হইল যে, দায় মিটাইবার জন্য উপযুক্ত নগদ টাকাও তহবিলে থাকা দরকার। ইউরোপীয় সমর শেষ হইবার পর যে 'বুম্' দেখা দেয় তাহাতে নতুন নতুন ব্যাঙ্ক গজাইয়া উঠে। বুমের পর মন্দা অবশ্যম্ভাবী এবং সেই মন্দার যুগে আবার অনেক ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইল। ১৯২৯-৩১ ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারী কমিটী (ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান বৈঠক) বসে এবং তাহার ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া গঠিত হয়।

এই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কথা আমরা বিশদ ভাবে আলোচনা করিব।

গাছের রঙ্

৩৪০৭ পৃষ্ঠার পর

তোমাদের মধ্যে বোধ হয় এমন কেহ নাই যে গাছের নানা রকমের রঙ দেখিয়া মুগ্ধ হও না। এই বর্ণ-বৈচিত্র্য গাছের আকৃতিক বৈশিষ্ট্য গুলির মধ্যে অত্যন্ত মনোরম। পৃথিবীতে গাছ পালা অসংখ্য এবং উহাদের রঙ্ ও নানাপ্রকার। আমরা ফুল, ফল, পাতা প্রভৃতির বিচিত্র রঙে সহজেই আকৃষ্ট হই। এই সকল বিভিন্ন রঙের সঙ্গে গাছের শারীরিক ক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সেইজন্য ইহাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা না থাকিলে গাছ কেমন করিয়া বাঁচে, বড় হয় ও জীবনের নান-প্রকার কাজ করে তাহা জানা যায় না।

সূর্য্য-কিরণে যে সাত রকমের রঙ্ থাকে তাহা ছাড়াও ঐ সকল রঙের সংমিশ্রণে যে সকল বিভিন্ন রকমের রঙের সৃষ্টি হয় তাহা নানারকম গাছের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সকল রঙের মধ্যে প্রধানতঃ সবুজ, লাল, নীল ও হলদে রঙের প্রাধান্যই বেশী। গাছের শরীরের মধ্যে যে সকল যৌগিক (chemical compound) পদার্থ পাওয়া যায় তাহাদের নিজস্ব একটা করিয়া রঙ্ আছে। এই সকল পদার্থের রঙই গাছের বর্ণ-বৈচিত্র্যের কারণ। গাছের কোন একটা অংশের রঙ্ এই সকল যৌগিক পদার্থের কোন একটার কিংবা অনেকগুলির সংমিশ্রণ হইতে উদ্ভূত। যখন কোন গাছকে সাদা দেখায় তখন উহাতে কোন রঙ্ থাকে না। বহুপ্রকার রঙের মধ্যে তোমাদিগকে কতকগুলির কথা সাধারণভাবে বলিব।

সবুজ রঙের কথা

প্রথমেই আমাদের গাছের সবুজ রঙের কথা মনে পড়ে। গাছের দেহে ক্লোরোফিল (chloroph-yle) নামে একপ্রকার সবুজ রং থাকে যাহার জন্য উহাকে সবুজ দেখায়। শেওলা, মস্, ফার্ণ ও প্রায় সকল বীজজ উদ্ভিদের মধ্যে এই রং পাওয়া যায়। পাতা, কাণ্ড, ফল এমন কি শিকড়েও এই রং থাকিতে পারে, যদি ঐ সকল অংশ মাটীর উপরে থাকে এবং যথেষ্ট পরিমাণে আলো পায়। গাছের দেহের যে অংশে আলো প্রবেশ করিতে পারে না এবং মাটীর নীচে উহার যে অংশ থাকে উহাতে সাধারণতঃই ক্লোরোফিল থাকে না। লাল ও হলদে রঙের পাতা দেখিয়া মনে হয় যে উহার মধ্যে ক্লোরোফিল নাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে।
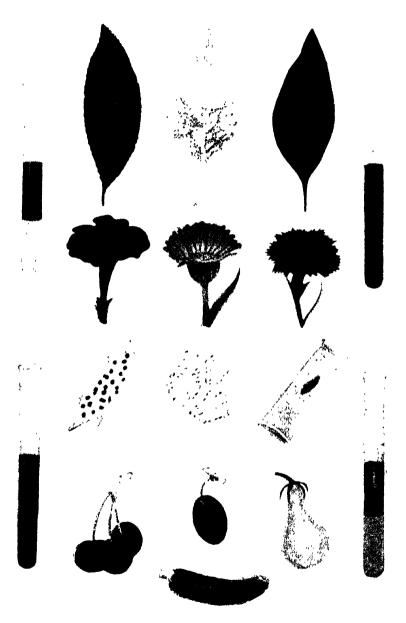
রঙের বৈচিত্র্য

লাল ও হলুদে রঙের প্রাধান্য খুব বেশী হওয়ায় উহারা ক্লোরোফিলের রঙকে ঢাকিয়া ফেলে। বীজাণু ছত্রাক প্রভৃতি উদ্ভিদে ক্লোরোফিল একেবারেই থাকে না উহারা শর্করা (sugar), ষ্টার্চ (starch) প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় (carbohydrate) খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না; সেইজন্য এইসকল গাছকে অন্য গাছ বা প্রাণীর উপর খাদ্যের জন্যে নির্ভর করিতে হয়। যে সকল গাছে ক্লোরোফিল থাকে তাহারা উহার সাহায্যে নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে। বাড়ী, ঘর যেমন ইট দিয়া তৈয়ারী সকল গাছের দেহ এক অথবা বহু কোষ (cell) দিয়া গঠিত। কোষগুলি এতই ছোট যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত উহাদের দেখা যায় না। তাহা হইলে কোষগুলিই গাছের শরীর গঠনের উপাদান। প্রত্যেক কোষের মধ্যে প্রাণবস্তু প্রটোপ্লাজম (protoplasm) নামে এক প্রকার জৈব পদার্থ থাকে। এই পদার্থকে আশ্রয় করিয়া জীবন থাকে বলিয়া ইহাকে জৈব পদার্থ বলা হয়। প্রটোপ্লাজমের অংশ বিশেষকে প্লাষ্টিড্ (plastid) বলে। এই প্লাষ্টিডের মধ্যেই ক্লোরোফিল থাকে। এই রকমের প্লাষ্টিডকে সবুজ কণিকা বা ক্লোরোপ্লাষ্ট্ (chloroplast) বলে। ইহা ছাড়াও কোন কোন কোষে অবর্ণ-প্লাষ্ট্ (dencoplast) পাওয়া যায় যাহার মধ্যে কোন প্রকার রঙ্ থাকে না। যে-সমস্ত গাছ অন্ধকারে বৃদ্ধি পায় তাহা দেখিতে অনেকটা সাদা বা ফিকে হলুদ রঙের। এই সকল গাছের কোষের মধ্যে অবর্ণ-প্লাষ্ট্ থাকে। যদি এইরূপ গাছকে আলোয় রাখিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উহার অবর্ণ-প্লাষ্টের মধ্যে ক্লোরোফিল জন্মায় এবং উহারা সবুজ কণিকায় পরিণত হয় যাহার জন্য সবুজ দেখায়। এই ক্লোরোফিল কিরূপে প্রস্তুত হয় তাহা এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নাই বটে কিন্তু কি কি উপাদান হইলে গাছের মধ্যে ক্লোরোফিল জন্মায় তাহা জানা গিয়াছে। পরিমিত আলো, উত্তাপ, অক্সিজেন (oxygen) ও কতকগুলি লবণ-জাতীয় পদার্থ যাহার মধ্যে লৌহ, নাইট্রোজেন (nitrogen) ও ম্যাগনেসিয়ম্ (magnesium) পাওয়া যায় এবং দ্রাক্ষা শর্করার (grape sugar) প্রয়োজন হয়। অত্যন্ত উজ্জ্বল আলোয় এবং অন্ধকারে ক্লোরোফিল নষ্ট হইয়া যায়। উদ্ভিদ্ কোষেমধ্যে ক্লোরোফিল নিয়ত নষ্ট হইতেছে বটে কিন্তু পুনরায় প্রস্তুত হওয়ায় তাহা বুঝা যায় না। ক্লোরোফিলকে সহজেই পাতা হইতে বাহির করা যায়। আল্কোহল (alcohol), ইথার (ether) এসিটোন (acetone) বেন্জিন (benzene) প্রভৃতিতে এই রঙ্ দ্রবণীয় কিন্তু জলে নহে। গাছের যে কোন সবুজ অংশ অ্যাল্কোহল দিয়া সিদ্ধ করিলে এই রঙ্ সহজেই বাহির হইয়া আসে। যাহা বাহির হয় তাহা খাঁটি ক্লোরোফিল নয়, ইহাতে জ্যান্থোফিল (xanthophyle) ও কেরোটিন (carotin) নামে আরও দুই রকমের রং থাকে।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা এই দুইটি রঙকেও ক্লোরোফিল হইতে পৃথক করা যায়।

ক্লোরোফিল ঔষধের সহিত ব্যবহার করা হয়। ইহা ছাড়া মোম, মোমবাতি, রঞ্জন, সাবান, তৈল, খাদ্য প্রভৃতি রঙ্ করিবার জন্যও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উদ্ভিদের নানাপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য ক্লোরোফিলের প্রয়োজন হয়, কারণ ঐ সকল খাদ্য হইতেই প্রাণবস্তু প্রটোপ্লাজমের উৎপত্তি হইয়া গাছের বৃদ্ধি ও প্রসারণ হইয়া থাকে। প্রাণীর দেহে ক্লোরোফিল থাকে না বলিয়া প্রাণী নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না। খাদ্যের জন্য উহাদিগকে উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিতে হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে উদ্ভিদ্ ক্লোরোফিলের সাহায্যে যে সকল খাদ্য প্রস্তুত করে তাহা সমস্ত জীব-জগতেরই খাদ্য।

লাল ও নীল রঙ

গাছের মধ্যে লাল একটী বিশিষ্ট রঙ্। ইহা পাতা, কাণ্ড, ফুল, ফল ও শিকড়ে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। অনেক সময়েই গাছের লাল, নীল ও বেগুনী রঙ্ অ্যান্থোসায়ানিন (anthocyanin) এক প্রকার রঙের জন্য হইয়া থাকে। এই রঙ প্লাষ্টিডের মধ্যে থাকে না; কোষরসের (cell-sap) মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় কিংবা কেলাস বা দানা (crystal) অবস্থায় থাকে। বিট-পালংয়ের লাল রঙের শিকড়, আপাং, জহর-চাঁপা, লালপাতা, বাগান বিলাস প্রভৃতির পাতার লাল ও বেগুনী রঙ্ এবং

নানাপ্রকার ফুল ও ফলের লাল ও বেগুনী রঙ্ এই অ্যান্থোসায়ানিনের জন্যই হইয়া থাকে। অ্যান্থোসায়ানিন গ্লুকোসাইড নামে একরকম রাসায়নিক পদার্থ। ইহা হইতে দ্রাক্ষা-শর্করা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। জল, অ্যাল্‌কোহল, ইথার প্রভৃতিতে ইহা দ্রবণীয়। বীটপালংয়ের শিকড় জলে সিদ্ধ করিলে এই রঙ্ সহজেই বাহির হইয়া আসে। বিভিন্ন অনুকূল অবস্থায় এই রঙ গাছের মধ্যে প্রস্তুত হয়।

অ্যান্থোসায়ানিন গাছের মধ্যে থাকার জন্য নানাপ্রকার কীট-পতঙ্গ মুগ্ধ হইয়া ফুলে আসিয়া পরোক্ষ ভাবে বীজের উৎপাদনে সাহায্য করে। কেহ কেহ বলেন যে এই সকল রঙ্ গাছের কোষের মধ্যে থাকার জন্য সূর্য্য কিরণের মধ্যে প্রোটোপ্লাজমের অনিষ্টকারী যে সকল রশ্মি থাকে সেইগুলিকে পর্দ্দার মত আটকাইয়া রাখে। আবার কাহারও কাহারও মতে এই সকল রঙ্ সূর্য্য কিরণ হইতে কতকগুলি রশ্মি শুষিয়া লইয়া তাপের সৃষ্টি করে, যাহার দ্বারা উদ্ভিদের শরীরের তাপ রক্ষা হয় এবং উহা কার্য্যকরী হইয়া উদ্ভিদের জীবনের সকল কাজ হইয়া থাকে।

হলুদে রঙ্

গাছের হলুদ রঙ্ কেরোটীন (carotin) ও জ্যান্থোফিল (xanthophyle) নামক রঙের জন্য হইয়া থাকে। ঐ রঙ্ ক্লোরোফিলের সহিত সবুজ কণিকার মধ্যে থাকে যাহার জন্য কচি কচি পাতায় হলুদ রঙের আভা দেখা যায়। ইহা ছাড়াও এই রঙ্ বর্ণপ্লাষ্ট্ (chromoplast) নামক এক প্রকার প্লাষ্টিডের মধ্যে থাকে। সর্ব্বজয়া ফুলের কোষগুলি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে এইগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই রঙ্ কখনই কোষরসের মধ্যে থাকে না। নানারকমের ফুল, ফল, বীজ ও শিকড়ের মধ্যে ইহাদের পাওয়া যায়, যেমন সর্ব্বজয়া; বিলাতী বেগুন, গাজর প্রভৃতি। গাজরে কেরোটিন খুব বেশী পরিমাণে আছে। কেরোটিন ও জ্যান্থোফিল প্রাণি-জগতেও দেখা যায়। হলদে রঙের মাখন ও ডিমের কুসুমের মধ্যে এই রঙ্ আছে।

কেরোটিন ও জ্যান্থোফিলের রঙ হলুদ হইতে নারঙ্গ অর্থাৎ কমলালেবুর রঙের মত। ইহারা প্লাষ্টিডের মধ্যে জলীয় অথবা দানা অবস্থায় থাকে। ক্লোরোফরম্ (chloroform) ইথার (ether) গরম অ্যাল্‌কোহল (alcohol) প্রভৃতির দ্বারা ইহাদের বাহির করা যায়। জ্যান্থোফিল বা কেরোটিন উজ্জ্বল আগুনে কিংবা তাপে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় না। ইহাদের কাজ অনেকটা অ্যান্থোসায়ানিনের মত কিন্তু তাহা ছাড়াও ইহারা কার্ব্বোহাইড্রেট খাদ্য প্রস্তুত করণে সাহায্য করে।

বিলাতী বেগুনের ও লঙ্কার খোসায় লাইকোপিন্ (lycopin) নামে আর এক রকমের রঙ্ দেখিতে পাওয়া যায়।

গাছের সাদা রঙ্

যখন কোন গাছকে সাদা দেখাইবে তখন বুঝিতে হইবে যে উপরোক্ত রঙগুলি উহাতে নাই। তখন গাছ সূর্য্য কিরণের কোন রশ্মিই শুষিয়া লইতে পারে না; ঐ সকল রশ্মি গাছের উপর প্রতিফলিত কিংবা উহার ভিতর দিয়া চলিয়া যাওয়ায় গাছকে সাদা দেখায়।

গাছের শোভা

গাছের রঙই গাছের শোভা। বসন্ত কালে যখন গাছে গাছে সবুজ পাতা গজায় তখন গাছ কি অপূর্ব্ব শোভাই না ধারণ করে। আমাদের দেশের কবিরা গাছের পাতার বিবিধ বর্ণের শোভা এবং ফুলের নানারূপ মনোলোভা রূপ দেখিয়া কতইনা বর্ণনা করিয়াছেন। সে সব তোমরা কাব্যে পড়িয়াছ ও পড়িবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা গাছের পাতা, ফুল, ও গায়ের রঙ দেখিয়া গবেষণা করেন এবং কি ভাবে কেমন করিয়া নানা রঙের সৃষ্টি হয় তাহা খুঁজিয়া বাহির করেন। কবি দেখেন বাহিরের রূপ, আর বৈজ্ঞানিক দেখেন অন্তরের মাধুর্য্য কোথায়? কোথায় সেরূপের উৎস, যে রূপ সকলকে মুগ্ধ করে! কবি, কল্পনার রঙে রাঙাইয়া আমাদের মনকে স্পর্শ করেন; আর বৈজ্ঞানিক তাঁর গবেষণাগারে বসিয়া মাইক্রস্কোপ, স্লাইড প্রভৃতির সাহায্যে সমস্ত জিনিষ বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের তার স্বরূপ বুঝাইয়া দেন। একই জিনিষকে দুই জনে দুই ভাবে দেখেন।

ডাকের অভিযান

ডাকের জন্মকথা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। এইবার কোন্ দেশে কি ভাবে ডাকের চিঠিপত্র, পার্শেল, এ-সব তোমরা পাইয়া থাক, সেকথা বলিতেছি। যাহারা ডাকের চিঠিপত্র বিলি করে, তাহাদিগকে আমরা সোজা কথায় বলি 'ডাক পিয়ন', ডাকহরকরা, পোষ্টম্যান (Postman) এইরূপ। ডাকহরকরা কিন্তু সকলেরই প্রিয়, প্রিয়জনের চিঠির আশায়, টাকা পাইবার প্রতীক্ষায়, সুখ-দুঃখ ও শোক-সংবাদ সকল সময়েই আমরা ডাক-হরকরার প্রত্যাশা করিয়া থাকি।

ডাক-হরকরা বা পিয়নদের কাজ তোমরা বড় সোজা মনে করিওনা। তাহাদের মাথায় অনেক ঝক্কি। চিঠিপত্র সময় মত বিলি করা চাই, তোমাদের টাকা কড়ি, পার্শেল, ইন্‌সিয়র সব যদি তোমরা সময় মত না পাও তাহা হইলেই ত তোমরা তাহাদের প্রতি বিরূপ হইয়া থাক।

যাহারা সহরে থাক, তাহারা দেখিতে পাও দিনে দুই তিনবার করিয়া নানা স্থানের ডাকের চিঠি বিলি হয়, দূর পল্লীগ্রামের ব্যবস্থা কিন্তু অন্যরূপ। সেখানে সপ্তাহে একদিন, কিংবা প্রত্যহ একবার মাত্র ডাকের চিঠি বিলি হয়। ডাকবাক্স হইতে চিঠি পত্র খুলিয়া আনা হয়। টাকা কড়ি বিলি হয়। গ্রামের লোকেরা প্রবাসী আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের চিঠি পত্রাদি পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে। ডাক-হরকরার, গ্রামবাসীদের কাছে প্রীতি ও ভালবাসা খুবই বেশী।

আমাদের ভারতের কাছেই লঙ্কা বা সিংহল দ্বীপ। সিংহলের ডাক-হরকরা ডাকের চিঠি পূর্ণ থলি কাঁধে করিয়া চিঠি বিলি করিতে এবং ডাক বাক্স হইতে চিঠি সংগ্রহ করিতে চলিয়াছে। ভারতীয় ডাক পিয়নের সহিত তাহার পোষাকের তফাৎটা লক্ষ্য করিয়া দেখিও।

একটি ছোট দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে চিঠি বিলি করিবার জন্য ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া পিয়ন চলিয়াছে।

দক্ষিণ রোডেশীয়ার [আফ্রিকা] একটি পিয়ন দুর্গম পার্ব্বত্য পথে সাইকেল চড়িয়া ডাকের চিঠি বিলি করিতে কেমন বেগে ছুটিয়াছে দেখ।

ফরাসী দেশের গ্রামে গ্রামেই যে ডাকঘর আছে তাহা নহে।

আমাদের দেশে যেমন প্রতি গ্রামেই ডাকঘর

নাই, তেমনি ফরাসী দেশেরও সব গ্রামেই ডাক ঘর নাই। এজন্য ডাকপিয়ন রণপা চড়িয়া গ্রামে গ্রামে ডাক বিলি করিয়া থাকে। ঐ দেখ একজন

সিংহলের ডাকপিয়ন

ফরাসী গ্রামের ডাক-হরকরা একজন চাষার বাড়ীতে চিঠি বিলি করিতেছে, আর কিরূপ আনন্দ ও

ফরাসী দেশের একটি ডাক হরকরা রণ-পা বা পাদ যষ্টির [stilt] উপর দাঁড়াইয়া চিঠি বিলি করিতেছে

আগ্রহের সহিত কৃষক চিঠি পত্র হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিতেছে।

সেকালে, এই ধরনা কেন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে ভাবে ডাক পাঠান হইত এবং ডাকের চিঠি

ভারতীয় ডাক-হরকরা

পত্র বিলি হইত তাহাতে অনেক সময় চিঠি পত্রাদি পৌঁছিতে একমাস, দু'মাস এমন কি কোন কোন

ব্যারব্যা দেশের পিয়ন

স্থানে ছয় মাস কিংবা এক বৎসরও লাগিত, কিন্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কারের জন্য সে দিন আর নাই, এখন 'ছয় দণ্ডে চলে যায় ছয় দিনের পথ।'

বোড়েশীয়ার সাইকেল আরোহী ডাক পিয়ন

উড়োজাহাজ ও ষ্টিমারে ডাক বিলি

গভীর সমুদ্রের অজানা দ্বীপে বর্ত্তমান সময়ে দ্রুতগামী ছোট ছোট ষ্টিমার ও উড়োজাহাজ ডাক লইয়া যায়। কাজেই দূর বলিয়া আর কিছুই থাকে না।

জার্ম্মেনীর পল্লী অঞ্চলে কোথাও কোথাও ছোট ছোট খালের ধারে যে সব গ্রাম আছে, সেই সব গ্রামে ছোট ছোট নৌকায় চড়িয়া চিঠি বিলি করা হয়।

কোন কোন পার্ব্বত্য অঞ্চলে ডাক বিলি করা বড় সহজ নহে। পাহাড়ের দুর্গম পথ, এজন্য ডাক-হরকরা পোষা শিক্ষিত কুকুরের পিঠে ডাকের চিঠি পত্র চাপাইয়া দিয়া ডাক বিলি করিয়া থাকে।

আবার কোন কোন দেশে ডাক-হরকরা আমাদের দেশের পিয়নের মত বাড়ী বাড়ী যাইয়া চিঠি বিলি করে না। সে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া বাঁশী বাজাইতে থাকে। বাঁশীর শব্দে গ্রাম-বাসীরা ছুটিয়া আসে এবং নিজ নিজ চিঠি লইয়া যায়। তাহারা ডাকের চিঠি বিলির নির্দ্দিষ্ট সময়ে কখন পিয়ন আসিবে, তাহার প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে।
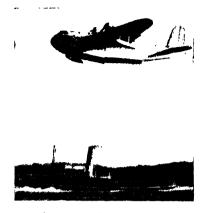
ইউকোনের দূর পল্লীতে ডাকের চিঠি বিলি

হল্যাণ্ডের জিদার-জী (Zuyder Zee) নামক অঞ্চল বার মাস বরফে ঢাকা থাকে। সেই বরফের ভিতর দিয়া কিরূপ ভাবে চিঠি পত্র বিলি করে ছবিতে তাহা দেখিতে পাইতেছ।

জার্মেনির পল্লী অঞ্চলে চিঠি বিলি

চীন দেশের মাঞ্চুকু [Manchukuo] অঞ্চলে

আমেরিকা যুক্তরাজ্যে চিঠি পত্র প্রেরণ ব্যবস্থা

ডাক-হরকরা গাধায় টানা গাড়ীতে করিয়া ডাক বিলি করে।

ভীষণ বালুকাময় মরুভূমি অঞ্চলে কি ভাবে ডাক বিলি হয় তাহাও চিত্রে দেখিতে পাইবে।

শ্যামদেশের ডাক পিয়ন

আফ্রিকার মরুভূমি অঞ্চলের ডাক-হরকরা

আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের ডাক হরকরা মোটর সাইকেলে চড়িয়া ডাক বিলি করে। সে দেশে ডাকের চিঠিপত্র কি ভাবে ফাঁপা বড় নলে পুরিয়া অতি যত্নের সহিত বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয় তাহা ছবিতে দেখ।

কোন্ দেশে কি ভাবে ডাকের চিঠি পত্রাদি

প্রেরিত হয়, তাহা তোমাদিগকে "শিশু ভারতীর" দুইখানি রঙীন চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইবার তোমরা জানিতে পারিলে ভিন্ন ভিন্ন দেশে কিরূপে

হল্যাণ্ডের জীদার অঞ্চলে ডাকের চিঠি বিলি

চিঠি পত্র বিলি করা হইয়া থাকে। আর ভিন্ন ভিন্ন দেশের ডাক হরকরাদের পোষাক-পরিচ্ছদই বা কি রকম! এই ভাবে দেখিতে পাইলে যে ডাকের অভিযান কিরূপ ভাবে চলিয়া আসিতেছে। ডাক হরকরাদের যে কত কষ্ট করিয়া তোমাদের বাড়ীতে

হাঙ্গারির ডাক পিয়ন বাঁশী বাজাইতেছে

আসিয়া চিঠি পৌঁছাইয়া দিতে হয় তাহাও উপলব্ধি করিতে পারিলে।

ানের মাঞ্চুকো অঞ্চলে ডাকের চিঠি বিলি
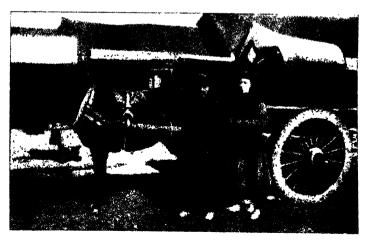
দক্ষিণ মেরু-অভিযান

উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর কথা তোমরা জান। ভৌগোলিকেরা পৃথিবীর যে আয়তন নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে পৃথিবী গোলাকার হইলেও উহার উত্তর পার্শ্ব এবং দক্ষিণ পার্শ্ব একটু চাপা। এই উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বের কেন্দ্রস্থলকে যথাক্রমে **উত্তরমেরু** ও **দক্ষিণ মেরু** বলা হয়। উত্তর মেরুকে কেন্দ্র করিয়া যে দেশ, তাহা উত্তর মেরু প্রদেশ [Arctic Regions] এবং দক্ষিণ মেরুকে কেন্দ্র করিয়া যে প্রদেশ তাহাকে দক্ষিণ মেরু দেশ [Antarctic Regions] বলে।

মানুষ চিরদিনই নূতন দেশ, নূতন জাতি ও নূতন জীব-জন্তু আবিষ্কারের পক্ষপাতী। তোমরা সকলেই নূতন নূতন দেশ দেখিতে ভালবাস। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :—

> নূতন দেশের নাম যত পাঠ করি, বিচিত্র বর্ণনা পড়ি,
> চিত্ত অগ্রসরি সমস্ত লঙ্ঘিতে চাহে।

তেমনই তোমাদেরও মন নূতন নূতন দেশ বেড়াইতে চাহে। কিন্তু যে সব নূতন দেশে রেলগাড়ী চড়িয়া ও ষ্টীমারে চড়িয়া বা মোটরে চড়িয়া যাওয়া সম্ভবপর হয় সে সব দেশ বেড়াইতেই সাধারণতঃ সকলে যাইয়া থাকে। কিন্তু কয়জন যাত্রী সাহারা বা গোবী মরুভূমির ভীষণ প্রান্তরে বেড়াইতে ইচ্ছা করে? কয়জন যাত্রী উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু বেড়াইতে চাহে? কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক দুঃসাহসিক অভিযানকারী জন্মিয়াছেন, যাহারা জীবন পণ করিয়া সাহারার বুকে, হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু অভিযান করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। সেই সব অভিযানকারীদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হইয়া রহিয়াছে। তোমাদের কাছে দক্ষিণ মেরুর অভিযান যাহারা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথাই বলিতেছি।

ভৌগোলিকেরা অনেক দিন হইতেই দক্ষিণ মেরুর সম্বন্ধে বিবিধ তথ্যানুসন্ধান করিতেছিলেন। তাহারই ফলে এখন আমরা দক্ষিণ মেরু সম্বন্ধে ভৌগোলিক বিষয় অনেক কিছু জানিতে পারি। শতাব্দীর পর শতাব্দী মেরু অভিযান চলিয়াছিল। প্রত্যেক দেশের লোকেরাই মেরু অভিযানে যাইয়া আপনাদের দেশের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করিয়া নিজ নিজ দেশের কৃতিত্ব এবং অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য কত না

সূর্য্য কিরণ দীপ্ত বরফ জমা দক্ষিণ মেরুসাগর
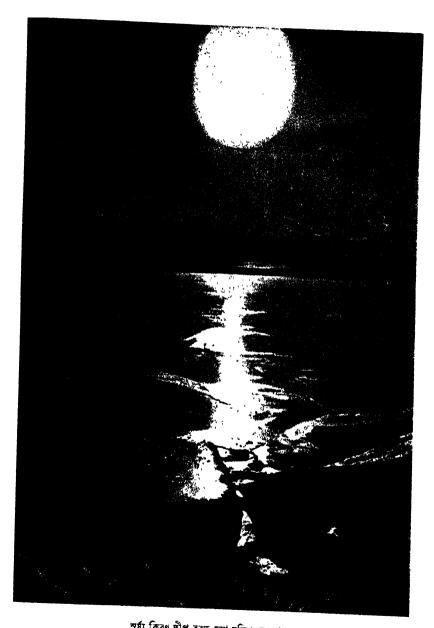
চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন। আমরা মেরু-যাত্রাকে একটা দৌড়ের বাজী বলিয়া মনে করিলে অন্যায় হয় না। আর এই দৌড়ের বাজীর জয় কোন দেশ বা জাতিরই ব্যক্তিগত বিজয় নহে—সমগ্র দেশ ও জাতিরই বিজয় কাহিনী, তাই ত এই অভিযানের জন্য প্রাণ পণ করিয়া যুগের পর যুগ, যাত্রীর পর যাত্রী সেই মহামেরু দেশে ধাবিত হইয়াছে। নাবিকেরা দেখিয়াছেন যে সমুদ্রের বুক দিয়া তাহারা দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছিতে পারেন না। তবে কি চেষ্টার ত্রুটি হইয়াছে? তাহা নহে।

বরফের চাপ

দক্ষিণ মেরুর ভৌগোলিক পরিচয়

পৃথিবীর স্থলভাগ বিষুব রেখার উত্তরে ও দক্ষিণে সমভাবে বিন্যস্ত নহে। উত্তর দিকের অংশে স্থল ভাগ অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী এবং উত্তর মেরু অভিমুখে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণ অংশে স্থল ভাগ [কোনও মহাদেশের অংশ] দক্ষিণ মেরু প্রদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই বলা যাইতে পারে। বিষুব রেখা হইতে উত্তর ও দক্ষিণে ৬০° অক্ষরেখা হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত স্থানকে উত্তর মেরু প্রদেশ ও দক্ষিণ মেরু প্রদেশ বলিয়া গণনা করা হয়। এই হিসাবে উত্তর মেরু প্রদেশের স্থান সমূহে প্রায় দশ লক্ষ লোকের বাস আছে এবং এই মেরু প্রদেশে স্থলচর প্রাণীর বাস ও বড় কম নাই। ঐ স্থানে বিস্তৃত বনভূমির ও বিভিন্ন প্রকার খনিজ দ্রব্যের আকরও রহিয়াছে। দক্ষিণ মেরু প্রদেশের অবস্থা অন্যরূপ, সেখানে লোক-বসতি দূরে থাকুক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট ছাড়া স্থলচর প্রাণী প্রায় দেখাই যায় না; বনভূমি দূরে থাকুক কোন প্রকারের একটা বড় গাছও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আমাদের পরিচিত মহাদেশসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন ও বহুদূরে অবস্থিত হইলেও দক্ষিণ মেরু প্রদেশেও একটি মহাদেশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই দক্ষিণ মেরু মহাদেশ অতি দুর্গম স্থান। প্রায় ৬০ মাইল পর্য্যন্ত অগভীর সাগর অতিক্রম করিলে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সকল মহাদেশ সমূহে একবার পর্য্যটন করিয়া আসা যায়। কিন্তু দক্ষিণ মেরু মহাদেশে যাইতে হইলে কম পক্ষে ৬০০ মাইল অতি

দুস্তর পারাবার অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। প্রশান্ত সাগর বক্ষের প্রবল আন্দোলন, বায়ু প্রবাহের তীব্র তাড়ন ও তুষার ঝটিকার কঠোর সংগ্রামে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তবে দক্ষিণ মেরুর ভীষণ সে অজানা দেশে পৌছান যায়।

এই দক্ষিণ মেরু মহাদেশের আয়তন ক্ষেত্র ৫০০,০০০ বর্গ মাইল। অষ্ট্রেলিয়া এবং রুশদেশ বাদ দিয়া সমগ্র ইউরোপের সমান। বলাবাহুল্য এই সমস্ত বিস্তৃত দেশ বরফের স্তরে আবৃত; স্থায়ী বরফ স্তরে আচ্ছাদিত নয় এমন ভূমি ৫০০,০০০ বর্গ মাইলের মধ্যে ১০০ বর্গ মাইল ও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

দক্ষিণ গোলার্দ্ধ

বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় উন্মুক্ত আকাশতলে জনহীন, তুষারাচ্ছাদিত, অবারিত বহু বিস্তৃত মেরু প্রান্তরের বর্ণনা করিয়াছেন

'মহামেরু দেশ—যেথানে লয়েছে ধরা
অনন্ত কুমারী ব্রত, হিমবস্ত্র পরা,
নিঃসঙ্গ, নিস্পৃহ, সর্ব্ব আভরণ হীন,
সেথা দীর্ঘ রাত্রি শেষে ফিরে আসে দিন
শব্দ, সঙ্গীতবিহীন।"
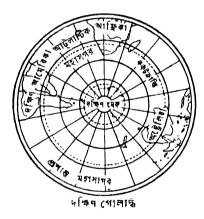
এই বিস্তৃত মহাদেশ আবার একটা মালভূমির মত; গড় উচ্চতা ৬০০০ ফুট। খাস দক্ষিণ মেরু যে মালভূমির উপর অবস্থিত তাহার উচ্চতা ১০,০০০ ফুট। দক্ষিণ মেরু ও আবার মোটের উপর দক্ষিণ মেরু মহাদেশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

এই মেরু প্রদেশে বিশাল আকারের বহু ভাসমান বরফ ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বরফক্ষেত্রটি প্রায় স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণতঃ দক্ষিণ মেরু অভিযানগামী জাহাজসমূহের গতি এখানে আসিয়া বাধা প্রাপ্ত হয় বলিয়াই বোধ হয় ইহার নাম ব্যারিয়ার [The Barrier] অথবা (আবিষ্কর্তার নামানুসারে) Ross Barrier, এই বরফ ক্ষেত্রের আয়তন প্রায় ফরাসীদেশের সমান। ৭৭° অক্ষরেখার সাগরপ্রান্তে ইহার তটরেখা প্রায় ৪০০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পরিধি প্রায় ৫০০ হইতে ১৫০০ মাইল পর্য্যন্ত। এই বরফক্ষেত্র দক্ষিণ মেরু মহাদেশের সহিত সংলগ্ন বলিয়া এই বরফক্ষেত্রের উপর দিয়াই দক্ষিণ মেরুতে পৌছাইবার একটা সহজ পথ। এদিকে এই বরফক্ষেত্র দক্ষিণ মেরু হইতে ৩০ মাইলের মধ্যে গিয়া পৌছিয়াছে।

দক্ষিণ মেরু প্রদেশের তাপমান উত্তরমেরু প্রদেশ হইতে মোটের উপর গড়পড়তা ৫° ডিগ্রি নিম্নতর। সর্ব্বনিম্ন তাপমান—৭৭° ডিগ্রি পর্য্যন্ত পরিমাপ করা হইয়াছে। এই প্রদেশে বৃষ্টি হয় না; কিন্তু তীব্র বায়ুপ্রবাহ এবং প্রবল তুষার ঝটিকা অতি সাধারণ ঘটনা। ঘণ্টায় ১০০ মাইল বেগে বায়ুর ঝড় অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিতে থাকে। তুষার ঝড় ব্লিজার্ড [Blizzard] নামে পরিচিত। এই প্রদেশে আগ্নেয়গিরিও অনেক আছে। কোনও কোনও আগ্নেয়গিরি হইতে এখনও অগ্ন্যুৎপাত হইয়া থাকে।

এই প্রদেশের প্রাণীর মধ্যে তিমি ও সীল মৎস্য এবং পেন্‌গুইন্ পাখী প্রধান। ইহা ছাড়া নানাজাতীয় অতি ক্ষুদ্রাকার কীট আছে যাহারা অতি ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ খাইয়া জীবন ধারণ করে। এই সকল জলজ উদ্ভিদ এত ক্ষুদ্র যে খালি চোখে প্রায় দেখা যায় না, অথচ ইহাদের রঙে সাগরজল রঞ্জিত দেখা যায়।

এই দক্ষিণ মেরু মহাদেশ বহুলাংশে প্রস্তরে গঠিত; ইহার মধ্যে নানা জাতীয় প্রস্তর এবং কয়লাও দেখিতে পাওয়া যায়।

সে প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর আগে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে সকলেই সাধারণতঃ বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন যে দক্ষিণ মেরুর চারিদিক ব্যাপিয়া এক বিশালকায় মহাদেশ বিস্তৃত রহিয়াছে। যাহার আয়তন হইবে পৃথিবীর অবশিষ্ট ভূ-ভাগের সমান; আর এই মহাদেশ দিকে দিকে সমস্ত মহাসাগর সমূহের মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গ্রীষ্ম-মণ্ডলের (Tropics) মধ্য পর্য্যন্ত আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ নাবিক কাপ্তেন কুক দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের বিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক। তাঁহার দ্বিতীয় অভিযানে (১৭৭২-৭৬ খৃঃ) প্রমাণিত হইল যে মেরু প্রদেশে যদি কোন মহাদেশ থাকিয়া থাকে তবে তাহার আয়তন প্রধানতঃ দক্ষিণ মেরু সীমান্ত রেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য উপনিবেশ স্থাপনের পক্ষে ইহার বিশেষ মূল্য নাই। কাপ্তেন কুক [Capt. Cook] সর্ব্বপ্রথমে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ মেরু অভিমুখে যাত্রা করেন কিন্তু তিনি দক্ষিণ মেরুর ১৩:৮ মাইল দূর হইতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। কাপ্তেন কুকের পঞ্চাশ বৎসর পরে আর একজন ইংরাজ নাবিক আরও খানিকটা দক্ষিণে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তারপরে আরও অনেকে দক্ষিণ মেরুতে পৌছিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই দক্ষিণ মেরুতে পৌছিতে পারেন নাই।

রুশ-অভিযান

১৮১৯ সালে সমগ্র রুশ দেশের সম্রাট প্রথম আলেকজেণ্ডার দক্ষিণ মেরু অভিযানে মনোযোগী হইলেন এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরু প্রদেশ অনুসন্ধানের জন্য [Fabian Von Bellingshansen] কাপ্তেন ফ্যাবিয়ান ভন্ বেলিংসানসেন্‌কে পাঠাইলেন। বেলিংসানসেন্ ১৮২০ সালের নভেম্বর মাসে সিড্‌নি হইতে রওনা হইয়া ১৬৩০ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ভয়ানক বিপদে পড়িলেন। বৃহদাকার বরফের চাপ্ প্রাচীরের মত তাঁহার পথ রোধ করিলে তিনি নিরুপায় হইয়া সেথান হইতে দক্ষিণ আমেরিকার শেষ প্রান্ত হর্ণ অন্তরীপ [Cape Horn] এর অভিমুখে রওনা হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য তৎকালে নব আবিষ্কৃত South Shetlands দ্বীপ দর্শন করা। পথে প্রায় ৪০ মাইল দূর হইতে স্থলভাগ দেখিয়া তিনি দুইটি দ্বীপ আবিষ্কার করিলেন-- Peter I Island এবং Alexander I Land, এই সময় South Shetlands এর চারিদিকে আমেরিকা হইতে একদল সীল মৎস্য-ব্যবসায়ী আসিয়া কাজ করিতেছিল। এই সকল নাবিকেরা নিশ্চয়ই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে বহুল পরিমাণে পর্য্যটন করিত; কিন্তু নিজেদের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সৃষ্ট হইবার আশঙ্কায় কোন কথা প্রচার করিত না। Bellingshansen ১৮২১ সালে Cronstadtএ ফিরিয়া আসিলেন।

১৮২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জেমস্ ওয়েডল্ [James Weddel] নামে ইংলণ্ডের রাজকীয় নৌবিভাগের (Royal Navy) অবসর প্রাপ্ত একজন নাবিক দক্ষিণ অর্কেনী দ্বীপপুঞ্জের চারিদিকে [South Orkney] সীল মৎস্য শিকার করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি স্থির করিলেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত বরফ প্রাকারে পথ রোধ না হয় একবার দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিবেন যে কোন নূতন তীরভূমি পাওয়া যায় কি না-- যেখান হইতে সীল মৎস্য শিকার করা চলে।

ওয়েডেল সাহেব তখন মুক্ত সাগরের বুক দিয়া অগ্রসর হইয়া ৬৪°১৭ 'পশ্চিম দ্রাঘিমার, ৭৪° ১৫' দক্ষিণ অক্ষরেখায় আসিয়া পৌছিলেন। এই স্থান কাপ্তেন কুকের সর্ব্ব দক্ষিণ স্থান হইতে ৩০ দক্ষিণে এবং দক্ষিণ মেরু হইতে ৯৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত। পথে তীরভূমির নিদর্শনস্বরূপ ওয়েডেল সাহেব দেখিতে পাইয়াছিলেন অনেক বরফের পাহাড়। পাহাড়গুলির বিশেষত্ব এই যে বরফের সহিত মৃত্তিকা ও মিশ্রিত ছিল। বরফে ও মৃত্তিকাতে গড়া এই পর্ব্বতগুলির বিশেষত্ব তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল। যে উন্মুক্ত সাগরের মধ্য দিয়া ওয়েডেল অগ্রসর হইয়াছিলেন পরে সেই সাগর তাঁহারই নামানুসারে ওয়েডেল্ সাগর [Weddel Sea] নামে পরিচয় লাভ করিয়াছে। তিনি ইউরোপে ফিরিবার সময় এক নূতন জাতীয় সীল মাছ ধরিয়া আনিয়াছিলেন। এই জাতীয় মৎস্য ইউরোপে পূর্ব্বে আর কেহ দেখেন নাই; এই জাতীয় সীল মৎস্য "ওয়েডেল সিল" নাম পাইল।

সে সময়ে [Enderby Brothers] নামে লণ্ডনের এক জাহাজ স্বত্বাধিকারী কোম্পানী সীল মৎস্যের তেলের ব্যবসায় করিতেন; ভৌগোলিক অনুসন্ধানেও ইহাদের উৎসাহ ছিল। ইহাদের এক ভ্রাতা ইংল্যাণ্ডের নব প্রতিষ্ঠিত (১৮৩০ সালে) রাজকীয় ভৌগোলিক সমিতির [Royal Geographical Society] একজন সদস্য ছিলেন। এই কোম্পানী হইতে জন্ বিসকো [John Biscoe] নামে এক ব্যক্তি দুই বৎসরের জন্য দক্ষিণ মেরু অভিযানে প্রেরিত হন; সীল মৎস্য শিকারের সহিত ভৌগোলিক অনুসন্ধান ও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। বিসকো ছিলেন কুক্‌ ও ওয়েডেলের ন্যায় একই শ্রেণীর লোক—প্রথম শ্রেণীর সাগর-অভিযানকারী। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে উদাসীন, ভয় লেশ মাত্রও ছিল না এবং সুদূর দক্ষিণ অভিযানে যাইবার জন্য উৎসুক ছিলেন। ১৮৩১ সালের জানুয়ারী মাসে বিস্‌কো দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগরে ৬০° দক্ষিণ অক্ষরেখা হইতে দক্ষিণ মেরু প্রদক্ষিণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইলেন। গ্রীন্‌উইচের দ্রাঘিমায় আসিয়া তিনি দক্ষিণ মেরু বৃত্ত অতিক্রম করিলে পর বরফ প্রাচীরে তাঁহার পথ রুদ্ধ হইল। তাহা অতিক্রম করা সম্ভব হইল না।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে তিনি দূর হইতে দেখিতে পাইলেন ৪৯° ১৮′ পূর্ব্ব দ্রাঘিমা এবং ৬৬° দক্ষিণ অক্ষরেখায় এক তীরভূমি। এই তীরভূমি পরে এণ্ডারবি স্থলভাগ [Enderby Land] বলিয়া পরিচিত হয়। তিনি নিমরোড্ দ্বীপ [Nimrod Islands] এর জন্য অনুসন্ধান করিয়া ব্যর্থকাম হইলেন; এই নিমরোড্ দ্বীপের অবস্থান ৫৬° দক্ষিণ অক্ষরেখা এবং ১৫৮° পশ্চিম দ্রাঘিমা বলিয়া জ্ঞাত ছিল। তখন Biscoe ৬০° দক্ষিণ অক্ষরেখা হইতে আরও দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া বেলিংসানসেন্ সাগরে প্রবেশ করিলেন।

এরিবাস্ পর্ব্বত [Mount Erebus]

এই পর্ব্বত শ্রেণী স্যার জেমস্ রস (James Ross) আবিষ্কার করেন

তিনি বেলিংসানসেনের অভিযান সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন—এবং বিস্‌কো দ্বীপ এবং [Graham land] গ্রাহামের তীর ভূমি আবিষ্কার করিলেন। তিনি দক্ষিণ মেরু বৃত্তের এর দক্ষিণে ৫০° দ্রাঘিমা ব্যাপিয়া পর্য্যটন করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ সালে ফিরিয়া আসিয়া বিস্‌কো রাজকীয় ভৌগোলিক সমিতি হইতে তাঁহার এই অভিযান ও আবিষ্কারের জন্য স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

১৮৩৮ সালে এন্‌ডারবি ও জন্ বোলিন নামে আর এক ব্যক্তি দক্ষিণ মেরুর দিকে কোন নূতন দেশ আছে কিনা তাহা আবিষ্কারের জন্য প্রেরিত হইলেন।

বোলিন ১৮৩৯ সালের ১৭ই জানুয়ারী দক্ষিণে নিউজিল্যাণ্ডের ক্যাম্পবেল দ্বীপ হইতে রওনা হইলেন। এবং ২৯শে তারিখে তিনি দক্ষিণ মেরু-বৃত্তের সন্ধান পাইলেন—১৭৮° পূর্ব্ব দ্রাঘিমা; দক্ষিণে অক্ষরেখা ৬৯° পর্য্যন্ত ও বেশী বরফ দেখিতে পান নাই। এই স্থান হইতে পশ্চিম দিকে ঘুরিয়া তিনি কতকগুলি আগ্নেয়গিরি পরিপূর্ণ দ্বীপ দেখিতে পাইলেন। পরে এই দ্বীপগুলি আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে ব্যালিনি (Balleny Island) দ্বীপ বলিয়া পরিচিত হয়।

অনেক পর্য্যটক স্থল বিশেষে দ্বীপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া দ্বীপের মত দেখিতে পারিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

Eudenby] এই সম্ভাবনাকে নিশ্চয়রূপে গ্রহণ করিয়া ঐ তীরভূমিকে অভিযানের দ্বিতীয় জাহাজের নামানুসারে স্যাব্রিনা দ্বীপ (Sabrina Land) নাম দিলেন। এই স্যাব্রিনা জাহাজখানা ভীষণ ঝড়ে পড়ায় সমস্ত আরোহীসমেত জলমগ্ন হইয়া গেল।

ফরাসীদের দক্ষিণমেরু-অভিযান

ফরাসী নৌ-বিভাগের Capt. Dumout d' urirlle ছিলেন প্যারী ভৌগোলিক সমিতির [Paris Geographical Society] স্থাপয়িতাদের মধ্যে একজন। তিনি ১৮২২ হইতে ১৮২৫ এবং ১৮২৬ হইতে ১৮২৯ সালে দুইবার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য সাগর পর্য্যটনে প্রেরিত হইয়াছিলেন; এইরূপে তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ সমূহের সংগঠন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। তৃতীয়বার যখন প্রেরিত হন তখন তিনি ফরাসী রাজা King Louis philippe সম্ভবতঃ Humboldt এর পরামর্শে Dumout d'urirlle এর নিজের কাজ ছাড়াও দক্ষিণাভিমুখে
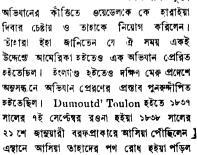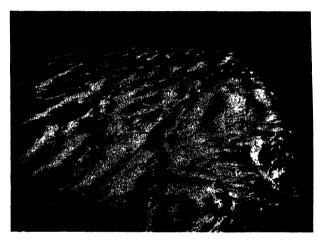
দক্ষিণ মেরুর সুবিস্তৃত বরফ প্রান্তর

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ব্যালিনী দ্বীপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন, কারণ দ্বীপের একটি পর্ব্বত শৃঙ্গ ১৪০০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ ছিল। তাঁহারা এই দ্বীপগুলির চমৎকার চিত্র অঙ্কন করিয়া আনিয়াছিলেন। এবং ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণার জন্য তীর হইতে প্রস্তরাদির নমুনাও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা (Balleny) দক্ষিণ অক্ষরেখা ৬৫° এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ১২১° ডিগ্রিতে তীর ভূমি দেখিতে পাইলেন বলিয়া মনে করিলেন। চার্লস্ এন্‌ডেনবি [Charles

অভিযানের কীর্ত্তিতে ওয়েডেলকে কে হারাইয়া দিবার চেষ্টায় ও তাহাকে নিয়োগ করিলেন। তাঁহারা ইহা জানিতেন যে ঐ সময় একই উদ্দেশ্যে আমেরিকা হইতেও এক অভিযান প্রেরিত হইতেছিল। ইংলাণ্ড হইতেও দক্ষিণ মেরু প্রদেশে অনুসন্ধানে অভিযান প্রেরণের প্রস্তাব পুনরুদ্দীপিত হইতেছিল। Dumoutd' Toulon হইতে ১৮৩৭ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর রওনা হইয়া ১৮৩৮ সালের ২১ শে জানুয়ারী বরফপ্রাকারে আসিয়া পৌছিলেন] এস্থানে আসিয়া তাহাদের পথ রোধ হইয়া পড়িল

তাহারা বরফ প্রাকারের ধারে ধারে এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া তাহারা ২৭শে ফেব্রুয়ারী ৬৩° দক্ষিণ অক্ষরেখায় তীরভূমি দেখিতে পাইলেন এবং এই সকল স্থানকে Louise Philippe Land এবং Joirirlle Island বলিয়া আখ্যাত করিলেন। এই সকল দ্বীপকে নিশ্চয়ই আমেরিকার সীল মৎস্য ব্যবসায়ীরা Palmer Land বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পামার ল্যাণ্ডেরই একটি অংশ এবং Biscoe'র আবিষ্কৃত গ্র্যাহাম স্থল ভাগের সহিত সংলগ্ন।

সকল আলোচনায় উদ্দীপ্ত হইয়া রাজ্য অনুশাসন অতিক্রম করিয়া ফরাসী দেশের গৌরব প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে South Magnetic Pole এর সন্ধানে যাইতে মনস্থির করিলেন। তিনি ১৮৪০ সালের ১লা জানুয়ারী Hobart Town ছাড়িলেন। এবং ২১শে তারিখে দূর হইতে দক্ষিণ মেরু-বৃত্তের উপরের ১৩৮° পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় তীরভূমি দেখিতে পাইলেন। নির্ম্মল আকাশের নীচে সূর্য্য-কিরণ-মণ্ডিত ভাসমান বরফ পর্ব্বত সমূহ এই সুদূর দক্ষিণ দেশে ভেনিস্ নগরীর অপরূপ প্রাসাদমালার ন্যায় শোভা পাইতেছিল। তীরে

ব্লিজার্ড বা তুষার-ঝটিকা

এই সময়কার আমেরিকার এবং ব্রিটিশ অভিযান সমূহের উদ্দেশ্য ছিল South Magnetic Pole আবিষ্কার করা। Magnetic Pole এর অবস্থান Gauss এর গণনা অনুসারে ৬৬° দক্ষিণ অক্ষরেখা এবং, ১৪৬° পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় বলিয়া বিশ্বাস ছিল। ১৮৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে D'urirlle যখন Hobart Town এ ছিলেন তখন সেখানে কেবলই এই সকল অভিযান কাহিনীর আলোচনা চলিতেছিল। D'urirlle এই

বরফমণ্ডিত পর্ব্বত-শিখর ১২০০ ফুট ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল এবং আবিষ্কর্তার পত্নীর নাম অনুসারে তীরভূমির নাম হইল Adelie Land. তাঁহারা একবার তীরে অবতরণ করিয়াছিলেন; তীর ধরিয়া দুই দিন পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পশ্চিম দ্রাঘিমা ১৩২°৩০' আসিলে আকাশ বাতাসের অবস্থা খারাপ হইল। সেখান হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলে ২৮শে জানুয়ারী এক সময়ে কুয়াসা পরিষ্কার হইয়া গেলে, পথ সুগম হইল।

সিন্ধাবাদ নাবিকের চতুর্থবার বাণিজ্য-যাত্রা

[৩৪৩৫ পৃষ্ঠার পর]

বণিকেরা তাঁহার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি সদয় হইলেন এবং কার্য্য শেষে তাঁহাদের জাহাজে লইয়া আর এক নূতন দ্বীপে আসিলেন।

এই নূতন দ্বীপের রাজা বেশ দয়ালু স্বভাবের ছিলেন। বণিকদের নিকট তিনি সিন্ধাবাদের দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়া এবং তাহার নিজের
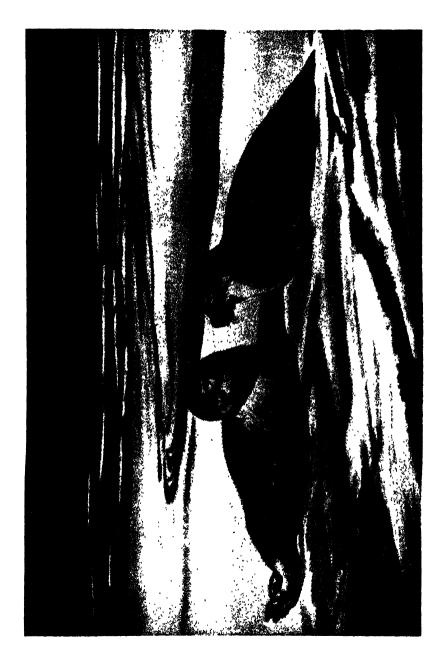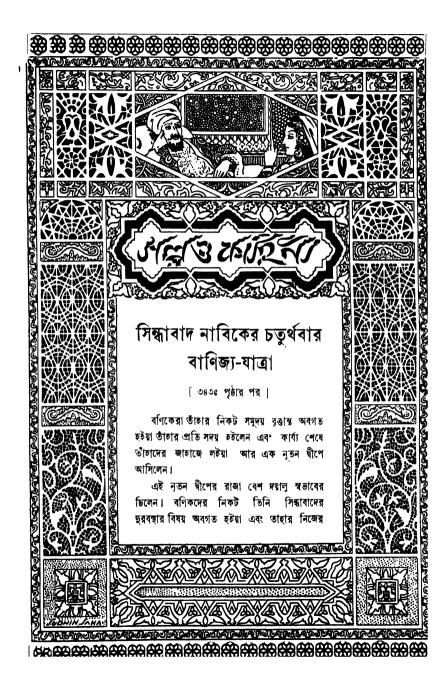
মুখে সমুদয় কাহিনী শুনিয়া সিন্ধাবাদের থাকিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

এই দ্বীপটি ছিল বেশ জনপূর্ণ। এখানকার লোকেরা সকলেই ঘোড়ায় চড়িতে পারিত। কিন্তু একটা আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তাহারা ঘোড়ার পিঠে জিনের ব্যবহার করিতে জানিত না। এমনকি দেশের রাজাও বিনা জিনেই ঘোড়ার পিঠে চড়িতেন।

সিন্ধাবাদ একদিন রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা জিন বিনা ঘোড়ার পিঠে চড়েন কেন?

রাজা বলিলেন,—তাঁহারা জিনের কথা কখনও শোনেন নাই। তখন সিন্ধাবাদ রাজার অনুরোধে সেখানকার একজন কারিগরকে দিয়া অতি সুন্দর ভাবে সোনা রূপার দ্বারা কারুকার্য্য করা একটি জিন প্রস্তুত করিল। রাজা ঐ জিনটি উপহার পাইয়া এবং উহা ঘোড়ার পিঠে দিয়া চড়িয়া খুব খুসী হইলেন এবং সিন্ধাবাদকে পুরস্কৃত করিলেন।

রাজার অনুরোধে সিন্ধাবাদ সে-দেশের একটি ধনশালিনী সুন্দরী মহিলাকে বিবাহ করিলেন। কিছুদিন তাঁহার বেশ আনন্দে দিন কাটিল। কিন্তু হঠাৎ সিন্ধাবাদের স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় তাহাকে বিশেষ বিপন্ন হইতে হইল। সে দেশে এক অদ্ভুত রীতি ছিল। স্বামী কি স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, স্বামী বা স্ত্রীকে জীবিত অবস্থায় সমাধিস্থ করা হইত। সিন্ধাবাদের স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় তাহাকেও তাহার স্ত্রীর সহিত সমাধিস্থ করা হইল।—

সেই গোরস্থান ছিল অতি ভীষণ। চারিদিকে পাহাড় পর্ব্বত। সেই পাহাড়ে ঘেরা নিভৃত বন-জঙ্গলের মধ্যে সেই ভীষণ স্থানে মৃত পুরুষ ও নারীর সহিত সামান্য কিছু খাদ্য ও জল দেওয়া হইত। একটি ভীষণ গহ্বরের মধ্যে মৃত দেহের পর মৃতদেহ পড়িয়া থাকিত, সে এক ভীষণ দৃশ্য।

এক দিন সিন্ধাবাদ দেখিলেন যে একটী স্ত্রীলোককে তাহার মৃত স্বামীর সহিত এই ভীষণ সমাধির মধ্যে রাখিয়া গেল। সিন্ধাবাদ অতি নির্দ্দয় ভাবে সেই স্ত্রীলোকটিকে হত্যা করিয়া, তাহাকে প্রদত্ত খাদ্যাদি সংগ্রহ করিল। এজন্য তাহার মনে অত্যন্ত অনুতাপ হইয়াছিল, কিন্তু আপনার প্রাণ রক্ষার জন্য বাধ্য হইয়াই তাহাকে এইরূপ গুরুতর অন্যায় কার্য্য করিতে হইয়াছিল।

কিছু দিন পরে একদিন সেই ভীষণ স্থানে বেড়াইতে বেড়াইতে অনুভব করিল একটা ভালুক সেইখানে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তখন তাহার মনে হইল নিশ্চয়ই এখানে আসিবার কোনও পথ আছে। সিন্ধাবাদ সেই পথ দিয়া কতক দূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইল যে গুহার ভিতরে আসিবার একটা সংকীর্ণ পথ আছে, সেই পথ দিয়া যে সামান্য আলো আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, সেই আলোতে সে দেখিতে পাইল যে একটা ভালুক সেই রন্ধ্র পথ দিয়া এই সমাধি স্থলে আসিয়াছে। সিন্ধাবাদকে দেখিয়া ভালুকটা তাড়া করিয়া আসিল। তখন সিন্ধাবাদ মড়ার হাড় লইয়া সেই ভালুকটাকে আক্রমণ করিল। ভালুকটাকে মারিয়া সে সেই রন্ধ্র—পথ দিয়া বাহিরে আসিল। আসিবার সময় সমাধিস্থ না হইতে অসংখ্য ধন-রত্ন কুড়াইয়া লইয়া আসিল।

গুহাটির বাহিরেই সমুদ্র। সমুদ্র তীরে আসিয়া তাহার প্রাণ জুড়াইয়া গেল। দুই তিন দিন বাহিরের মুক্ত আকাশের নীচে থাকিয়া মুক্ত বায়ু সেবনে তাহার শরীর সুস্থ ও সবল হইল।

এক দিন সে দেখিতে পাইল সমুদ্রের মধ্য দিয়া একখানা জাহাজ যাইতেছে, সিন্ধাবাদ পাগড়ী খুলিয়া জাহাজের দিকে নিশানা করিল। জাহাজের লোকেরা তাহার নিশানা বুঝিতে পারিয়া তীরে আসিয়া তাহাকে জাহাজে তুলিয়া লইল।

জাহাজের নাবিক তাহার মুখে সব কাহিনী শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তাহারা তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। সিন্ধাবাদ নিরাপদে বোগদাদে পৌছিল।

সিন্ধাবাদ নাবিকের পঞ্চম বাণিজ্য-যাত্রা

কয়েক বৎসর বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল।

সিন্ধাবাদ পূর্ব্ববার বাণিজ্য যাত্রায় যে ক্লেশ পাইয়াছিল তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। আবার বাণিজ্য-যাত্রার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, অবশেষে একটি খুব বড় জাহাজ প্রস্তুত করিয়া যাত্রা করিল।

কয়েক দিন বেশ আরামে কাটিয়া গেল। একদিন তাহাদের জাহাজ একটি দ্বীপে আসিয়া পৌছিল। দ্বীপটি বেশ বড়, কিন্তু খুব নির্জ্জন। সেখানে কতকগুলি রক্ পাখীর ডিম পড়িয়াছিল, ডিমগুলির ছুঁচাল

মুখের দিক হইতে রক্ পাখীর বাচ্চা গুলির চঞ্চু দেখা যাইতেছিল। সিন্ধাবাদের সঙ্গী বণিকেরা ঐ ডিমগুলি ভাঙ্গিয়া বাচ্চা গুলিকে খাইয়া ফেলিল। সিন্ধাবাদ তাহাদিগকে এরূপ কার্য্য করিতে বাধা দিয়াছিল, কিন্তু তাহারা তাহা শোনে নাই। নাবিকেরা তাহাদের খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতেছে এইরূপ সময়ে দেখা গেল, আকাশ ঢাকিয়া দুইটি বৃহৎ আকারের রক্ পাখী বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। তখন সিন্ধাবাদ সঙ্গী নাবিকদিগকে বলিল, আমাদের আর রক্ষা নাই, চল তাড়া তাড়ি জাহাজে যাইয়া উঠি। নাবিকেরা তাহার কথায় শীঘ্র যাইয়া জাহাজে উঠিল। কিন্তু জাহাজে যাইয়া তাহারা নিরাপদ হইতে পারিল না। পাখী দুটি তাহাদের ডিম ঐভাবে নষ্ট হওয়ায় প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়াছিল। তাহারা তাদের নখে করিয়া বড় বড় প্রস্তর খণ্ড বহিয়া আনিয়াছিল, সেই সকল প্রস্তর খণ্ড উপর হইতে দম দম ফেলার ফলে জাহাজের চারিদিকে একটা ভীষণ ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হইল।

জাহাজ খানি তবুও এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোনওরূপে রক্ষা পাইয়াছিল, কিন্তু একটা পাখী খুব বড় একটি প্রস্তর খণ্ড জাহাজের উপর ফেলায় জাহাজখানি একেবারে শত খণ্ডে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।

সেই জাহাজে যাত্রী ও নাবিকেরা সকলেই প্রাণ হারাইয়াছিল। সিন্ধাবাদও সমুদ্রের জলে ডুবিয়া গিয়াছিল, তাহার যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিতে পাইল, তাহার কাছ দিয়া একখানি কাঠ ভাসিয়া যাইতেছে। সিন্ধাবাদ সেই কাঠখানা ধরিয়া অতি কষ্টে তাল গাছের সমান উচু ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে কোনও রূপে সাঁত-রাইয়া একটি দ্বীপের কাছে আসিয়া পৌঁছিল। সমুদ্রের পাড় সেখানে খুব খাড়া উচু ছিল, সিন্ধাবাদ অতি কষ্টে উপরে উঠিল খানিকক্ষণ ঘাসের উপর বসিয়া বিশ্রাম করিল। তাহার কাছে এই দ্বীপটি অতি সুন্দর লাগিল। চারি-দিকে গাছপালা, ফুল ও ফলের বাগান, চারিদিক হইতে সুমধুর ফুলের সৌরভ ভাসিয়া আসিতে-ছিল। সিন্ধাবাদ সেখানকার পাতা ও ফল খাইয়া ক্ষুধা দূর করিল। ক্রমে রাত্রি আসিল, একটি বড় গাছের ছায়ায় শুইয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল।

পরের দিন সকাল বেলা বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইল যে একটি ক্ষুদ্র নদীর ধারে একজন বৃদ্ধ বসিয়া আছে। এইরূপ স্থানে একটি বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য সিন্ধাবাদের খুব ইচ্ছা হইল। সিন্ধা-বাদ তাহাকে নমস্কার করিলে, সেই বৃদ্ধ তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইবার জন্য ইঙ্গিত করিল। সে কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইল। বৃদ্ধ সিন্ধাবাদের কাঁধে উঠিয়াই তাহার দুই পা দিয়া সিন্ধাবাদের কাঁধ এমন ভাবে জড়াইয়া ফেলিল যে তাহাতে তাহার কাঁধ নাড়া চাড়া করিবার আর কোনও শক্তি রহিল না। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই নামিতে চাহে না। এমন কি শুইবার সময়ও সে নামে না, আবার সিন্ধাবাদ ঘুম গেলে পর সে তাহার পা দু'খানি দিয়া পেটের উপর এত জোরে আঘাত করিত কিছুতেই সিন্ধাবাদের পক্ষে নিদ্রা যাওয়া সম্ভবপর ছিল না।

অবশেষে কৌশল ক্রমে বৃদ্ধকে আঙ্গুর ফলের রস পান করাইয়া উন্মত্ত করিয়া তাহার হাত হইতে সে উদ্ধার পাইয়াছিল। আঙ্গুরের রস পান করিয়া বৃদ্ধ ঘুমাইয়া পড়িলে পর সিন্ধাবাদ তাহাকে কাঁধ হইতে ফেলিয়া দিয়া একটা প্রস্তর খণ্ড ছুঁড়িয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল।

এইভাবে সিন্ধাবাদ ঐ বৃদ্ধের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইল। মনের আনন্দে সিন্ধাবাদ বেড়াইতে বেড়াইতে সমুদ্র তীরে আসিয়া দেখিতে পাইল যে তীরে একখানি জাহাজ নোঙ্গর করা রহিয়াছে। জাহাজের নাবিকেরা তীরে নামিয়া সুমিষ্ট জল সংগ্রহের জন্য এদিকে ওদিকে বেড়াইতেছিল। তাহারা এইরূপ নির্জ্জন দ্বীপে সিন্ধাবাদকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল এবং তাহার মুখে বৃদ্ধের কাহিনী শুনিয়া কহিল,— তোমার বরাত ভাল তাই রক্ষা পাইয়াছ, নচেৎ এই দ্বীপে যখন যে আসিয়াছে, তাহাকেই এই বৃদ্ধের হস্তে প্রাণ হারাইতে হইয়াছে।

এই বার সিন্ধাবাদ সেখানকার গভীর বনের মধ্যে যে নারিকেল গাছের সারি ছিল, সেখানে বানরদিগকে তাড়া করিয়া বহু নারিকেল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া

নাবিকদিগের কাছে বিক্রয় করায় তাহার প্রচুর ধন রত্ন লাভ হইয়াছিল।

সিন্ধাবাদ নাবিকদের সঙ্গে নিরাপদে বোগদাদ নগরীতে ফিরিয়া আসিল।

সিন্ধাবাদ নাবিকের ষষ্ঠ বাণিজ্য-যাত্রা

কয়েক বৎসর পরম আনন্দে অতিবাহিত করিয়া সিন্ধাবাদ ষষ্ঠ বার বাণিজ্য যাত্রা করিল। এ যাত্রায় তাহাদের জাহাজ একটি ভীষণাকার পর্ব্বতের নিকট বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। অন্যান্য স্থানে দেখা যায় যে ছোট ছোট সব নদী আসিয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়। কিন্তু এ স্থানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব, এখানে একটি বড় নদী দ্বীপের মধ্যস্থিত হ্রদ হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে। নদীর স্রোতোধারা পাহাড়ের ভিতরকার গুহাপথে প্রবাহিত হওয়ায় তাহার স্রোতের বেগ এত প্রবল ছিল যে জাহাজ ইত্যাদি সেই স্রোতের মধ্যে পড়িলে আর রক্ষা নাই। আর এই সব পাহাড়—মণি, মুক্তা, হীরক ইত্যাদিতে পূর্ণ। সিন্ধাবাদের জাহাজ খানিও এই ভীষণ নদীর স্রোতে পড়িয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাহারা যে কয়জন বাঁচিয়াছিল, অতি ক্লেশে দ্বীপে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

দুঃখের দিনে কে কাহাকে দেখিবে? দ্বীপে ধনরত্নের, হীরা মাণিকের অভাব ছিল না। অভাব ছিল শুধু খাদ্যের। যতদিন সম্ভব হইল, পরস্পরে ভাগাভাগি করিয়া খাওয়া দাওয়া করিল। কিন্তু ঐ ভাবে কদিন চলে? একে একে সকল সঙ্গীরাই প্রাণ হারাইল, বাকী রহিল শুধু সিন্ধাবাদ।

সিন্ধাবাদ দেখিল, একাও আর থাকা চলেনা। তখন সে জাহাজের ভাঙ্গা কাঠ ইত্যাদি সাজ সরঞ্জাম দিয়া একটি ভেলা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র এবং প্রচুর পরিমাণে হীরা, মণি, প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ঐ ভেলা জলে ভাসাইয়া দিল।

সিন্ধাবাদের ভেলাখানি সেই গভীর গুহার ভিতর দিয়া স্রোতের বেগে ভাসিতে ভাসিতে একটি অতি সুন্দর দেশে আসিয়া পৌঁছিল। নদীর তীরে সবুজ সুন্দর দেশটি। সে দেশের অধিবাসীরা সিন্ধাবাদের সহিত অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করিল। তাহাদের মধ্যে একজন আরব্য ভাষা জানিত। সে সিন্ধাবাদের মুখে তাহাদের বিপদের কাহিনী শুনিয়া তাহাকে পরম সমাদরের সহিত গ্রহণ করিল।

সেদেশের রাজা সিন্ধাবাদকে পরম সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। সেখান হইতে প্রচুর ধন রত্ন লাভ করিয়া নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে সিন্ধাবাদ আবার নিরাপদে বোগদাদ ফিরিয়া আসিল।

সিন্ধাবাদ নাবিকের সপ্তম বাণিজ্য-যাত্রা

সিন্ধবাদ সপ্তমবার বাণিজ্য-যাত্রা করিয়া একটি বৃহৎ মৎস্যকে দ্বীপ মনে করিয়া সেই স্থানে জাহাজ নোঙ্গর করায় তাহাদের নাবিকদলের ও বণিকদের সকলেরই প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল, সিন্ধাবাদ কোন রূপে প্রাণে বাঁচিয়াছিল।

সিন্ধাবাদ কোনরূপে রক্ষা পাইয়া যে দেশে আসিল, সেই দেশের লোকেরা তাহার প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিল। একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি তাহাকে পরম সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া তাহার কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন।

কিছুকাল পরে, সেই বৃদ্ধের মৃত্যু হইল। এ সময়ে সিন্ধাবাদ সে দেশের একজন প্রধান ধনীরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

একদিন সিন্ধাবাদ দেখিল যে সেদেশের লোক গুলি পাখীর আকার ধারণ করিতেছে। সিন্ধাবাদ ও ঐরূপ একটি মানুষ—পাখীর কাঁধে চড়িবার জন্য মিনতি করায় তাহারা তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইল।

মানুষ পাখীর পিঠে চড়িয়া সিন্ধাবাদের খুব ভাল লাগিল। নীচে পৃথিবী পড়িয়া আছে, আর উপরে সুন্দর নীল আকাশ, কত সব সুন্দর দৃশ্য, কত সব দেববালারা পাখা মেলিয়া শূন্যে উড়িয়া বেড়াইতেছিল।

সিন্ধাবাদ যেমন ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়া এইরূপ আনন্দ ও তৃপ্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছিল, সেই সময়ে পাখা গুলি মাটিতে পড়িয়া গেল,—কেননা তাহারা ছিল নাস্তিক, ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না, তাই তাহাদের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম ঘটিল। সিন্ধাবাদ তাঁহার স্ত্রীর নিকট ফিরিয়া আসিলে তাঁহার স্ত্রী বলিলেন—"আমার পিতা এই দেশের লোক ছিলেন না। তিনি বিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন। তারপর

স্ত্রীর অনুরোধে সিন্ধাবাদ সেখানে যে সমুদয় ভূ সম্পত্তি ও ধন রত্ন সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া একখানি জাহাজ ভাড়া করিয়া নিরাপদে বোগদাদ ফিরিয়া আসিল। এই ভাবে সিন্ধাবাদ নাবিকের সপ্তমবার বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ শেষ হইল। তাহার পর সিন্ধাবাদ আর বাণিজ্য-যাত্রা করে নাই। পরম ঐশ্বর্য্যসম্পদের মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে বোগদাদে বাস করিতে লাগিল।

সিন্ধাবাদ, হিন্দাবাদের নিকট তাহার বাণিজ্য যাত্রার কাহিনী বলিয়া শেষ করিয়া একশত স্বর্ণ মুদ্রা দান করিয়া তাহাকে বিদায় দিল।

পক্ষীরাজ ঘোড়া

বহু প্রাচীনকালে পারস্যের রাজসভায় একদিন একজন ভারতবর্ষের লোক আসিয়া সুলতানের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিল। সুলতান অনুমতি দিলে পর সে সভার ভিতর একটা কাঠের তৈয়ারী ঘোড়া লইয়া আসিল এবং বলিল যে এই ঘোড়ার একটা আশ্চর্য্য গুণ আছে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ?

সেই লোকটি বলিল—সুলতান, এই ঘোড়া এমন আশ্চর্য্য কৌশলে তৈয়ারী যে, যে কেহ ইহার উপর উঠিয়া শূন্যে বেড়াইতে পারিবে।

সুলতান প্রমাণ দেখিতে চাহিলে সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার উপর চড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখাইল।

সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কত মূল্যে ঘোড়াটিকে বিক্রয় করিবে।

বিদেশী অভিবাদন করিয়া জানাইল—সুলতান যদি তাঁহার কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দেন তাহা হইলেই সে ঘোড়াটি সুলতানকে দিবে—নতুবা কিছুতেই—সে ঘোড়াটি বিক্রয় করিবে না।

কাছেই বাদশাজাদা দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি বিদেশীর আস্পর্দ্ধা দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু সুলতান লোকটির কথায় রাজী হইলেন।

বাদশাজাদা কিন্তু সুলতানের মত অত সহজে রাজী হইবার পাত্র ছিলেন না, তিনি পরীক্ষা করিবার জন্য একলাফে ঘোড়ার উপর চড়িয়া ঘোড়ার মালিককে যে কলটি টিপিয়া শূন্যে উঠিতে দেখিয়াছিলেন তাহা টিপিয়া দেওয়া মাত্র রাজপুত্র দেখিতে দেখিতে শূন্যে মিলাইয়া গেলেন।

বাদশাহ তাঁহার ছেলেকে এই ভাবে অদৃশ্য হইতে দেখিয়া বিপদের আশঙ্কায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি আদেশ দিলেন—যতদিন না বাদশাজাদা ফিরিয়া আসেন ততদিন ঘোড়াওয়ালাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখা হউক। কেননা বাদশাজাদা নামিবার কৌশল না শিখিয়াই ঘোড়ায় উঠিয়াছিলেন—সুতরাং পদে পদে তাহার জন্য বিপদের আশঙ্কা ছিল।

এদিকে বাদশাজাদা সমস্ত দিন ঘোড়ায় চড়িয়া অনেক জায়গায় বেড়াইলেন, কিন্তু নামিবার সময় দেখেন যে তিনি কোন্ কল টিপিলে নামিতে হইবে তাহা একেবারেই জানেন না। অনেক খুঁজিবার পর সন্ধ্যার সময় তিনি ল্যাজের দিকে আর একটা চাবি খুজিয়া পাইয়া উহা টিপিয়া দিলেন, অমনি তিনি একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদের ছাদে নামিয়া পড়িলেন। রাজার ছেলে ছাদ হইতে নামিয়া প্রাসাদের এ ঘর ও ঘর ঘুরিতে ঘুরিতে একটি ঘরে আসিয়া দেখিলেন এক পরমাসুন্দরী কন্যা সেখানে সোনার পালঙ্কে শুইয়া ঘুমাইতেছে।

বাদশাজাদার সঙ্গে শীঘ্রই মেয়েটির আলাপ-পরিচয় হইল। সেই মেয়েটি ছিলেন সে দেশের রাজকন্যা। তখন বাদশাজাদা কয়েক দিন সেখানে বিশ্রাম করিয়া বাদশাজাদীকে সঙ্গে লইয়া সেই ঘোড়ায় চড়িয়া পিতার নিকট ফিরিয়া চলিলেন। স্থির হইল সেখানে গিয়া তাঁহারা বিবাহ করিবেন।

পুত্রকে নিরাপদে ফিরিতে দেখিয়া সুলতান এত খুশী হইলেন যে তিনি ঘোড়াওয়ালাকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিলেন। তাহার ঘোড়াও তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। ঘোড়াওয়ালা কিন্তু তাহাকে বিনা দোষে বন্দী করিয়া রাখিবার জন্য বাদশার উপর প্রতিশোধ লইবার সংকল্প করিল।

সে একদিন চুপি চুপি রাজপুত্রের ভাবী পত্নীকে যে প্রাসাদে আনিয়া রাখা হইয়াছিল সেখানে তাহার কলের ঘোড়া লইয়া গিয়া হাজির হইয়া বলিল সুলতান-পুত্র আপনাকে শীঘ্র আমার সঙ্গে এই ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে বলিয়াছেন।

বাদশাজাদী তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া যেমন ঘোড়ায় চড়িয়াছেন অমনি ঘোড়াওয়ালা ঘোড়ায় চড়িয়া বাদশাজাদীকে লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। অনেক দূর আসিয়া তাহারা এক বনের কাছে থামিল।

তখন ঘোড়াওয়ালা জোর করিয়া বাদশাজাদীকে বিবাহ করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে দেশের সুলতান বাদশাজাদীর কান্না শুনিয়া সেখানে আসিয়া সব কথা শুনিলেন এবং ঘোড়াওয়ালাকে বধ করিয়া নিজে তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন।

বাদশাজাদী প্রমাদ গণিয়া সুলতানের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য পাগল সাজিয়া রহিলেন। সুলতান বাদশাজাদীর রোগ দূর করিবার জন্য অনেক চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন—দেশ-দেশান্তর হইতে বহুলোকে রাজপুত্রীকে রোগমুক্ত করিবার জন্য আসিতে লাগিল।

পারস্যের বাদশাজাদাও এই সংবাদ পাইয়া চিকিৎসক সাজিয়া রাজপুত্রীকে দেখিতে আসিলেন। তিনি সে দেশের সুলতানকে বলিলেন যে ঘোড়ায় চড়িয়া রাজপুত্রী এখানে আসিয়াছেন সেই ঘোড়াটি আনাইয়া রাজপুত্রীকে তাহাতে চড়াইতে হইবে। তারপর তিনি মন্ত্র পড়িয়া বাদশাজাদীর রোগ দূর করিবেন।

সুলতান রাজী হইলেন। পারস্য দেশের রাজপুত্র তখন বাদশাজাদাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং মন্ত্র পড়িতে পড়িতে সকলের অলক্ষ্যে ঘোড়ায় চড়িয়া শূন্যে উঠিয়া রাজপুত্রীকে লইয়া পারস্যে ফিরিয়া আসিলেন। পারস্যরাজ পুত্র ও পুত্রবধূকে পাইয়া আনন্দে আটখানা হইয়া পড়িলেন। শীঘ্রই মহা ধুমধামে পারস্য রাজপুত্রের সহিত সেই বাদশাজাদীর বিবাহ হইল।

রাজা ও বণিক

কোশল দেশের রাজা ছিলেন খুব ধার্ম্মিক ও দানশীল। কেহ কোন ভাল জিনিষ লইয়া আসিলে তিনি তার খুব সমাদার করিতেন। একবার একজন মালী তাহার বাগানের সরোবরে প্রস্ফুটিত একটি অতি সুন্দর ও বৃহৎ শ্বেতপদ্ম আনিয়া রাজাকে উপহার দিল। রাজা ফুলটি পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং মালীকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দিয়া বিদায় দিলেন।

কোশলের রাজধানীতে একজন বণিক ছিলেন কিন্তু লোকটি ছিলেন ভয়ানক লোভী। রাজা যখন মালীকে পাচশত টাকা পুরস্কার দেন তখন সেই বণিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন রাজা যদি একটি সামান্য পদ্ম ফুলের জন্য পাঁচশো টাকা পারিতোষিক দিতে পারেন, না জানি খুব ভাল কোন জিনিষ উপহার দিলে তিনি আরও অনেক বেশী টাকা উপহার দিবেন।

এইরূপ ভাবিয়া একদিন সেই বণিক রাজার কাছে তাহার একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব লইয়া উপস্থিত করিলেন এবং বলিলেন—মহারাজ, আপনি যদি দয়া করিয়া আমার এই ঘোড়াটি গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব। অশ্বটি গ্রহণ করিয়া রাজা তাহাকে পরের দিন পারিতোষিক গ্রহণ করিবার জন্য আসিতে বলিলেন।

পরের দিন খুব উৎসাহের সহিত সেই বণিক রাজদরবারে যাইয়া হাজির হইলেন। রাজা মালীর নিকট হইতে যে পদ্ম ফুলটি পাইয়াছিলেন তাহা বণিকের হাতে দিয়া বলিলেন—এই নিন আপনার পুরস্কার।

বণিক বুঝিতে পারিলেন যে রাজা তাহার হীন স্বভাবের জন্য কিরূপ কৌশলে দণ্ড বিধান করিলেন।

এক যে চাষা

এক চাষা একদিন তার ঘরের চাল হইতে লাউ পাড়িবার জন্য মই বাধিয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ সে পা পিছলাইয়া নীচে পড়িয়া গেল। ইহাতে তাহার পা মচ্‌কাইয়া গিয়াছিল। সে বেদনায় অস্থির হইয়া পড়িল। তাহার একজন প্রতিবেশী তাহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিল—ভাই আমি তোমাক এমন একটি কৌশল শিখিয়ে দেব যাতে তোমার আর কোনদিন পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাক্‌বেনা।

সেই চাষা বলিল—ভাই আমাকে সেই কৌশলটি শিখিয়ে দাও।

প্রতিবেশী কৃষক-বন্ধু বলিল—তুমি মই বেয়ে উঠ্‌বার সময় তাড়াতাড়ি উঠ্‌লেও নাব্‌বার সময় বেশ আস্তে আস্তে নাব্‌বে তাহলে তুমি নিশ্চয় জেন পড়ে যাবার ভয় আর থাক্‌বেনা। চাষা তাহার কথা শুনিয়া হাসিল।

আলোর উৎপত্তি

এই জগতে প্রত্যেক ব্যাপার সম্বন্ধে দুইটা প্রশ্ন করা চলে। এই দুইটা প্রশ্নের উত্তরই সেই ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের প্রায় সব জ্ঞান আনিয়া দেয়। এই দুইটা প্রশ্ন হইল—"ইহা কি?" এবং "কেমন করিয়া ইহা উৎপন্ন হইল?" "ইহা কি?"—এই প্রশ্নের উত্তরে উৎপত্তি লাভ করিবার পর হইতে তাহার সমস্ত কাজ আর লক্ষণের যথাযথ বর্ণনা করিতে হয়। বিজ্ঞানের বেশীর ভাগই এই বর্ণনাগুলি কিভাবে যথাযথ আর নির্ভুল হইতে পারে সেই কাজেই ব্যাপৃত থাকিতে হয়। বেশীর ভাগ এই কাজেই ব্যাপৃত থাকিতে হইলেও ইহাতেই তাহার সকল কাজ শেষ হয় না। উপরিল্লিখিত দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া বাহির করাও তাহার অপর একটা প্রধান কাজ। সমস্ত জিনিষ কিরূপে উৎপন্ন হইল এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও বিজ্ঞানেরই সীমার মধ্যে। আলো সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা যাহা আমরা এই পর্য্যন্ত করিয়াছি তাহাতে "আলো কি" এই প্রশ্নের উত্তরই প্রধানতঃ আছে। আলো কি ভাবে তৈয়ারী হইল তাহা এইবার তোমাদের বলিব।

প্রথমেই তোমরা একটা কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিবে। একটা উদাহরণ দিয়া তোমাদের তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করি। আমার এই টেবিলের উপর একটা কাচের পাত্রে কতকটা গুঁড়া পড়িয়া আছে। এই গুঁড়াগুলি Calcite বলিয়া এক রকম স্ফটিক চূর্ণ করিয়া পাওয়া গিয়াছিল। এই Calcite-এর গুঁড়াগুলির কিভাবে উৎপত্তি হইয়াছে বলিতে হইলে আমি যদি বলি যে ইহা Calcite স্ফটিক গুঁড়া করিয়া পাওয়া গিয়াছে তাহা হইলে আমার উত্তর নির্ভুল হইলেও সম্পূর্ণ হয় না। Calcite এর গুঁড়াগুলির উৎপত্তির কথা বলিবার সময় আবার সেই Calcite আনিয়া ফেলিলে তাহা ঠিক উত্তর হয় না—উত্তরকে পাশ কাটাইয়া যাওয়া হয় মাত্র। অতএব উৎপত্তির কথা বলিতে হইলে এমন একটা জিনিষের কথা বলিতে হইবে যাহা ঠিক সেই বস্তুটি নহে। এইরূপ উত্তর যেখানে রূপান্তরের বর্ণনা সেখানে দেওয়া চলে—উৎপত্তি আলোচনায় তাহা দেওয়া ভুল হইবে।

অতএব আলোর উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিতে হইলে আমাদের আলোর অতিরিক্ত কোনও জিনিষ লইয়া তাহা হইতে আলোকে বাহির করিতে হইবে। এই

জিনিষটি কি? বিজ্ঞানের উত্তর ইহা বিদ্যুতের অণু বা ইলেক্‌ট্রোন (Electron).

আলো যখন একস্থান হইতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয় তখন তাহাকে এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী জায়গা ভেদ করিয়াই যাইতে হয়। এই মধ্যবর্ত্তী স্থানকে শূন্য বলা হয়। শূন্য হইলেও ইহা একেবারে "কিছু না" তাহা নহে। একটা চুম্বক রাখিয়া তাহার উপরে একটা কাগজ রাখ। এই
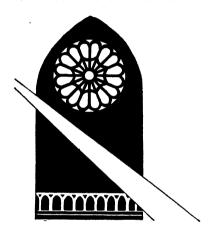
কাগজের উপর লোহার গুড়া ছড়াইয়া দাও। দেখিবে গুঁড়াগুলি যেখানে সেখানে পড়িতেছে না – বিশেষ একভাবে সাজাইয়া পড়িতেছে। ঠিক মত ভাবে ছড়াইতে পারিলে দেখিতে পাইবে বিচিত্র এক প্যাটার্ন তৈয়ারী হইবে। এখন প্রশ্ন এই যে শূন্যের মধ্য দিয়া পড়িবার সময় লোহার গুঁড়াগুলি কেন এই ভাবে নিজেদের সাজাইয়া লইল? আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য কর। একটা তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চলিতেছে। একটা শক্ত কাগজ ভেদ করিয়া তারটিকে যাইতে দাও। কাগজের উপর পূর্ব্বের মত কতকগুলি লোহার গুঁড়া রাখিয়া কাগজটিকে পাশ হইতে ঠুকিয়া দাও। দেখিবে গুঁড়াগুলি তারটির চতুর্দ্দিকে বিচিত্র রকম বৃত্তাকারে নিজেদের সাজাইয়া লইতেছে। এই রকম অনেক ঘটনা তোমাদের বলিতে পারি যেখানে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় শূন্য স্থানে আসিবার সময়ও সমস্ত পদার্থ কোনও অদৃশ্য শক্তির কবলে পড়িয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে শূন্যস্থান একেবারেই শূন্য নহে। তড়িৎ, চুম্বক ইত্যাদি নানাজাতীয় পদার্থের উপর ইহা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিবার ক্ষমতা রাখে। তাই শূন্য স্থানকে শূন্য না বলিয়া শক্তিক্ষেত্র নাম দেওয়াই অধিক সমীচীন। বিদ্যুতের শক্তি, চুম্বকের শক্তি সমস্ত সঞ্চিত হইয়া থাকে এই শূন্য স্থানে বা শক্তিক্ষেত্রে।

বৈজ্ঞানিকেরা এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন যে পৃথিবীর যাবতীয় শক্তি সঞ্চিত হইয়া থাকে এই শক্তিক্ষেত্রে। কিন্তু কি ভাবে তা সঞ্চয় হয় সে সম্বন্ধেও তাঁরা নীরব নন্। ধনুক লইয়া খেলা তোমরা অনেকেই করিয়াছ বা করিয়া থাক। তীর ছুড়িবার সময় তাহার কাঠের অংশটিকে বাকাইয়া দাও। ধনুকের এই অংশ বাকিয়া গিয়া তোমার শরীরের কতকটা শক্তি নিজের মধ্যে করিয়া লয়। ইংরাজীতে ইহাকে strained হইয়া যাওয়া বলে। একটা ইস্পাতের টুকরাকে বাকাইয়া লও। ছাড়িয়া দিলে ইহা আবার নিজে নিজেই সোজা হইয়া যায়। ইস্পাত নিজের strained অবস্থা মুক্ত হইয়া লয়। ঘড়ির মধ্যে একটা ইস্পাতের স্প্রিং থাকে। এই স্প্রিংটিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তাহার মধ্যে strain সৃষ্টি করা হয় ও এই ভাবে তাহার মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। আর এই সঞ্চিত শক্তি দিয়া ঘড়ি চালান হয়। মোট কথা এই উদাহরণগুলি হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে কোথাও strain সৃষ্টি করিতে পারিলে তাহাতে শক্তি সঞ্চিত হইয়া পড়ে। শক্তিক্ষেত্রের মধ্যে strain সৃষ্টি হইয়া তাহাতে শক্তি সঞ্চিত হইয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন এই যে কে এইরূপ strain সৃষ্টি করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকের উত্তর—জগতে যা কিছু সমস্তই এই শক্তিক্ষেত্রের মধ্যে নিজের নিজের ভাবে strain সৃষ্টি করে। ইলেক্‌ট্রন, পসিট্রন ইত্যাদি বিদ্যুতের কণা একভাবে strain সৃষ্টি করে। চুম্বকত্ব যে সব পদার্থের মধ্যে আছে তাহারা আর একভাবে strain সৃষ্টি করে। যে কারণে সমস্ত জিনিষের মধ্যে ভার (mass) উৎপন্ন হয় তাহা আর একভাবে ইহারই

মধ্যে sratin জন্মায়। বিদ্যুৎ এবং চুম্বক যে ভাবে ইহার মধ্যে strain জন্মায় বৈজ্ঞানিকেরা বলেন আলোর সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে একটা বিদ্যুতের কণা তাহার চতুর্দ্দিকের ক্ষেত্রে strain আনিয়া দেয়। এই strain-এর একটা স্বরূপ আছে। কারণ প্রত্যেক বিদ্যুতের কণা (Electron) ঠিক একই ভাবে strain আনে। যদি শক্তিক্ষেত্রের মধ্যে কোনও উপায়ে সেই রকম strain উৎপন্ন হয় তবে তৎক্ষণাৎ সেখানে বিদ্যুতের কণা দেখা দেয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে শক্তিক্ষেত্রের এই বিশেষভাবে দুমড়াইয়া থাকা আর বিদ্যুতের কণা হওয়া মোটামুটি একই কথা। পাশের ছবিতে ভিতরের চক্রটি হইল একটি বিদ্যুতের কণা আর রেখাগুলি হইল বিদ্যুতের কণাটি থাকার জন্য শক্তিক্ষেত্রের বিদ্যুৎ জাতীয় strain রেখা। দুইটা চুম্বক রাখিলে শক্তিক্ষেত্রে যে চুম্বক জাতীয় strain উৎপন্ন হয় তাহা ছবিতে দেখানো হইয়াছে।

এই বিদ্যুতের কণাটি চলিতে আরম্ভ করিলে strain রেখাগুলি মোটামুটি অপরিবর্দ্ধিতই থাকে। কিন্তু ইহার সঙ্গে তখন চুম্বক জাতীয় রেখার আবির্ভাব হয়। কিন্তু চলিতে চলিতে বিদ্যুতের কণাটির গতি পরিবর্দ্ধিত হইলে চুম্বক জাতীয় strain-টা পুরা দুমড়াইয়া গিয়া নিজের সহিত নিজেই মিশিবার চেষ্টা করে। যদি কখনও কোথাও মিশিয়া যায় তখন তাহার সহিত মূল বিদ্যুতের কণাটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় শক্তিক্ষেত্রের এই strain-টি তখন শক্তিক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়। এই-যে বস্তুটি বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিতে আরম্ভ করে তাহাই হইল **আলো**।
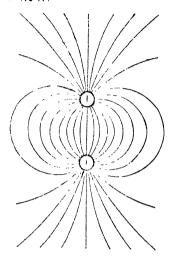
অতএব তোমরা এই তত্ত্বটি জানিলে যে বিদ্যুতের অণুর গতি পরিবর্ত্তিত হইলে তাহার চতুর্দ্দিকে শক্তিক্ষেত্রের strain যাহা বিদ্যুতের কণাটির সঙ্গে সংযোজিত হইয়াছিল তাহার কতকটা অংশ বিদ্যুতের কণাটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আলো হইয়া চলিতে থাকে। তোমরা জান যে আলো নানা রকমের আছে। গামা আলো, রঞ্জন আলো, দৃশ্য আলো, উত্তাপ আলো আর রেডিও আলো—এই গুলি তাহাদের মধ্যে প্রধান। বিদ্যুতের গতি কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইলে এই বিভিন্ন রকমের আলোর সৃষ্টি হয় তাহা এইবার বলি। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তোমাদের আর একটি বিষয় সম্বন্ধে একটু জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া লইতে হইবে। সে বিষয়টি হইল আণবিক গঠন—অর্থাৎ কি ভাবে অথবা কি উপায়ে অণু তৈয়ারী হইয়াছে।

একটা অণু বা atom কে বুঝিতে হইলে তাহাকে তিনটা ভাগে বিভক্ত করিয়া লইলে তাহা

বুঝিবার সুবিধা হইবে। প্রথমে মনে কর অণুর কেন্দ্র স্থান। অণুর সমস্ত ভার (mass) বা ওজন থাকে এই কেন্দ্র স্থান বা কেন্দ্রিণের (nucleus) মধ্যেই। এই কেন্দ্রিণের মধ্যে পসিটিভ বিদ্যুৎই ভর্ত্তি থাকে—নেগেটিভ একটুও নাই। কেন্দ্রিণটি নিজে একটি অখণ্ড বস্তু নহে ইহাও অনেকগুলি কণিকা দিয়া গঠিত। এই কেন্দ্রিণ হইতে অনেক দূরে কেন্দ্রিণকে মধ্যে রাখিয়া অনেকগুলি ইলেকট্রণ চক্রাকারে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই ইলেকট্রণ গুলির চক্রাকারে ঘুরিবার একটি রীতি আছে। প্রত্যেক
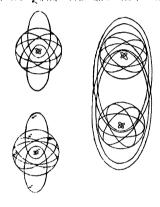
ইলেকট্রণের একটি নিজস্ব চক্র আছে। সে এই চক্র হইতে সাধারণতঃ বাহিরে যায় না। অর্থাৎ প্রত্যেক কেন্দ্রিণকে বেষ্টন করিয়া অনেকগুলি ঘুরিবার কক্ষ বা চক্র থাকে আর এই কক্ষ বা চক্রগুলি ইলেকট্রণ দিয়া ভর্ত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু যতগুলি চক্র থাকে তাহাদের সবগুলি ইলেকট্রণ দিয়া ভর্ত্তি হয় না। বাহিরের অনেকগুলি কক্ষ খালিই থাকে। অণু বা atom হইল কেন্দ্রিণ, ইলেকট্রণ দিয়া ভর্ত্তি কক্ষ, ও খালি কক্ষা এই সমস্ত লইয়া একটি ব্যাপার।

কেন্দ্রিণের মধ্যে যে বিদ্যুৎ থাকে তাহা ঠিক কিভাবে থাকে তাহা এখনও স্পষ্ট ভাবে জানা যায় নাই। কিন্তু এইখানকার বিদ্যুৎ তাহার গতি বা অবস্থা পরিবর্ত্তন করিবার কালে শক্তিক্ষেত্রের মধ্যে যে strain ছড়াইয়া দেয় তাহা আমাদের কাছে গামা রশ্মি হইয়া দেখা দেয়। কক্ষা বা চক্রের মধ্যে যে ইলেকট্রণ গুলি ঘুরিতে থাকে ঘুরিবার সময় তাহারা কোনও strain ছড়াইতে পারে না। কিন্তু কোনও প্রক্রিয়াতে একটা কক্ষ যদি ইলেকট্রণ হীন হইয়া পড়ে তবে সে ইলেকট্রণ হীন কক্ষাতে নিকটস্থ অপর কক্ষা হইতে ইলেকট্রণ ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই ঝাঁপাইয়া পড়িতে গিয়া সেই ইলেক্-ট্রণটি চতুর্দ্দিকের শক্তিক্ষেত্রে কতকটা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া দেয়। রঞ্জন-রশ্মি তৈয়ারী হইবার ইহাই হইল ব্যবস্থা। এই অণুটি (atom) সব থেকে বাহিরে থাকিয়া যে ইলেকট্রণটি চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে সে সুবিধা পাইলে যে কক্ষাগুলি ভর্ত্তি নাই তাহাতে অনেক সময় চলিয়া যায়। গিয়া অবশ্য থাকিতে পারে না তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসে। ফিরিয়া আসিবার সময় সেও তাহার চতুর্দ্দিকে শক্তিক্ষেত্রে আলোড়ন উৎপন্ন করে। এই আলোড়নই আমাদের কাছে দৃশ্য আলোক, বেগুনী আলোক আর ultra violet আলো হইয়া প্রকাশ পায়। কিছু অতি লাল আলোও এইভাবে তৈয়ারী হইয়া থাকে। উত্তাপ রশ্মি তৈয়ারী হইতে সামান্য আরও একটু অন্যরকমের আয়োজনের প্রয়োজন হয়—কারণ তাহা প্রধানতঃ তৈয়ারী হয় অণু (atom) একত্র হইয়া কণা তৈয়ারী হইলে সেই কণা হইতে। তাহা কিভাবে হয় এই বার বলিতেছি।

দুইটি বা ততোধিক অণু একত্রিত হইতে পারে এই ভাবে অণু একত্রিত হইলে তাহা হইতে সকল প্রকার কণা (molecule) তৈয়ারী হয়। যে অণু দিয়া কণাটি তৈয়ারী হইল সে অণুগুলির কেন্দ্রিণ-গুলি মিশ খাইয়া একটা কেন্দ্রিণে
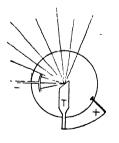
পরিণত হয় না—একটা বিশেষ ব্যবধানে থাকিয়া স্পন্দিত হইতে থাকে। রেডিও রশ্মিও তৈয়ারী হয় এই রূপই এক উপায়ে। কিন্তু রেডিও রশ্মির বেলা আর প্রাকৃতিক অণু বা কণার প্রয়োজন হয় না।

বাঙ্গলার ইতিহাস

শেরখাঁসূর ও হুমায়ুন বাদশা

৩৩০২ পৃষ্ঠার পর

শেরখাঁর পরিচয় এরূপ---ইঁহার প্রকৃত নাম ফরিদ। ইঁহার পিতামহ ইব্রাহিম স্থর ভারতবর্ষে আসিয়া দিল্লী জেলার অন্তর্গত হিস্‌সারে ফিরোজা নামক স্থানে বাস করেন। এইখানে আনুমানিক ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ফরিদের জন্ম হয়। যৌবনে নিজ হস্তে একটা বাঘ মারিয়া শেরখাঁ উপাধি পাইয়াছিলেন। ফারসী ভাষায় বাঘকে শের বলে। ফরিদের পূর্ব্ব পুরুষেরা আফগানিস্থানের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহারা স্থরবংশীয়। ফরিদের পিতামহ ইব্রাহিম খাঁ স্থর প্রথমে ভারতবর্ষে আসেন। ফরীদের পিতা হসন খাঁ জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা জামালখাঁর নিকট হইতে বিহারের সাসেরাম প্রভৃতি তিনটী পরগণা জায়গীর পাইয়াছিলেন। সেকালে সৈন্যদিগের ভরণপোষণের জন্য জায়গীর দেওয়া হইত। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে জায়গীর প্রদাতাকে সাহায্য করিবার জন্য জায়গীরদারকে ঐ সকল সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইতে হইত। হসন খাঁ ফরীদের বিমাতার জন্য তাঁহাকে সেরূপ ভালবাসিতেন না, ফরিদ পিতার নিকট হইতে উপযুক্তরূপ সাহায্যও পাইতেন না। সেইজন্য তিনি পিতার নিকট হইতে জৌনপুরে জমালখাঁর নিকট চলিয়া যান। হসন্ তাঁহাকে আবার ফিরাইয়া আনেন এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে ফরীদকে দুইটী পরগণার শাসনভার প্রদান করেন। ফরীদ সুশাসন দ্বারা পরগণা দুইটীর রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। হসন আবার ফরীদের বিমাতার অনুরোধে তাঁহার হস্ত হইতে পরগণা দুইটী ফিরাইয়া লন। ফরীদ আবার গৃহত্যাগ করিয়া কানপুরে গমন করেন। তথা হইতে কোন কোন আত্মীয়ের সহিত আগরায় বাদশাহ ইব্রাহিম লোদীর দরবারে উপস্থিত হন। সে সময়ে আগ্রা দিল্লীর বাদশাহদিগের রাজধানী ছিল। এই সময়ে হসন্ খাঁর মৃত্যু হওয়ায় ফরীদ বাদশাহের দরবার হইতে পিতার প্রাপ্ত জায়গীর লাভের আদেশ-পত্র লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

মোগল পাঠানে যুদ্ধ

ইহার পরেই ভারতবর্ষের সিংহাসন লইয়া পাণিপথ ক্ষেত্রে মোগল পাঠানে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় তাহাতে মোগলেরা জয়লাভ করে ও ভারত সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। পাঠানেরা আফগানিস্তানের আর মোগলেরা মোঙ্গোলিয়া প্রদেশের অধিবাসী। মোগলবীর বাবরশাহ আফগানিস্তানের

সোনা মসজিদ-গৌড়

কাবুল প্রভৃতি অধিকার করিয়া অবশেষে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন এবং পাণিপথ ক্ষেত্রে পাঠান বাদশাহ ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়া ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ইব্রাহিম লোদীর মৃত্যুর পর ফরীদ বিহারের শাসনকর্তা সুলতান মহম্মদের আশ্রয়ে উপস্থিত হন। শেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের অনুরোধে তাঁহাদের আত্মীয় মহম্মদ খাঁ-সুর শেরখাঁর জায়গীর অধিকার করিয়া লন। শেরখাঁ কড়ামাণিকপুরের শাসনকর্তার সাহায্যে নিজ জায়গীর পুনরাধিকার করিয়া মহম্মদ খাঁ সুরের জায়গীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লন। পরে তাঁহাকে তাহা ফিরাইয়া দেন।

বিহার ও গৌড়

শেরখাঁ আবার আগরায় গমন করিয়া মোগল-বাদশাহ বাবর শাহের দরবারে উপস্থিত হন এবং মোগলদিগের রীতিনীতি ও গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া আসেন। সাসেরামে ফিরিয়া আসিয়া শেরখাঁ আবার সুলতান মহম্মদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবশেষে তাঁহার মৃত্যুর পর সুলতানের অল্প বয়স্ক পুত্র জলালখাঁর অভিভাবক নিযুক্ত হন। জলালখাঁর আত্মীয়গণ কিন্তু শেরখাঁর বিরোধী হইয়া উঠেন। তাঁহাদেরই পরামর্শে জলালখাঁ গৌড়রাজ্য আক্রমণের ছলে বিহার পরিত্যাগ করিয়া গৌড়েশ্বর সুলতান গিয়াসউদ্দীন মামুদ শাহের

নিকট গমন করেন। তখন শেরখাঁ বিনা যুদ্ধেই বিহার প্রদেশের অধীশ্বর হন। তাহার পর গৌড়েশ্বর মামুদশাহ অনেক সৈন্যসামন্ত সহ সেনাপতি ইব্রাহিমখাঁকে শেরখাঁর বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন। শেরখাঁর সহিত যুদ্ধে ইব্রাহিমখাঁ পরাজিত ও নিহত হন। শেরখাঁ গৌড়রাজ্যের কতক অংশ অধিকার করিয়াও লন। তাঁহার আদেশে তাঁহার পুত্র জলালখাঁ অন্যান্য সেনাপতি ও সৈন্যসহ গৌড় অধিকার করিতে অগ্রসর হন। তাঁহারা গৌড়রাজ্যে উপস্থিত হইলে মামুদ তাঁহাদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া গৌড় নগরের প্রাচীর ও পরিখার মধ্যে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হন। অবশেষে তিনি মোগল বাদশাহ হুমায়ুনের নিকট সাহায্য চাহিয়া দূত পাঠাইয়া দেন।

বাদশাহ হুমায়ুন

হুমায়ুন বাবর শাহের পুত্র। বাবরের মৃত্যুর পর তিনি দিল্লীর বাদশাহ হইয়াছিলেন। শেরখাঁ কাশীর নিকট চুনার দুর্গ অধিকার করিয়া লন। হুমায়ুন চুনার দুর্গ অবরোধ করিয়া তাহা অধিকার করেন। ওদিকে শেরখাঁ রোহতাশ নামে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ রাজা হরেকৃষ্ণ-রায়ের কেশরীর নিকট হইতে অধিকার করিয়া লন। শেরখাঁর সেনাপতিগণ গৌড়নগরও অধিকার করেন। গৌড়ের সুলতান মামুদশাহ দক্ষিণ বঙ্গে পলাইয়া যান। তাঁহার পুত্রগণকে শেরখাঁর পুত্র জলাল খাঁ বন্দী করেন। শের খাঁ মামুদ শাহের পিছে পিছে গমন করিলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে মামুদশাহ পরাজিত ও আহত হন। হুমায়ুন গৌড়ের দিকে অগ্রসর হইলে শের খাঁ রোহতাশ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মামুদশাহ পথিমধ্যে হুমায়ুনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সময়ে শের খাঁর পুত্র জলাল খাঁর আদেশে মামুদশাহের দুই পুত্র নিহত হইলে, মামুদশাহ তাহা শুনিয়া শোকে ও দুঃখে পথিমধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন। হুমায়ুন তখন গৌড়ে উপস্থিত হন। তাঁহার পূর্ব্বে শেরখাঁ গৌড় নগর হইতে লুণ্ঠিত ধন-সম্পত্তি রোহতাশ দুর্গে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। হুমায়ুন গৌড় অধিকার করিয়া তাহার জন্নতাবাদ নাম দিয়াছিলেন। তাহার পর তথায় একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করাইয়া হুমায়ুন আগরার দিকে অগ্রসর হইলে শেরখাঁ রোহতাশ দুর্গ হইতে বাহির হইয়া হুমায়ুনকে আক্রমণ করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব হইয়াছিল বটে কিন্তু শেরখাঁ একদিন রাত্রি শেষে সহসা মোগল-শিবির আক্রমণ করিয়া বসিলে মোগলেরা পরাজিত হয়। হুমায়ুন প্রাণ ভয়ে পলায়ন করেন। তাঁহার বেগম ও অন্যান্য রমণীগণ বন্দী হইয়া রোহতাশ দুর্গে যাইতে বাধ্য হন। শেরখাঁ অবশেষে কিন্তু তাঁহাদিগকে সসম্মানে হুমায়ুনের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

শেরখাঁর শেষ দিন

এদিকে গৌড়ের মোগল-শাসনকর্ত্তা শেরখাঁর সেনাপতিগণের নিকট পরাজিত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন। শেরখাঁ গৌড় অধিকার করিয়া ফরীদ-উদ্দীন শেরশাহ্ উপাধি ধারণ করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তাহার পর তিনি বাদশাহ হুমায়ুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। হুমায়ুন আগরা হইতে অগ্রসর হইয়া কনোজের নিকট উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। তাহাতে হুমায়ুন পরাজিত হইয়া আগরায় পলায়ন করেন। শেরশাহ তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আগরায় গমন করিলে হুমায়ুন আগরা হইতে লাহোরের পথে তথা হইতে পলায়ন করিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। শেরশাহ দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তিনি অনেক দেশ জয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে কালিঞ্জর নামক দুর্গ জয় করিতে গিয়া সহসা বোমার আগুনে দগ্ধ হইয়া শেরশাহ প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃতদেহ আনিয়া সাসারামে সমাহিত করা হয়। তথায় তাঁহার সমাধি আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। শেরশাহের পর তাঁহার পুত্র জলাল খাঁ ইসলাম শাহ উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ইসলাম শাহের পর সুর বংশীয়েরা আর অধিক দিন রাজত্ব ভোগ করিতে পারেন নাই। হুমায়ুন আবার দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া লন। এদিকে গৌড়ের শাসনকর্ত্তারা ও স্বাধীনতা অবলম্বন করেন।

দেড় হাজার ক্রোশ পথ

শেরশাহ যে কয় বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তিনি অনেক লোকহিতকর কার্য্যের

অনুষ্ঠান করেন। তিনি উৎপন্ন শস্যের এক চতুর্থাংশ রাজকর স্থির করিয়া বাঙ্গলার ভূমি রাজস্বের ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়া দেন। তাহার পর আকবর বাদশাহের সময় সে বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ ভাবেই হইয়াছিল। সে কথা তোমাদিগকে পরে বলিব। শেরশাহ বাঙ্গলাদেশকে অনেক ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগের জন্য এক একজন আমীন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলের উপরে একজন প্রধান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ছিল। প্রতি সরাইয়ে সংবাদ লইয়া যাইবার জন্য দুইজন অশ্বারোহী ও কয়েকজন পদাতিক নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে অশ্বারোহী দ্বারা সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল না। এই অশ্বারোহী দ্বারা সংবাদ লইয়া যাওয়াকে "ঘোড়ার ডাক" বলিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন শেরশাহের পুত্র ইসলাম শাহ এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শেরশাহের সময় দেশে দস্যু-তস্করের ভয় নিবারিত হইয়াছিল। শেরশাহ এরূপ
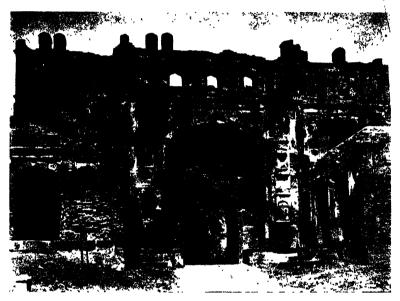
লুকোচুরি—তোরণ গৌড়

ন্যায়পরায়ণ ছিলেন যে নিজের পুত্র অপরাধ করিলে তাঁহাকেও সামান্য অপরাধীর ন্যায় দণ্ড দিতেন।

হন। শেরশাহ অনেক মস্‌জীদাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কোরাণ পাঠের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার অদ্ভুত কীর্ত্তি সুবর্ণগ্রাম হইতে পঞ্জাবের সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত প্রায় দেড় হাজার ক্রোশ দীর্ঘ এক রাজপথ নির্ম্মাণ। এই রাজপথের দুই পার্শ্বে বৃক্ষ রোপিত হইয়া পথিকগণকে ফলও ছায়া দান করিত। এক এক ক্রোশ অন্তর হিন্দু-মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে এক একটী সরাই ও কূপের বন্দোবস্ত করিয়া পথিকগণের বিশ্রামের সুব্যবস্থা করা হইয়া-

কোচবিহার রাজ্য

তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, হোসেন শাহ আসামের কামতাপুর রাজ্য জয় করার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। ইহার কতক অংশ তাঁহার অধিকারে আসে। কামতাপুর রাজ্যের পতনের পর উত্তর বঙ্গে একটী হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কোচ

জাতীয় বিশ্বসিংহ বা বিশুসিংহ এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই কোচবিহার রাজ্য। এই কোচবিহার রাজ্য এখনও পর্য্যন্ত কতক পরিমাণে স্বাধীন ভাবে শাসিত হইয়া থাকে। বিশ্বসিংহের পুত্র মল্লদেব বা নরনারায়ণের সময় তাঁহার ভ্রাতা ও সেনাপতি শুক্লধ্বজ বহুদূর পর্য্যন্ত কোচবিহার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কামরূপ, কাছাড়, মণিপুর প্রভৃতি জয় করিয়া ওই সকল প্রদেশের রাজাদিগকে বশে আনিয়াছিলেন। শুক্লধ্বজ ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া জয়ন্তিয়া পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লন।

সোলেমান খাঁ কররাণীর শাসনকালে নরনারায়ণ গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সোলেমানের সেনাপতি কালাপাহাড় শুক্লধ্বজকে পরাজিত করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত অধিকার করেন। সোলেমান খাঁ কোচ রাজধানী পর্য্যন্ত অগ্রসর হন, কিন্তু তাঁহার রাজ্যে গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। সোলেমানের পুত্র দায়ুদ খাঁর বিরুদ্ধে নরনারায়ণ দিল্লীর সম্রাট আকবর বাদশাহকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে, দায়ুদখাঁর পরাজয়ের পর তাঁহার রাজ্য আকবর ও নরনারায়ণ উভয়ে মিলিয়া ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। দায়ুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রার সময় শুক্লধ্বজ পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র রঘুদেব তাহার পর কোচ-সৈন্যের নায়ক হইয়াছিলেন।

নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের কোচবিহার রাজ্য অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাঁহার অনেক পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য, হস্তী ও রণতরী ছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ আকবর বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিলে, তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ বাঙ্গলার মোগল সুবাদার রাজা মানসিংহের সাহায্যে তাঁহাদিগকে দমন করিয়াছিলেন। রাজা মানসিংহ কোচবিহারের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়াও শুনা যায়।

কালাপাহাড়

সোলেমান খাঁ কররাণীর সেনাপতি কালাপাহাড়ের কথা তোমাদিগকে বলিতেছি। প্রথমে সোলেমান কররাণীর কথাই বলিতেছি। শেরশাহ ও তাঁহার বংশধরেরা দিল্লীর বাদশাহ হইলে গৌড়ে তাঁহাদের অধীনে একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শেরশাহের পুত্র ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর গৌড়ের শাসনকর্ত্তা মহম্মদ খাঁ সূর স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। সেই সময়ে সোলেমান খাঁ কররাণী বিহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনিও স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে ত্রুটী করেন নাই। মহম্মদ খাঁ সূরের পুত্র ও পৌত্রের গৌড়ের রাজত্বের অবসান হইলে সোলেমান খাঁ কররাণী গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়া লন। কালাপাহাড় তাঁহার প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি আফগান জাতীয় ছিলেন।

কালাপাহাড় উড়িষ্যা জয় করিয়া সোলেমান কররাণীর অধীনে আনিয়াছিলেন। উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেব গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিয়া সপ্তগ্রাম অধিকার করিয়া লন। তাহার পরে সোলেমান খাঁ কালাপাহাড়কে উড়িষ্যা অধিকার করিতে পাঠাইয়া দেন। মুকুন্দদেব একজন বিদ্রোহী সামন্তের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলে কালাপাহাড় বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করেন এবং তাহারা যুদ্ধে নিহতও হয়। কালাপাহাড় তখন উড়িষ্যা অধিকার করেন। সোলেমানের পুত্র দায়ুদ খাঁর সময়ে কালাপাহাড় মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। সোলেমানের সময় হইতে উড়িষ্যার হিন্দু রাজ্যের অবসান হয় এবং তাহা মুসলমানদিগের অধিকারে আসে।

মোগল-বিজয়

সোলেমান কররাণি মোগল বাদশাহ আকবরশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র দায়ুদ খাঁ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। সোলেমানের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরে আফগান সর্দ্দারেরা তাঁহাকে হত্যা করিয়া সোলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দায়ুদকে সিংহাসন প্রদান করেন। সে সময়ে টাঁড়ানগরী বাঙ্গালার রাজধানী হইয়াছিল। সোলেমান গৌড় হইতে টাঁড়ায় রাজধানী লইয়া যান। সিংহাসনে বসিয়া দায়ুদ খাঁ আপনার সহস্র সহস্র অশ্বারোহী পদাতি সৈন্য, অসংখ্য কামান, হস্তী এবং পরিপূর্ণ রাজকোষ দেখিয়া স্বাধীন হইবার অভিপ্রায়

করিলেন। তিনি আপনাকে বাঙ্গালার স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া মোগল বাদশাহ আকবর শাহের রাজ্য মধ্যে নানারূপ উপদ্রব করিতে লাগিলেন। তখন মোগল সেনাপতি মুনিম খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে আসিলেন। দায়ুদের সেনাপতি লোদী খাঁ মুনিম খাঁর সহিত সন্ধি করিলেন। ইহাতে আকবর বা দায়ুদ কেহই সন্তুষ্ট হন নাই। এই সময়ে কুচক্রীর কুমন্ত্রণায় ভ্রান্ত হইয়া দায়ুদ লোদীখাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। তাহার পর আবার তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

মুনিম খাঁ ও রাজা তোডরমল্ল দায়ুদ খাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে দায়ুদ রাজধানী টাঁড়ায় গিয়া কিন্তু সেই সময়ে গৌড়ে এক ভীষণ মহামারী উপস্থিত হওয়ায় তাহাতেই মুনিম খাঁর প্রাণ-বিয়োগ হয়। দায়ুদ আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া বাঙ্গালার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং রাজধানী টাঁড়া অধিকার করিয়া লন। তিনি বিহার প্রদেশ পর্য্যন্ত ও ধাবিত হইয়াছিলেন। আকবরশাহ তখন সেনাপতি খাঁজাহানকে বাঙ্গালার সুবেদার নিযুক্ত করিয়া পাঠান। খাঁজাহান ক্রমে অগ্রসর হইয়া রাজমহলে উপস্থিত হন। তথায় দায়ুদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে দায়ুদ পরাজিত ও ধৃত হন। অবশেষে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া সেই মুণ্ড বাদশাহের নিকট

গৌড়ের বারদুয়ারীর মসজিদের একটি দৃশ্য

আশ্রয় লন। মোগল সৈন্য টাঁড়ার দিকে অগ্রসর হইলে দায়ুদ আপনার ধনসম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া উড়িষ্যার দিকে পলাইয়া যান। প্রথমে রাজা তোডর-মল্ল, পরে মুনিম খাঁও তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া মেদিনীপুর জেলায় দাঁতনের নিকটস্থ মোগলমারী নামক স্থানে যুদ্ধে দায়ুদকে পরাস্ত করেন। দায়ুদ আবার সন্ধি করিয়া বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া লন। তাঁহাকে কেবল উড়িষ্যা প্রদেশ মাত্র ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মুনিম খাঁ ফিরিয়া আসিয়া টাঁড়া হইতে আবার গৌড়ে রাজধানী লইয়া আসেন।

পাঠাইয়া দেওয়া হয়। দায়ুদের সহিত বাঙ্গলায় পাঠান রাজত্বের ও অবসান ঘটে।

গৌড়ে মহামারী

তোমরা শুনিয়াছ যে দায়ুদ খাঁর সহিত যুদ্ধের সময় মোগল সেনাপতি মুনিম খাঁ গৌড়ের মহামারীতে প্রাণত্যাগ করেন। আমরা এক্ষণে সেই ভীষণ মহামারীর কথা বলিতেছি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সোলেমান কররাণী বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী গৌড় হইতে টাঁড়ায় রাজধানী লইয়া যান। গৌড় একটী

প্রাচীন নগর। অনেক দিন হইতে ইহার স্বাস্থ্য খারাপ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সেই জন্য সোলেমান সেখানে থাকা নিরাপদ মনে না করিয়া টাঁড়ায় রাজধানী লইয়া যান। মুনিম খাঁ কিন্তু গৌড়ের অবস্থান ও সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ সকল দেখিয়া আবার গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করিতে অভিপ্রায় করেন। তিনি সৈন্য সামন্ত ও রাজকর্মচারীদিগকে টাঁড়া হইতে গৌড়ে যাইতে আদেশ দেন।

বড় দর্গা—পাণ্ডুয়া

সে সময়ে বর্ষাকাল। চারিদিক জলে ভাসিতেছিল। গৌড় অনেক দিন হইতে পরিত্যক্ত হওয়ায় জল জমিয়া ভূমি অত্যন্ত সেঁতসেঁতে হইয়া উঠিল। পানীয় জল কাদায় ভরিয়া গেল। বাতাস শীতল হইয়া বহিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নানারূপ পীড়া আসিয়া দেখা দিল। তখন সেখানে এক মহামারী উপস্থিত হইল। প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক মরিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগকে দাহ করা বা কবর দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেরই মৃতদেহ গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিয়াছিল।

বাঙ্গলার রাজস্ব বন্দোবস্ত

মুনিমখাঁর পর খাঁ জাহানের হস্তে বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নরপতি দায়ূদখাঁর পতন হইলে, বাঙ্গলা দেশ মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তখন হইতে বাঙ্গলায় মোগল শাসনের আরম্ভ। খাঁ জাহানই বাঙ্গলার প্রথম শাসনকর্তা বা সুবেদার নিযুক্ত হন। খাঁ-জাহানের পর মুজঃফর খাঁ এবং তাহার পর রাজা তোডড়মল্ল সুবেদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অনেক দিন থাকিয়া রাজা তোডড়মল্লের বাঙ্গলাদেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। তিনি শেরশাহের নিকটও কিছুকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। শেরশাহ বাঙ্গলার রাজস্ব বন্দোবস্তের যে চেষ্টা করেন, তোডড়মল্ল সে সকল অবগত ছিলেন। সেই জন্য আকবর বাদশাহ তাঁহাকে বাঙ্গলার রাজস্ব বন্দোবস্তের ভার প্রদান করেন।

তোড়ডমল্ল বাঙ্গলার ভূমির বিবরণ ও পরিমাণ জানিয়া লইয়া তাহাকে কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত করেন। তাঁহার বৃহত্তর বিভাগগুলি সরকার ও ক্ষুদ্রতর বিভাগগুলি পরগণা বা মহাল নামে অভিহিত হয়। কতকগুলি গ্রাম বা মৌজা লইয়া পরগণা ও কতকগুলি পরগণা লইয়া সরকার গঠিত হইয়াছিল। এইরূপে সমস্ত বঙ্গরাজ্য ১৯ সরকার ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত হয়। বঙ্গরাজ্যের ভূমিকে খালসা ও জায়গীর নামে অভিহিত করা হইত। যাহার আয় রাজকোষে আসিত, তাহাকে খালসা ও যাহার আয়ে রাজকর্ম্মচারীগণের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত, তাহাকে জায়গীর বলিত। তোড়ড়মল্ল খালসা ভূমির ৬৩, ৪৪, ২৭০, টাকা ও জায়গীরভূমির ৪৩, ৪৮, ৮৯২, টাকা মোট ১,০৬, ৯৩, ১৫২, টাকা জমা স্থির করেন। তিনি এই জমা বন্দোবস্তের যে কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাকে 'আসল-জমা-তুমার' বলে। এইরূপে রাজা তোডড়মল্ল শেরশাহের অসম্পূর্ণ বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন।

মোগল-পাঠান

বাঙ্গলা দেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও, এখান হইতে পাঠানদিগের ক্ষমতা একেবারে লোপ পায় নাই। দায়ুদখাঁর পতন হইলেও অন্যান্য পাঠান-সর্দ্দারেরা সহজে মোগলদিগের অধীনতা স্বীকার করে নাই। উড়িষ্যায় ও উত্তর বঙ্গের ঘোড়াঘাট প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া পাঠানেরা ক্রমাগত মোগলদিগকে বাধা প্রদান করিতেছিল। এই সময়ে মাশুম খাঁ কাবুলী প্রভৃতি কয়েকজন বিদ্রোহী মোগল কর্ম্মচারীও পাঠানদিগের সহিত যোগদান করে। মোগল সুবেদার আজিমখাঁর শাসন সময়ে দায়ুদের প্রধান অনুচর কতুল খাঁ উড়িষ্যায় প্রধান হইয়া উঠিলে, আজিম খাঁ তাঁহার দমনের চেষ্টা
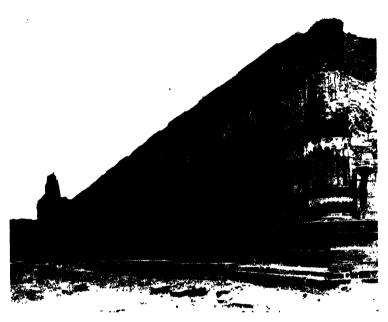
আদিনা মস্‌জিদের এক দিকের প্রাচীর—পাণ্ডুয়া

করেন। সেই সময়ে ঘোড়াঘাটের পাঠানদিগকেও দমন করিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু পাঠানেরা কিছুতেই মোগলদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হয় নাই। তাহার পর রাজা মানসিংহ বাঙ্গলার সুবেদার হইয়া আসিলে, পাঠানদিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। মানসিংহ কতুল-খাঁকে দমন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ পাঠানদিগের হস্তে বন্দী হইয়া বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের কৌশলে মুক্তিলাভ করেন। এই সময়ে কতুলখাঁর মৃত্যু হইলে পাঠানেরা বাধ্য হইয়া মোগলদিগের সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হয়।

কিছুকাল পরে আবার পাঠানেরা বিদ্রোহাচরণ করিতে আরম্ভ করে। মানসিংহ তাহাদিগকে দমন করিতে উড়িষ্যা পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং তাহাদিগকে পরাজিতও করেন। ইহার পর মানসিংহ বাদশাহের আদেশে বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিলে পাঠানেরা ওসমান খাঁকে সর্দার মনোনীত করিয়া বাঙ্গলা রাজ্য পর্যন্ত ধাবিত হয়। বাদশাহ আবার মানসিংহকে বাঙ্গলায় পাঠাইয়া দেন। মুর্শিদাবাদ জেলার শেরপুর আতাই নামক স্থানে ওসমানের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ওসমান পরাজিত হন। তাহার পর পাঠানেরা উড়িষ্যা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। ওসমানের দল কিছুকাল শান্তভাবে রহিয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য পাঠানদিগের সহিত মোগলদিগের সঙ্ঘর্ষ চলিতে থাকে।

ইস্‌লাম খাঁর শাসন সময়ে ওসমান আবার পূর্ব্ববঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মোগল-সেনাপতিদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সেই যুদ্ধে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করেন এবং বাঙ্গলায় পাঠান বিদ্রোহেরও অবসান হয়। অন্যান্য পাঠানরাও ক্রমে ক্রমে পরাজিত হইয়াছিল। এই মোগল-পাঠানের যুদ্ধ লইয়া 'মোগল-পাঠান' নামে একটী খেলার সৃষ্টি হইয়াছিল। 'মোগল-পাঠানের' চিহ্ন লুপ্ত হইলে সেই খেলার পট হইতেই তাঁহাদের কথা জানা যাইত। তাই কবি বলিয়াছেন—

"কিছুদিন পরে আর,—বিধির বিধান,
কৌড়াপটে বিরাজিবে মোগল পাঠান।"

গৌড়-রাষ্ট্রের শেষ স্বাধীন নরপতি

দাউদ্ শাহ্ ছিলেন গৌড়রাজ্যের শেষ স্বাধীন নরপতি। সোলেমান্ বা বায়াজিদ্ আপনার নামে কোনও মুদ্রা মুদ্রিত করেন নাই। দাউদ্ কিন্তু নিজ নামে রজত মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন। শেরশাহ ও ইস্‌লাম শাহের অনুকরণে তিনি আরবী ও হিন্দী ভাষায় রৌপ্য মুদ্রার প্রচার করেন। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন:-দাউদ শাহের বর্ষ চতুষ্টয় ব্যাপী রাজ্যকালে, কোনও সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না এবং তাহার রাজ্যকালের কোনও শিলালিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। * * দাউদের মৃত্যু হইলেও, মগধে ও গৌড়ে আফগান প্রধান-গণ মোগল সম্রাট্ জালালুদ্দীন্ মহম্মদ্ আকবর বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করেন নাই, গৌড়-বঙ্গ-মগধ দীর্ঘকাল মোগল ও আফগানের রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে করিম্ দাদ্খাঁ, ইব্রাহিম খাঁ, মস্‌নদ্-ই-আলা-ইসা খাঁ, কৎলু খাঁ লোহানী ও ইসা খাঁ লোহানী দীর্ঘকাল স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। গৌড়রাজ্যে, মোগল বাদ্‌শাহগণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে অর্দ্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছিল।"

বার ভূঁইয়া

বাঙ্গলাদেশের স্বাধীন আফ্‌গান রাজত্ব লুপ্ত হইল। বাঙ্গলা দেশের পাঠান ও হিন্দু জমিদারগণ কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়াছিলেন, এমন কি; কেহ কেহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত আপনাদের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখিয়া-ছিলেন। ইঁহারা ইতিহাসে বারভূঁইয়া নামে পরিচিত। বাখরগঞ্জের কন্দর্পনারায়ণ, বিক্রমপুরের কেদার-রায়, ঈশাখাঁ এবং যশোহরের প্রতাপাদিত্যের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের কথা আমরা পরে বলিব।

[এই প্রবন্ধের ছবিগুলি ঈস্টার্ণ বেঙ্গল রেলের সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

চিকিৎসা-বিজ্ঞান

১৫০৭ পৃষ্ঠার পর

বিজ্ঞান, চিকিৎসা—শাস্ত্রের যে কল্যাণ করিয়াছে, তাহা ভাবিলে মনে হয়, এ যেন একটা স্বপ্ন। একদিন যাহা অসম্ভব ছিল, বিজ্ঞান আজ তাহা সম্ভব করিয়াছে। কেমন করিয়া এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্ভব হইল ?—বৈজ্ঞানিক বলেন—গবেষণা এবং সাধনার বলেই তাহা সম্ভব হইয়াছে। মানুষ যেদিন এই পৃথিবীতে আসিয়াছে, সেদিন হইতেই তাহার সঙ্গে সঙ্গেই নানা ভাঙ্গা-গড়ার সৃষ্টি হইয়াছে। সেই আদি যুগ হইতেই মানুষ রোগ আরোগ্যের জন্য যত্ন করিয়াছে, নানা লতা পাতা, ধাতু ও ফুল ফলের মধ্যে জলের ধারা ও সূর্য্যের রশ্মিতে তাহার প্রতিকারের পথ খুঁজিয়াছে। সেই সময় কত যাদু মন্ত্রে বিশ্বাস, কত দেব-দেবীর পূজা, কত রক্ষাকবচ ধারণই না মানুষ করিয়াছে, তবু কি সে প্রকৃত ঔষধের সন্ধান পাইয়াছে ? তাহা নহে—কিন্তু তাহার সাধনার বিরাম কোন দিনই হয় নাই, হয় নাই বলিয়াই আজ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নানা দিক্ দিয়া এত জয়জয়কার !

অস্ত্রচিকিৎসা

মিশর দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই অস্ত্র-চিকিৎসার প্রচলন ছিল। সে কালে বাড়ী বাড়ী সাধারণ রোগ আরোগ্যের জন্য ঔষধের 'পেটারা' থাকিত। মিশরের সব চেয়ে আদি চিকিৎসকের নাম ছিল এমোটেপ্ [Emotep]। ইহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সারা মিশর জুড়িয়া ব্যাপৃত ছিল। অ্যাসিরিয়াতেও প্রায় ঐ সময়ে ক্ষত চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। ক্ষত হইলে, ফোঁড়া হইলে, হাড় ভাঙ্গিলে, চক্ষু রোগ হইলে তাঁহারা চিকিৎসা করিতেন।

গ্রীস দেশের চিকিৎসাশাস্ত্র মিশর ও অ্যাসিরিয়ার পরে খ্যাতিলাভ করে। গ্রীকেরা চিকিৎসা বিদ্যার প্রচুর উন্নতি করেন। তাঁহারাই মুক্ত বায়ু সেবন, সূর্য্য কিরণের রোগ আরোগ্য করিবার ক্ষমতা, ব্যায়াম এবং খাদ্য সম্বন্ধে নানা নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কোসের (Cos) ও এপিডেরাসের (Epiderus) এর সূর্য্যদেবতার মন্দির আজিও সূর্য্যরশ্মি সেবনের উপকারিতার বিষয়

যে গ্রীকেরা জানিতেন তাহা প্রচার করিয়া দিতেছে। হিপোক্রেটিস্ (Hippocrates) এবং ডিয়োক্লেসের

ইমোটেপ্

(Diocles) চিকিৎসা শাস্ত্রের বিষয়ক গ্রন্থাদি আজ পর্য্যন্তও পণ্ডিতেরা সমাদর করিয়া আসিতেছেন। গ্রীকেরা খাদ্য সম্বন্ধে বেশ নিয়ম মানিয়া চলিতেন। প্রতি দিন তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দ্ধারিত কয়েকবার নিয়মিত ভাবে খাওয়া দাওয়া করিতেন।

গ্রীক্ ঐতিহাসিক থুশিদেশ [Thucydides] ইহাদের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সেকালের গ্রীক্-পণ্ডিতেরা যখন যে বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেন, সেদিকে তাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টা ও যত্ন ছিল, এজন্যই গ্রীকৃদের চিকিৎসা-প্রণালী ইউরোপের নানা দেশের লোক গ্রহণ করিল। গ্রীসদেশের পণ্ডিতদের ও খুব নাম হইল।

আরব ও গ্রীক্ চিকিৎসা-শাস্ত্র

৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আরবেরা এডেশা [Edessa] অধিকার করেন। সে সময়ে গ্রীক্ চিকিৎসা-শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় হয়। আরবেরা হিপোক্রেটিশের বইয়ের আরবী ভাষায় অনুবাদ করিলেন। আরবেরা ইউরোপের নানা দেশ জয় করেন—সঙ্গে সঙ্গে গ্রীসদেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের ও প্রচার হইল। বিশেষ করিয়া পশ্চিম ইউরোপের লোকেরা গ্রীকৃদের চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিল। পশ্চিম ইউরোপের লোকেরা বিজয়ী আরবদের কাছ হইতেই চিকিৎসা-বিজ্ঞান লাভ করেন। তারপর নানাদেশে কি ভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞান ছড়াইয়া পড়িল, সে কথা আর নাই বা বলিলাম।

১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে স্বাস্থ্য-বিধান সম্বন্ধে বিধি (Sanitary Act) প্রবর্ত্তিত হয়। তারপর রাজার পর রাজা আসিলেন, বড় বড় বৈজ্ঞানিকের জন্ম হইল, বড় বড় চিকিৎসক
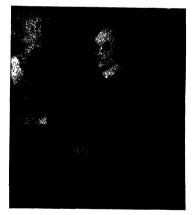
উইলিয়ম হার্বে

হইলেন এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানেরও দিন দিন উন্নতি হইতে আরম্ভ হইল।

প্লেটো ও অ্যারিষ্টোটল যেমন গ্রীসদেশে চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রচারের একটা প্রেরণা জাগাইয়া

দিয়াছিলেন, তেমনি রজার ব্যাকন [Roger Bacon] নামে একজন যাজক খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রচার করেন। সে সময়ে অনেক উদ্ভিদ্‌বিদ, গাছ-পালার ছবি আঁকিয়া তাহাদের দোষ গুণ প্রচার করিলেন। গ্যালিলিও পদার্থবিদ্যার মধ্য দিয়া শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য সেকালের বৈজ্ঞানিকগণকে উপদেশ দিলেন। এলব্রেক্ ডুরার [Albreche, Durer], লেনার্ডো ডে ভিন্সি [Leonardo da vainci] প্রভৃতি বড় বড় চিত্রকরেরা মানুষের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চিত্র অঙ্কিত করিলেন। জন গ্র্যায়াণ্ট [John Graunt] নামে কর্ণহিল নিবাসী একজন কাপড়ের ব্যবসায়ীর মৃত্যু-তালিকা রক্ষা করিবার একটা খেয়াল ছিল। কোন্ ব্যক্তি কি ব্যারামে মারা গেল, তিনি তাহা তাঁহার রোজনামচায় (Diary) লিখিয়া রাখিতেন। তাঁহার এই মৃত্যু তালিকার খাতাখানি চিকিৎসকদের গবেষণার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল।

সেই গ্রীক্‌দের সময় হইতে নানা দেশের পণ্ডিতেরা চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে নানা বই লিখিলেন। ইটালির পাডুয়ার [Padua] বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ নানা বিষয়ে গবেষণা করিয়া পৃথিবীর সব দেশেই খ্যাতি লাভ করেন।

তখন সেখানে নানা দেশ হইতে চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিবার জন্য দলে দলে ছাত্রেরা আসিত। ১৫৪৩-১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাডুয়ার খুবই নাম ছিল।

উইলিয়ম হার্বে

উইলিয়ম হার্বে [William Harvey] নামে একজন ইংরাজ যুবক ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। হৃৎপিণ্ড ও রক্ত-সঞ্চালন সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কি ভাবে আমাদের দেহের সর্ব্বত্র রক্ত চলাচল করে এ-সম্বন্ধে তিনি মানুষের এবং পশুর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া তবে বইখানি লিখিয়াছিলেন। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের চিকিৎসা-বিদ্যালয়েও শরীর-সংস্থান বিদ্যা সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা করেন। ইহার পর উইলিয়ম হার্বে পাড়ুয়াতে যাইয়া বৃদ্ধ অধ্যাপক Fabricus এর নিকট কিছুকাল এ-বিষয়ে উপদেশ লাভ করেন। [হার্বে ১৫৭৮-১৬৫৭ খ্রীঃ] গ্রন্থ প্রকাশের পর চিকিৎসা-জগতে এক নূতন আলো প্রকাশিত হইল। হার্বে রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়া সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রচলিত মতের প্রতিবাদ করিয়া যখন নূতন ভাবে তাঁহার পরীক্ষার ফল প্রকাশ করিলেন তখন বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা অত্যন্ত সমাদরের সহিত তাহা গ্রহণ করিলেন।

হার্বের লিখিত এ্যানটামি গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠার ছবি

ডাক্তার রিচার্ড মিড্

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর সব দেশেই জ্ঞানের রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে। নানা দিকে নানা অভিযান চলিতে থাকে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার লাভ হয়। সে-সময়ে প্রত্যেক দেশের শিক্ষিত-জন-সমাজ নিজ দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য নানাভাবে মন দিলেন সব দেশেরই নানাদিক্ দিয়া উন্নতি হইল। এ সময়ে ইংল্যাণ্ডে যে সব চিকিৎসক বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে রিচার্ড মিড্ (Dr. Richard Mead) ছিলেন একজন। ডাক্তার মিড্ সে-কালে লণ্ডনের বড়লোকদের বাড়ীতে চিকিৎসা করিতেন। দেশের রোগবালাই দূর করিবার পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন।

সে সময়ে মার্শেলি (Marsiles) নগরীতে প্লেগ বা মহামারী সংক্রামক রূপে দেখা দেয়। পাছে ইংল্যাণ্ডে এই দুরন্ত ব্যাধি আসিয়া ছড়াইয়া পড়ে, তাহারই

প্রতিকারের জন্য মিডের উপর গভর্ণমেণ্ট ভার দেন। মিড্ এ-সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং প্লেগ-

ডাক্তার রিচার্ড মিড.

জন্ হাক্সাম্

রোগীদিগের সম্বন্ধে কতকগুলি কড়া-কড়ির ব্যবস্থা করিয়া ইংল্যাণ্ডকে মহামারীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। মিড্ যে ভাবে ইহার প্রতিকারের পথ নির্দ্দেশ করেন, তাহা সে সময়কার সমুদয় চিকিৎসকদেরই খুব ভাল লাগিল। তখন নানা রোগ সম্বন্ধে এবং তাহার প্রতিকারের বিষয়ে অনুসন্ধান চলিতেছিল। তখনকার দিনে বসন্ত (Small Pox), ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, (Influenza), স্কারলেট ফিবার, টাইফাস্ এবং প্লেগের বেশ প্রকোপ ছিল। এ সমুদয় রোগের প্রতিকার এবং জন সাধারণকে তাহাদের হাত হইতে নিরাপদ রাখিবার জন্য যে সকল বিধান করেন যেমন রোগীকে পৃথক রাখা এবং বাড়ী রোগদোষ মুক্ত

উইলিয়াম হিবারডিন্

করা ও বাড়ীর অন্য লোকদিগকেও রোগ প্রতিরোধের ও ব্যবস্থা করেন।

সে সময়ে লণ্ডনে হিবারডিন্ [Heberdeen] নামে একজন পণ্ডিত ও চিকিৎসক ছিলেন। তিনি রোগীদের ইতিহাস, রোগের ইতিহাস, ঔষধের ফলাফল প্রভৃতি লিখিয়া রাখিতেন এবং পরে "History and Cure of Disease"—ব্যাধি ও তাহার প্রতিষেধক নামে একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। হিবারডিন্-[১৭১০—১৭৮১ খৃঃ অঃ] রচিত এ-বইখানি দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত করিয়াছিল।

জন ফোদার গিল্ [John Fother Gill] নামে একজন চিকিৎসকের ও সে সময়ে বেশ নাম ও যশঃ ছিল। হিবারডিনের ন্যায় তিনিও একখানি তাঁহার চিকিৎসার অভিজ্ঞতার সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রচার করেন। লোকটি ছিলেন অগাধ পণ্ডিত,—উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, আবহবিদ্যা এবং রোগ সম্বন্ধে অনুধাবনায় তাঁহার খুবই যশঃ ছিল। স্কার্লেট জ্বরের সময় গলক্ষত সম্বন্ধে তাঁহার চিকিৎসা ও আরোগ্য বিধান বিষয়ে তাঁহার নাম ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকাতে প্রচার হয়।

ঐ সময়ে এবং তাহার কিছু পূর্ব্বে চিকিৎসা শাস্ত্রের সংস্কার করিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার জন্ হাক্সাম [Dr. John Huxham], স্বীয় গবেষণার দ্বারা কয়েকটি সংক্রামক ব্যাধির প্রতিকার সম্বন্ধে নূতন নূতন প্রতিকারের পথ নির্দ্দেশ করেন।

ডাক্তার জন হেগার্থ এবং ডাক্তার পার্সিভেল [Dr. Haygurth and Dr. Thomas Percival] অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের চিকিৎসা শাস্ত্র ও আরোগ্যশালা [Hospital] সম্বন্ধে বিবিধ নিয়ম-কানুন, বসন্ত, হাম প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে নূতন বিধান এবং ডাক্তারদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে উপদেশপূর্ণ বই লেখেন। ডাক্তার পার্শিভেল অঙ্ক-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া রোগীর সংখ্যা, রোগ-পরিচয় রোগ-আরোগ্য এবং মৃত্যু গণনা সম্পর্কে আদমসুমারি লইবার জন্য বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেন। কারখানার মজুরদের, খনির মজুরদের, সাধারণ কুলিদের ও দীন দরিদ্রদের এবং নৌ-সৈনিক-দের সম্পর্কে বিশেষ আইন প্রণয়ন করিয়া তাহাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কারখানার মজুরেরা সুরাপান করিয়া অর্থের অপব্যয় করিত তাহাতে নানা পারিবারিক অশান্তি ঘটিত, তিনি তাহার প্রতিকারের জন্য অনেক কিছু ব্যবস্থা করেন।

সে সময়ে ইংল্যাণ্ডে শিশু-মৃত্যু অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। সন্তান প্রসবের সময় মাতার মৃত্যু-সংখ্যা ছিল অত্যন্ত বেশী। ১,০০০ হাজারের মধ্যে কুড়ি জন মা সন্তান প্রসবের সময়ই মারা যাইতেন। আর শতকরা ৫০ জন শিশু পাঁচ বৎসর বয়েসের পূর্ব্বেই মারা যাইত। ১৭৩০—৪৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে শতকরা ৭৪ জন শিশুর মৃত্যু হইত, এখন শতকরা ৫ জন ও হয় না।

লণ্ডন হাস্‌পাতাল—১৭৫৩

শিশুরা জাতির জীবন, ভবিষ্যতের আশা ও ভরসা। তাহাদের অকাল মৃত্যু নিবারণ এবং মায়েদের জীবন যে কত বড় মূল্যবান্ তাহা পার্শিভেল বিশেষরূপে জনসাধারণকে বুঝাইয়াছিলেন। তাই তিনি Maternity Institution বা মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করেন। সংক্রামক রূপে নানা ব্যাধির প্রচার মাতা ও শিশুর অত্যধিক অকাল মৃত্যু [high mortality among

mothers and children] অতিরিক্ত মদ্যপান (excessive drinking) এ সমুদয় দূর করিবার জন্য ডাঃ পার্শিভেল নানা দিক্ দিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশ এবং জাতির কল্যাণের দিকে চাহিয়া তিনি জনসাধারণকে এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতায় ইংল্যাণ্ডে এক নূতন জীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। নূতন ভাবে মানবতা জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেকালের ঐতিহাসিকেরা বলেন:—"A spirit of sympathy and compassion spread throughout England, and associated as it was with the advance of medical knowledge it proved the means of introducing important sanitary measures. সারা ইংল্যাণ্ডে চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির জন্য এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উন্নতি করিবার জন্য দেশের সর্বত্র একটা সহানুভূতি এবং অনুকম্পার সৃষ্টি হইল। তাহারই ফলে, হাসপাতাল, ঔষধাগার [Dispensaries] প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে।

ওয়েষ্টমিনষ্টারে, গ্রে ষ্ট্রীট্, মিডলসেক্স হাসপাতাল, শিশু-চিকিৎসালয়, বসন্তরোগের জন্য স্বতন্ত্র আরোগ্য শালা, এবং অনেকগুলি মাতৃমন্দির [Maternity-home] প্রতিষ্ঠিত হইল। দেশের লোক বুঝিতে পারিল, পুরানো কোন একটা কিছু ধরিয়া থাকিলে জাতির উন্নতি হইতে পারে না, তাই তাহারাও দিন দিন নূতন নূতন বিধি বিধানকে বেশ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল।

চিকিৎসা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই এডিনবরা [Edinbnrgh] ও লণ্ডনে অনেক মেডিকেল স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠা হইল এবং চিকিৎসা-বিদ্যা সম্পর্কে উপাধি দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। আমাদের দেশের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকেরা যেমন ছাত্রদের বাড়ী রাখিয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন, ঔষধ প্রস্তুত, রোগী দেখা প্রভৃতিও যেমন তাহারা অধ্যাপকের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা লাভ করে, ঠিক সেই ভাবেই ঐ সময়ে ইংল্যাণ্ডে বড় বড় চিকিৎসকদের নিকট ছাত্রেরা শিক্ষা লাভ করিত। মেডিকেল স্কুল এবং কলেজ ছাড়া ও তাহারা শিক্ষকদের বা ডাক্তারদের বাড়ী বাড়ী রসায়নশাস্ত্র, অস্ত্র-বিদ্যা,

জন্ হাণ্টার

নাপিতের অস্ত্র চিকিৎসা

রোগ বিজ্ঞান (নিদান—তত্ত্ব-রোগ-নিরূপণ-বিদ্যা) প্রভৃতি শিক্ষা করিত। লণ্ডনের জন হান্টারের [John Hunter] পূর্ব্বে ফরাসীদের প্যারী সহরে অস্ত্রবিদ্যা সম্বন্ধে খুব ভাল শিক্ষা দেওয়া হইত।

এডওয়ার্ড জেনার

আমাদের দেশে এমন এক সময় ছিল যখন নাপিতদের হাতে অস্ত্রবিদ্যা ছিল। আমরা ছেলেবেলাও নাপিতদিগকে ফোঁড়া ইত্যাদি কাটিতে দেখিয়াছি, ইউরোপেও ঐরূপ ছিল, সেখানেও নাপিতদের হাতে অস্ত্র-বিদ্যা ছিল। এখানে সেকালের নাপিতদের অস্ত্র-চিকিৎসার একখানা চিত্র দেওয়া হইল।

মানুষের বন্ধু

ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যাতে আসিল যুগান্তর। এ সময়ের চিকিৎসকেরা, বৈজ্ঞানিকেরা কি ভাবে কি হয়, কোন্ রোগের উৎপত্তি কোথায় এ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সব গবেষণায় অতি সুফল ফলিল। ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনার [Dr. Edward Jenner] বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে কিরূপে মানুষ রক্ষা পাইতে পারে তাহার পথ আবিষ্কার করিলেন। তিনি দেখিলেন যে গো-বসন্তের বীজ মানুষের পক্ষে ক্ষতিজনক নহে, উহা মৃদু বলিয়া যদি মানুষের শরীরে টিকা দেওয়া যায় তাহা হইলে সেই ব্যক্তির বসন্ত রোগ হইতে পারে না। হইলেও তাহা তেমন প্রবল হয় না। সেই অবধি বসন্ত রোগের প্রতিকার কল্পে টিকা দিবার ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। ডাক্তার জেনার ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম গো-বসন্তের বীজ হইতে মানুষের দেহে টিকা দিয়াছিলেন। তখন সারাদেশের লোকের মধ্যে একটা বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিয়াছিল।

বসন্তের টিকার বিরুদ্ধে শোভা-যাত্রা

ভারতের রেল পথের ইতিহাস

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর সমস্ত ভারতবর্ষে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল, তাহা উনবিংশ শতকের প্রথম দিক্ দিয়াও দূর হয় নাই। ইংরাজদিগের আধিপত্য ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতেছিল বটে কিন্তু তাঁহাদের সাম্রাজ্য তখনও সুদৃঢ় হয় নাই। রাজ্যরক্ষা ও বিস্তারের কার্য্যে তখনও তাঁহারা এতই লিপ্ত থাকিতেন যে, জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য কোন কার্য্য করিবার সময় বা অর্থ তাঁহাদের আদৌ থাকিত না।

এই বিশৃঙ্খলার যুগে ভারতবর্ষে পথঘাটের যে দুরবস্থা হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। মোগল সম্রাট্দের আমলে প্রস্তুত বড় বড় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাস্তাগুলি মেরামতের অভাবে যানবাহন চলাচলের একেবারেই অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল। শুধু মেরামতের অভাব নয়, পরাজিত সৈন্যেরা বিজয়ীদিগের অগ্রগতিতে বাধা দিবার জন্য রাস্তা-ঘাট ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিয়া দিত। ইহার ফলে সে-সময়ে স্থল পথে অধিক দূর যাওয়া একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। নদীপথেই সকলকে যাতায়াত করিতে হইত। কিন্তু এ-পথে গতিও যেমন মন্থর, যাত্রাও তেমনি বিপজ্জনক—বর্ষাকালের ত কথাই নাই। বর্ষার কয় মাস স্থলপথেও যান-বাহনের চলাচল বন্ধ হইয়া যাইত। তখন পশুপৃষ্ঠে মাল-পত্র বহন করা ছাড়া উপায় থাকিত না। ইহাতে পশুদের দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না—জলে ক.দায় তাহারা পীড়িত হইয়া পড়িত এবং অকালে মারা যাইত। বৃষ্টিতে ভিজিয়া জিনিষপত্র নষ্ট হইয়া যাইত। আর খরচের ত কথাই নাই। এই সময়কার বর্ণনা দিতে যাইয়া একজন বিদেশী ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন, "আর কোথাও এমন দেশ নাই যেখানে লোকেরা এত বুদ্ধিমান ও ধনী, অথচ রাস্তাঘাট এত কম এবং যাতায়াতের এত কষ্ট।"

ভারতবর্ষের যখন এ রকম অবস্থা তখন ইংল্যাণ্ডে রেলপথ দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছিল। সেখানে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে প্রথম রেলপথ খোলা হয় ও শীঘ্রই সমস্ত দেশ রেলপথে ছাইয়া যায়। ইংরাজরা সে-সময় রেল-বাতিকগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তাহাদের নজর ভারতবর্ষের দিকেও পড়িল। আর শুধু বাতিক নয়, আমাদের দেশে রেলপথ খোলার জন্য ইংরাজরা যে আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন তাহার অন্য কারণ ও আছে। উনবিংশ শতকের গোড়ায় শ্রমশিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডে কাঁচা মালের চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ভারতবর্ষে নানা প্রকারের কাঁচামাল অনেক উৎপন্ন হইত, কিন্তু উপযুক্ত যানবাহনের অভাবে প্রয়োজনমত তাহা ইংল্যাণ্ডে রপ্তানি করা যাইত না। যতটুকু যাইত তাহারও দাম পড়িত অনেক। ভারত-

বর্ষে রেল খুলিলে এ-সমস্ত মাল সহজে ও অল্প খরচে বন্দরে আনা যাইবে ও সেখান হইতে জাহাজে করিয়া ইংলণ্ডে চালান যাইবে। তাছাড়া সামরিক প্রয়োজনে রেলের সুবিধা দেখিয়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও রেল খুলিবার পক্ষপাতী হন। সুতরাং ভারতবর্ষের কথা অনেকেরই মনে উদয় হইল।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে স্যার ম্যাকডোনাল্ড ষ্টিফেনসন প্রথম ভারতবর্ষে রেল খুলিবার প্রস্তাব করেন। পর বৎসর ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদিগের নিকট একটি রেল কোম্পানীর অনুষ্ঠান পত্র দাখিল করা হয়। এই পত্রে কলিকাতা হইতে এলাহাবাদের দিকে প্রায় ১৫০ মাইল লম্বা পরীক্ষামূলক একটি রেলপথ খুলিবার কথা উত্থাপন করা হয়। কোম্পানী রেলপথ খুলিবার সমস্ত খরচের উপর শতকরা তিন টাকা হিসাবে সুদ অথবা বাৎসরিক ৩০,০০০ পাউণ্ড বোনাসের প্রতিশ্রুতি ভারতসরকারের নিকট চাহিয়াছিল।

নানা কারণে কোম্পানী এই প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছিল। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা তখন মোটেই সুবিধাজনক ছিল না। ইংরাজদের সহিত শিখদের যুদ্ধ বাধ বাধ হইয়াছিল। তখনও তাঁহারা সমস্ত দেশজোড়া রাজত্বের মালিক হন নাই। এ-রকম অশান্ত অবস্থায় যে কোন মুহূর্ত্তে রেলপথ খুলিবার জন্য নিয়োজিত সমস্ত অর্থ মারা যাইতে পারে। তাহার উপর ভারতবর্ষের অধিবাসীরা যে রকম গোঁড়া তাহাতে তাহারা রেলপথে ভ্রমণ করিবে কিনা সে-সম্বন্ধে কোম্পানীর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। ইংল্যাণ্ডে প্রায় সকলেই মনে করিতেন যে ভারতবর্ষে রেলপথ খোলার চেষ্টা অকৃতকার্য্য হইবে। একে ত দেশের জলবায়ুই এক মস্ত বাধা, তাহাতে আবার প্রচণ্ড ঝড় জলে লাইন ভাঙ্গিয়া, ভাসিয়া যাইবে। পোকামাকড়ে কাঠ নষ্ট করিয়া দিবে। এ-সমস্ত অমূলক ভয় ছাড়াও সত্যকার বাধা একটি ছিল। লাইন পাতিবার জন্য বা ইঞ্জিন লাগাইবার জন্য উপযুক্ত লোক ত ভারতবর্ষে পাওয়া যাইবে না। এই সমস্ত ভয় ও ভাবনার জন্য সকলে মনে করিতেন যে ভারতবর্ষে রেলপথ খুলিবার জন্য টাকা দিলে তাহার প্রতিদান ঠিকমত পাওয়া যাইবে না। কিন্তু ভারত-সরকার প্রতিদানের দায়িত্ব লইলে তাঁহারা নির্ভাবনায় টাকা খরচ করিতে পারেন।

ষ্টিফেনসন সাহেব অনুষ্ঠানপত্র দাখিল করিবার পর, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর ডিরেক্টররা ভারত-সরকারের নিকট রেলপথ খোলা সম্বন্ধে বিশেষ তদন্ত করিবার জন্য এক পত্র দেন। ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহারা মিঃ সিম্‌স্ নামে এক অভিজ্ঞ রেল ইঞ্জিনিয়ারকে ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। তাঁহাকে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া রিপোর্ট দিতে বলা হইল। ডিরেক্টাররা ভারতবর্ষে রেলপথ খুলিতে অনিচ্ছুক ছিলেন না কিন্তু ইংল্যাণ্ডে যথেচ্ছা লাইন খোলার অসুবিধা দেখিয়া তাঁহারা চাহিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে রেলপথগুলি যেন সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে কয়েকটি বাঁধাধরা নিয়মানুসারে খোলা হয়। মিঃ সিম্‌সের রিপোর্ট লইয়া ভারত-সরকার ও ডিরেক্টরদের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ চলে—বিশেষ করিয়া লাভের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্বন্ধে। শেষে ডিরেক্টররা ঠিক করিলেন যে এই প্রতিশ্রুতি না দিলে রেলপথ খুলিবার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন পাওয়া যাইবে না। অতঃপর ভারত-সরকারের সহিত রেল কোম্পানীগুলির যে যুক্তি হয় তাহার প্রধান সর্ত্তগুলি এই :—

১। রেলের পথ সরকার নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

২। প্রয়োজনীয় জমি সরকার বিনামূল্যে রেল কোম্পানীগুলিকে দিবেন।

৩। গাড়ী চলাচলের সময় অন্যান্য ব্যবস্থা সরকারের অনুমতিসাপেক্ষ হইবে।

৪। রেল কোম্পানী বিনামূল্যে ডাক বহন করিবে।

৫। রেলপথ খুলিতে কোম্পানীর মোট যা ব্যয় হইবে সরকার তাহার উপর শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে সুদ দিবেন।

৬। কোম্পানীর লাভ শতকরা পাঁচ টাকার বেশী হইলে অতিরিক্ত আয় কোম্পানীও সরকারের মধ্যে সমান সমান ভাগ হইবে।

৭। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর সরকারের রেলপথ গুলি কিনিয়া লইবার অধিকার থাকিবে।

এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া ছয়টি কোম্পানী —ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার, মাদ্রাজ, বম্বে বড়োদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান, সিন্দ পাঞ্জাব দিল্লী ও ঈষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে—কাজ

আরম্ভ করিল। ঠিক হইল লাইনগুলি চওড়ায় সাড়ে পাঁচ ফুট হইবে।

এখন এই সর্ত্তগুলির পরীক্ষা করা প্রয়োজন। চুক্তির মধ্যে প্রধান সর্ত্ত হইল শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে সুদের প্রতিশ্রুতি। কোম্পানীগুলি এই হিসাবে লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং ঘাটতি পূরণের জন্য ভারত সরকারকে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। মোট খরচের

জর্জ ষ্টিফেনসনের বাড়ী—ইংল্যাণ্ড

উপর সুদের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় কোম্পানীগুলি ব্যয় সম্বন্ধে অতিরিক্ত খরচ করিতে থাকে। এ-কথা লর্ড লরেন্সও স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার নিন্দা করিয়া তিনি বলেন যে সুদ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ায় কোম্পানীগুলির ব্যয় লাঘব করার কোন গরজ ছিল না। প্রথম জীবনের এই বিপুল ব্যয়ের গুরুভার রেল আজও বহন করিয়া আসিতেছে। অবশ্য এ কথাও বলিতে হইবে যে তখনকার দিনে রেলের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষই ইংল্যাণ্ড হইতে আনিতে হইত এবং আনিবার খরচও পড়িত অনেক। আবার অনেকের মতে সুদের হারও অত্যন্ত অধিক রাখা হইয়াছিল। ইহার চেয়ে কম সুদেও প্রয়োজনীয় টাকা পাওয়া যাইত। সে সময় ইংরাজদের হাতে যে পরিমাণ টাকা জমিয়া গিয়াছিল তাহাতে তাহারা সুদূর দক্ষিণ আমেরিকাতেও টাকা খাটাইতেছিলেন। এ অবস্থায় তাঁহারা যে ভারতবর্ষকেই উপেক্ষা করিয়া যাইতেন এমন নহে। মাত্র কয়েক বৎসর পরেই অনেক কম সুদের প্রতিশ্রুতিতে ও কয়েকটি কোম্পানী কার্য্যে অগ্রসর হয়।

ভারতবর্ষে রেলপথ খুলিবার প্রস্তাব ১৮৪৪ খৃঃ প্রথম হয় এবং উপরোক্ত চুক্তিগুলি ১৮৪৭ খৃঃ স্বাক্ষরিত হয়। বিভিন্ন পক্ষের অন্যায় জিদের জন্য এই তিন বৎসর কাল বৃথা নষ্ট হয়। যাহা হউক, এই বৎসর হইতেই লাইন পাতার কাজ আরম্ভ হইল। কিন্তু বাধা বিপত্তি অনেক দিক হইতে আসিয়া পড়িল। প্রথমতঃ সরকারের সহিত কোম্পানীগুলির পথ লইয়া গোল বাধিতে লাগিল। কোম্পানী চাহিল ব্যবসায় প্রধান স্থানগুলির ভিতর দিয়া লাইন পাতিতে, আর সরকার চাহিলেন একটানা সোজা লাইন যাহাতে যে কোন স্থানে চট্ করিয়া সৈন্য পাঠান যাইতে পারে। দ্বিতীয় বাধা আসিল সিপাহী-বিদ্রোহের সময়। বিদ্রোহীদের অত্যাচারে কাজ অসম্ভব হইয়া পড়িল। তাহারা রেলপথের অনেক ক্ষতি সাধন করিল। তা'ছাড়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা কাজ ছাড়িয়া অস্ত্র ধরিলেন। বিদ্রোহের সময় কোম্পানীর দ্বারা লাইন পাতার সুবিধা সকলে বুঝিতে পারিলেন। সরকার এই সময় বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজকোষে একেবারেই অর্থ ছিল না। কিন্তু কোম্পানীগুলি এ-সময়ে ও তাহাদের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে বেগ পায় নাই। কাজেই বিদ্রোহ শান্তি হইবার পর পুনরায় কাজ আরম্ভ করিতে কোন গোলমাল হয় নাই।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীর লাইন গঙ্গার তীর ধরিয়া উত্তর দিকে চলিল। কলিকাতার ষ্টেশন খাস কলিকাতায় করিবার জন্য মিঃ সিম্স্ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। গঙ্গার উপর সেতু বাঁধিবার অর্থ না থাকায় ষ্টেশন হাওড়াতেই করা হইল। তবু লাইন কলিকাতায় লইয়া যাইবার কথা একেবারেই লোপ পায় নাই। মাঝে

মাঝে এ-কথা উঠিত। সরকার ১৮৬৯ খৃঃ হাওড়া ব্রিজ খুলিবার ঠিক করেন। ১৮৭৫ খৃঃ এ ব্রিজ খুলিলে দেখা গেল যাত্রী ও মালের সমস্ত প্রয়োজন ইহাতে মেটে না। সুতরাং ১৮৮৭ খৃঃ হুগলী ও ১৯৩১ খৃঃ বালী ব্রিজ খোলা হয়। এখনও ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর হাওড়া ও ঈষ্ট বেঙ্গল কোম্পানীর শেয়ালদা ষ্টেশন দুটিকে মিলাইয়া এক করিয়া দেওয়ার কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়।

লাইন দু' ভাগে বিভক্ত হইবে। উত্তর দিকের লাইন থাল ঘাটের পথে পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া জব্বলপুরে আসিয়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান লাইনের সহিত মিলিত হইবে। অপর পথটি ভোরঘাট অতিক্রম করিয়া পুণা হইয়া রায়চুরে আসিয়া মাদ্রাজ হইতে আগত লাইনের সহিত মিলিবে।

বম্বে বরোদা সেনট্রাল ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর লাইন পাতিতে অনেক কষ্টে পড়িতে হয়। নর্ম্মদা

সেকালের গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের যাত্রী

ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর লাইন চলিয়াছিল গঙ্গার তীর ধরিয়া। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল যে সোজা-পথে উত্তর ভারতের সহিত কলিকাতা বন্দরের যোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং ১৮৫৪ খৃঃ আজকাল যেটিকে মেন লাইন বলা হয় সেটি খুলিবার অনুমতি কোম্পানীকে দেওয়া হয়। ১৮৭১ খৃঃ ইহা খোলা হয়।

গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে কোম্পানীর লাইন লইয়াও অনেক গোলমাল হয়। শেষে লর্ড ড্যালহাউসী ঠিক করেন যে দুটি পথে এই কোম্পানীর লাইন পশ্চিমঘাট পর্ব্বত অতিক্রম করিবে। বম্বে হইতে কল্যাণ পর্য্যন্ত আসিয়া

নদীর উপর সমস্ত সেতু দু'বার ভাসিয়া যায়। পরে বিশেষ উপায়ে সেতু বাঁধা হয়। মাদ্রাজ প্রদেশে বিশেষ কোন গোলমাল হয় নাই--কারণ সেখানে প্রাকৃতিক বাধা তেমন কিছু নাই।

১৮৫৪ খৃঃ ইংরাজদের দ্বারা ব্রহ্মদেশ বিজিত হয় এবং বর্ম্মায় শীঘ্র যাতায়াতের ব্যবস্থা করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। কলিকাতা হইতে ঢাকা হইয়া আকিয়াবের পথে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত একটি রেলপথ খুলিবার ঠিক করা হয়। ১৮৫৮ খৃঃ ঈষ্ট বেঙ্গল কোম্পানীর সহিত সরকারের একটি চুক্তি হয় এবং কলিকাতা হইতে ঢাকার দিকে গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত লাইন পাতিবার ব্যবস্থা হয়।

এই সময় কলিকাতা হইতে সুন্দরবন হইয়া চট্টগ্রাম পর্যান্ত আর একটি লাইন খুলিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু শীঘ্রই এ প্রস্তাবের অসম্ভবতা বোঝা যায় ও প্রস্তাবটি পরিত্যাগ করা হয়।

রেলপথের বিস্তার ভারতীয় আর্থিক ও ব্যবসা জগতে নানা পরিবর্তন আনিয়া দেয়। উন্নততর ও দ্রুততর যানের সাহায্য পাইয়া ব্যবসা, বাণিজ্য অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের দু'গুণ তুলা রপ্তানী হয়। শস্য, তৈলবীজ প্রভৃতি দ্রব্য বিপুল পরিমাণে রপ্তানী হইতে থাকে। আমদানীও ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। ইংল্যাণ্ডে তৈয়ারী নানাবিধ সস্তা মাল ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলে। ফলে ভারতীয় কারিগরদিগের প্রস্তুত মালের চাহিদা কমিয়া যায় ও তাহারা বেকার হইয়া পড়ে। বিশেষ করিয়া ১৮৬৯ খৃঃ সুয়েজখাল কাটার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বহির্বাণিজ্য খুব বাড়িয়া যায়।

দূরের পথিক

রেল পথ খোলার জন্য ভারতবর্ষে ছোট বড় নানাবিধ শিল্প গড়িয়া উঠে। কয়লা শিল্প ত সম্পূর্ণভাবে রেলের চাহিদার জন্যই আরম্ভ হয়। প্রথম কয়লার খনি ১৮৫৪ খৃঃ কাজ আরম্ভ করে।

আর্থিক জগতের উপর রেলের প্রভাবের কথা বলিতে হইলে প্রথমেই বলিতে হয় রেল কোম্পানী গুলির বিপুল ঘাট্‌তির কথা। এই ঘাট্‌তি সরকারকে পূরণ করিতে হইত। এবং সেজন্য তাঁহারা আর্থিক গোলযোগে ক্রমশঃই বিব্রত হইয়া পড়িতেছিলেন। অপর দিকে ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের ফলে দেশের ধনসম্পদ বাড়িতেছিল এবং পরোক্ষভাবে নানাবিধ কর হইতে সরকারের অধিক আয় হইতেছিল। রেলের দরুন দেশে শান্তি-রক্ষার কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছিল। সরকারকে অনর্থক যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে হইত না সেজন্যও টাকা বাঁচিত অনেক। এ-টাকা নানাবিধ লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইত। রেলপথ খুলিবার পর হইতে দুর্ভিক্ষের তীব্রতা কমিয়া যায়। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দেশে বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য দ্রুত সরবরাহ করা যাইত বলিয়া অনশনে আর বিশেষ কেহ মরিত না। ক্রমশঃ রেলপথ খোলায় ইংরাজদের প্রচুর মূলধন ভারতবর্ষে খাটিতে লাগিল।

ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনের উপর রেলের প্রভাব খুব গভীর ভাবে পড়িয়াছিল। ইংরাজদের রাজত্বের আরম্ভ হইতেই ভারতীয় সমাজের ধারায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন হইতেছিল। রেলপথ খোলায় এই পরিবর্তনের ফল অত্যন্ত দ্রুত হইয়া উঠিল।

জর্জ্জ ষ্টিফেনসন্ ও তাঁহার কীর্ত্তি-পরিচয়
প্রথম এঞ্জিন, রেলপথ ও সেতু ইত্যাদির চিত্র সে সময়কার গ্রন্থ হইতে গৃহীত

আমাদের জীবনের সংকীর্ণতা ভাঙ্গিয়া গেল। নিজেদের গ্রামের সীমা ছাড়িয়া আমরা বাহির হইতে শিখিলাম ব্যবসার প্রয়োজনে অথবা তীর্থ-ভ্রমণের জন্য অনেকেই দূরদূরান্তে যাতায়াত করিতেন। একসঙ্গে ছত্রিশ জাতের সহিত এক গাড়ীতে ভ্রমণ করিতে হইত বলিয়া জাত্যাভিমান ও সংকীর্ণতা ক্রমশঃ দূর হইতে লাগিল। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান যেমন বাড়ীতে লাগিল, তেমনি সকলের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ ও বাড়িতে লাগিল।

শীঘ্রই প্রতিশ্রুতি প্রথার অনেক গলদ প্রকাশ পাইতে লাগিল। মূলধনের উপর সুদের প্রতিশ্রুতি পাইয়া কোম্পানীগুলির ব্যয় বাহুল্য বাড়িয়া গেল। খরচ সম্বন্ধে তাহাদের আর কোন সংযমই রহিল না। অথচ আয় তেমন হইত না। ফলে ক্ষতিপূরণ করিতে সরকার ঋণজালে জড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন। সুতরাং সকলেই প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে বিরুদ্ধমত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও রেল সম্বন্ধে সরকারের নীতির কোন পরিবর্ত্তন ১৮৬৩ ৬৪ খৃঃ পর্য্যন্ত হয় নাই। এই সময় ভারতীয় শাখা রেলওয়ে কোম্পানী ছোট ছোট শাখালাইন খুলিবার প্রস্তাব সরকারের নিকট করে। বিনা মূল্যে জমি চাওয়া ছাড়া আর কোন সাহায্য তাহারা চায় নাই। কিন্তু কার্য্যারম্ভের পর দেখা গেল সরকারের সাহায্য ভিন্ন কিছুই হইবে না। তাই ভারতসচিব কোম্পানীকে কিছু কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করিলেন। কানপুর হইতে লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত যে লাইন পাতা হয়, তার জন্য সরকারের নিকট হইতে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা ধার করিতে হয়।

ইহাতে ভারত-সচিব স্থির করিলেন যে বিনা প্রতিশ্রুতিতে ভারতবর্ষে কোন রেলপথ খোলা সম্ভব নয়। এই সিদ্ধান্ত মত কাজ করিয়া ১৮৬৯ খৃঃ তিনি পুরাতন কোম্পানীগুলির সহিত নূতন চুক্তি করিলেন। প্রতিশ্রুত সুদের জন্য যে টাকা সরকার তাহাদের যোগাইয়াছিলেন তাহা মকুব করিয়া দেওয়া হইল। আর ভবিষ্যতে সুদ দিয়া রেলের আয় হইতে যে টাকা বাঁচিবে সরকার তাহার অর্দ্ধেক পাইবেন। প্রথম পঁচিশ বৎসরের পর কোম্পানীগুলি ক্রয় করিবার যে ক্ষমতা সরকারের ছিল তাহাও লুপ্ত করা হইল। শুধু ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান কোঃ এ-সর্ত্তে রাজী হয় নাই, কারণ তাহাদের এ সময় লাভ হইতেছিল।

এ সমস্তই ভারতসচিব নিজেই ঠিক করেন--- ভারত সরকারকে কিছুই জানান হয় নাই। সরকার যখন টের পাইলেন তখন এই চুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। লর্ড লরেন্স তখন ভারতের বড়লাট ছিলেন। তিনি যুক্তি দ্বারা দেখাইলেন যে সমস্ত লাইন সরকারের কিনিয়া লওয়া উচিত ও সমস্ত নূতন লাইন সরকারের তরফ হইতে পাতা উচিত। তাহাতে ব্যয় অল্প হইবে এবং সমস্ত রেল এক পক্ষের শাসনে আসিবে। তাঁহার পর লর্ড মেয়োও একথাই বলিলেন। সুতরাং ১৮৬৯ খৃঃ নূতন ভারত-সচিব তাঁহাদের মত মানিয়া লইলেন ও এই সময় হইতে খাস সরকারী লাইন পাতিবার ব্যবস্থা হইল।

খুব উৎসাহের সহিত লাইন পাতার কাজ চলিল। স্থির করা হইল যে প্রতি বৎসর প্রায় দুই কোটি টাকা এ কাজে ব্যয় করা হইবে। দ্রুত রেলপথ বিস্তারের জন্য সস্তা, কম চওড়া (এক মিটার— মিটার---প্রায় এক গজ তিন ইঞ্চি) লাইন পাতা ঠিক হইল। কাজ বেশ ভালই চলিল, ফলও বেশ ভালই হইল। খরচ পড়িত খুবই কম। কিন্তু মুস্কিল হইল এই যে প্রয়োজন ও সময়মত টাকা পাওয়া যাইত না। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে, বিশেষ করিয়া ১৮৭৪-৭৯ খৃঃ মধ্যে কয়েকবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে সরকারের প্রভূত রাজস্ব হানি হয়। তা'ছাড়া টাকার বিনিময় হার ক্রমশঃই কমিতেছিল। সেজন্য সরকারের বিলাতে দেয়-অর্থের পরিমাণ ক্রমশঃই বাড়িতেছিল। এই সময়ে আবার দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ বাধে ও তাহাতে জলের মত টাকা খরচ হইতে থাকে। যুদ্ধের জন্য সিন্ধু ও পাঞ্জাবের ছোট লাইনগুলিকে বড় করিতে হইল। এই সব নানাপ্রকার বিপুল ব্যয় হওয়াতে রাজকোষ অর্থ শূন্য হইয়া পড়িল। অর্থা- ভাবে রেলপথের আশানুযায়ী দ্রুত বিস্তার হইল না। ১৮৮০ খৃঃ যে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন বসে, তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত স্থানসমূহে দ্রুত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য আরও ৫০০০ মাইল লাইনের আশু প্রয়োজন। সরকার ক্রমশঃই বুঝিতে

পারিলেন যে অর্থাভাবে ঠিক ইচ্ছামত লাইন পাতা অসম্ভব। সুতরাং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ঠিক দশ বৎসর পরে, সরকারকে নিজেদের মত পরিত্যাগ করিতে হয় ও বাধ্য হইয়া বেসরকারী মূলধনের সাহায্য লইতে হয়।

ঊনবিংশ শতকের অষ্টম দশকে রেল সম্বন্ধে নূতন নীতি প্রচলিত হইল। সুদের প্রতিশ্রুতি দিয়া পুনরায় কোম্পানীদের কাজে লাগান হইল। বেঙ্গল নাগপুর, মাদ্রাজ সাউথ মারাঠা, আসাম বেঙ্গল প্রভৃতি কোম্পানীর সহিত ভারত সরকার চুক্তি করিলেন। এই চুক্তির সর্ত্তে কয়েকটি পরিবর্ত্তন করা হইল। পুরাতন চুক্তির সহিত নূতন চুক্তির প্রধান প্রভেদ এই যে, (১) কোম্পানী যে লাইন পাতিবে তাহা সরকারের সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করা হইবে, (২) সুদের হার শতকরা পাঁচ হইতে কমাইয়া শতকরা সাড়ে তিন করা হইল, এবং (৩) তদতিরিক্ত লাভে সরকারের ভাগ বাড়াইয়া তিন-পঞ্চমাংশ করা হইল।

পুরাতন কোম্পানীগুলির সহিত চুক্তির মেয়াদ ফুরাইয়া যাইলে সরকার তাহা বাতিল করিয়া দিলেন। ঈষ্টবেঙ্গল ও আউদ রোহিলখণ্ড কোম্পানী ছু'টি কিনিয়া লইয়া সরকার তাহা নিজেই পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান ও গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন-সুলার রেলও সরকার ক্রয় করিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের পরিচালনার ভার কোম্পানী ছু'টিকেই ফিরাইয়া দিলেন। শুধু তাহাদের সহিত নূতন সর্ত্তে চুক্তি হইল।

এই সময়ে সরকার দেশীয় রাজাদের নিজ নিজ রাজ্যে রেল লাইন বসাইতে অনুরোধ করেন। তাহার ফলে দেশীয় রাজ্যগুলিতেও শীঘ্রই রেলপথ বিস্তার হইতে লাগিল। সর্ব্বপ্রথম হায়দ্রাবাদের নিজাম এ-সম্বন্ধে অবহিত হন। উপস্থিত সমস্ত দেশীয় রাজ্য-গুলিতে মোটামুটি পাঁচ হাজার মাইল রেলপথ আছে। তাহার বেশীর ভাগই রাজাদের নিজস্ব সম্পত্তি।

এ-পর্য্যন্ত যে সমস্ত রেলপথ খোলা হইয়াছিল, তাহাদের সকল গুলিই বড় বড় সহর ও ব্যবসা কেন্দ্রের ভিতর দিয়া সোজা একটানা চলিয়াছিল। দেশের অভ্যন্তরে রেলপথের জাল বিস্তার হয় নাই এবং ছোট ছোট সহরও গ্রামগুলির সহিত এ-সকল লাইনের কোন যোগ ছিল না। সুতরাং মালপত্র বা যাত্রীর সংখ্যার দিক হইতে তেমন সুবিধা হইতেছিল না। রেল কোম্পানীগুলি যাহাতে এ-বিষয়ে সুবিধা করিতে পারে তজ্জন্য সরকার শাখা লাইন খুলিবার জন্য উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ১৮৯৩ খৃঃ তাঁহারা প্রচার করিলেন যে নিম্নলিখিত সর্ত্তে তাঁহারা শাখা লাইন কোম্পানীকে সাহায্য করিতে রাজী আছেন—(১) জমি বিনা মূল্যে দেওয়া হইবে। (২) মূলধনের পরিমাণ টাকায় নির্দ্দেশ করা হইবে এবং তাহা ভারতবর্ষ হইতেই সংগ্রহ করা হইবে। (৩) কোম্পানীর পরিকল্পনা ও অন্যান্য বিষয় সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ থাকিবে। এবং (৪) সরকার আর্থিক সাহায্য করিবেন—হয় শতকরা সাড়ে তিন টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইবে, নয় মাল ও যাত্রী বহনের মোট আয়ের উপর নির্দ্ধারিত অনুপাতে সাহায্য করা হইবে। অতিরিক্ত আয় উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হইবে।

উপরোক্ত সর্ত্তে কয়েকটি কোম্পানীর সহিত চুক্তি হয় এবং বহু মাইল ব্যাপী শাখা পথও খোলা হয়। কিন্তু এ পরিকল্পনায় আয়ের দিক হইতে ভাল ফল হইল না। ইহার ব্যয় সাপেক্ষতার জন্য সকলেই এ-পদ্ধতিকে আক্রমণ করিয়াছেন। অবশ্য এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে যে এ সাহায্য না পাইলে অনেক শাখা লাইন আদৌ খোলা যাইত না। উপস্থিত সমস্ত শাখা লাইন প্রধান কোম্পানী- গুলির নিকট বদলি করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

উপরে বিংশ শতকের আরম্ভ পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া হইল। এখন এমন একটি সমস্যার কথা বলা হইবে যাহা লইয়া বহু দিন ধরিয়া গোলযোগ ও বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। এটি হইল গেজ সমস্যা। রেলপথের চওড়াকে ইংরাজীতে গেজ বলে। ভারতবর্ষের প্রধান রেলপথগুলি পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চি চওড়া। পথ চওড়ায় কত হইবে তাহা লইয়া অনেক তর্ক উঠে। ইংল্যাণ্ডে রেলপথ খুলিবার সময় কোম্পানীগুলি স্বাধীন ভাবে কাজ করায় সে দেশে গেজ বিভ্রাট বাধিয়াছিল। প্রত্যেক কোম্পানীর পথের চওড়াই যদি বিভিন্ন হয় তাহা হইলে এক কোম্পানীর ইঞ্জিন বা গাড়ী অন্য কোম্পানীর লাইনে চলিতে পারে না। ইহাতে নানা রকম অসুবিধা হয়। তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।
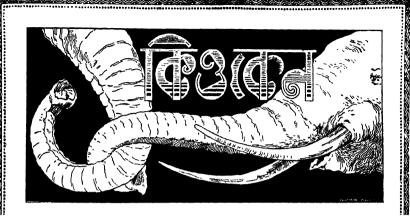
একমণ তুলা ভারী না একমণ লোহা ভারী ?

এ প্রশ্নটীকে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। দুইটীর ওজন যখন সমান তখন আবার হাল্কা ভারীর কথা উঠে কি করিয়া ? কিন্তু আমরা যে ভাবে ওজন করি তাহাতে একমণ তুলাই ভারী। আমরা যখন জিনিষের ওজন লই তখন আমরা তাহার বস্তুমানের তুলনা করি। পৃথিবীর প্রত্যেক জিনিষকেই একটা অদৃশ্য শক্তির দ্বারা তাহার কেন্দ্রের দিকে টানিতেছে, এবং ঐ শক্তির পরিমাণ-ই পদার্থের ওজন।

৩৪৪০ পৃষ্ঠার পর

প্রত্যেক জিনিসকে জলের মধ্যে হালকা বোধ হয়। কারণ পৃথিবীও যেমন জিনিষটা তাহার কেন্দ্রের দিকে টানিতেছে জলও তেমনি তাহার প্লবতা শক্তির দ্বারা উহাকে উপর দিকে ঠেলিয়া তুলিতেছে। আরও দেখা যায় যে কোন জিনিষকে জলের মধ্যে ডুবাইলে উহা তাহার নিজের আয়তনের জল সরাইয়া দেয় এবং ঐ জলের যা ওজন জলের মধ্যে জিনিষের ওজন ততখানি কম। আবার দুইটী সমান পরিমাণ জিনিষের মধ্যে যাহার ঘনত্ব কম তাহার আয়তন বেশী, সেইজন্য উহা অপরটী অপেক্ষা অধিক পরিমাণ জল সরাইয়া দেয় বলিয়া জলের মধ্যে উহার ওজন অপেক্ষাকৃত বেশী কমিবে। সমান পরিমাণ সোণা ও রূপা দাঁড়িপাল্লায় দুইদিকে রাখিয়া উহাদের জলের মধ্যে ডুবাইয়া দিলে রূপার ঘনত্ব কম বলিয়া উহাকে সোণা অপেক্ষা হালকা বোধ হইবে। এই অবস্থায় রূপার দিকে আরও কিছু রূপা যোগ করিলে তবে উহাদের সমতা রক্ষা হইবে। এখন যদি উহাদের পুনরায় জলের বাহিরে আনা হয় তাহা হইলে রূপার দিকই ভারী হইবে।

জলের মত বাতাস ও উপর দিকে চাপ দেয় বলিয়া বাতাসের মধ্যেও প্রত্যেক জিনিষের ওজন কম হয়। সেইজন্য দাঁড়িপাল্লার একদিক একটী একমণ বাটখারা ও অপরদিকে সমান পরিমাণ তুলা লইয়া যদি দাঁড়িপাল্লাটীকে বায়ুশূন্য স্থানে রাখা যায় তাহা হইলে তুলার বস্তুমান বেশী বলিয়া উহা ভারী হইবে; কারণ লোহার ঘনত্ব অপেক্ষা তুলার ঘনত্ব কম বলিয়া তুলা বেশী পরিমাণ বাতাসকে সরাইয়া দেয় বলিয়া উহার ওজনও বেশী কমে এবং বায়ুপূর্ণ স্থানে উহাদের ওজন সমান করিবার জন্য বেশী পরিমাণ তুলা লইতে হয়।

বাঘের গায়ে ডোরা কাটা থাকে কেন ?

বাঘের গায়ে যে ডোরা থাকে তাহা যে নিছক প্রকৃতির খেয়াল বা তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে তাহা নয়। ইহার ও একটা তাৎপর্য্য আছে। নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রত্যেক জীবকেই পারিপার্শ্বিক জগতের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। কেহ যদি জীবন সংগ্রামে পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে না পারে তাহা হইলে তাহার বাঁচিয়া থাকা শক্ত। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে প্রত্যেকেরই খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইবে এবং এই কার্য্যে তাহাদের যে কত জানা অজানা শত্রুর সামনে আসিতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু মা যেমন তাহার শিশু সন্তানকে বাচাইবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করেন প্রকৃতিও তেমনি ইহাদের বাচাইবার জন্য নানারূপ উপায় করিয়া দিয়াছেন, রংএর এই কারচুপি তাহাদের মধ্যে একটা।

বাঙ্গলার রয়েল বেঙ্গল টাইগার সুন্দরবনে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে বাস করে। ছোট ছোট ঝোপের মধ্যে বসিয়া তাহাকে শিকারের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। যদি তাহার গায়ে এই প্রকার ডোরা কাটা না থাকিত তাহা হইলে শিকার অনেক দূর হইতে তাহার অবস্থিতি বুঝিতে পারিয়া তাহার নিকটে আসিত না। তাহার ফলে তাহাকে খাদ্যাভাবে মরিতে হইত। কিন্তু তাহার এই বিচিত্র রং তাহাকে এমন বেমালুম লুকাইয়া রাখে যে কাহার সাধ্য তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করে।

এইরূপ প্রত্যেক জন্তুরই রংএর এক একটা অর্থ আছে। সিংহকে আফ্রিকার বালুকাময় প্রান্তরে নিজেকে শিকার ধরিবার জন্য লুকাইয়া রাখিতে হয় বলিয়া উহার গায়ের রং বালির মত ফিকে জরদ রংএর। আবার চিতা বাঘকে গাছের উপরে পাতার আড়ালে থাকিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া তাহার গায়ে পাতার মত গোল গোল ছাপ। হাতী, পাহাড় অঞ্চলে থাকে বলিয়া তাহার গা পাহাড়ের মত ধূসর রংএর। আবার বরফের দেশের ভালুক, শৃগাল প্রভৃতি বরফের মত সাদা ধবধবে হয়। এইরূপে প্রকৃতি প্রাণীদের রক্ষা করে।

সাবানের ফেনা কি হাওয়ায় ভাসিতে পারে ?

ছেলেরা খড় বা পাঁকাটি দিয়া সাবান গোলা জলে যে বল তৈয়ারী করে তাহা খানিকক্ষণ বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায় ও পরে পড়িয়া যায়। এইরূপ হয় কেন? আমাদের শরীরের মধ্যে সকল সময়েই দহন জনিত তাপ উৎপন্ন হইতেছে। প্রশ্বাস বায়ু শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ তাপ পরিশোধন করে এবং উত্তপ্ত হইয়া নিশ্বাসরূপে বাহির হয়। আমাদের নাক ও মুখের সামনে হাত দিলে নিঃশ্বাসের বাতাস যে গরম তাহা অনুভব করা যায়। ছেলেরা যখন সাবান জলের বল তৈয়ারী করে তখন কিছু সাবান জলের মধ্যে নিঃশ্বাস বায়ু প্রবেশ করে। গরম বাতাস ঠাণ্ডা বাতাস অপেক্ষা হাল্কা বলিয়া ঐ বলটি বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায় কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন ঐ বাতাস তাপ বিকিরণ করিয়া ঠাণ্ডা হয় তখন উহা ভারী হয় এবং সেই জন্য উহা আর ভাসিয়া থাকিতে পারে না বলিয়া নীচে নামিয়া পড়ে।

বাড়ীর ছায়া বেশী ঠাণ্ডা না গাছের ছায়া বেশী ঠাণ্ডা ?

জলে তাপ দিলে জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। জল দিয়া ঘর ধুইলে ভিজা মেঝে খানিক পরে শুকাইয়া যায়। আবার গা ধুইয়া গা না মুছিলেও গা শুকাইয়া যায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে জলে তাপ না দিলেও জল, সাধারণ তাপ মাত্রাতেও বাষ্প হইতে পারে। কিন্তু পদার্থের অবস্থান্তর ঘটায় তাপ।

আমাদের শরীর হইতে যেমন সকল সময়ই ঘামের সহিত দূষিত পদার্থ বাহির হয় তেমনি গাছ ও তাহার শরীর হইতে জলীয় পদার্থের সহিত দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া দেয়। জলীয় পদার্থের সহিত দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া দেয় বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে গাছের পাতাগুলি ঠাণ্ডা হয় এবং বাতাস ঠাণ্ডা পাতার সংস্পর্শে আসিয়া ঠাণ্ডা ও ভারী হইয়া নীচের দিকে নামিয়া আসে। সেই জন্য গাছ তলার বাতাস সকল সময়েই বেশ ঠাণ্ডা থাকে। কিন্তু মানুষ বা গাছের মত বাড়ী তাহার শরীর হইতে জলীয় পদার্থ বাহির করে না। সুতরাং বাড়ীর ছায়া গাছের ছায়ার মত ঠাণ্ডা নয়।

গবেষণাগারে মাদাম কুরী
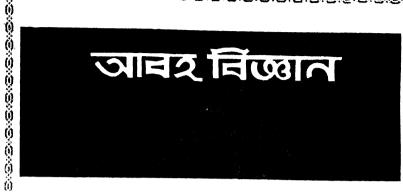
আবহাওয়ার কথা

জীব জন্তু বল, উদ্ভিদাদি বল, যাহা কিছু এই পৃথিবীতে জন্মায় তাহারা সকলেই এই ভূমণ্ডলে আসিবার মুহূর্ত্ত হইতেই সর্ব্ব প্রথম হাওয়ার সহিত পরিচিত হয়। বায়ু ভিন্ন কোন প্রাণীই পৃথিবীতে বাঁচিতে পারে না, তাই প্রাণকে 'প্রাণবায়ু' বলা হয়। সুতরাং এই বায়ু কি পদার্থ, তাহার স্বভাব কিরূপ, তাহার ধর্ম্ম কি, প্রভৃতি প্রশ্ন মানুষ যখন হইতে চিন্তা করিতে শিখিয়াছে তখন হইতেই তাহার মনে জন্মিয়াছে। বায়ু সম্বন্ধে অনেক তথ্য মানুষ ক্রমে জানিয়াছে, কিন্তু আরও কত রহস্য যবনিকার অন্তরালে লুকান আছে যাহা লইয়া আজও পণ্ডিতগণ মাথা ঘামাইতেছেন।

হাওয়ার সঙ্গে তোমাদের জন্মাবধি পরিচয় থাকিলেও তাহার ভিতর কত রহস্য লুকান আছে তাহা বোধ হয় তোমাদের জানা নাই। সেই সকলের সঙ্গে তোমাদের একটু পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য বর্ত্তমান প্রসঙ্গ তুলিযাছি। প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে যে বাতাস আমাদের ভিতর যাওয়া আসা করিতেছে তাহার প্রকৃতি কেমন, বায়ুর মধ্যে কতরকম আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে এবং কেন ঘটে, কেমন করিয়া বৃষ্টি হয়, কেন মেঘ হয়, কেন কালবৈশাখী, ঝড় বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি হয়, বর্ষাকাল প্রতি বৎসর প্রায় একই সময়ে কেন আসিয়া উপস্থিত হয়, ইত্যাদি বিষয় জানিতে বোধ হয় স্বভাবতঃই তোমাদের কৌতূহল হয়। এইখানে তোমাদের বলিয়া রাখি, যে শাস্ত্রে বায়ুমণ্ডলে উপরি লিখিত নৈসর্গিক ঘটনাবলির বিবরণ, তাহাদের কার্য্য কারণ সম্বন্ধ প্রভৃতি তত্ত্ব আলোচিত হয় তাহাকে **'আবহ বিজ্ঞান'** বা **'আবহাওয়া-তত্ত্ব'** বলে। ভূ-পৃষ্ঠের বায়ুর এক নাম 'আবহ', তাহা হইতে এই বিজ্ঞানের নামকরণ হইয়াছে **আবহ-বিজ্ঞান**।

আবহ-বিজ্ঞান অতি পুরাতন শাস্ত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যখন হইতে মানবজাতির সৃষ্টি হইয়াছে তখন হইতেই এই শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের বেদ, পুরাণ প্রভৃতি বহু প্রাচীন গ্রন্থে এবং

পৃথিবীর অন্যান্য প্রায় সকল জাতিরই পুরাতন পুস্তকাদিতে ‘আবহ’ সম্বন্ধে অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যায়। আবহাওয়া সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ বচন পৃথিবীর সকল দেশে প্রাচীনতম যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু অনাদি কাল হইতে আবহাওয়ার আলোচনা সুরু হইলেও বর্ত্তমান যুগে এই শাস্ত্রের সাধনা খুবই বাড়িয়াছে। এই সাধনার ফলে ‘আবহ-বিজ্ঞানের’ দ্রুত উন্নতি হইতেছে এবং ইহার নিত্য নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে।

আবহাওয়া সম্বন্ধে আলোচনার গোড়াতেই তোমরা প্রশ্ন করিতে পার, এই শাস্ত্রের আলোচনায় লাভ কি? ইহাতে মানুষের কি উপকার হয়? ইহা কি শুধু কাল্পনিক তত্ত্ব আলোচনার মত, না ইহার সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কোন যোগ আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞান ও সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে আবহাওয়ার বড় নিকট সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। কৃষিকার্য্যের সঙ্গে বৃষ্টিপাতের সম্পর্ক, কোন্ আবহাওয়ায় কোন্ ফসল কেমন ফলে ইত্যাদি বিষয়ের নানাকথা আমাদের এই কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে অনেক কাল হইতেই মানুষ জানে। ইঞ্জিনিয়ারগণ নদীর উপর সেতু তৈয়ারী করিতে গেলে, অথবা কোন সহরের জলনিকাশের ব্যবস্থা (নর্দ্দমা প্রস্তুত) করিতে হইলে প্রথমেই খবর লইয়া থাকেন সেই অঞ্চলে বর্ষা কতটা হয়, ঝড়বৃষ্টির সময় অল্প সময়ের মধ্যে কতখানি বৃষ্টিপাত হয়, এবং সেই খবরের উপর তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী নির্ভর করে। বোম্বাই সহরে জলসরবরাহ করিবার জন্য সেখানকার ম্যুনসিপালিটীকে, কোন্ স্থানে গেলে বেশী বৃষ্টির জল ধরিতে পারা যাইবে তাহা, খুঁজিয়া বাহির করিতে হইয়াছে। সমুদ্রে যে সব জাহাজ যাতায়াত করে তাহাদের সুবিধার জন্য প্রত্যহ নিয়মিত সমুদ্রের আবহাওয়ার সংবাদ বেতার-যোগে জানান দরকার হয়। কোথাও ঝড়বৃষ্টির সূত্রপাত হইতেছে কি না সময় থাকিতে জানিতে পারিলে জাহাজগুলি আত্মরক্ষার্থ সাবধান হইতে পারে। কোন বন্দরে ঝড় ঝাপটা আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে কর্ত্তৃপক্ষকে সময় থাকিতে সাবধান করিয়া ধন ও প্রাণ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হয়। এইরূপে রেলকর্ত্তৃপক্ষগণ ও সময় থাকিতে দুর্য্যোগের সংবাদ পাইয়া রেলপথ বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কি করিয়া ভবিষ্যৎ আবহাওয়ার সংবাদ পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারা যায় সে কথা তোমাদের পরে বলিব। আজকাল আকাশে যে সকল ‘এরোপ্লেন’ (উড়োজাহাজ) উড়িতে দেখা যায় তাহারা আকাশের আবহাওয়ার সংবাদ না লইয়া উড়ে না। বিভিন্ন স্থানে ভূপৃষ্ঠের উপর বিভিন্ন স্তরে বায়ুর দিক্ ও গতিবেগ তাহাদের জানা নিতান্ত প্রয়োজন। আবার দেখা যায় যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে আবহাওয়ার সংবাদ জানা কত প্রয়োজন। ইতিহাস পড়িয়া আমরা জানিতে পারি যে একমাত্র আবহাওয়া প্রতিকূলে থাকায় মহাশক্তিশালী অভিযান ও বিপক্ষের বিনা বাধায় বিফল হইয়া গিয়াছে! দেখা যায় যুদ্ধমানশক্তি সর্ব্বদা অনুকূল আবহাওয়াকে নিজের কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। আর একদিকে দেখিতে পাই পাহাড়ে চড়িবার জন্য লোকে আবহাওয়ার খোঁজ লইতেছে! গত কয় বৎসর ধরিয়া হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গে উঠিবার জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা হইতেছে তাহাতে পর্ব্বতা-

রোহিগণ দিনের পর দিন নিয়মিত, পর্ব্বতের উপর আবহ-সংবাদ লইতেছেন। এই সব ব্যাপার হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে জলে, স্থলে বা আকাশে বিচরণ করিতে, যুদ্ধ-বিগ্রহে, শান্তির সময়, সকল অবস্থাতেই মানবজীবনের সহিত আবহ-সংবাদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।
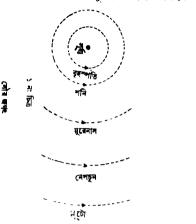
নিরাকার বায়ুমণ্ডলের প্রকৃতি আলোচনা করিবার পূর্ব্বে উহার জন্ম-কথা একটু শুনা যাক্। তোমরা হয়ত জান যে সূর্য্য ও নয়টী প্রধান গ্রহ লইয়া "সৌরমণ্ডল" গঠিত। আমাদের জননী ধরিত্রী এই "সৌরমণ্ডলের" অন্তর্গত একটা গ্রহ। এইসব গ্রহগুলি সূর্য্যের

প্রথম তালিকা

গ্রহ	সূর্য্য হইতে দূরত্ব (গড়ে)	সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ কাল	নিজ কক্ষে গতির বেগ প্রতি সেকেণ্ডে
বুধ (Mercury)	৩ কোঃ ৬০ লক্ষ মাঃ	৮৮ দিন	২৪ মাইল
শুক্র (Venus)	৬ ,, ৭০ ,, ,,	২২৫ ,,	২২ ,,
পৃথিবী (Earth)	৯ ,, ৩০ ,, ,,	৩৬৫ ,,	১৮½ ,,
মঙ্গল (Mars)	১৪ ,, ১০ ,, ,,	১ বৎসর ৩২১ ,,	১৫ ,,
বৃহস্পতি (Jupiter)	৪৮ ,, ৩০ ,, ,,	১১ ,, ৩১৪ ,,	৮ ,,
শনি (Saturn)	৮৮ ,, ৬০ ,, ,,	২৯ ,, ১৬৮ ,,	৬½ ,,
য়ুরেনাস (Uranus)	১৭৮ ,, ২০ ,, ,,	৮৪ ,, ৭ ,,	৪ ,,
নেপচুন (Neptune)	২৭৯ ,, ৩০ ,, ,,	১৬৪ ,, ২৮৮ ,,	৩⅓ ,,
প্লুটো (Pluto)	৩৬৮ ,, ০ ,, ,,	২৪৯ ,, ৭৩ ,,	৩ ,,

চতুর্দ্দিকে ভিন্ন ভিন্ন দূরে থাকিয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরিতেছে।

সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটের গ্রহ হইতেছে বুধ (Mercury), তাহার পর শুক্র (Venus) এইরূপে যথাক্রমে পৃথিবী, মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), য়ুরেনাস (uranus), নেপচুন (Neptune) ও প্লুটো (Pluto) বিভিন্ন দূরে রহিয়াছে। সূর্য্য হইতে কোন্ গ্রহ কত দূরে এবং তাহাদের অন্য দুই একটা খবর তোমাদের তালিকায় দেখান হইল।

জ্যোতিষের কোটি কোটি সংখ্যার অঙ্ক গুলি মানুষের ধারণায় আনা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। ধারণা করিবার সুবিধার জন্য বলা যাইতে পারে যে, যদি পৃথিবীকে এক ইঞ্চি ব্যাসের (diameter) একটা গুলির মত ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে সেই অনুপাতে সূর্য্য একটা নয় ফিট ব্যাসের প্রকাণ্ড গোলক হইবে। এগার হাজার ছয়শত পাঁচশটি (১১৬২৫) পৃথিবী পাশাপাশি রাখিলে তবে সূর্য্যের কাছে পৌঁছান যায়।
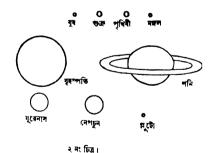
২ নং চিত্র।

নবগ্রহের আপেক্ষিক আয়তন।

মোটামুটি ১৫ লক্ষ পৃথিবী একসঙ্গে করিলে সূর্য্যের আয়তনের সমান হয়। সমস্ত গ্রহগুলি একত্র করিলেও সূর্য্য তাহাদের চেয়ে প্রায় ৫০০ গুণ বড়। ২নং চিত্রে নয়টি গ্রহের আপেক্ষিক আয়তন দেখান হইল।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন সূর্য্য এবং তার পরিবারস্থ গ্রহ উপগ্রহগুলি অনাদিকাল পূর্ব্বে একত্রে পুঞ্জীভূত হইয়া ব্যোমমার্গে এক অতি ভীষণ প্রকাণ্ড অগ্নিগোলকের আকারে স্বীয় মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিত। কালে এক সময়, তাহাও কত কোটি কোটি যুগ আগে বলা যায় না, এইগুলি এক এক করিয়া সূর্য্য গর্ভ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র আকারে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। আমাদের জননী পৃথিবী ও এইরূপে সূর্য্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিজের পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সময় পৃথিবী সূর্য্যের ন্যায়ই উত্তপ্ত একটি অগ্নিময় গোলক ছিল। স্বতন্ত্র হইবার পর যুগযুগান্তর ধরিয়া তাপ ক্ষয় হইবার ফলে ক্রমে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিতে থাকে। প্রথম অবস্থায় পৃথিবীর অধিকাংশ পদার্থই বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত ছিল। সে অবস্থায় পৃথিবীতে এক ফোঁটা জলের অস্তিত্ব থাকা সম্ভবপর ছিল না। তখন যাহা কিছু পার্থিব পদার্থ সমস্তই লেলিহান অগ্নিশিখার আকারে একদিক হইতে অপর দিকে সঞ্চালিত হইত। অনন্তকাল ধরিয়া তাপ বিকিরণ করিবার ফলে ধরণী ক্রমে ঠাণ্ডা হইতে লাগিল। পাহাড় পর্ব্বত ক্রমে জমিতে লাগিল। অন্তরীক্ষের বাষ্প-সকল শীতল হইয়া মেঘ, বৃষ্টি জন্মাইতে লাগিল, সমুদ্র, হ্রদ, নদীর ক্রমে উদ্ভব হইল। পৃথিবীর বর্ত্তমান উত্তাপে যে সকল গ্যাস তরল হইতে পারে না তাহারাই কেবল আকাশে এখন রহিয়াছে। এই সকল গ্যাসগুলি মিলাইয়া বর্ত্তমান বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি হইল। ক্রমে পৃথিবীর

উপর উদ্ভিদাদি জন্মিল, নানাবিধ পশুপক্ষীর সৃষ্টি হইল, পরে একদিন প্রথম মানব অবাক্-বিস্ময়ে সৃষ্টিকর্ত্তার বিচিত্র সৃষ্টির পানে চাহিয়া দেখিল কি অপূর্ব্ব সে সৃষ্টি।

একদল বৈজ্ঞানিক এক সময়ে মনে করিতেন যে এই পৃথিবী যখন অগ্নিময় বাষ্পাবস্থা হইতে শীতল হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তখন যুগযুগান্তর পরে একদিন হয়ত ইহা হিম-শীতল হইয়া পড়িবে। তখন আকাশের সমস্ত জলীয় বাষ্প জমাট বাঁধিয়া বরফ হইয়া যাইবে, বায়ুমণ্ডলের সমস্ত গ্যাসগুলি জমিয়া গিয়া বায়ুর অস্তিত্ব লোপ পাইবে। সে বিচিত্র জগতে আকাশের আলোক নিবিয়া যাইবে, দিনমানেও তারকাগুলি দেখা যাইবে। শব্দের অস্তিত্ব আর থাকিবেনা। এ হেন জগতে জীবজন্তুর অস্তিত্ব বহু পূর্ব্বেই লোপ পাইয়া যাইবে। আবার আর একদল বৈজ্ঞানিক বলেন, এই সকল কষ্ট কল্পনা মন হইতে তাড়াইয়া দাও। পৃথিবী বর্ত্তমান অবস্থায় যে উত্তরোত্তর শীতল হইয়া পড়িতেছে একথা অমূলক। বহু যুগ পূর্ব্বে পৃথিবীর অধিকাংশ অংশ এক সময় বরফাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু এখন সে সব অংশ আবার গরম হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং পৃথিবীর অন্তর্নিহিত উত্তাপের সহিত ভূপৃষ্ঠের উত্তাপের বিশেষ সম্বন্ধ এখন আর নাই। যাহা হউক জননী ধরিত্রী যে এখনও আমাদের বহুযুগ ধরিয়া অঙ্কে স্থান দিবেন এই কথা ভাবিয়া আমরা উপস্থিত মনে দুঃশ্চিন্তার স্থান না দিলেও পারি।

তোমরা ভূগোলে পড়িয়াছ পৃথিবী গোলাকার, ঠিক ফুটবলের মত গোল নয়, কমলালেবুর মত দুই দিকে একটু চাপা। এই গোলাকার পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করিয়া বায়ুমণ্ডল অবস্থিত অথবা মনে করা যাইতে পারে যে বায়ু-সমুদ্রের মধ্যস্থলে গোলাকার পৃথিবী অবস্থান করিতেছে। পৃথিবী যেমন নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতেছে এই বায়ুমণ্ডলও পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। বায়ুমণ্ডল যদি স্থির থাকিত এবং তাহার মধ্যভাগে শুধু পৃথিবী স্বীয় মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিত তাহা হইলে আপেক্ষিক গতির ফলে ভূপৃষ্ঠের উপর অনবরত ঝড় বহিতে থাকিত। তোমরা জান বাতাস একেবারে স্তব্ধ থাকিলেও রেলগাড়ী যখন চলে গাড়ীর জানালার কাছে খুব হাওয়া পাওয়া যায়, গাড়ী যত জোরে চলে হাওয়া তত বেশী জোরে হয়। ইহা

৩নং চিত্র
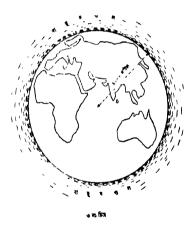
বাতাস ও গাড়ীর আপেক্ষিক গতির ফলে হয়। পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে মিনিটে ১৭½ মাইল বেগে ঘুরিতেছে। বায়ুমণ্ডল যদি পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে না ঘুরিত তাহা হইলে আপেক্ষিক গতির ফলে ভূপৃষ্ঠে অনবরত মিনিটে ১৭½ মাইল বেগে ঝড় বহিত। এমন অবস্থায় পৃথিবীর উপরকার

জীবজন্তুর কি অবস্থা হয় তাহা কল্পনা করিতেও ভয় হয়।

বায়ু স্বাদহীন, গন্ধহীন, অশরীরী বস্তু। যখন স্তব্ধ থাকে তখন তাহার অস্তিত্ব আমরা সহজে বুঝিতে পারি না, যদিও প্রতি নিঃশ্বাসে বায়ু আমাদের শরীরের ভিতর যাতায়াত করিতেছে। সচল অবস্থায় বায়ুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ থাকে না। ঝঞ্ঝা বাত্যায় আকাশে যখন বায়ুর তাণ্ডবলীলা চলিতে থাকে তখন প্রাণী মাত্রেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে।

মাছ যেমন জলের তলদেশে বাস করে, আমরা তেমনি বায়ু সমুদ্রের তলদেশে বাস করি। ভূপৃষ্ঠ হইতে উঠিয়া বায়ু আকাশের দিকে অনেক উপরে উঠিয়াছে। কতদূর ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত বায়ু উঠিয়াছে তাহা জানিবার

৭ নং চিত্র

জন্য অনুসন্ধিৎসু মানুষ মাত্রেরই মনে কৌতূহল হয়। বায়ুর উপরকার খবর জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ অনেক দিন ধরিয়া চেষ্টা করিতেছেন। বহুলোক এই কার্য্যে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়াছেন। অনেকে বেলুনে চড়িয়া আকাশের খবর আনিবার জন্য ভূপৃষ্ঠ হইতে ১৪ মাইল ঊর্দ্ধে পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। হাল্কা মুক্ত বেলুন ছাড়িয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া ২০ মাইল উপরের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তোমরা অনেকে হয়ত আকাশে ছোট ছোট উল্কা-পাত দেখিয়াছ, যা'কে চলতি কথায় 'তারা খসিয়া পড়া' বলে। এই উল্কাগুলি সাধারণতঃ ক্ষুদ্র মটর বা কলাই অথবা বালু-কণার মত ছোট বস্তু। তাহারা আকাশ-পথে ঘুরিতে ঘুরিতে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আসিয়া পড়িলে ভীষণ বেগে ভূপৃষ্ঠের দিকে ছুটিয়া চলে। তাহাদের গতিবেগে (সেকেণ্ডে ২০ হইতে ৪০ মাইল) আকাশের উপরের পাতলা হাওয়ার সহিত ঘর্ষণে তাহারা এতই উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে তাহাদের জ্বলন্ত দেখায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ভূপৃষ্ঠে উপর ৬০ হইতে ১০০ মাইলের মধ্যে উল্কাপিণ্ডদের দেখা যায়। মেরু-প্রদেশে আকাশের মেরুরশ্মি (অরোরা) নিরীক্ষণ করিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে ভূপৃষ্ঠের ৩০০ হইতে ৫০০ মাইল উপরেও হাওয়ার অস্তিত্ব আছে। রেডিও রশ্মির প্রকৃতি অনুশীলন দ্বারা অনুমান করা হয় যে আকাশে ৫০ মাইল উপরে এবং ১৪০ মাইল উপরে দুইটী বায়ুস্তর আছে যাহারা রেডিও তরঙ্গের চলাচলকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই দুইটী স্তরকে যথাক্রমে 'হেভিসাইড্ স্তর' (Heaviside layer, 50 miles) ও 'অ্যাপ্‌ল্‌টন স্তর' (Appleton layer, 140 miles) বলা

হয়। এই দুইটী স্তরের মধ্যস্থ বায়ুমণ্ডলকে 'আয়নমণ্ডল' (ionosphere) বলা হয়।

৫ নং চিত্র

যান্ত্রিক পরীক্ষা ও গবেষণা দ্বারা জানা গিয়াছে যে ভূপৃষ্ঠ হইতে ৬-৭ মাইল উপর পর্য্যন্ত বায়ুস্তরের উপাদান অনেকটা একরূপ এই স্তরকে 'ঘনস্তর' (troposphere) বলা হয়। এই স্তরের ভিতর ভূপৃষ্ঠ হইতে যত উপরে উঠা যায়, বায়ুচাপ ও বায়ুর উষ্ণতা ক্রমশঃ কমিতে থাকে। ঝঞ্ঝা, বাত্যা মেঘ, বৃষ্টি, তুষারপাত প্রভৃতি ঘটনাবলি এই স্তরের ভিতরই ঘটিয়া থাকে।
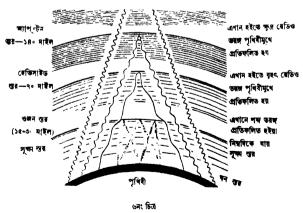
ঘনস্তরের উপর যে স্তর অবস্থিত তাহাকে 'সূক্ষ্মস্তর' (Stratosphere) বলে। এই স্তরে উচ্চতার আধিক্যের সহিত বায়ুচাপের হ্রাস ঘটে বটে (যেমন ঘনস্তরে হইয়া থাকে) কিন্তু বায়ুতাপের তারতম্য বিশেষ লক্ষিত হয় না। এই স্তরে সর্ব্বত্র বায়ুতাপের সমতা অথবা উচ্চতার আধিক্যের সহিত তাপের বরং কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিই (ঘনস্তরে যাহা ঘটে ঠিক তাহার বিপরীত) দেখা যায়। বায়ুমণ্ডল শেষ পর্য্যন্ত কতদূর উঠিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে তাহা এখনও কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। অনুমান করা হয় উর্দ্ধে উঠিয়া বায়ু ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া অনন্ত মহাকাশে মিলাইয়া গিয়াছে। সে অনন্তের কি আর শেষ আছে!

৬নং চিত্র

হজরৎ লূত

[হজরৎ মূছার সম্বন্ধীয় নূতন এবং প্রয়োজনীয় অংশ শিশুভারতীর ৩২১৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহুদী জাতির ইতিহাসে উহা প্রকাশিত হওয়ায় আর বাকী অংশ অনাবশ্যক বোধে প্রকাশ করা হইল না। শিশুভারতী তৃতীয় খণ্ডে উহা দেখিতে পাইবে।]

৩৪১৯ পৃষ্ঠার পর

হজরৎ লূত, হজরৎ এব্রাহিমের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁহার সমসাময়িক। তিনিও, পিতৃব্যের মতই একজন পরম ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। এব্রাহিমের মক্কায় অবস্থান কালে কেনানের পূর্ব্ব-দিগ্‌বর্ত্তী 'সোডম' ও 'গোমরা' প্রভৃতি স্থানে হজরৎ লূত ইছলাম ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন।

এব্রাহিমের অনুপস্থিতিতে দেশবাসিগণ, উচ্ছৃঙ্খলতার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা আল্লার উপাসনা ত্যাগ করিয়া মূর্ত্তি পূজায় লিপ্ত হইয়াছিল; তাঁহার বিধান অমান্য করিয়া চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, মিথ্যাকথা প্রভৃতি পাপ কার্য্যে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিত। হজরৎ লূত ইহাদিগকে সৎপথে আনিবার জন্য বহু উপদেশ দিতেন কিন্তু তাহারা তাঁহার উপদেশবাণী আদৌ শ্রবণ করিত না; বরং তজ্জন্য তাঁহার উপর নানা প্রকার অত্যাচার ও নির্য্যাতন করিত। অমানুষিক অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া লূত আল্লার নিকট প্রার্থনা করিলেন "হে আমার দয়াময় আল্লাহ্! আমার জাতি কিছুতেই সৎপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে না; আমার উপদেশ শুনিয়া বরং তাহারা আরও অধিকতর পাপ কার্য্যে লিপ্ত হইতেছে! এবং আমার উপরে অসহ্য অত্যাচার করিতেছে। হে আল্লাহ্! তোমার ধর্ম্ম তুমি প্রচার না করিলে আমার সাধ্য কি আমি উহা প্রচার করি? অজ্ঞানদিগকে তুমিই জ্ঞান দান কর।

একদিন রাত্রিকালে দ্বাদশ জন সুশ্রী যুবক লূতের গৃহে অতিথি হইলেন। অতিথির সৎকার ইছলামের অন্যতম বিধান। তাই হজরৎ লূত অতিথিদিগকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইলেন।

স্থানান্তর হইতে কোন যুবক তথায় আসিলে, সহরের উচ্ছৃঙ্খল যুবকেরা, তাহাদের উপর নানা অত্যাচার করিত। একমাত্র হজরৎ লূতই তাহাদের এই পাপ কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন। ইহাতে রুষ্ট হইয়া উচ্ছৃঙ্খল যুবকেরা লূতের উপরে আদেশ জারি করিল যে, কোন আগন্তুক যুবককে লূত যেন তাঁহার গৃহে আশ্রয় না দেন। এই আদেশ সত্ত্বেও লূত আজ

বিদেশী যুবকগণকে আশ্রয় দিয়াছেন শুনিয়া সহরের যুবকেরা লূতের গৃহ আক্রমণ করিয়া যুবকগণকে তাহাদের হাতে অর্পণ করিতে আদেশ করিল। আর্ত্তের ত্রাণ ও অতিথি সেবাই ইছলামের বিধান। সুতরাং কি করিয়া লূত আল্লার বিধান অমান্য করিয়া আগন্তুক যুবকগণকে আততায়ীদের হাতে সমর্পণ করিবেন! লূত মহা ফাঁপরে পড়িলেন এমন সময় তাঁহার অতিথিগণ বলিলেন "লূত! তুমি চিন্তিত হইও না। আমরা মানুষ নই, আল্লার দূত। এই সহরবাসীদের ধ্বংস আসন্ন। তোমাকে আমরা এই সুসংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য আল্লার আদেশে তোমার গৃহে আগমন করিয়াছি। দুর্বৃত্তেরা আমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবেনা! তুমি আজি রাত্রিতেই কেনানে গমন করিবে। আগামী কল্য প্রাতঃকালেই ইহাদের ধ্বংসের লীলা আরম্ভ হইবে!" এই বলিয়া দূতগণ অন্তর্ধান করিলেন। অতিথিরা কোথায় লুকাইল দুষ্কৃত্তেরা তাহার আর সন্ধান না পাইয়া ক্ষুণ্ণ মনে লূতের গৃহ ত্যাগ করিল। হজরৎ লূতও সেই রাত্রিতেই স্বদেশ ছাড়িয়া কেনানে চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রভাতে সত্য সত্য এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে সমগ্র 'সোডম'ও 'গোমরা' দেশটী সশব্দে ভূগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া স্থানটী এক বিরাট জলাশয়ে পরিণত হইল। হজরৎ লূতের উপদেশ না শুনার জন্যই স্থান দুইটী ভূগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া জলাশয়ে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া উহা "বাহ্‌রেলূত" বা লূতের সাগর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাই আধুনিক মরুসাগর (Dead-Sea)। তোমরা এসিয়ার মানচিত্রের উপর লক্ষ্য করিলে দেখিবে প্যালেষ্টাইনের পূর্ব্বদিকে, সুয়েজ খাল হইতে প্রায় ১৫০ মাইল দূরে এই লূতের সাগর অবস্থিত। হরমন পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া ইয়ারদান (জর্ডন) নদী এই লূতের সাগরে পড়িতেছে। এই সাগরের এক বিশেষত্ব এই যে, কোন জলজন্তু ইহাতে বাঁচিতে পারে না। এবং ইহার জলে সাঁতার দিতে কেহ ডুবিয়া যায় না।

বৃদ্ধ বয়সে হজরৎ লূত স্বর্গারোহণ করেন। হেব্রণ বা খলিলুর রহমান হইতে প্রায় তিন মাইল পূর্ব্বদিকে এখনও হজরৎ লূতের সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে।

হজরৎ ইছমাইল

হজরৎ ইব্‌রাহিমের প্রথমা স্ত্রী ছারার গর্ভে কোন সন্তান না হওয়ায় তিনি বিবি হাজেরার পাণিগ্রহণ করেন। ইব্‌রাহিমের বয়স যখন ৮৬ বৎসর, তখন এই হাজেরার গর্ভে হজরৎ ইছমাইলের জন্ম হয়। কিন্তু বিমাতার চক্রান্তে শৈশবেই স্নেহময়ী মাতা সহ তিনি মক্কার নিকটবর্ত্তী এক বিজন বনে নির্ব্বাসিত হন। এই জনমানবহীন বনে তাঁহারই কল্যাণে "জমজম কূপের" উদ্ভব হয়। এবং সেই সময় হইতেই তথায় লোকে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে এই স্থানটী একটী প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হয়।

যখন তিনি দশ বৎসরের বালক তখন পিতা ইব্‌রাহিম, একদিন তাঁহার প্রিয় বস্তুকে কোরবাণী দিতে স্বপ্ন যোগে আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। তদনুযায়ী তিনি বালক পুত্রকে লইয়া নিকটবর্ত্তী মীনা পাহাড়ের অন্তরালে গমন করিলেন। পথিমধ্যে তিন স্থানে শয়তান ইছমাইলকে প্ররোচনা করিতে চেষ্টা করিল। ইছমাইল দৃঢ় কণ্ঠে তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন এমন কি তাহার প্রতি কঙ্কর নিক্ষেপ পর্য্যন্ত করিলেন। আজিও ঐ স্থানে হজরৎ ইছমাইলের পুণ্য-স্মৃতি স্মরণ করিয়া হাজিগণ উক্ত তিন স্থানে কঙ্কর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন।

পিতা পুত্রের নিকট আল্লার আদেশ এবং তাঁহার নিজের উদ্দেশ্যের কথা জানাইলেন। পিতৃভক্ত পুত্র ও পিতার ন্যায় ধর্ম্মভীরু ছিলেন। সুতরাং তিনিও আল্লার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে সাগ্রহে পিতাকে সম্মতি দিলেন। আত্মত্যাগের কি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

পুত্রের সম্মতিক্রমে তাহার হাত পা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া, তাহাকে অধোমুখে শোয়াইয়া পিতা গ্রীবাদেশে ছুরিকা দিয়া সজোরে আঘাত করিলেন; কিন্তু লীলাময়ের কি আশ্চর্য্য লীলা! তীক্ষ্ণধার অস্ত্রে পুত্রের গায়ে সামান্য আঘাতও লাগিল না। অবশেষে দৈববাণী হইল "ইবরাহিম! তোমাদের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগে আমি পরম তুষ্ট হইয়াছি। তোমার কোরবাণী কবুল করিলাম। ইছমাইলের পরিবর্ত্তে দুম্বা কোরবাণী কর।" আদেশানুযায়ী কার্য্য হইল।

ইছমাইল আল্লার উদ্দেশ্যে নিজেকে "কোরবান" (আত্মত্যাগ) করিয়াছিলেন বলিয়া আরব্য সাহিত্যে এখনও তাঁহাকে "যবিহুল্লাহ্" (Zabihullah) বা আল্লার কোরবাণী বলা হয়। এই ঘটনা হইতেই মোছলমানদের মধ্যে কোরবাণীর প্রথা প্রচলিত আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

ইছমাইলের বয়স যখন ১৩ বৎসর, সেই সময় কাবার ঘরের সংস্কার করিবার জন্য পিতা পুত্র উভয়ের প্রতি আল্লার আদেশ হয়। তদনুযায়ী ইছমাইল পিতার সহিত কাবার ঘরের সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন করেন।

হজরৎ ইছমাইল পিতার ন্যায় অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু ছিলেন। পবিত্র ইছলামের আদর্শে তিনি কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেন না। একদিন এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "আপনি আমার জন্য এই স্থানে অপেক্ষা করুন; আমি না আইসা পর্য্যন্ত আপনি চলিয়া যাইবেন না।" ইছমাইল তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে ঐ ব্যক্তি দীর্ঘ এক বৎসরের মধ্যে আর ফিরিলেন না। এই দীর্ঘকাল পর একদিন সেই ব্যক্তি সেই স্থান দিয়া গমন কালে দেখিলেন হজরৎ ইছমাইল তাহার প্রতীক্ষায় সেই স্থানেই অবস্থান করিতেছেন।

তিনি জরহাম বংশীয় এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া মক্কাতেই আজীবন অতিবাহিত করেন, এবং ইমেন প্রভৃতি স্থানকেই জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া লন।

হজরৎ ইবরাহিম পুত্র দর্শন মানসে কেনান হইতে মাঝে মাঝে মক্কায় গমন করিতেন। এক দিন ইছমাইলের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ইছমাইল গৃহে নাই। শুধু পুত্রবধূ রহিয়াছেন। তিনি পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, ইছমাইল কোথায় গিয়াছে?" পুত্রবধূ কোনরূপ নম্রতা বা শিষ্টাচার প্রদর্শন না করিয়া কর্কশ স্বরে উত্তর দিলেন "শিকারে গিয়াছে।" পুত্রবধূর এইরূপ উত্তরে ইব্রাহিম বিশেষ দুঃখিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, "মা! ইছমাইল আসিলে তাহাকে তাহার ঘরের আছবাব পরিবর্ত্তন করিতে বলিও।"

ইছমাইল গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্ত্রীর মুখে পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পিতার ইঙ্গিত-অনুযায়ী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেন।

হজরৎ ইছমাইলের কল্যাণে আরবের সেই বিজন অরণ্যে সমৃদ্ধিশালিনী "নগরী জননীর" উদ্ভব হইয়াছিল; তাঁহারই কল্যাণে পবিত্র কাবার ঘর সমগ্র মোছলেম জগতের তীর্থকেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছে।

তাঁহার ১২ জন পুত্র ও ১ জন কন্যা ছিলেন। পুত্রগণের মধ্যে কেদার ও ছাবেত নামক পুত্রদ্বয় মক্কায় অবস্থান করিতেন। কেদার, ইমেন, হেজাজ প্রভৃতি স্থানের উপরে প্রভুত্ব করিতেন।

১৩০ বৎসর বয়সে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়া স্নেহময়ী মাতার পার্শ্বে সমাধি লাভ করেন।

হজরৎ ইছমাইলের বংশই বনি ইছমাইল বংশ নামে পরিচিত। এই বংশ হইতেই আরবের সুপ্রসিদ্ধ "কোরেশ" বংশের উদ্ভব হয়। এই বনি ইছমাইল বংশ ইমেন হইতে সিরিয়া পর্য্যন্ত ভূভাগের মধ্যে বসতি করিত। পবিত্র কাবার কর্ত্তৃত্ব ভার বহুদিন পর্য্যন্ত ইহাদেরই হাতে ছিল।

হজরৎ ইছ্হাক

হজরৎ ইব্রাহিমের প্রথমা স্ত্রী ছারার গর্ভে কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল না। ইব্রাহিমের বয়স যখন ৮৬ বৎসর তখন দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরার গর্ভে ইছমাইলের জন্ম হইল। স্বামী এই সপত্নীর পুত্রকে লইয়াই পবিত্র কাবার ঘর সংস্কার করিলেন। সপত্নী পুত্র নিজের জীবনকে আল্লার নামে উৎসর্গ করিবার সুযোগ লাভ করিল। সুতরাং ছারা মনে মনে দুঃখ প্রকাশ করিলেন "হায় আল্লাহ্! আজ আমার একটী পুত্র সন্তান থাকিলে সেও পিতার সহিত কত ধর্ম্ম কার্য্য করিতে পারিত!" এই পুত্রহীনা ছারা বিমর্ষভাবে জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহার হৃদয়ের এই গভীর বেদনার স্পন্দন আল্লার সিংহাসন পর্য্যন্ত পৌঁছিতে বাকী রহিল না। তাই বুঝি ইব্রাহিমের ১০২ বৎসর বয়সের সময় ছারার গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন এই পুত্রের নামই

হজরৎ লূতের রক্ফা (Raqfa) নাম্নী এক কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি মাতা ছারা সহ কেনানেই বাস করেন।

ইছৌ (Esau) ও ইয়াকুব নামে হজরৎ ইছ্হাকের দুই পুত্র জন্মে। হজরৎ ইছমাইলের এক কন্যার সহিত ইছৌর বিবাহ হয়।

হজরৎ ইছ্হাকও পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনিও আজীবন পিতার ইছলাম ধর্ম্মই প্রচার করিয়াছেন। ১৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তিনি পুত্রদিগকে বলিলেন "তোমরা সকলে পিতার ধর্ম্ম পালন করিবে এবং ইহার প্রচার করিবে।"

তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ইয়াকুবের অন্য নাম 'ইছ-রাইল'। এই ইছরাইলের বংশাবলীকেই বনি-ইছ্রাইল বা ইছ্রাইল বংশ বলা হয়। এই বংশে হজরৎ 'দাউদ' (David) ছোলায়মান 'মুছা', 'ইছা' প্রভৃতি পয়গম্বরগণ জন্মগ্রহণ করেন।

হজরৎ ইছ্হাক কেনান, শাম, প্রভৃতি উত্তর আরবে ইছলাম প্রচার করেন। মৃত্যুর পর জননী ছারার পার্শ্বেই তিনি সমাধি লাভ করেন। আজিও হেব্রন বা খলিলুর রহমান নামক স্থানে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে।

হজরৎ ইয়াকুব

হজরৎ ইছ্হাকের দুই পুত্র, ইছৌ ও ইয়াকুব। হজরৎ ইছ্হাক অন্ধ ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র ইছৌকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। একদিন তিনি পুত্রগণকে বলিলেন "যে আমাকে তৃপ্তির সহিত মাংসের কাবাব খাওয়াইবে তাহাকে আমি অন্তরের সহিত 'দোওয়া' দিব অর্থাৎ আশিস করিব।"

পিতা একজন পয়গম্বর। সুতরাং তিনি যাহাকে দোওয়া দিবেন তিনি নিশ্চয়ই একজন পয়গম্বর হইবেন, এই আশায় পিতাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য উভয়েই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইছৌ তীর ধনু লইয়া শিকারের জন্য বনে গেলেন।

হজরৎ ইয়াকুব মাতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। মা, পিতার এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া ইয়াকুবকে অবিলম্বে একটি দুম্বা জবেহ করিয়া আনিতে বলিলেন। এবং অনতিবিলম্বে ঐ দুম্বার মাংসের কাবাব তৈয়ার করিয়া ইয়াকুবকে দিলেন। ইয়াকুব কাবাব লইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। পিতা তৃপ্তি সহকারে কাবাব ভক্ষণ করিয়া পুত্রকে দোওয়া করিলেন "আমি আল্লার নিকট দোওয়া 'মাঙ্গিতেছি' আল্লাহ্ তোমাকে এবং তোমার বংশের মধ্যে পয়গম্বরি দান করিবেন।"

অতঃপর ইছৌ বন হইতে ফিরিয়া শিকারের মাংস পিতার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। পিতা বলিলেন, "বাবা! আমিত তোমার ভাইকে পয়গম্বরির জন্য দোওয়া করিয়াছি। সুতরাং তোমার জন্য দোওয়া করিতেছি আল্লাহ তোমাকে এবং তোমার বংশে বাদশাহি দিবেন।"

ইছৌ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। পার্থিব সম্মান অপেক্ষা পারলৌকিক সম্মানকে তাঁহারা অধিক-তর গৌরবজনক মনে করিতেন। সুতরাং ইছৌ ইয়াকুবের উপর অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইলেন। এমন কি তাঁহাকে হত্যা করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। ভাব দেখিয়া ইয়াকুব প্রাণ-ভয়ে, রাত্রিযোগে পলাইয়া শামদেশে মাতুলালয়ে গমন করিলেন।

উত্তরে এশিয়া মাইনর, দক্ষিণে প্যালেষ্টাইন পূর্ব্বে ইরাক পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে শামদেশ বলা হইত। লেবানন পর্ব্বত ইহার ভিতর দিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইয়ারদান নদী ছাড়া এখানে অন্য কোন নদী নাই। এই সময় হিটাইট নামক এক সুসভ্য জাতি এই স্থানের উপর আধিপত্য করিতেন। এশিয়ামাইনর পর্য্যন্ত ইহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সময় সময় বাবিলনের উপরও ইহারা আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেন। কৃষিকার্য্য এবং পশুচারণই ছিল ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। গৃহপালিত পশুর মধ্যে উট, দুম্বা, ও ছাগলই ছিল প্রধান। ইরাক, বাবিলন্, মক্কা, ইমেন প্রভৃতি স্থানের ন্যায় এখানেও লোকে অল্প বিস্তর গোরু পুষিত। কৃষিজাত ফল মূলের মধ্যে খেজুর, কিস্মিস্, বেদানা ইত্যাদিই ছিল প্রধান। গম ও অন্যান্য রবিশস্য ও উৎপন্ন হইত।

হজরৎ ইয়াকুবের মাতুল, সম্ভবতঃ এই হিটাইট বংশেরই লোক ছিলেন। তিনি বেশ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কৃষির মধ্যে তাঁহার কতিপয় ফলের বাগান, এবং পশুর মধ্যে কতকগুলি

ছাগল দুম্বা ছিল। হজরৎ ইয়াকুব এইগুলির তত্ত্বাবধান করিতেন।

লিয়া (Leah) ও রাহেলা (Rachel) নামে লিয়ানের দুই কন্যা ছিল। তিনি স্থির করিলেন ইহার ভাগিনেয়ের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিবেন। হজরৎ ইয়াকুব ও সম্মতি দিলেন। তখন টাকা পয়সা ছিল না। এক জিনিষের বদলে অন্য জিনিষ দিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য্য চলিত। কৃষিকার্য্যের চাকরিতেও এইরূপ চাকরের পরিশ্রমের বিনিময়ে তাহাকে আহার্য্য বা পশ্বাদি দেওয়া হইত। যাহাদের সাংসারিক অভাব অত্যন্ত বেশী তাহারা নিজেকে অথবা সন্তান-সন্ততিকে উপযুক্ত ফসলাদির বিনিময়ে কোন ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে বিক্রয় করিত। ক্রমে শক্তিশালী ব্যক্তিরা যুদ্ধের বন্দীদিগকে আজীবন নিজ গৃহে গোলামরূপে রাখিত। বন্দী সংখ্যা অধিক হইলে উহাদিগকে উপযুক্ত দ্রব্য বিনিময়ে বিক্রয় করিত। এইরূপেই দাস-প্রথার উদ্ভব হইয়াছে।

বর বা বরপক্ষের নিকট হইতে তখনও মোহরানা (স্ত্রীধন) লইবার প্রথা ছিল। কিন্তু হজরৎ ইয়াকুব নিঃস্ব, পরমুখাপেক্ষী, সুতরাং বিবাহের মোহরানা স্বরূপ তাঁহার কিছু দিবার সঙ্গতি ছিল না, অতএব স্থির হইল এই মোহরানার পরিবর্ত্তে হজরৎ ইয়াকুব সাত বৎসর তাঁহার মামুর (মামার) পশুচারণ করিবেন। এই সাত বৎসর পর তাঁহার বিবাহ হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর হজরৎ লিয়ান কন্যার সহিত ভাগিনেয়ের বিবাহ দিলেন। অতঃপর ভাগিনেয়কে সর্ব্বগুণসম্পন্ন দেখিয়া তিনি তাঁহার দ্বিতীয় কন্যাকেও তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিলেন।

যুগের সভ্যতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সনাতন ধর্ম্মের বিধানাবলীর যুগে যুগে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কোন জিনিষই জগতে চিরদিন সমানভাবে কার্য্যকারী হইতে পারে না। নূতন যুগের আগমনে নূতন বিধানই অধিকতর কার্য্যকারী। ইছলামই প্রকৃত যুগধর্ম্ম। এই সময় দুই সহোদরা ভগ্নিকে একই সময় বিবাহ করা জয়েজ (শাস্ত্র সঙ্গত) ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে হজরৎ মুছার সময় স্ত্রীর জীবদ্দশায় তাহার সহোদরা ভগ্নীকে বিবাহ করা রহিত হইয়া যায়। বর্ত্তমান যুগের মোছলমানদের মধ্যেও এই শেষোক্ত বিধানই বলবৎ রহিয়াছে। বরং বিবাহ ও অন্যান্য যাবতীয় অনুষ্ঠানেই যুগোপযোগী আরও বহু নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইছলামের বিধানাবলী বর্ত্তমান যুগোপযোগী বলিয়া সভ্য জগৎ আজ ঐগুলিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেছেন।

কথিত আছে হজরৎ ইয়াকুব ২১ বৎসরকাল শাম দেশে ছিলেন। এই সময় তাঁহার দ্বাদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে আবার পিতৃভূমি কেনানে ফিরিয়া আসেন।

হজরৎ ইয়াকুব ১৪৭ বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি পুত্রদিগকে শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া তাহাদিগকে বলিলেন "হে আমার প্রিয় পুত্রগণ। তোমরা পিতামহ ইবরাহিমের ধর্ম্ম পালন করিবে। তোমরা যে পর্য্যন্ত মোছলমান না হও সে পর্য্যন্ত ম রও না।"

প্যালেষ্টাইনের অন্তর্গত হেব্রন বা খলিলুর রহমান নামক স্থানে পিতৃপিতামহ ও পূর্ব্বপুরুষগণের সমাধি-পার্শ্বে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। হজরৎ ইয়াকুবের অন্য নাম ছিল ইছরাইল। এই জন্য তাঁহার বংশধরগণকে বনি ইছরাইল বা ইছরাইল বংশ বলা হয়। ইহারাই ইতিহাস প্রসিদ্ধ হিকসস্ (Hyksos) জাতি। ইহারা খৃঃপূঃ ১৮ শতাব্দীতে মিশরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেন।

এই সকল মহামানবেরা যেমন দেশের কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন, তেমনি ইছলামের মহান্ আদর্শ ও সংস্কৃতির সম্বন্ধে এমন অনেক কাজ করিয়াছেন, যে আদর্শ ও বিধি-ব্যবস্থাকে এখনও আমরা মানিয়া চলিতেছি।

সেকালের সমাজও তাহার আদর্শের সহিত একালের আদর্শ ও সমাজের এবং শিক্ষার যে প্রভেদ হইয়া আসিতেছে তাহা আমরা এসমুদয় মহাপুরুষগণের জীবনী হইতেই তোমাদিগকে দেখাইতে চেষ্টা করিব। প্রত্যেক দেশেই যুগে যুগে এমন সব মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেন, যাহাদের আদর্শ, সকল দেশের ও সকল সমাজের লোকেরাই গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা সেই কত শত বৎসর আগে যে সকল শিক্ষা, উপদেশ ও গ্রন্থ ইত্যাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন, এখন আমরা তাহারই অনুসরণ করিয়া চলিতেছি। অতএব তাঁহাদের চিন্তা ও ধারণা যে কত বড় মহৎ ও দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন ছিল তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

সন্তরণে আত্মরক্ষা

৩৭৫৯ পৃষ্ঠার পর

সাঁতারের সময় সাঁতারে নানা বিপদ ঘটে, এই নিমিত্ত আত্মরক্ষা করিবার জন্য যে সমুদয় সন্তরণোপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইয়াছে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল। রবার-নির্ম্মিত টুপীর মধ্যে বাতাস ভরিয়া মস্তকে ধারণ করিলে, সন্তরণ-শিক্ষার্থীর মস্তক উপরে ভাসিয়া থাকিবে। ইহাতে প্রথম শিক্ষার্থীদের ভয়ের কোন কারণ থাকে না। যাহারা ভাল সাঁতার জানে এই

সাঁতারের টুপী

টুপী পরিয়া থাকিলে তাহারা সহজে সাঁতার দিতে পারে। বাতাস-ভরা এই টুপীতে কান ঢাকা থাকে এজন্য কোনরূপেই কানে জল ঢুকিতে পারে না। টুপীগুলি বেশ আরামপ্রদ।

জলের নীচে ডুব দিবার টুপী

জলের নীচে ডুব দিয়া চোখ মেলিয়া কিছু দেখার চেষ্টা করা বোকামি এবং তাহা পারাও যায় না। এক প্রকার টুপীর সৃষ্টি হইয়াছে যাহাতে জলের তলায় সহজে নিঃশ্বাস লওয়া চলে এবং চারিদিক দেখা যায়। টুপী পরিয়া কথা বলিতে কিংবা মুখ দিয়া নিঃশ্বাস লইতেও কোন অসুবিধা হয় না।

ভাসমান স্নানের পোষাক

নিরাপদ পেটি

সম্প্রতি এক প্রকার নূতন ধরণের পেটির চলন হইয়াছে। এই পেটি পরিয়া জলে নামিলে ডুবিবার

কোন ভয় থাকে না। এই পেটির ওজন আধ সের ইহাতে বায়ুপূর্ণ করিবার চারিটি কক্ষ আছে। দুইটি সম্মুখে এবং দুইটি পশ্চাতে। এই পেটি ইচ্ছামত বায়ু-পূর্ণ এবং বায়ু শূন্য করা যাইতে পারে।

জীবন-রক্ষী-তোষক

একজন নাবিক জীবন-রক্ষক তোষক প্রস্তুত করিয়াছেন। ঝড়ে বা অন্য কোনও দৈব-দুর্ব্বিপাকে জাহাজ জলে ডুবিয়া গেলে, আরোহীগণ এইরূপ তোষকের সাহায্যে জীবন রক্ষা করিতে পারিবে। উদ্ভিদ্‌জাত একপ্রকার অত্যন্ত লঘুভার কার্পাস

জীবনরক্ষক-তোষক

তুলার মত পদার্থ দ্বারা এই তোষকের ভিতরটা পূর্ণ এই জন্য তোষকটী জলে ভিজিতে পারে না। জীবন-রক্ষক তোষক অঙ্গে ধারণ করিলে বাহু যুগল মুক্ত থাকে পদ যুগলও তোষকের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও উহার নির্ম্মাণ কৌশলে সঞ্চারণ করিতে পারা যায়। জলের উপর সোজা ভাবে দাড়াইয়া থাকিয়াও জলমগ্ন ব্যক্তি দীর্ঘকাল আত্মরক্ষার সুযোগ পায়।

সাতারের জুতা

বর্ত্তমানে সাঁতার দিবার সুযোগের জন্য এক প্রকার কাঠের জুতার আবিষ্কার হইয়াছে। সাঁতার কাটিবার সময় ইহাতে খালি-পা অপেক্ষা ঢের বেশী সুবিধা হয়। পা টানিবার সময় পাদুকার এই অংশ লাগিয়া যায়। আবার ঠেলিবার সময় তাহা খুলিয়া

সাতারের জুতা

যায়। ইহাতে জল ঠেলিবার জোর বেশী হয়। প্রত্যেক পাদুকায় দুইটি অংশ কব্জা দিয়া লাগান আছে।

সাঁতারের বালিশ

এক প্রকার বালিস নির্ম্মিত হইয়াছে, উহা আপনা-আপনি বায়ুপূর্ণ হয়। এই বালিশ মোটর-গাড়ী

বায়ুপূর্ণ বালিশ

চালনা, সন্তরণ ও নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুকে বিশেষ আরাম প্রদান করিয়া থাকে। যখন বায়ুপূর্ণ না থাকে, তখন ইহা ভাঁজ করিয়া পকেটে লওয়া চলে। এই বালিসের থলে দৈর্ঘ্যে ১৭ ইঞ্চি ও প্রস্থে ১২ ইঞ্চি মাত্র। রবার ও খাকি কাপড়ের সমবায়ে উহা নির্ম্মিত। উপরের মুখে রবার এমন ভাবে যুক্ত আছে যে, উহা বন্ধ করিলে বাতাস বাহির হইতে পারে না। জল প্রবেশ করিতে অসমর্থ এই বালিসে মাথা রাখিয়া বেশ আরামে সাঁতরান চলে।

সাঁতারের নূতন পোষাক

সন্তরণ-জগতে মিস্ জেট্টার নাম সকলেরই জানা আছে। মাঘ মাসের মত ভীষণ শীতেও স্বচ্ছন্দে সাঁতার দিয়া ইংলিশ চেনেল (English Channel) অতিক্রম করিবার উপযোগী তিনি এক নূতন রকমের রবারের পোষাক তৈয়ারী করিয়াছেন। তাঁহার রবার-নির্ম্মিত পোষাকে একটিও যোড় নাই কিন্তু তাহাতে সাঁতারের পক্ষে কোনও অসুবিধা হয় না। বরং খুবই সুবিধা হয়।

ভাসমান সাঁতারী-পোষাক

অনেকে একটু একটু সাঁতার জানেন, অথচ ভরসা করিয়া জলে নামিতে পারেন না। তাঁহাদের ভয় হয় পাছে কোন রকমে ডুব জলে হাবুডুবু খান। প্রথম সাঁতারের শিক্ষার্থীদের জন্য এক রকমের ভাসমান জামা তৈয়ারী হইয়াছে; ইহার ভিতরের দিকে হাওয়া ভরা রবারের নল আছে। হাওয়া ইচ্ছামত ভরা যায়। নলে হাওয়া ভরা থাকিলে জামা দেখিতে ফোলা ফোলা মনে হয়। কিন্তু পরিলে খুব হাল্কা লাগে। হাওয়া ভরা না থাকিলে এই জামা ঠিক্ সাধারণ জামার মত দেখায়।

সাঁতারে আরাম

ভাসিবার জামা

এক রকম জামা তৈয়ারী হইয়াছে, ইহার সাহায্যে সাঁতার কাটিতে কাটিতে জলাশয়ের মাঝখানে বেশ বিশ্রাম করা চলে। ছবিটির উপরের কোণে যে লোকটী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে উহার গায়ে এই নূতন জামা রহিয়াছে। একটী নলের সাহায্যে ফুঁ দিয়া জামাটি ফুলাইয়া লইতে হয়।

জলে ভাসিবার যন্ত্রপাতি

ইউরোপ ও আমেরিকায় সাঁতারুরা নানা প্রকারের যন্ত্রপাতির আবিষ্কার করিয়া সাঁতারের

পথ বেশ সহজ করিয়া দিয়াছেন, আমরা এখানে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিলাম।
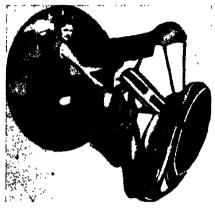
পৃষ্ঠ বিলম্বিত সন্তরণ যন্ত্র

জলে ভাসা চেয়ার

গ্রীষ্মকালে জলের উপর ভাসিয়া আরামে সংবাদপত্র পড়া আজকাল একটা ফ্যাসান্ হইয়াছে।

সাঁতারের ভাসমান চেয়ার

এইজন্য মার্কিন মুলুকে শোলা অপেক্ষাও লঘুভার এক প্রকার কাঠের চেয়ার তৈরী হইয়াছে। উহার হাতল দুইটি অশ্বখুরাকৃতি সমস্তটাই মোটা ক্যাম্বিস্ দিয়া আবৃত। কেদারায় বসিয়া চেয়ারের দুই বাহুতে হাত রাখিয়া স্নানার্থী জলে ভাসিতে থাকে এবং হাত দিয়া যে-দিকে ইচ্ছা যাইতে পারে।

জীবন-রক্ষী বয়া

ফিনল্যাণ্ডের একজন ধীবর একপ্রকার নূতন ধরণের জীবনরক্ষী বয়া আবিষ্কার করিযাছেন। এই বযার মধ্যে একটী লোক দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। বয়াটী, একটী দুই হাতওয়ালা ওয়াটারটাইট্ ব্যাগের তৈয়ারী (ওয়াটার টাইট্- অর্থাৎ, যাহা হইতে জল বাহিরে আসিতে পারে না কিংবা যাহাতে জল প্রবেশ করিতে পারে না।) এই থলের নীচে একটী বালতি আটকান আছে।

অদ্ভুত জীবন-রক্ষী বয়া

ব্যাগের উপরে একটী জানালা আছে—তাহা দিয়া মধ্যস্থ ব্যক্তি, বাহিরের জিনিষ দেখিতে পায়। বয়াটী যখন জলে থাকে তখন নীচের বাল্তি জলে ভরিয়া যায় এবং এই জলের ভার সমস্ত বয়াটীকে সোজা করিয়া রাখে। ব্যাগটা রবারের তৈয়ারী বলিয়া তাহা পরিয়া আস্তে আস্তে সাঁতার কাটাও যায়।

জীবন-রক্ষক যন্ত্র

বয়ার মাথায় একটী নল আছে, তাহা সব সময় জলের উপরে থাকে, সেইজন্য বয়ামধ্যস্থ ব্যক্তির নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কোন প্রকার কষ্ট হয় না। নলের মাথায় একটী গাঢ় লাল বা অন্য কোন জল্‌জলে রংয়ের বলের মত থাকে—তাহা দেখিয়া সাহায্যকারীর দল জলমগ্ন ব্যক্তির উদ্ধার সাধন করিতে পারে।

জলের উপর বসিবার উপায়

সমুদ্র জলে পড়িয়া গেলে যে সকল সাধারণ গোলাকার জীবন-রক্ষক বায়ুপূর্ণ আধার ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইদানীং তাহার সঙ্গে রবারের পাজামা, জুতা পদ সংলগ্ন জল কাটাইবার যন্ত্র এবং একজোড়া ছোট দাঁড় ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাতে জলমগ্ন ব্যক্তির নিরাপদে তীরে পৌছিবার অনেক সুবিধা হয়। উল্লিখিত দ্রব্যাদি অঙ্গে ধারণ করিয়া কোনও ব্যক্তি যদি সমুদ্র গর্ভে পড়িয়া যায়; তাহা হইলে সহসা তাহার জীবন নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকেনা। পরিচ্ছদ এমনই দীর্ঘ এবং পাজামা এমনই ভাবে

সাঁতারের পেটি

নির্ম্মিত যে, জলের উপর বসিবার বিশেষ সুবিধা আছে। হস্তস্থিত দাঁড় দুইটির সাহায্যে বসিয়া তীরের অভিমুখে অগ্রসর হইবারও সুযোগ পাওয়া যায়। পদ সংলগ্ন জল কাটাইবার যন্ত্রের সাহায্যেও অনেক সুবিধা ঘটে।

মোটর যন্ত্র সাহায্যে অভিনব জলক্রীড়ার ব্যবস্থা

প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল ভাগে সম্প্রতি এক প্রকার জল ক্রীড়ার উপযোগী মোটর চালিত যানের ব্যবহার হইতেছে। রবার নির্ম্মিত মোটা নালাবর্ত্ত জলের উপর ভাসিতে থাকে। আরোহীর পৃষ্ঠ দেশে একটী মোটর যন্ত্র আবদ্ধ। মোটর চলিতে আরম্ভ করিলেই চালক জলের উপর দিয়া মধ্য গতিতে অগ্রসর হয়।

পৃষ্ঠ-বিলম্বিত সন্তরণ যন্ত্র

সন্তরণে সুবিধা হইবে বলিয়া বায়ুপূর্ণ যন্ত্র পৃষ্ঠদেশে "ন্যাপস্যাকে" বাঁধিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

পৃষ্ঠবিলম্বিত সন্তরণ যন্ত্র

ইহাতে সন্তরণকারী স্বাধীন ভাবে হস্ত ও পদ সঞ্চালন করিতে পারে। জলমগ্ন হইবার আশঙ্কা নাই। অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত এই যন্ত্রের সাহায্যে জলে ভাসিয়া

মোটর যন্ত্রে জলক্রীড়া

থাকা যায়। পানীয় জল এবং খাদ্যসার এই যন্ত্রের মধ্যে সঞ্চিত রাখিবার ব্যবস্থাও আছে। কেহ কেহ ব্যাটারী ও আলোক উৎপাদক যন্ত্রও উক্ত বায়ুপূর্ণ যন্ত্রের সহিত সন্নিবিষ্ট করিয়া থাকে।

ভাসমান শিকারী

কালিফোর্ণিয়ার জনৈক শিকারী জলা ভূমিতে শিকারের জন্য বিচিত্র পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া জলের মধ্যে ঋজুভাবে ভাসিয়া শিকারী সহজে হংস শিকার করিতে পারিবে। পাদদেশে এক প্রকার রবার নির্ম্মিত জুতা

ভাসমান শিকারী

কটিদেশে বায়ুপূর্ণ শরীরের বেষ্টনী থাকিবে। একখণ্ড রবারের চাদর বুট হইতে নল পর্য্যন্ত এমন ভাবে সংলগ্ন থাকিবে যে কোনও দিক দিয়া জল প্রবেশ করিতে পারিবে না। এইরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিলে হস্তপদ সঞ্চালনের ও কোনও ব্যাঘাত হইবে না।

জলের উপর শিকার

অষ্ট্রিয়ার সৈনিকগণ ড্যানিয়ুব নদের জলে প্রায় শিকার করিয়া বেড়ায়। উহারা চরণ সংলগ্ন ভেলার সাহায্যে অনায়াসে জলের উপর যেখানে সেখানে ভাসিয়া বেড়াইতে পারে। বড় বড় দুইখানি কাঠের তক্তার উপর চরণ রাখিয়া সৈনিক কৌশলে উহা চালিত করে। বসিবার জন্য আসনের ব্যবস্থাও আছে। এই "স্কী" জাতীয় নৌকাগুলি এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, পায়ের জুতা জলে ভিজে না। সৈনিকেরা এই "স্কী" নৌকায় চড়িয়া শিকার করিয়া বেড়ায়।

সন্তরণোপযোগী "বয়া" প্রভৃতি

আমেরিকার সন্তরণকারীদের সুবিধার জন্য সন্তরণ করিবার পুকুরে অনেক রকম সরঞ্জামের ব্যবস্থা করিয়াছে। সন্তরণকারীদের মধ্যে কেহ ক্লান্ত

জলের উপর শিকার

হইয়া পড়িলে, তাহাকে কূলে টানিয়া তুলিবার জন্য ডাঙ্গা হইতে টেনে বাঁধা এক প্রকার টর্পেডো আকারের নূতন ধরণের 'মগ্নত্রাণ' 'বয়া' স্থানে স্থানে

ভাসমান শিকারীর পোষাক

ভাসাইয়া রাখে। ঐ বয়ার সহিত দড়ি বাঁধা রক্ষক নিযুক্ত রাখে। এক একটী 'বয়ায়' ছয়জন করিয়া সাঁতারু অনায়াসে ভাসিতে পারে। তাহারা আনাড়িদের জন্য হাঁস পা' ও 'হাত পাখনা' বাঁধিয়া সাঁতার শিখিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহার সাহায্যে তাহারা অতি সত্বর সন্তরণে অভ্যস্ত হইয়া যায়।

সাঁতারের কথা শেষ হইল। সাঁতার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সব কথাই তোমাদিগকে বলা হইয়াছে। আমাদের দেশে যাহাদের বাড়ী নদীর ধারে, খালের পাড়ে এবং সমুদ্রের তীরবর্ত্তী তাহারা প্রায় সকলেই বাল্যকাল হইতেই সাঁতার সম্বন্ধে শিক্ষা পাইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর নানা দেশে যেমন সাঁতার সম্বন্ধে নানারূপ বৈজ্ঞানিক-প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। এখন বিখ্যাত সাঁতারুরা অনেকে সাগর পাড়ি দিয়া থাকেন। তাহাদিগকে বলে long distance swimmer এই সব সাঁতারুরা Channel Swimming বা ডোভার প্রণালী সাঁতরাইয়া খ্যাতিলাভ করিয়া আসিতেছেন।

ক্যাপটেন ওয়েব্ (Captain Webb) আগে সর্ব্বপ্রথম ডোভার হইতে ক্যালে (Calais) ২১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে সাঁতরাইয়া পার হইয়াছিলেন। মহিলা সাঁতারুর মধ্যে আমেরিকান মহিলা কুমারী জি, এডারলি (Miss G. Ederle] উহা সাঁতরাইয়া পার হইয়াছিলেন। কিছু দিন হইল বাঙ্গালার বিখ্যাত সাঁতারু শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ Channel Swimmingএর জন্য ইংল্যাণ্ড গমন করিয়াছেন।

সাঁতার শিক্ষা সম্বন্ধে প্রথম বই লেখেন, নিকোলাস্ উইনম্যান (Nicolas Winman) লেখক ব্যাভেরিয়ার (Bavaria) ইঙ্গোলস্টেডের (Ingolstadt) একজন অধ্যাপক ছিলেন। বই খানি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংল্যাণ্ডের এভরার্ড ডিগ্‌বি) Everard Digby) ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সাঁতার সম্বন্ধে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহাই হইতেছে দ্বিতীয় গ্রন্থ।

এখন ভারতের নানা ভাষায় সাঁতার সম্বন্ধে অনেক ভাল ভাল বই প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায়ও সাঁতারের কয়েক খানি বেশ ভাল বই আছে।

এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

৩৪৬৯ পৃষ্ঠার পর

এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের হেড্ অফিস্ ভারতের বাহিরে থাকে। এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) ভারতের মধ্যে যে-গুলির কারবারের পরিমাণ অল্প এবং (২) ভারতের মধ্যেই যেগুলির মোটা কারবার।

এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যকরী পুঁজি (working capital) আসে—(ক) পেড্-আপ্ ক্যাপিট্যাল্ ও রিজার্ভ ফাণ্ড (খ) মিয়াদী আমানৎ ও চল্তি হিসাবের আমানৎ হইতে। সাধারণতঃ মিয়াদী আমানৎ-এ ৪% ও চল্তি আমানতে ২% সুদ দেওয়া হয়।

এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের কাজ বড় দায়িত্বপূর্ণ। লণ্ডন ও ভারত এই উভয় স্থানেই কারবার চালাইতে হয়; সুতরাং সর্ব্বদা নজর রাখিতে হয় যাহাতে এই উভয় স্থানের সকল চাহিদা মিটাইয়া দেওয়া সম্ভব হয়। আবার একই সঙ্গে যদি বিলাত ও ভারতে সঙ্কট উপস্থিত হয় তাহা হইলেও ইঁহাদের বিপদ। সচরাচর ইঁহারা বিলাত হইতে টাকা আনিয়া এদেশে খাটান আবার কাজ হইয়া গেলে ফেরৎ দেন। পক্ষান্তরে, লণ্ডনে টাকার টান পড়িলে ভারতীয় শাখা হইতে সে-টাকা যোগান দেন।

কারবারের ধরণঃ এক্সচেঞ্জের কারবারই এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ, অর্থাৎ আমদানী-রপ্তানীর হুণ্ডী কেনাই প্রধান কাজ; তবে সাধারণ ব্যাঙ্কিং কারবারও ইঁহারা করেন, যেমন, আমানৎ গ্রহণ, কর্জ্জদান, ওভারড্রাফট্ দেওয়া ইত্যাদি। জয়েণ্টষ্টক ব্যাঙ্কগুলির সহিত কিছু প্রতিযোগিতাও ইঁহাদের করিতে হয়। কোন কোন স্থানে—যেমন, অমৃতসর, শ্রীনগর ও ম্যাণ্ডালে—অন্তর্বাণিজ্যেও ইঁহারা অর্থ সাহায্য করেন। বাংলা দেশে পাটের কাজেও ইঁহারা টাকা যোগান।

রপ্তানী বিল্ বা হুণ্ডী দুই প্রকারের হয়; (১) ডি-এ বিল্ (বা দায় স্বীকারে দলিল ছাড়—ইংরাজী পারিভাষিকে 'ডকুমেন্ট্স্ অন্ অ্যাক্সেপ্‌টেন্স') ও (২) ডি-পি বিল্ (বা আদায় সাপেক্ষ দলিল ছাড়—ইংরাজী পারিভাষিকে 'ডকুমেণ্ট অন্ পেমেণ্ট')। ভারতে বসিয়াই লণ্ডনের উপর এই সব বিল বা হুণ্ডী লেখা হয়; লণ্ডনের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর এই সব হুণ্ডী লেখা হয় বলিয়া বাট্টা দিয়া ভাঙ্গান সহজ। এখানকার এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক সেই

বিল্ খরিদ্ করিয়া লণ্ডনের হেড্ অফিসে পাঠাইয়া দেয়; হেড্ অফিস ডি-পি বিল্গুলি পাকিয়া না উঠা পর্যন্ত রাখিয়া দেন এবং মিয়াদ ফুরাইলে টাকা আদায় করেন। ডি-এ বিল লণ্ডনের প্রতিষ্ঠানটী কর্তৃক স্বীকৃত হইলেই পুনরায় 'ডিস্কাউন্ট' করা হয় বা ভাঙ্গান হয়। লণ্ডনের হেড্ অফিস্ ডি-এ বিলগুলি সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় ডিস্কাউন্ট করিবেন কিনা তাহা নির্ভর করে (১) বিল লেখকের প্রতিষ্ঠার উপর (২) ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডের বাট্টার হারের উপর এবং (৩) টাকার প্রয়োজনের উপর। ভারতের শাখা অফিসে যদি টাকার টানাটানি না থাকে তাহা হইলে ডি-এ বিল্ 'রি-ডিস্কাউন্ট' করা হয় না বা পুনরায় ভাঙ্গান হয় না।

বিলাত হইতে আমদানীর পরিমাণের চেয়ে ভারতের রপ্তানীর পরিমাণ সাধারণতঃ বেশী। এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক এই ব্যালেন্স, 'কাউন্সিল্ বিল্' ও 'টেলিগ্রাফিক্ ট্রান্স্ফার' খরিদ্ করিয়া শোধ করেন। অধিকন্তু সোনারূপার তালও ভারতে পাঠান। এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি রপ্তানী বিল্ বা হুণ্ডী ক্রয় করেন, এই কয়টীর সাহায্যে—(১) আমদানী বিল্ (২) কাউন্সিল বিল ও টেলিগ্রাফিক্ ট্রান্সফার (৩) সোনা ও রূপার তাল (৪) 'রুপি পেপার' চালান (৫) ছাত্র ও পরিব্রাজকদের ড্রাফ্‌ট্‌স্ বিক্রয়।

এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের শেয়ারের দর ও (ডিভিডেণ্ডের) লভ্যাংশের বহর দেখিলে বোঝা যায় যে সেগুলি বেশ লাভজনক ভাবেই ব্যবসায় করিতেছে; সুতরাং কোন নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী যাহাতে না দাঁড়ায় সে চেষ্টা করিতেও কিছু কমতি দেখা যায় না। নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাঁহারা একটী সঙ্ঘও করিয়াছেন।

জয়েণ্টষ্টক ব্যাঙ্ক

এজেন্সি হাউসের দৌলতেই এদেশে ষ্টক বা যৌথ-প্রথায় পরিচালিত ব্যাঙ্ক দেখা দিয়াছে। এজেন্সী হাউসগুলির প্রধান কাজ ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য; কিন্তু তাহার সহিত ব্যাঙ্কিং কারবারও চালাইতেন। আলেক্সাণ্ডার অ্যাণ্ড কোম্পানীই প্রথম ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন—তার নাম ছিল "ব্যাঙ্ক অফ্ হিন্দুস্থান"; এই ব্যাঙ্ক নোটও ছাড়িতেন। সরকার সে নোট গ্রহণ করিতেন না বটে তবু সেগুলির বেশ চলন ছিল। ১৮৩২ খৃঃ এই ব্যাঙ্ক ফেল হয়। এই ভাবেই হইল জয়েণ্টষ্টক ব্যাঙ্কের গোড়া পত্তন।

জয়েণ্টষ্টক ব্যাঙ্কগুলির হেড্ অফিস সাধারণতঃ বড় বড় সহরেই থাকে। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন ও করাচীতে 'ক্লিয়ারিং হাউস'ও আছে। দেশীরাজ্যগুলিতে জয়েণ্টষ্টক ব্যাঙ্ক দেখা যায় না বলিলেও চলে। তবে 'ব্যাঙ্ক অফ্ বরোদা' ও 'ব্যাঙ্ক অফ্ মহীশূর' বেশ ভাল ভাবেই দেশীয় রাজ্যের মধ্যে কারবার করিতেছে।

কাজ ঃ সাধারণতঃ এই ব্যাঙ্কগুলির কাজ দুটী—(১) লোকের টাকাকড়ির শক্তি বাড়ান এবং (২) ক্রেডিট্ দান। সুতরাং ইহাদের প্রধান কাজ আমানৎ আকর্ষণ ও অন্তর্বাণিজ্যে টাকা যোগান। আমানতী টাকার জন্য শতকরা ৪।৫ টাকা সুদ দিয়া থাকে; কোম্পানীর কাগজের সুদ যখন ৩½ তখন ব্যাঙ্ক তার বেশী সুদ না দিলে আমানৎ পায় কি করিয়া? সংক্ষেপে বলা যায় যে তাহারা এই সব কারবার করে—

(ক) খরিদ্দারদের চল্‌তি হিসাব রাখে। কখনও কখনও সুদও দিয়া থাকে।

(খ) নির্দ্দিষ্ট মিয়াদে টাকা আমানৎ রাখে। মিয়াদ অনুসারে সুদের হার বিভিন্ন হইয়া থাকে।

(গ) হুণ্ডী কেনা-বেচা করে। এই ভাবেই তাহারা অন্তর্বাণিজ্যে টাকা যোগান দিয়া থাকে।

(ঘ) সিকিওরিটী ও কোম্পানীর কাগজ বন্ধক রাখিয়া টাকা আগাম দিয়া থাকে। ওভার-ড্রাফ্‌টেও নিয়মিত খরিদ্দারদের টাকা আগাম দেয়।

(ঙ) কমিশানে অপরের টাকা লেন-দেনে সাহায্য করিয়া থাকে।

(চ) 'লেটার্স অফ্ ক্রেডিট্' বা ক্রেডিট্ পত্র দিয়া থাকে।

(ছ) কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার, ষ্টক প্রভৃতিও খরিদ্দারের হইয়া ক্রয়-বিক্রয় করে।

(জ) খরিদ্দারের হইয়া সুদ ও লভ্যাংশ আদায় করিয়া খরিদ্দারের হিসাবে জমা করে।

(ঝ) গহনা-পত্র প্রভৃতি গচ্ছিত রাখে।

(ঞ) এক অফিস হইতে অপর শাখা অফিসে কোন চার্জ্জ না লইয়া টাকা চালান দেয়।

(ট) অনেক ব্যাঙ্কের একটা করিয়া সেভিংস শাখাও থাকে।

ফেল ঃ স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যে-সব ব্যাঙ্ক গজাইয়া উঠে তাহাদের সাধারণতঃ "স্বদেশী ব্যাঙ্ক" বলা হইত। পূর্ব্ব হইতেই যে-সব ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল সে-গুলি এই নূতন স্বদেশী ব্যাঙ্ক-গুলিকে প্রীতির চক্ষে দেখে নাই, তাই সঙ্কট কালে তাহারা কোন সাহায্য করে নাই। ১৯১৩, ১৯১৪ ও ১৯১৫ খৃঃ অনেকগুলি ব্যাঙ্ক ফেল হয়। পাঞ্জাবের পিপ্‌ল্‌স্ ব্যাঙ্ক ৭০টা শাখার সহিত ফেল হইয়া যায়; এই ব্যাঙ্কের আমানতের খাতে প্রায় এক কোটী টাকা ছিল। আরও কয়েকটী বড় ব্যাঙ্ক ফেল হয়। "১৯১৩-১৭ সালে যে সব ব্যাঙ্ক ফেল হয় তাহার ফলে ভারতীয় জয়েণ্টষ্টক ব্যাঙ্কগুলির মোট পেড্-আপ্ ক্যাপিট্যালের অন্যূন পক্ষে ৩৪% টাকা একবারে ডুবিয়াছে।"

এতগুলি ব্যাঙ্ক কেন ফেল হইল তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ব্যাঙ্ক পরিচালনার অনভিজ্ঞতাই ইহার মূল কারণ। ব্যাঙ্কের যে সব ডিরেক্টার নির্ব্বাচিত হইতেন তাঁহাদের ব্যাঙ্কিং জ্ঞান ছিল না বলিলেও চলে, ফলে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারদের কোন সাহায্য বা পরামর্শ দিতে পারিতেন না। ব্যাঙ্ক ডিরেক্টারদের প্রথম কাজ হইতেছে দেখা যে ব্যাঙ্কের টাকা নিরাপদ ভাবে খাটান হইতেছে; ব্যাঙ্কের হিসাব, কারবার ও প্রথা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান তাঁহাদের থাকা দরকার। সমাজেও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা থাকা আবশ্যক। অধিকন্তু ব্যাঙ্কের ভাল-মন্দের উপর তাঁহাদের নিজেদের আর্থিক সঙ্গতি অনেকখানি নির্ভর করা চাই। চরিত্র বলেরও জোর চাই। যাহারা জয়েণ্টষ্টক ব্যাঙ্কগুলির ডিরেক্টার নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন তাঁহারা ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ব্যবসায়ে জ্ঞান থাকিলেই যে ব্যাঙ্ক পরিচালনার জ্ঞান জন্মাইবে তাহা বলা যায় না। অধিকন্তু তাঁহারা কোথায় ম্যানেজারকে পরামর্শ দিবেন, না ম্যানেজারই তাঁহাদের ইচ্ছামত ঘুরাইতেন।

ম্যানেজারদের ব্যাঙ্ক চালান ক্ষমতা ছিল না। অংশীদারেরাও নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। অংশীদারের জানা আবশ্যক যে তিনি একজন মালিক; ব্যাঙ্কের সম্বন্ধে কোন মন্দকথা বলা তাঁহার পক্ষে অন্যায়, পক্ষান্তরে তাহা দূর করাই তাঁহার কাজ; ব্যাঙ্কের খরিদ্দার কি করিয়া বাড়ে, আমানৎ বৃদ্ধি পায় তাঁহারই দেখার কথা; তাঁহার দেখা কর্ত্তব্য যাহাতে উপযুক্ত লোক পরিচালক হিসাবে নির্ব্বাচিত হয়; এবং কখনও ভোলা উচিৎ নয় যে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার তাঁহাদের মাইনে করা চাকর। আমাদের অংশীদারেরা এ সব কথা জানিতেন না। সুতরাং পরিচালকদের সবাই যখন অনভিজ্ঞ তখন যে ব্যাঙ্কগুলি ফেল হইবে তার আর আশ্চর্য্য কি!

ইহা ছাড়াও ব্যাঙ্ক ফেল হইবার আরও কারণ ছিল।

(১) পেড্‌আপ্, অথরাইজড্ ও সাবস্‌ক্রাইবড্ ক্যাপিট্যালের মধ্যে পার্থক্য ছিল অনেক। ক্যান্‌ভাসার ও এজেণ্টদের মাহিনা, ভাতা প্রভৃতি খুব বেশী দেওয়া হইত। পেডআপ ক্যাপিট্যাল অল্প, অথচ খরচার বাহুল্য থাকিলে যাহা হয় তাহাই হইত। সুতরাং এমন একটা আইন থাকা দরকার যাহার ফলে ব্যাঙ্ক অন্ততঃ ৫০% পেড্‌আপ্ ক্যাপিট্যাল আদায় করিবার পূর্ব্বে কোন কাজ আরম্ভ করিতে না পারে।

(২) কোন কোন ব্যাঙ্ক আবার নিজের ব্যাঙ্কের শেয়ার প্রতিভূ রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দিত। বেনারেস্ ব্যাঙ্ক (আজকালকার বেনারেস্ ব্যাঙ্ক নয়) ও ক্রেডিট্ ব্যাঙ্ক অফ্ বম্বে এই কারণেই ফেল হয়।

(৩) কোন কোন ক্ষেত্রে হিসাব পরীক্ষার বালাই ছিল না। হিসাব পরীক্ষক অনেক ক্ষেত্রে ম্যানে-জারকে তুষ্ট রাখিবার জন্য হিসাব পরীক্ষায় ঢিলা দিতেন।

(৪) কোন কোন ব্যাঙ্ক আবার এক-আধটু ফট্‌কাবাজীতে টাকা ন্যাস্ত করিত। ইণ্ডিয়ান স্পিশি ব্যাঙ্ক রূপা কিনিয়া বাজার কোণ-ঠাসা (কর্ণার) করিতে যাইয়া ফেল হইয়া যায়।

(৫) অনেক ব্যাঙ্ক দীর্ঘ মিয়াদে টাকা কর্জ্জ দিয়া

ফাঁপরে পড়িয়াছে। হঠাৎ প্রয়োজন হইলে টাকা আদায় করিতে পারে না।

(৬) আমানৎকারীদের, ব্যাঙ্ক চড়া হারে সুদ দিত। এই চড়া সুদ দিবার জন্য ব্যাঙ্ককে টাকা নানা বিপদজনক ভাবে খাটাইতে হইত। এবং ফলে হইত ব্যাঙ্কের দুয়ার বন্ধ।

(৭) ব্যাঙ্কিং কারবারের সহিত অন্য কারবারে নিযুক্ত থাকাও একটা মস্ত দোষ। কোন কোন ব্যাঙ্ক নিজের কারবারের সহিত গাড়ী তৈরী, এক্কা মেরামৎ প্রভৃতিতেও নিযুক্ত থাকিত।

(৮) কোন কোন ব্যাঙ্কের কর্ত্তারা ব্যাঙ্কের টাকা তাহাদের নিজস্ব কারবারে নিয়োগ করিতেন। লাহোর ব্যাঙ্ক ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার ইহাই হেতু।

(৯) অনেক ব্যাঙ্ক আবার পুঁজি নিঃশেষিত হইলেও আমানতের টাকা হইতে লভ্যাংশ দিত।

যৌথ-প্রথায় পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি ফেল হইয়া যাওয়ার ফলে এই শিক্ষা লাভ করা গিয়াছে যে ব্যাঙ্ক ম্যনেজার সৎ, কার্য্যদক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য না হইলে ব্যাঙ্কিং কারবার চলে না। ভাল ভাল ব্যাঙ্কিং আইন পাশ করিলেই হয় না, চাই ভাল ভাল ব্যাঙ্কার।

ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া

বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের তিনটী প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ককে একীভূত করিয়া ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া গড়িয়া উঠে। গত মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ত্রুটীগুলি প্রকটিত হইয়া উঠে এবং তাহারই ফলে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের জন্ম।

ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের মোট অথরাইজ্ড্ ক্যাপিট্যাল ১১,২৫,০০,০০০ টাকা; তাহা ২২৫,০০০ অংশে (শেয়ার) বিভক্ত; প্রত্যেক অংশের মূল্য ৫০০ টাকা। ইহার মধ্যে ৭৫,০০০ শেয়ারের ৫০০ টাকার বদলে ১২৫ টাকা আদায় হইয়াছে (পেড্ আপ)।

ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ককে নিম্নলিখিত বাধাগুলি মানিয়া চলিতে হয়:--

(১) ৬ মাসের বেশী মিয়াদে ব্যাঙ্ক টাকা কর্জ্জ দিতে পারে না।

(২) ব্যাঙ্কের নিজস্ব ষ্টক বা শেয়ার জমা রাখিয়া ব্যাঙ্ক টাকা কর্জ্জ দিতে পারে না।

(৩) মূল সিকিওরিটী হিসাবে ব্যাঙ্ক অস্থাবর সম্পত্তি বাঁধা রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দিতে পারে না; তবে বাড়তি সিকিওরিটী হিসাবে ব্যাঙ্ক তাহা গ্রহণ করিতে পারে।

(৪) কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বা প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক ২০ লক্ষ টাকার অধিক টাকা কর্জ্জ বা হুণ্ডী ভাঙ্গাইয়া টাকা আগাম দিতে পারে না।

(৫) দুইটী বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হুণ্ডি সই করিয়া না দিলে ব্যাঙ্ক হুণ্ডী ভাঙ্গাইয়া দিতে পারে না।

(৬) সিকিওরিটী গ্রহণ না করিয়া ১ লক্ষ টাকার বেশী ওভারড্রাফ্ট্ দিতে পারে না।

(৭) নিজের খরিদ্দার ছাড়া পরের জন্য লণ্ডন অফিসে হিসাব খুলিতে পারে না।

(৮) যে কাজ করার কথা আইনে উল্লেখ নাই তাহা ব্যাঙ্ক করিতে পারে না।

সরকার ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের উপর নিজের ক্ষমতা চালাইতে সক্ষম:—

(১) কেন্দ্রীয় বোর্ডে ৪ জন গভর্ণর নিয়োগ করিবার ক্ষমতা সরকারের আছে।

(২) সরকারই ম্যানেজিং গভর্ণর নিয়োগ করেন।

(৩) সরকার ব্যাঙ্কের নিকট দাবী করিতে পারেন।

(৪) ব্যাঙ্কের হিসাব পরীক্ষার জন্য সরকার আয়-ব্যয় পরীক্ষক নিয়োগ করিতে পারেন।

ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক সরকারের হইয়া এই কাজ করেন—

(১) সরকারী ট্রেজারীর সব কাজ ব্যাঙ্ক কোন খরচা না লইয়া এমনিই করেন ও (২) সরকারের টাকার দরকার হইলে সরকারের হইয়া কর্জ্জ গ্রহণ করেন (রেজেস্ লোন্)।

অন্যান্য কাজ: (১) প্রায় সব ব্যাঙ্কই ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কে উদ্বৃত্ত নগদ্ টাকা জমা রাখে; সুতরাং ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ককে "ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্ক" বলা যায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে এই ব্যবস্থাই ছিল।

(২) ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিং হাউসগুলিও পরিচালনা করে।

(৩) কথা ছিল যে প্রতিষ্ঠানের দিবস হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্ক ১৮০টী শাখা আফিস খুলিবে; ১৯৩০শের মার্চ্চ মাসেই সেই শাখার সংখ্যা ১৬৪ হইয়া দাঁড়ায়।

(৪) ভারতের সিক্কা-ব্যবস্থাকে ব্যাঙ্ক স্থিতি-স্থাপকতা (ইল্যাস্‌টিসিটি) দান করে। যে-সময়ে বাজারে কেনা-বেচা জোরসে চলিয়াছে, সে-সময়ে ব্যাঙ্ক টাকা যোগাইবার জন্য হুণ্ডী, বিল জমা রাখিয়া পেপার কারেন্সী রিজার্ভ হইতে ১২ কোটি টাকা পর্য্যন্ত কর্জ্জ লইতে পারে।

(৫) ব্যাঙ্কও সাধারণকে টাকা পাঠাইবার সুবিধা করিয়া দেয়।

সুবিধা: ইম্পিরিয়াল্ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে লোকের এই উপকার হইবে আশা করা গিয়াছিল (১)—ব্যাঙ্কিং কারবার ছড়াইয়া পড়িলে সাধারণের সুবিধা হইবে এবং ব্যাঙ্কে টাকা রাখিবার সাহসও লোকের হইবে।

(২) ভারতীয়দের ব্যাঙ্কে শিক্ষানবিশী লওয়া হইবে এবং তাহার ফলে ব্যাঙ্ক-কারবারে কিছু লোক চাকরী পাইবে এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় পরিচালিত ব্যাঙ্কও গড়িয়া উঠিবে।

ব্যাঙ্কের খরিদ্দারগণও কিছু উপকৃত হইবে—

(১) সরকারের টাকা ব্যাঙ্কের হেপাজতে থাকার দরুন ইম্পিরিয়াল্ ব্যাঙ্ক বাট্টার হার হ্রাস করিতে সক্ষম হইবে এবং শিল্প-বাণিজ্যেও নিম্নহারে টাকা আগাম দিতে পারিবে।

(২) ব্যাঙ্ক বিভিন্ন স্থানে যখন শাখা খুলিবে তখন ব্যবসায়-বাণিজ্যের পক্ষে টাকা পাওয়ারও সুবিধা হইবে।

সরকারের লাভ আছে। যে-সময়টায় কারবার জোরসে চলে, সে-সময়ে বহু টাকা রিজার্ভ ট্রেজরীতে আট্‌কাইয়া থাকে; ফলে বাজারে টাকার টান ধরে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই টাকাটা কাজে লাগিবে।

(৩) 'পাব্‌লিক্ ডেট্' 'ডি-সেণ্ট্র্যালাইজ্' করার জন্য অল্প পুঁজির মালিকও কোম্পানীর কাগজে টাকা খাটাইবার সুবিধা পাইবে।

(৪) সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্‌কে যে-সব ব্যাঙ্কিং কাজ করিতে হয়, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের লণ্ডনস্থ শাখা অফিস অনায়াসে তাহা নিজের হাতে লইতে পারে।

(৫) অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ করাও সরকারের পক্ষে সম্ভব হইবে।

দোষঃ লোকের যতটা উপকার হইবে মনে করা গিয়াছিল ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক তাহা করিতে সক্ষম হয় নাই। আশা করা গিয়াছিল যে ইম্পি-রিয়াল ব্যাঙ্ক আসলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইয়া উঠিবে; ব্যাঙ্কগুলির সহিতই প্রধানতঃ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কারবারগত সম্বন্ধ থাকিবে; লাভের চেয়ে দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে সাহায্য করিতেই দেখা যাইবে; কিন্তু ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সে-আশা পূর্ণ করে নাই। "এক্সটার্ন্যাল্ ক্যাপিটাল্ কমিটি"র রিপোর্টে শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী বলেন যে ইউরোপীয় বণিকগণকে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক যতটা সাহায্য করে, ততটা সহানুভূতিও এ দেশের লোকের প্রতি দেখায় না। একটা প্রধান অভিযোগ এই যে ইম্পিরিয়াল্ ব্যাঙ্ক ভারতীয় জয়েণ্ট-ষ্টক্ ব্যাঙ্কগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করে। অধিকন্তু ভারতীয়দের শিক্ষা দিয়া উচ্চ-পদে অধিষ্ঠিত হইবার সুযোগ ব্যাঙ্ক বিশেষ দেয় নাই।

নীচের হিসাব দেখিলেই বোঝা যাইবে :—

	লণ্ডন হইতে লওয়া হইয়াছে		ভারত হইতে লওয়া হইয়াছে
বৎসর	ইউরোপীয়	ভারতীয়	ভারতীয়
১৯২৫	৩২	১	১২
১৯২৬	৬	১	—
১৯২৭	৩	১	১
১৯২৮	৮	১	৪
১৯২৯	৬	—	৭
১৯৩০	—	—	১

ভারতের ব্যাঙ্কিং, ক্যাপিট্যাল বাড়াইতেও ইম্পিরিয়াল্ ব্যাঙ্ক সক্ষম হয় নাই। ১৯২৬,৩১শে মার্চ্চের মধ্যে ব্যাঙ্ক ১০২টি নতুন শাখা অফিস খোলে; এদের মধ্যে ৫০টি এমন স্থানে খোলা হয় যেখানে পূর্ব্ব হইতেই জয়েণ্টষ্টক ব্যাঙ্ক প্রতি-ষ্ঠিত ছিল। ব্যাঙ্কের অনেকগুলি শাখা এখনও লাভজনক হয় নাই। একটা অবাধ বাট্টার বাজার সৃষ্টি করিতেও ব্যাঙ্ক সক্ষম হয় নাই। স্থানীয় লোকের সাহায্য লইয়া যে ব্যাঙ্ক হুণ্ডী ভাঙ্গাইবার সহায়তা করিবে, তাহাও দেখা যায় না। কৃষি বা সমবায়েও টাকা সাহায্য করে নাই।

কুকুরের কথা

২৮৫১ পৃষ্ঠার পর

'কুকুর বড় প্রভুভক্ত' এই কথা কয়টি তোমরা 'শিশুশিক্ষা' তৃতীয় ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল পাঠ্য পুঁথিতেই পড়িয়া আসিতেছ। বাস্তবিক কুকুরের ন্যায় প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী জন্তু আর নাই বলিলেই চলে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কুকুর পাওয়া যায়। কোনটী ছোট, কোনটি বড়, কোনটির মুখের আকৃতি গোল, কোনটির ছুঁচালো এইরূপ। প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা মনে করেন যে কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে কেবল একজাতীয় বৃহদাকার কুকুরই বাস করিত। তাহাদের বংশধরেরাই নানা ভাবে নানাদেশে নানা আকারের হইয়া পড়িয়াছে। সেই অতি আদিম যুগে কুকুরেরাই ছিল মানুষের বন্ধু। এবং সকলের আগে কুকুরেরাই মানুষের পোষ মানিয়াছিল। আদি মানবের জীবন-যাত্রার প্রথম বন্ধুই ছিল কুকুর। তাহারা কুকুর সঙ্গে লইয়া বন্য বরাহ ইত্যাদি শিকার করিত।

প্রাচীন মিশর দেশের লোকেরা কুকুরকে নীলনদের দেবতা বলিয়া মনে করিত। এবং কুকুরের মস্তক ও মনুষ্যের দেহ দিয়া দেবতা আকৃত করিত। ঐ মূর্ত্তিগুলি মিশর দেশের সকল দেবালয়ের সম্মুখে রাখা হইত। এমন কি কুকুরের সম্মানার্থে সাইনোপলীস্ নামে একটি দেশ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল। মিশর দেশের সমাধিগর্ভ হইতে কুকুরের 'মামী' পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। তাহারা কুকুরের নামে একটী নক্ষত্রেরও নাম দিয়াছিল। কাজেই চার পাঁচ হাজার বছর আগেও ঐ সকল দেশে যে অনেক শ্রেণীর কুকুর লোকালয়ে বাস করিত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, কুকুরের উৎপত্তির ইতিহাস কি? এ ইতিহাস বলা বড় কঠিন। এখানে একটু সামান্য ইতিহাস তুলিয়া দিতেছি। ফ্রান্সে এক প্রকার কুকুরের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, সেই জন্তু খেঁকশিয়াল ও শেয়ালের মধ্যবর্ত্তী। বোধ হয় সেই জন্তু খেঁকশেয়ালের পূর্ব্ব পুরুষ ছিল। এখন তাহারা আর পৃথিবীতে নাই। আফ্রিকার দক্ষিণ অংশে এক প্রকার লম্বা কান-ওয়ালা কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে

এক প্রকার জন্তুর ' পাওয়া গিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া মনে হয়, সেই জন্তু আফ্রিকা-বাসী ঐ প্রকার কুকুরের ও ছোট খেঁক-

আদিম অধিবাসীদের কুকুরের সাহায্যে বরাহ-শিকার

শেয়ালের পূর্ব্বপুরুষ ছিল। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, এই দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী কুকুরের পূর্ব্বপুরুষ এবং কুকুর, শৃগাল, নেকড়ে ও খেঁক-শেয়ালের পূর্ব্বপুরুষ একজাতীয় জন্তু ছিল; পরে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া সেই জন্তুর সন্তান-সন্ততি বিভিন্ন আকারও স্বভাব পাইয়াছে এবং ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াও অস্থি কঙ্কালে মূল জন্তুর চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

এই লুপ্ত জন্তুর এক শ্রেণীর সন্তান-সন্ততি হইতে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী কুকুরের উৎপত্তি হইয়াছে। আর এক শ্রেণী হইতে অন্যান্য কুকুর, শৃগাল ও নেকড়ের উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, যে সকল জন্তু এখন সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া মনে হয়, তাহারা একই জাতীয় জন্তুর সন্তান-সন্ততি। একজাতীয় জন্তুর পরিবর্ত্তনে পৃথিবীতে কত প্রকারের জন্তুর উৎপত্তি হইতেছে। ঐ পরিবর্ত্তন সেকালে ও একালে সমান ভাবে চলিতেছে। — বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যেমন জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতেছে আমরাও তেমনি বুঝিতে পারিতেছি যে নানা শ্রেণীর গৃহপালিত কুকুর, জঙ্গলী কুকুর, নেকড়ে ও শৃগাল প্রভৃতি যে এক বংশসম্ভূত তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। শৃগাল ও কুকুরের

কুকুরের সাহায্যে ভালুক-শিকার

বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে, দেখিবা মাত্রই বোধ হয় যে, ইহারা উভয়েই একবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা হইলে কি হইবে? শৃগাল ও কুকুর এত যে দ্রুত গতিতে লুপ্ত হইতেছে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। এইত গেল কুকুরের জন্মের ইতিহাস, এখন নানা জাতীয় কুকুরের কথা শোন।

সেকালের শিকারী—কুকুরের সাহায্যে বরাহ শিকার করিতেছে—ড্রেসডেন্ চিত্রশালার একখানি প্রাচীন চিত্র

নিকট আত্মীয় হইয়াও পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করিবার জন্য ব্যগ্র। কুকুর এখন মানুষের আশ্রয়ে
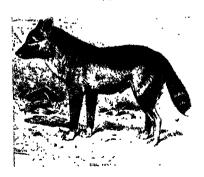
ডিঙ্গো কুকুর—৩

আসিয়া নিরাপদ হইয়াছে বটে কিন্তু শৃগালের বংশ

অষ্ট্রেলিয়া দেশের অসভ্যেরা এক রকম কুকুর পোষে, তাহার নাম ডিঙ্গো (Dingo)। ইহারা গৃহ-পালিত ও আছে এবং বনেও বাস করে। গৃহ-পালিত ডিঙ্গো এবং বন্য ডিঙ্গো উভয়ই এক জাতীয়। ইহারা দলে দলে অষ্ট্রেলিয়ার বনে বনে বিচরণ করে এবং ক্যাঙ্গারু ও ছাগল প্রভৃতি দেখিতে পাইলে মারিয়া খায়। ইহারা অতিশয় বলিষ্ঠ ও দেখিতে বড়। ইহাদের মাথা বড় ও চওড়া, কান ছোট, কিন্তু সোজা, লেজ মাঝামাঝি, রং ঈষৎ লাল। ইহারা বড় চতুর ও বলবান। সাধারণ কুকুরের ন্যায় ডাকে না, কিন্তু বাঘের ন্যায় গর্জ্জন করে। ইহারা পাহাড়ের গুহায় বাস করে এবং শাবকদিগকে খুব সাবধানে রক্ষণাবেক্ষণ করে।

উত্তর আমেরিকার অসভ্যেরা এক প্রকার কুকুর পোষে। ম্যাকেঞ্জি নদীর (Mackenzie) ধারে এই কুকুর দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া

ইহাদিগকে ম্যাকেঞ্জী নদীর কুকুর বলে। ইহারাও বড় একটা ডাকে না। এই কুকুরের গায়ে খুব ঘন বড় বড লোম আছে। গ্রীষ্মকালে ইহাদের লোম ধূসরবর্ণ হয়, কিন্তু শীতকালে সাদা হইয়া থাকে। ইহাদের কান লম্বা এবং মোটা মোটা পা। ইহারা বরফের উপর দিয়া অনায়াসে চলিতে পারে। এই কুকুর স্বদেশে সহজেই পোষ মানিয়া থাকে এবং শিকারের কাজে দেশের লোকের খুব সাহায্য

আইরিশ টেরিয়ার

করে। ম্যাকেঞ্জী কুকুরের গায়ে হাত বুলাইয়া দিলে অতিশয় সন্তুষ্ট হয় কিন্তু প্রহার করিলে রাগিয়া উঠে এবং নেকড়ে বাঘের ন্যায় শব্দ করিয়া থাকে।

গ্রীনল্যাণ্ড দেশের এস্কিমো (Eskimo) জাতীয় লোকেরা এক প্রকার কুকুর পুষিয়া থাকে তাহারা কখনও সম্পূর্ণভাবে পোষ মানেনা, একটু ক্ষুধা পাইলেই নিজের প্রভুকেই আক্রমণ করিতে ইতস্ততঃ করে না। এস্কিমোদেশের এই কুকুরকে যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহারা সে দেশের নেকড়ে বাঘের সহিত যাইয়া মিশে। এই কুকুর ও নেকড়ের যে ছানা হয় সেগুলি সহজে পোষ মানে না।

ইউরোপের হাঙ্গারী দেশের কুকুর ও নেকড়ের মধ্যেও সাদৃশ্য দেখা যায়।

আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে "বুয়নগু" নামক এক প্রকার বন্য কুকুর । নেপালে ইহাদের

এস্কিমো কুকুর

তিব্বতী কুকুর

জন্ম। সিন্ধু নদ ও ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলেও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা শিকারী কুকুর। দলবদ্ধ হইয়া বেড়ায়। ইহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় খুব প্রখর। শিকারের গন্ধ পাইলেই তাহার অনুসন্ধানে বাহির হয়। শিকার করিবার সময় ইহারা ডাল কুকুরের ন্যায় শব্দ করে। বিন্ধ্যাচলের বনে বনে ও এই জাতীয় কুকুরকে বিচরণ করিতে দেখা যায়। এই জাতীয় কুকুর সহজে পোষ মানে না।

মধ্য-প্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে একজাতীয় কুকুর পাওয়া যায় তাহাদের নাম 'বালশূন'। ইহারা বন্য কুকুর। এই কুকুরের মাথাটা লম্বা এবং চক্ষুগুলি বাকান। ইহাদের আকৃতি পারস্য দেশীয় ডাল কুকুরের মত।

বুলডগ্

এক প্রকার বন্য কুকুর আছে, তাহারা দেখিতে সাধারণ নেকড়েবাঘের মত। কান ছোট, বর্ণ পিঙ্গল।

বেলুচীস্থানে এবং পারস্য দেশের পাহাড়ীয়া অঞ্চলে 'বেলুক' নামক বন্য কুকুরের বাস। ইহাদের বর্ণ লাল এবং প্রকৃতি অত্যন্ত ভয়ানক। এসিয়ামাইনরের সিরিয়া দেশে একপ্রকার বন্য কুকুর আছে তাহাদিগকে সীস্ বলে। ইহাদের দাঁতে এত বিষ যে, একবার কামড়াইলেই সেই ব্যক্তি পাগল হইয়া মরিয়া যায়। ইহারা বাঘের মত লাফাইয়া শিকার করে। মিশর দেশের 'ডিব' জাতীয় বুনো কুকুরও অত্যন্ত ভীষণ প্রকৃতির হইয়া থাকে।

বোম্বাই অঞ্চলে জঙ্গলকুলা নামে একপ্রকারের বন্য কুকুর দেখা যায়, ইহাদের গায়ের রং ঈষৎ ধূসর এবং শরীরের উপর কাল কাল দাগ আছে।

নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের ল্যাণ্ডসিয়ার কুকুর

গলার নীচের অংশটা সাদা সাদা এবং গায়ে বেশী লোম নাই। ইহাদিগকে দেখিলে ছোট বাঘ বলিয়া মনে হয়।

পৃথিবীর সব দেশের কুকুরের ইতিহাস বলাত আর সম্ভবপর নয়। তোমরা সচরাচর যে সকল কুকুরের কথা শুনিতে পাও, তাহাদের মধ্যে **স্পেনিয়াল কুকুর, ডাল কুকুর, মাষ্টিফ কুকুর**

সেণ্ট বার্ণার্ড কুকুর

(Grey hound) **আরবিয়ান** জাতীয় কুকুর, **ইংল্যাণ্ডের কুকুর, রক্ত-পিপাসু ডালকুকুর নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড** দেশের কুকুর প্রধান।

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড জাতীয় কুকুরকে সেণ্টবার্ণার্ড-দেশের ধর্ম্মযাজকেরা (Monks) মনুষ্যের উপ-

কারে আসিবার জন্য, মনুষ্যকে বরফ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শিখাইয়া থাকেন। ইহাদের কান লোটান, গায়ে বড় বড় লোম এবং ইহারা খুব বলবান্ বলিয়া বিখ্যাত। যখন শীতের দারুণ প্রভাবে চারিদিকের জল জমিয়া বরফ হয়, সে

ফরাসীদেশের ডাল কুত্তা

সময়ে অনেক পথিকেরা শীতে কাতর হইয়া পাহাড়ের উপর বা গাছতলায় প্রাণ বিসর্জ্জন করে, তখন এই সকল কুকুরদিগকে সেণ্টবার্ণার্ড ধর্ম্ম যাজকেরা ঐরূপ পথভ্রান্ত ক্লান্ত পথিকদিগকে খুঁজিয়া আনিবার জন্য পাঠাইয়া থাকেন। দারুণ শীতের রাত্রিতে এই কুকুরেরা যোড়ায় যোড়ায়
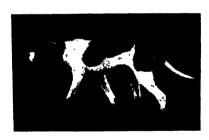
ইংল্যাণ্ডের পোয়ণ্টার কুকুর

বাহির হয়, কাহারও গলায় মদের বোতল ঝুলিতে থাকে, কাহারও গলায় গরম কাপড়ের জামা বাঁধা থাকে। এইরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, যখন কোন ভ্রমণকারী কোন বিপদে পড়িবেন, তখন কুকুরের কাছ হইতে ঐ সমস্ত দ্রব্য লইয়া তাঁহার প্রাণ বাঁচাইতে পারেন। যদি পথিক চলিতে পারে, তাহা হইলে কুকুর তাহাকে পথ দেখাইয়া আশ্রমের দিকে লইয়া যায়, কিন্তু যদি সে অচৈতন্য হইয়া পড়ে তাহা হইলে সে অমনি দৌড়াইয়া যাইয়া ধর্ম্মযাজকদিগকে সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হয়। এই কুকুরদের ঘ্রাণশক্তি এত তীক্ষ্ণ যে যদি কোন ব্যক্তি বরফের নীচে চাপা পড়িয়া থাকেন, তথাপি তাহাকে বাহির করিয়া দেয়। এইরূপ মনুষ্যের উপকার করিতে গিয়া অনেক সময় এই জাতীয় কুকুর অনেক মারা গিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত **মাষ্টিক্, টেরিয়া,** ও অষ্ট্রেলিয়া দেশের কুকুরদের নাম করিতে পারা যায়। টেরিয়া কুকুর নানা রকম হয় এবং নানা দেশে

চীনা কুকুর—চো-চো

নানা বর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাতে এই কুকুর খুব অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কাহারও গায়ে বড় বড় লোম হয়। কোন জাতীয়ের ছোট ছোট লোমও হয়।

আমাদের হিন্দুর নিকট, মুসলমানের নিকট এবং এক সময়ে প্যালেষ্টাইনের লোকেরা কুকুরকে অস্পৃশ্য জন্তুর মধ্যে গণ্য করিতেন।

হিন্দু শাস্ত্রকারেরা বলেন—"কুকুর কোন সঙ্কর জন্তু নহে। শৃগাল বা ব্যাঘ্র বংশেও ইহার জন্ম নয়। অন্যান্য জন্তুর উৎপত্তির ন্যায় প্রজাপতি কাশ্যপের বংশে কুকুরের উৎপত্তি। ইহাদের আদি মাতার নাম সরমা। এইজন্য কুকুরের

এক নাম "সারমেয়"। কুকুরের গুন এইরূপ—বহুভোজী, অল্পে সন্তুষ্ট, সতন্দ্র নিদ্রা, যেখানে সেখানে যে কোন অবস্থায় কুকুরের নিদ্রা হয়। শীঘ্রই চেতনা হয়, গাছের পাতা পড়িলে বা পিপীলিকাটি নড়িলেও ইহারা জাগরিত হয়। কুকুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ ইহাদের প্রভুভক্তি। কুকুরের এত গুণ থাকিলেও কুকুরকে স্পর্শ করা শাস্ত্রে নিষেধ। অমরকোষে সাধারণ কুকুরের এই সব নাম আছে—কৌলেয়ক, সারমেয়, মৃগদংশক, শুনক, ভষক, শ্বা।

কুকুরের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলাম। এইবার কুকুরের প্রভুভক্তি সম্বন্ধে তোমাদের কাছে কয়েকটি গল্প বলিতেছি।

ফরাসী সম্রাট্ প্রথম নেপোলিয়ান্ ইটালির প্রধান যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যখন সেই ভীষণ রণক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি

মেক্সিকোর লোমহীন কুকুর

একটি কুকুরের যে অসাধারণ প্রভুভক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে নেপোলিয়ান লিখিয়াছেন—"গভীর রাত্রি। চন্দ্রের আলোকে চারিদিক আলোকিত হইয়াছে। আমরা রণক্ষেত্রের মধ্য দিয়া একটির পর একটি মৃতদেহ পার হইয়া যাইতেছি। এমন সময় একটা কুকুর এক মৃত সৈন্যের কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া এক লম্ফে আমাদিগকে আক্রমণ করিল। আমরা লাঠি প্রহার করিবার উদ্যোগ করিলাম; কুকুরটা করুণ সুরে চীৎকার করিতে করিতে পুনরায় তাহার প্রভুর কাপড়ের ভিতর যাইয়া লুকাইল। কুকুরটা একবার সেই মৃত যোদ্ধার হাত চাটিতে লাগিল এবং একবার আমাদের দিকে ডাকিতে ডাকিতে দৌড়িয়া আসিতে লাগিল। এই ঘটনা দেখিয়া আমার মনে হইল যে, এই ব্যক্তিকে পৃথিবীর সমুদয় আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে কিন্তু তবুও এই প্রভুভক্ত প্রাণী শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইহার সঙ্গ ছাড়ে নাই, ইহা কি কম আশ্চর্য্যের বিষয়!

বিলাতী গ্রেহাউণ্ড কুকুর

ফরাসী বিপ্লবের সময় একজন প্রধান শাসন-কর্ত্তার প্রতি বিপ্লব আইন অনুসারে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। যখন অস্ত্রধারী লোকেরা আসিয়া সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিল তখন তাহার পালিত কুকুরটাও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। অবশেষে কারাগারের ভিতরে আর সেই কুকুরকে যাইতে দেওয়া হইল না। কুকুরটা নিরুপায় হইয়া প্রভুর প্রতিবেশীর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু প্রত্যহ একবার করিয়া সেই কারাগারের দরজায় যাইয়া উপস্থিত হইত। ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিত না। এইরূপে দ্বারবানের কাছে প্রত্যহ লেজ নাড়িয়া মিনতি করিয়া অবশেষে সে ভিতরে ঢুকিতে পাইয়াছিল। কুকুরটা ঢুকিয়াই প্রভুকে পাইয়া যে কি আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। কারাধ্যক্ষ একদিন কুকুরটিকে তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু তবুও সে প্রত্যেক দিন কোন না কোন ক্রমে প্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইত। যখন এইরূপে প্রাণদণ্ডের দিন উপস্থিত

হইল সেইদিন কুকুরটি রক্ষকমণ্ডলী ভেদ করিয়া প্রভুর পায়ের কাছে যাইয়া বসিল। তারপর যখন গিলোটিন অস্ত্রাঘাতে প্রভুর মুণ্ডপাত হইল তখনও কুকুরটি প্রভুর দেহ ছাড়িল না। অবশেষে সেই প্রভুভক্ত কুকুরটি প্রভুর গোরের উপর যাইয়া শুইয়া
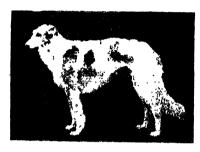
বোরজোই কুকুর

থাকিত। ক্রমাগত তিনমাস কাল সেই একবার একজনের বাড়ী যাইয়া আহার করিয়া আসিত, আর সেই রকম গোরের উপর শুইয়া থাকিত। অবশেষে আহার ত্যাগ করিল, দেহ

প্রভুর সমাধি পাশে প্রভুভক্ত কুকুর

অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং যেদিন তাহার মৃত্যু সময় আসিয়া উপস্থিত হইল সেই দিনও সে ক্রমাগত প্রভুর কবরের মাটি খুঁড়িয়া কাঁদিয়াছিল। ইহা সত্য ঘটনা।—কুকুরের প্রভুভক্তি সম্বন্ধে এইরূপ শত শত গল্প প্রচলিত আছে।

কুকুর তিন বৎসরে প্রকৃত বলবান হয়। পনেরো বৎসরের আধক প্রায় বাঁচে না তবে কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত ও বাঁচিতে দেখা যায়।

আমাদের বাঙ্গলা দেশে ও ভারতের সর্ব্বত্র এক জাতীয় অযত্ন বর্দ্ধিত কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগকে বড় একটা যত্ন করিতে হয় না। পথে-ঘাটে আপনার মনে বিচরণ করে। কেহ কেহ বাড়ীতে যত্ন করিয়া পুষিয়াও থাকে। এই কুকুরেরা আপনা হইতেই পোষ মানে এবং খুবই প্রভুভক্ত হয়। সামান্য যা কিছু ডাল ভাত পাইলেই সন্তুষ্ট হয়। দুঃখের বিষয় এই জাতীয় কুকুরের বংশও দেশের লোকের অযত্নে দিন দিন কমিয়া আসিতেছে।

এস্‌কিমো কুকুরেরা বরফের উপর দিয়া গাড়ী টানিয়া থাকে। এক একটি গাড়ীতে দুইটি তিনটি করিয়া কুকুর জুড়িয়া দেওয়া হয়। কখনও বা সাত আটটা কুকুর জুড়িয়া গাড়ী চালান হইয়া থাক।

স্পেনিয়াল কুকুরদের এক জাতীয় কুকুরকে 'জলের স্পেনিয়াল' বলে। ইহারা জলে যাইতে খুব পটু। অন্য কুকুরদের অপেক্ষা ইহারা বেশী পরিমাণ চতুর ও চালাক।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমে কুকুর লইয়া লোকে নেকড়ে বাঘ, ভালুক এবং বন্য শূকর শিকার করিত। কেহ কেহ বা হরিণ শিকার করিত। কেহবা কুকুর দিয়া প্রহরীর কার্য্য করাইত। অনেকে মনে করেন যে সেকালে গ্রীসদেশে ভাল কুকুর ছিল এবং বাঘের ন্যায় সোজা-কানযুক্ত কুকুরও ছিল। কান ঝোলা কুকুর গ্রীস ও রোমে ছিল না। এক জাতীয় জাপানী কুকুর তোমরা বড় বড় সহরে অনেকের বাড়ীতেই পুষিতে দেখিয়া থাকিবে। এই জাপানী কুকুরগুলি জাপানী মানুষদের মতই আকারে ছোট হয়। সারা গায়ে বড় বড় লোম। জাপানের এই শ্রেণীর কুকুর ছাড়া আরও অনেক জাতীয় কুকুর আছে।

কুকুরের প্রভুভক্তির গল্প এবং তাহাদের সব জাতির ইতিহাস বলিতে গেলে মস্ত বড় এক পুঁথি হয়, তাই এখানেই শেষ করা গেল।
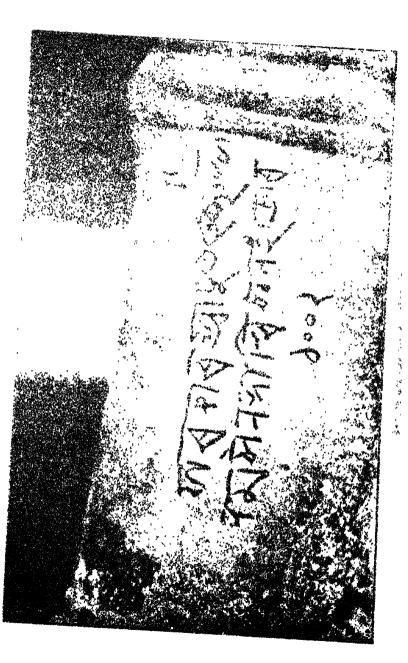
বাঙ্গলার কথা

ঈশা খাঁ, কেদার রায়, বীর হাম্বীর ও প্রতাপাদিত্য

মোগলেরা যে কেবল পাঠান-দিগকেই দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা নহে, বাঙ্গলার পরাক্রান্ত হিন্দু মুসলমানদেরও সহিত তাঁহারা বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গলাদেশ সহজে মোগল-দিগকে আধিপত্য স্থাপন করিতে দেয় নাই। এই সময়ে বাঙ্গলা দেশ কতকগুলি ক্ষমতাশালী ভূঁইয়া রাজার অধিন ছিল। তাঁহারা বার ভুঁইয়া নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীরই লোক ছিলেন। মুসলমানেরা সকলেই পাঠান বা তাঁহাদের সহিত সংস্পৃষ্ট ছিলেন। পূর্ব্বে অবশ্য এই বারভুঁইয়ার সকলেই হিন্দু ছিলেন। বাঙ্গলা দেশের ন্যায় আসাম, আরাকান প্রভৃতি স্থানেও বার ভুঁইয়ারা ছিলেন বলিয়া জানা যায়। পালবংশের রাজত্বকাল হইতে বাঙ্গলার বার ভুঁইয়ার কথা জানা গিয়া থাকে। ইঁহারা পাল রাজগণের অধীন রাজা বলিয়াই গণ্য হইতেন; প্রচীন গ্রন্থাবলীতে পাল রাজগণের সভা বর্ণনায় বার ভুঁইয়ার উল্লেখ দেখা যায়।

"বার ভুঁঞা বসে আছে বুকে নিয়ে ঢাল"

পাঠান আমলেও এই বার-ভুঁইয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে সে সময়ে মুসলমানেরাও ভূঁইয়া হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

মোগল-বিজয়ের সময় যাঁহারা বারভুঁইয়া ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নয়জন মুসলমান ও তিনজন হিন্দু। কেহ কেহ হিন্দু ভুঁইয়ার সংখ্যা আরও অধিক মনে করিয়া থাকেন। মুসলমানেরা যে সকলেই পাঠান বা তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট, সে কথা অবশ্য তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। কারণ তখন বাঙ্গলাদেশে পাঠানেরাই রাজত্ব করিতেন। এই মুসলমান ভুঁইয়াগণের মধ্যে যিনি প্রবল ছিলেন তাঁহার নাম **ঈশা খাঁ**। কিন্তু অন্য আটজন মুসলমান ভুঁইয়ার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। হিন্দু তিন জনের মধ্যে বিক্রমপুর—শ্রীপুরের কেদার-রায়, চাঁদরায়, বাকলা চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্প রায়, রামচন্দ্র রায় ও যশোরের প্রতাপাদিত্যের কথা আমরা জানিতে পারি। এই চারিজন প্রসিদ্ধ ভুঁইয়ার সহিত কিরূপে মোগল সুবেদারগণের যুদ্ধ চলিয়াছিল। এইখানে সেই কথা বলিলাম।

ঈশা খাঁ—মশনদ আলী

কথিত আছে ঈশাখাঁর পিতা হিন্দু ও মাতা পাঠান রমণী ছিলেন। ঈশার পিতা কালিদাস গজদানী রাজপুত বংশীয়, তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সোলেমান খাঁ উপাধি ধারণ করেন। ঈশা ও ইস্মাইল নামে তাঁহার দুইটী পুত্র জন্মে। ঈশা আপন প্রতিভাবলে সামান্য সৈনিক হইতে ক্রমে ক্রমে একজন প্রধান ভূঁইয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের প্রায় অধিকাংশই তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহার অনেকগুলি রাজধানী থাকার পরিচয়

মোগল সুবেদারগণ ঈশাখাকে পরাস্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঈশা মধ্যে মধ্যে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিতেন। কিন্তু সুযোগ পাইলেই স্বাধীন হইয়া উঠিতেন।

এইরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মোগল সুবেদারদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ চলিতে চলিতে মানসিংহ আসিয়া উপস্থিত হন। তখন ঈশাখাঁর সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া যায়। ঈশা মানসিংহের সহিত স্থলযুদ্ধ ও জলযুদ্ধ উভয় যুদ্ধেই যারপর নাই পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত জল যুদ্ধে মানসিংহের পুত্র দুর্জ্জনসিংহ নিহত হন। মানসিংহ
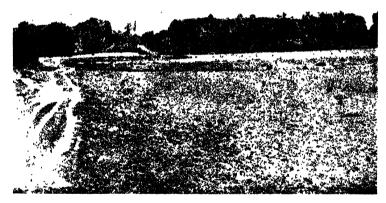
বাইশগজী প্রাচীর-গৌড়। বর্ত্তমান সময়েও এইরূপভাবে বর্ত্তমান আছে। এখনও ইহার উচ্চতা কম নহে। এই বিরাট দুর্গ প্রাচীর দর্শনীয় বটে

পাওয়া যায়। ঢাকা জেলাস্থ নারায়ণগঞ্জ সহরের উত্তরাংশে স্থিত খিজিরপুর বা দেওয়ানবাগ এবং ময়মনসিংহ জেলাস্থ জঙ্গলবাড়ী গ্রামে তাঁহার রাজধানী ছিল। অন্যান্য ভূঁইয়ারা তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ঈশা খাঁ প্রথমে মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। তিনি অন্যান্য পাঠানদিগের সহিত মিলিত হইয়া মোগলদিগকে বাধা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। বিদ্রোহী কয়েকজন মোগল কর্ম্মচারী ঈশাখাঁর সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।

এগারসিন্দু দুর্গ অবরোধ করিয়া ঈশার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। যুদ্ধে মোগলপক্ষ বড় সুবিধা করিতে পারে নাই। আজীবন মস্তক উন্নত রাখিয়া মোগলের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ঈশা খাঁ পরলোকে গমন করেন। ঈশা খাঁর উপাধি ছিল মশনদ-ই-আলি। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীগণ ঈশা খাঁর রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। সে বিবরণ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

কেদার রায়

এবার তোমাদিগকে একজন সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ভুঁইয়ার কথা বলিতেছি। তাঁহার নাম কেদার রায়। কেদার রায়ের পুত্রের নাম চাঁদরায়। ইঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ নিমরায় কর্ণাট দেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণ বা কানসোনা হইতে আসেন এইরূপও অনেকে বলেন। ইঁহারা বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর প্রদেশে ইঁহারা অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। শ্রীপুর নগর ইঁহাদের রাজধানী ছিল। শ্রীপুর পদ্মায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আরম্ভ হয়। মোগলেরাও ইঁহাদিগকে দমন করিতে অনেকরূপ চেষ্টা করেন। কিন্তু ইঁহাদের রাজ্যে বহু নদ-নদী প্রবাহিত থাকায় তাঁহাদিগের রাজ্য-মধ্যে মোগলদিগের প্রবেশ করা কঠিন হইয়া উঠিত।

কিছুকাল পরে চাঁদরায়ের মৃত্যু হইলে কেদাররায় একাকীই আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিতে থাকেন। শ্রীপুরের সম্মুখস্থিত সন্দ্বীপ তাঁহাদের অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু মোগলেরা তাহা অধিকার করিয়া লয়। কেদাররায় তাহা উদ্ধার করিবার জন্য যারপর নাই চেষ্টা করেন। তাহার অনেকগুলি

নারায়ণগঞ্জের অপর তীরে সেকালের একটি প্রাচীন দুর্গ ও তাহার তোরণ দ্বার। এই দুর্গের তোরণটি এখনও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে

তাঁহাদের শেষ কীর্ত্তি রাজাবাড়ীর মঠ ও কয়েক বৎসর হইল পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। এখন তাহার কোনই চিহ্ন নাই। চাঁদরায় ও কেদার রায় দুইজনই অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইউরোপীয় ভ্রমণ-কারীদের বিবরণ হইতে ইঁহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। ঈশা খাঁর ন্যায় ইঁহারাও মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। ঈশাখাঁর সহিত ইহাদের বেশ মিত্রতাও ছিল। কিন্তু অবশেষে সে মিত্রতা ভাঙ্গিয়া যায়। তখন দুইপক্ষে বিবাদ রণতরী ছিল। কার্ভালো নামে এক জন পর্ত্তুগীজ বা ফিরিঙ্গী সেনাপতির সাহায্যে তিনি সন্দ্বীপ আবার অধিকার করিয়া লন। কার্ভালো যখন সন্দ্বীপে ছিলেন তখন তাহা অবরোধ করিবার চেষ্টা হইলে চট্টগ্রামের পর্ত্তুগীজগণ তাঁহাকে সাহায্য করিয়া রক্ষা করে। এই সময়ে আরাকানের মগ রাজা সেলিমসা পর্ত্তুগীজদিগকে দমন করিবার জন্য সনদ্বীপ আক্রমণ করেন। কেদাররায় পর্ত্তুগীজ-দিগের প্রাধান্যে অসন্তুষ্ট হইয়া মগরাজকেই সাহায্য

করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজেরা কিন্তু মগরাজের রণ-তরী সকল ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়। মগরাজের সহিত যুদ্ধে পর্ত্তুগীজদিগের রণতরী সকলও ভগ্ন হইয়া যায়। তখন তাহারা সনদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য স্থানে গমন করে। কার্ভালো কতকগুলি রণতরী লইয়া শ্রীপুরে পুরাতন প্রভু কেদাররায়ের নিকট উপস্থিত হন। সন্দ্বীপ লইয়া মোগল, বাঙ্গালী, মগ ও ফিরিঙ্গীর মধ্যে কিরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা অবশ্য তোমরা বুঝিতে পারিতেছ পর্ত্তুগীজেরা সন্দ্বীপ পরিত্যাগ করিলে মগরাজা তাহা অধিকার করিয়া লন।

তাঁহার সাহায্যের জন্য একদল সৈন্য পাঠাইয়া দেন। কেদাররায়ের সহিত মহারাজা মানসিংহের নৌযুদ্ধ বাঙ্গলার ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জল করিয়া আছে। উভয় পক্ষ হইতে গভীর গর্জ্জনে কামান সকল গোলা-বৃষ্টি করিতে থাকে এবং ঘোরতর অগ্নিক্রীড়ার অভিনয় হয়। কেদার রায় আহত হইয়া বন্দী হন। মান-সিংহের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হয়। এইরূপ অমানুষিক বীরত্ব দেখাইয়া কেদার রায় যুদ্ধে জীবন-বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শিলাময়ী নামে দেবী মূর্ত্তি মানসিংহ লইয়া গিয়া তাহার রাজধানী অম্বর নগরে স্থাপন

দুর্গের অপর দিকের ভগ্ন প্রাচীর দেখা যাইতেছে। দুর্গের ভিতরের অংশের কোন চিহ্নই বিদ্যমান নাই। এখন কৃষকেরা চাষ বাস করিয়া থাকে

ঐদিকে মানসিংহ কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ করেন। কার্ভালোর সহিত যুদ্ধে মানসিংহের সেনাপতি মন্দারায় নিহত হ'ন। ইহার পর কেদার রায় মগ রাজের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। মানসিংহ আবার কেদার রায়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তিনি প্রথমে আরাকান রাজকে দমন করিয়া কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ করেন। সে সময়ে কেদার রায়ের ৫০০ শত রণতরী ছিল। তিনি মোগল সেনাপতি কিলমকুকে শ্রীনগরে অবরোধ করিলে মানসিংহ

করেন। এখনও তথায় সেই প্রতিমার পূজা হইয়া থাকে।

বীর হাম্বীর

ভুঁইয়ারা ব্যতীত আরও কোন কোন বাঙ্গালী জমীদার সে সময়ে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর এবং পূর্ব্ববঙ্গের ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য

ঈশাখাঁর সাতটি কামান
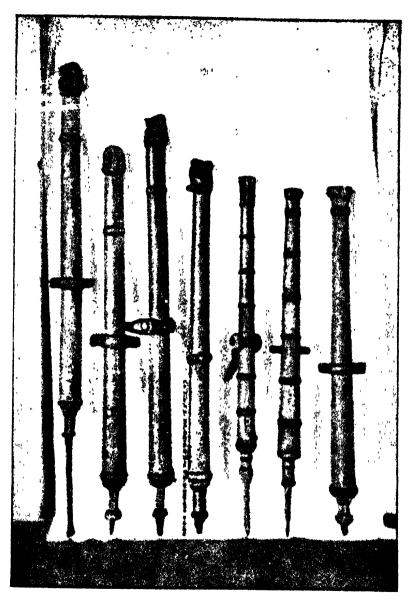
ও ভূষণায় মুকুন্দরাম রায়ই প্রধান। বের রাজ বংশ প্রাচীনকাল হইতে একরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। ইঁহারা মল্লবংশ নামে পরিচিত। আদিমল্ল রঘুনাথ হইতে ইঁহাদের বংশ আরম্ভ। মল্লাব্দ নামে একটী অব্দও ইঁহাদের রাজ্যে প্রচলিত ছিল। মোগল-পাঠানের সঙ্ঘর্ষের সময় বীর হাম্বীর মল্ল বিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন। তিনি প্রথমে মোগলদিগের বিরুদ্ধে পাঠানদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। হাম্বীর কতুলখাঁর সহিত মিলিত হন। পাঠানেরা রাত্রিকালে জাহানাবাদের নিকট মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের শিবির আক্রমণ করিলে হাম্বীর তাঁহার বিপদ বুঝিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। ও বিষ্ণুপুরে লইয়া যান। তিনি পূর্ব্ব হইতে জগৎসিংহকে সতর্ক করিয়াছিলেন। জগৎসিংহ কিন্তু হাম্বীরের কথায় কান দেন নাই। ইহার পর মোগলদিগের সহিত হাম্বীরের মিলন ঘটে। তখন আবার পাঠানেরা তাঁহার রাজ্য লুট পাঠ আরম্ভ করে। কিন্তু মানসিংহ পাঠানদিগকে পরাজিত করেন।

হাম্বীর একজন ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। সে সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্ম—প্রচারক শ্রীনিবাসাচার্য্য তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইল হাম্বীরের লোকেরা আচার্য্যের ভক্তি-গ্রন্থ সকল অপহরণ করে। হাম্বীর আচার্য্যের পরিচয় পাইয়া সে সকল গ্রন্থ ফিরাইয়া দেন ও তাঁহার শিষ্য হন। হাম্বীরের রচিত দুই একটী গানের পদও দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি চৈতন্যদাস নাম ধারণ করিয়াছিলেন। এই নামের ভণিতাযুক্ত তাঁহার কতকগুলি গান প্রচলিত আছে—,

'শ্রী চৈতন্য দাস নামে যে গীত বর্ণিল।
নিস্তারের ভয়ে তাহা নাহি জানাইল॥"

পাম্বার দিক হইতে জঙ্গলের আড়াল দিয়া দুর্গটি দেখা যাইতেছে এখন ইহা দ্রুত ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। শীঘ্রই ভূমিসাৎ হইবার সম্ভাবনা

হাম্বীর কোন কোন দেবমূর্ত্তিরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের কালাচাঁদ নামে বিগ্রহ তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত।

প্রতাপাদিত্য

প্রতাপাদিত্যের নাম তোমরা অবশ্য শুনিয়া থাকিবে।

'যশোর নগর ধাম প্রতাপাদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে বাদসায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ডরে সব নৃপতি দ্বারস্থ॥

বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলক' হাতী অযুত তুরঙ্গ সাথী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥"

মহাকবি ভারতচন্দ্রের এই কবিতা বাঙ্গলার ঘরে ঘরে পঠিত হইয়া যাঁহাকে সকলের নিকট পরিচিত করিয়া রাখিয়াছে তাঁহার কথা তোমাদের সকলের জানা আবশ্যক।

প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্ব পুরুষেরা প্রথমে সপ্তগ্রাম, পরে গৌড়ে কাননগো দপ্তরে কার্য্য করিয়াছিলেন। কাননগোরা রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্য করিতেন। প্রতাপাদিত্যের পিতা শ্রীহরি শেঠ পাঠান নরপতি দায়ুদের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন, এমনকি কতুলখা ও শ্রীহরি দায়ুদের দক্ষিণও বামহস্ত স্বরূপ ছিলেন।

দায়ুদের নিকট হইতে শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য উপাধি লাভ করেন। দায়ুদ যখন মোগলদিগের ভয়ে উড়িষ্যায় পলাইয়া যান, তখন বিক্রমাদিত্যের উপর তাঁহার ধন রত্ন রক্ষার ভার দিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য কতকগুলি নৌকায় তাহা বোঝাই করিয়া পলায়ন করিতে করিতে সুন্দরবনের মধ্যে আসিয়া পড়েন। সেইখানে চাঁদখা নামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের জায়গীর ছিল। তাঁহার বংশে কেহ না থাকায় বিক্রমাদিত্য দায়ুদের নিকট হইতে ঐ জায়গীর চাহিয়া লইয়াছিলেন। সেই জায়গীর মধ্যে হিন্দুদিগের দুইটী প্রধান তীর্থস্থান ছিল। একটী যশোর আর একটী সাগরসঙ্গম। যশোর যশোরেশ্বরী নামে দেবতার পীঠস্থান, আর সাগরসঙ্গম গঙ্গা ও সাগরের মিলন স্থান। বিক্রমাদিত্য যশোরে যশোরেশ্বরীর নিকট বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে যখন দায়ুদ ক্রমে ক্রমে পরাজিত হইয়া মোগল হস্তে নিহত হইলেন, তখন বিক্রমাদিত্য দায়ুদের সেই সমস্ত ধন রত্ন লইয়া যশোর নগর পত্তন করিয়া চাঁদখাঁর জায়গীর ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি মোগল সুবেদারদের নিকট হইতেও তাহা মঞ্জুর করিয়াও লইয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের এক খুড়তত ভাই ছিলেন। তাঁহার নাম জানকীবল্লভ। জানকীবল্লভ বসন্তরায় উপাধি পাইয়াছিলেন। এই বসন্তরায়ের চেষ্টায় বিক্রমাদিত্য যশোর নগর ও যশোর সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বিক্রমাদিত্য মৃত্যুর পূর্ব্বে ভ্রাতা বসন্তরায় ও পুত্র প্রতাপাদিত্যকে সমস্ত সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দেন। বেশীর ভাগ প্রতাপাদিত্যের অংশেই পড়িয়াছিল। প্রতাপাদিত্য যশোরের নিকট ধূমঘাট নামে নগর পত্তন ও এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন। বসন্তরায় যশোরেই ছিলেন। মোগল পাঠানের বিবাদে সুযোগ পাইয়া প্রতাপাদিত্য ক্রমে ক্রমে বল সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার যেমন অনেক ঢালী, পদাতিক, অশ্বারোহী ও হস্তী ছিল, সেইরূপ অসংখ্য রণতরী ও কামানও ছিল। এই সকল রণতরীর কতক ধূমঘাটের নিকট ও কতক সাগরসঙ্গমের সাগর দ্বীপে থাকিত। এই সাগর দ্বীপকে সেকালে ইউরোপীয়গণ চান্দেকান বলিতেন। চাঁদখাঁর জায়গীরের মধ্যে তাহা ছিল বলিয়া তাহাকে চান্দেকান বলা হইত বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন। এই সময়ে পাঠান সর্দ্দার কতলুখাঁর সহিত মোগলদিগের বিবাদ চলিতেছিল। কতলু বিক্রমাদিত্যের বন্ধু ছিলেন। প্রতাপ পিতৃবন্ধুর সাহায্যের জন্য উড়িষ্যায় গমন করেন। মোগলদিগের সহিত তাঁহার বিবাদের এই প্রথম সূত্রপাত। উড়িষ্যা হইতে প্রতাপ গোবিন্দদেব নামে কৃষ্ণমূর্ত্তি ও উৎকলেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ লইয়া আসেন।

"নীলাচল হইতে গোবিন্দজীকে আনি।
রাখিলেন কীর্ত্তি যশঃ ঘোষয়ে ধরণী॥"

গোবিন্দদেব এখনও পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছেন। মানসিংহ যখন সুবেদার হইয়া আসেন, তখন প্রতাপ শান্তভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই সময়ে নানাস্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ সৈন্য সংগ্রহ ও সেনাপতি নিয়োগ করিয়া ক্রমে ক্রমে বলশালী হইয়া উঠিতেছিলেন এবং মোগলদিগের অধীনতা স্বীকার না করিয়া স্বাধীন হইবার আয়োজন করিতেছিলেন। বসন্তরায়ের এ সকল ভাল লাগিত না। তিনি প্রতাপকে নিজ পুত্রদের অপেক্ষাও স্নেহ করিতেন। বসন্তরায় প্রতাপকে মোগলদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতে নিষেধ করায় প্রতাপ ক্রমে ক্রমে তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠেন। সামান্য কতকগুলি ব্যাপার লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। তাহার মধ্যে চাকসিরি নামক স্থান প্রতাপ বসন্তরায়ের নিকট হইতে চাহিয়া পান নাই বলিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। সেই জন্য "সাত রাত পাকফিরি, তবুও না পাই চাকসিরি" বলিয়া

একটী কথা প্রচলিত আছে। বিবাদ বাড়িয়া উঠিলে প্রতাপ ক্রোধের বশে বসন্তরায়কে হত্যা করেন।

বসন্তরায়ের কোন কোন পুত্রও প্রতাপের হাতে নিহত হইয়াছিলেন। বসন্তরায়ের একপুত্র রাঘব রায় বা কচুরায় কোনরূপে পলাইয়া গিয়া বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন ও সমস্ত কথা নিবেদন করেন।

'তার খুড়া মহাকায় আছিল বসন্তরায়
রাজা তারে সবংশে কাটিল,
তার বেটা কচু রায় রাণী বাঁচাইল তায়
জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল॥'

কচুবনে রক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া রাঘবের কচুরায় নাম হয়। বসন্তরায়ের হত্যা প্রতাপ চরিত্রের এক ভীষণ কলঙ্ক। কেবল তাহা নহে তিনি তাঁহার জামাতা বাকলার ভূঁইয়া রামচন্দ্র রায়কেও বিবাহ সময়ে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া একটা কথাও প্রচলিত আছে। রামচন্দ্রের রাজ্য অধিকার করিয়া লওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া কথিত হয়। তদ্ভিন্ন পর্ত্তুগীজ সেনাপতি কার্ভালো বিক্রমপুর হইতে তাঁহার নিকটে আসিলে তিনি তাঁহাকেও হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। ইহার কারণ কার্ভালোর বীরত্বের জন্য সকলেই তঁহাকে ভয় করিত। এই সকল ব্যাপারের জন্য প্রতাপাদিত্যের অধঃপতন ঘটিয়াছিল।

বসন্তরায়ের হত্যার পর প্রতাপাদিত্য যশোর রাজ্যের একচ্ছত্র রাজা হইলেন। তিনি যেমন বীর ছিলেন সেইরূপ দাতাও ছিলেন; তাঁহার মুক্তহস্ততা সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে।

"স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ, বাসুকি পাতালে।
প্রতাপ আদিত্য রায় অবনী মণ্ডলে॥"

এরূপ কবিতাও রচিত হইয়াছিল। ইউরোপীয় পাদরীগণ প্রতাপের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সাগরদ্বীপে প্রতাপের সাহায্যে এক গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তাহাই বাঙ্গালার প্রথম গির্জ্জা। কিন্তু কার্ভালোর হত্যার পর প্রতাপাদিত্য পাদরীদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া গির্জ্জা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ দেন।

আকবর বাদশাহের মৃত্যুকাল উপস্থিত হওয়ায় মানসিংহ বাংলা পরিত্যাগ করিয়া রাজধানী আগ্রায় চলিয়া যান। প্রতাপাদিত্য সেই সুযোগে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠেন। কচুরায়ও বাদশাহ দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের প্রতি প্রতাপের অত্যাচারের কথা জানাইলেন। সে সময়ে আবার পাঠানেরা গোলযোগ করিতে আরম্ভ করিলে বাদশাহ জাহাঙ্গীর এই সকল দমনের জন্য মানসিংহকে আবার বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দিলেন।

মানসিংহের পরে কুতুবউদ্দীন প্রভৃতি দু'একজন সুবেদারের পর ইসলাম খাঁ চিশ্‌তি বাঙ্গলার সুবেদার হইয়া আসেন। তিনি রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী লইয়া যান ও তাহার জাহাঙ্গীরনগর নাম প্রদান করেন। ইসলাম খাঁ রাজমহলে উপস্থিত হইলে প্রতাপ তাহাকে উপহার দিবার জন্য কয়েকটী হস্তী ও নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্য নিজ কনিষ্ঠ পুত্র সংগ্রামাদিত্যের সহিত পাঠাইয়া দেন। পরে ইসলাম-খাঁর ঢাকা যাইবার পথে প্রতাপ নিজে সাক্ষাৎ করেন এবং হস্তী, নানাপ্রকার মূল্যবান দ্রব্য ও অনেক টাকা উপহার দেন। সুবেদারও তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইয়াছিলেন। তাহার পর প্রতাপকে মোগল-সৈন্যের সহিত যোগ দিয়া বিদ্রোহীগণের দমনে সাহায্য করিতে হইবে বলিয়া ইসলাম খাঁ আদেশ দেন ও প্রতাপকে বিদায় প্রদান করেন। প্রতাপ কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত সুবেদারের আদেশ পালন করিলেন না। তিনি মোগলের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মোগলের আজ্ঞাবহ হইতে ইচ্ছা করেন নাই। ইসলাম খাঁ বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে লাগিলেন। অনেকে তাঁহার নিকট পরাজিত হইলে প্রতাপ বুঝিতে পারিলেন যে ইসলাম খাঁর সহিত পারিয়া উঠা সহজ হইবে না। তখন তিনি পূর্ব্ব কথা মত কয়েকখানা রণতরী সহ নিজ পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে সুবেদারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। প্রতাপ পূর্ব্বে যোগ না দেওয়ায় সুবেদার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। সংগ্রামাদিত্য সুবেদারের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহার নৌকাগুলি গৃহনির্ম্মাণের কাষ্ঠ বহন করাইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন ও ইনায়েৎ খাঁ নামক সেনাপতিকে যশোর অধিকার করিবার জন্য পাঠাইলেন।

ইনায়েৎ খাঁ অশ্বারোহী, পদাতিক, রণতরী ও

কামান লইয়া প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। মির্জ্জানথন তাঁহার সহকারী হইলেন। ইনায়েৎ খাঁ স্থল সৈন্যের রণতরী ও তোপের ভার গ্রহণ করেন। ইঁহারা পদ্মা, জলঙ্গী প্রভৃতি নদী অতিক্রম করিয়া ক্রমে ইছামতী নদীতে আসিয়া পড়েন। প্রতাপাদিত্য পূর্ব্ব হইতেই সংবাদ পাইয়াছিলেন। যখন মোগলেরা তাঁহার রাজ্যে আসিয়া পড়িল, তখন তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রতাপ জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্যকে সেনাপতি কমলখোজা ও কতলুখাঁর পুত্র জামালখাঁর সহিত কতকগুলি রণতরী, হস্তী ও পদাতিক লইয়া মোগলদিগকে বাধা দিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এবং নিজে রাজধানী ধূমঘাটের নিকট রহিলেন। সেখানে যমুনা নদীর সহিত ইছামতী মিলিত হইয়াছে তাহারই নিকটে মোগলদিগের সহিত প্রতাপের সৈন্যের যুদ্ধ বাধিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। শেষে মোগল সৈন্যের আক্রমণে প্রতাপের সৈন্যেরা হটিতে লাগিল। সেনাপতি কমলখোজা বন্দুকের গুলিতে নিহত হইলেন, তখন উদয়াদিত্য রণতরী লইয়া পিছাইতে লাগিলেন। জামাল খাঁও হস্তী ও কামান লইয়া হটিয়া আসিলেন।

মোগলেরা ক্রমে ক্রমে জলপথে ও স্থলপথে আসিয়া ধূমঘাটের নিকট উপস্থিত হইল। সেখানে স্বয়ং প্রতাপের সহিত তাহাদের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। দুই পক্ষ হইতে গোলা-গুলি বর্ষিত হইতে লাগিল। কামান সকল গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তীর, বর্শা, তরবারির খেলা চলিল। অগণ্য মোগল সৈন্যের নিকট প্রতাপের সৈন্যেরা অবশেষে পরাজিত হইল। প্রতাপ ধূমঘাট দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইলেন। পাছে মোগলেরা দুর্গ ধ্বংস করিয়া ফেলে, ইহা মনে করিয়া প্রতাপ নিজে ইনায়েৎ খাঁর নিকট ধরা দিলেন। খাঁ প্রতাপকে লইয়া ঢাকায় ইসলাম খাঁর নিকট গমন করেন। ইসলাম খাঁ প্রতাপকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন।

এদিকে মির্জ্জা নথন কিছুদিন পরে ধূমঘাটের চারিদিকে লুটপাট করিতে লাগিলেন। লোকে যারপর নাই উৎপীড়িত হইয়া উঠিল। উদয়াদিত্যের সহিত নথনের আবার যুদ্ধ হইয়াছিল কিনা বলা যায় না। প্রতাপকে বন্দী করিয়া লইয়া যাওয়ার পর উদয়াদিত্যের কি হইল তাহাও জানা যায় না। প্রবাদ আছে যে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। আর একরূপ প্রবাদও আছে যে প্রতাপাদিত্যকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া বাদশাহের নিকট পাঠান হইয়াছিল কিন্তু পথিমধ্যে কাশীতে তাঁর প্রাণ-বিয়োগ হয়।

প্রতাপের স্বাধীনতা ক্ষেত্রের ভগ্নাবশেষ এখনও খুলনা জেলায় রহিয়াছে। ঈশ্বরীপুর ও তাহার নিকটস্থ স্থানে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার জাহাজ নির্ম্মাণের স্থান, গোলা-গুলি ও কামানও দু'একটি এখনও লোকে দেখিতে পায়। প্রতাপাদিত্যের বংশের সন্ধান পাওয়া যায় না। বসন্তরায়ের বংশীয়েরা আজিও চব্বিশ পরগণা জেলায় খোড়গাছি ও খুলনা জেলার নুরনগর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

যশোরেশ্বরী

প্রতাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যশোরেশ্বরী দেবী পশ্চিম বাহিনী। লোক প্রবাদ এই যে দেবী, প্রতাপের প্রতি বিমুখ হইয়াছিলেন। তাই ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গলে' লিখিয়াছেন :—

"শিলাময়ী নামে, ছিলা তাঁর ধামে, অভয়া যশোরেশ্বরী,
পাপেতে ফিরিয়া, বসিলা রুষিয়া, তাহারে অকৃপা করি।"

বলা বাহুল্য যে ইহা জনপ্রবাদ মাত্র। মাতা যশোরেশ্বরী ভীষণা কালীমূর্ত্তি। তাঁহার মুখ মাত্র রহিয়াছে। হস্তপদাদি কিছুই নাই। গলার দিক হইতে নীচের সব অংশটা লাল কাপড়ে ঢাকা।

প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে "সারতত্ত্বতরঙ্গিণী" নামক গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা আছে :

"কলিতে প্রতাপাদিত্য নামে নরপতি।
যশোর নগরে ধাম বীর্য্যবন্ত অতি॥
প্রচণ্ড প্রতাপ যথা ছিল দুর্য্যোধন।
ভয়ে যত রাজগণ লইলা শরণ॥
বরপুত্র ভবানীর বিজয়ী ভুবনে।
যশঃ কীর্ত্তি জগতে বিখ্যাত সর্ব্বজনে॥
নীলাচল হইতে গোবিন্দজীকে আনি।
রাখিলেন কীর্ত্তি যশ ঘোষয়ে ধরণী॥
স্বীয় কর্ম্ম দোষে ভবানী বিমুখ হৈল।
রাজা মানসিংহ হস্তে পরাভব পাইল॥"
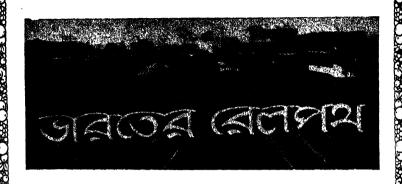
ভারতে রেলের প্রসার

৩৫১৮ পৃষ্ঠার পর

রেল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রী ও মাল চলাচলের যে সকল অসুবিধা দেখা যাইতে লাগিল, এইবার সে সকলের সংস্কারের দিকে দৃষ্টি পড়িল। প্রথম কথা বার বার গাড়ী বদল করিতে যেমন খরচ পড়ে বেশী তেমনই মালপত্র ভাঙ্গিয়া ভিজিয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনাও খুব। তা'ছাড়া মাল-বহনের কার্য্যে অনাবশ্যক দেরী হয়। অথচ সমস্ত লাইনগুলি যদি চওড়ায় এক হয় তাহা হইলে গাড়ী বদল করার সমস্যা মিটিয়া যায়। মাল গাড়ী এক লাইন হইতে অন্য লাইনে চালান করিয়া দিলেই হইল। ইংল্যাণ্ডের এই বিভ্রাট দেখিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর ডিরেক্টররা ঠিক করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে রেলপথগুলির গেজ এক রাখিতে হইবে, সুতরাং তাঁহারা কোম্পানীগুলিকে লাইন চার ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি করিতে বলেন। ইংল্যাণ্ডের বেশীর ভাগ লাইন ঠিক এই পরিমাণ চওড়া। ভারত-সরকার আপত্তি করিয়া বলেন যে ভারতবর্ষে লাইন আরও চওড়া হওয়া প্রয়োজন। রেল সম্বন্ধে পরামর্শ দাতা এঞ্জিনিয়ার মিঃ সিম্‌স লাইনগুলি চওড়ায় সাড়ে পাঁচ ফুট করিবার পক্ষে যুক্তি দেখাইয়া বলেন যে ইহাতে আরও ৯।৽ ইঞ্চি জায়গা পাওয়া যাইবে ও এঞ্জিনের বিবিধ কলকব্জা পাশাপাশি বসাইতে পারা যাইবে। তাহাতে এঞ্জিনের ও গাড়ীর ভার কেন্দ্র নীচে নামিয়া আসিবে এবং সে জন্য ঝাঁকানি কম লাগিবে। ইহাতে যাত্রা আরও আরামপ্রদ হইবে, এবং লাইনের ও এঞ্জিনের ক্ষয় ও ভাঙ্গন কমিয়া যাইবে। তা'ছাড়া ভারকেন্দ্র অপেক্ষাকৃত নীচে থাকিলেও ঝড় জলের সময় গাড়ীর নিরাপত্তা বাড়িবে। ভারতবর্ষে যে রকম ভীষণ ঝড় জল তাহাতে ভারকেন্দ্র উপরে হইলে গাড়ী উল্টাইয়া যাইতে পারে।

সে সময়ে লর্ড ড্যালহাউসী ভারতবর্ষের বড়লাট ছিলেন। তিনি মিঃ সিম্‌সের মত সমর্থন করেন এবং বলেন যে লাইন ছ' ফুট হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরস্ তাঁহাদের মত মানিয়া লন এবং আদেশ দেন যে, লাইন চওড়ায় সাড়ে পাঁচ ফুট হইবে। কিন্তু তখন সিম্‌সের পরিবর্ত্তে মেজর কেনেডি পরামর্শদাতা হইয়াছেন। তিনি লাইন ছ'ফুট চওড়া করিবার অনুরোধ জানাইয়া ডিরেক্টর-দের চিঠি লেখেন। কিন্তু তাঁহারা বলিলেন যে কোম্পানীগুলি জিনিষ-পত্র কিনিয়া ফেলিয়াছে।

এখন মত পরিবর্তন করিলে সকল পক্ষেরই ক্ষতি। তা'ছাড়া যুক্তি ও সুবিধার দিকে নজর রাখিয়াই তাঁহারা গেজ ঠিক করিয়াছেন। সুতরাং তাহা পরিবর্তন করা অনাবশ্যক। অগত্যা লাইন সাড়ে পাঁচ ফুট চওড়া হইল। ইহাই ভারতবর্ষে ব্রড গেজ লাইন।

নব-বিজিত অযোধ্যা প্রদেশে রেলপথ খুলিবার কয়েকটি প্রস্তাব ভারত সরকারের নিকট ১৮৫৭ খৃঃ আসে। লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ইউল তখন পূর্ত্ত-বিভাগের সচিব ছিলেন। এই প্রস্তাবগুলি পরীক্ষা করিয়া তিনি লিখিলেন যে, এই সকল শাখা লাইনের জন্য অপেক্ষাকৃত ছোট গেজই ঠিক। তাহাতে অনেক টাকা বাঁচিবে। আর গেজ বিভিন্ন হওয়ার যে অসুবিধা তাহাও বিশেষ ভোগ করিতে হইবে না, কারণ গঙ্গা নদীর উপরিস্থিত কানপুরে আসিয়া এই লাইন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কেম্পোনীর লাইনের সহিত মিলিত হইবে। সেখানে কোন সেতু না থাকায় গাড়ী বদল করিতেই হইবে। লেঃ কর্ণেল ইউলের এ মত সরকার মানিয়া লইয়াছিলেন।

১৮৬২ খৃঃ লর্ড এলগিন ভারতের বড়লাট হইয়া আসিলেন। ছোট গেজের লাইন সম্বন্ধে তিনি আপত্তি করিলেন। বিশেষ করিয়া এ ক্ষেত্রে লাইনগুলিকে কিছুতেই শাখা বলিয়া ধরা যায় না। বেনারস হইতে সাহারাণপুর পর্য্যন্ত লাইনের দৈর্ঘ্য ৫০০ মাইল। আশে-পাশের দেশ ঘন-বসতিসম্পন্ন ও ধন-সম্পদপূর্ণ। এ অবস্থায় ছোট লাইন দেশের প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে না। কানপুরের নিকট গঙ্গার উপর সেতু হইলেই যাহাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও এই কোম্পানীর গাড়ী পরস্পরের লাইনে যাইতে পারে তাহাই করা উচিত। শাখা কোম্পানীর কর্তারাও মত পরিবর্তন করিলেন এবং ব্রড গেজ (সাড়ে পাঁচ ফুট চওড়া) লাইন পাতিতে রাজী হইলেন। ভারতসচিবও ইহাতে অনুমতি দিলেন।

রেল এঞ্জিন—সেকাল ও একাল

১৮৬৯ খৃঃ লর্ড মেয়ো বড়লাট হইলেন। তিনি ভারতবর্ষে রেলপথ বিস্তারের আশু প্রয়োজন দেখিলেন। তিনি এ বিষয়ে ইংল্যাণ্ডে চিঠি লিখিলেন এবং বলিলেন যে যদি লাইনগুলি উপস্থিত ব্যয় বহুল পদ্ধতিতে নির্ম্মিত হয় তাহা হইলে এই পথ নির্ম্মাণের খরচ ভারতবর্ষ যোগাইতে পারিবে না। কিন্তু সমস্ত লাইন প্রথম শ্রেণীর করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

অনেকক্ষেত্রে ছোট ও সস্তা লাইন বেশ কার্য্যোপযোগী হইবে অথচ তাহাতে খরচ কম পড়িবে। লর্ড মেয়োর এই চিঠিই হইল ভারতবর্ষে মিটার গেজ লাইনের উৎপত্তির মূল। এই চিঠি লইয়া অনেক লেখালেখি চলে ও ছোট লাইন কত চওড়া হইবে সে সম্বন্ধে একটা কমিটি বসে। কমিটি স্থির করে যে দুই ফুট ন ইঞ্চি গেজই ঠিক হইবে ভারত-সচিব কিন্তু লাইন সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভার বড়লাটের উপর ছাড়িয়া দেন। তিনি লাইনগুলি চওড়ায় ৩ ফুট ৩৳ ইঞ্চ অনেক। ভারতসরকারের রেল সম্বন্ধে পরামর্শ-দাতা এঞ্জিনিয়ার মোলসওয়ার্থ সামরিক বিশেষজ্ঞদের সহিত এ বিষয়ে একমত না হইলেও বলিলেন যে, লাহোর হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত যে লাইন পাতা হইতেছে তাহা কলিকাতা হইতে যে লাইন আসিয়াছে তাহারই অংশ মাত্র। সুতরাং এই লাইনও ব্রড গেজ হওয়া উচিত। সকলেই একমত হওয়ায় সরকারকে লাইন বদলাইয়া চওড়া করিতে হইল। ১৮৮৮ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রায় আট শত মাইল লাইন

শিলিগুড়ি ষ্টেশন—দার্জ্জিলিং যাইবার ছোট গাড়ী ও রেলপথ

(এক মিটার) করিতে বলিলেন। তখন ভারতবর্ষে মেট্রিক পদ্ধতি (ফরাসী দেশের মাপ) চালাইবার কথা হইতেছিল, সুতরাং বড়লাট এক মিটার চওড়া লাইন করিতে বলেন। ইহাই হইল আমাদের মিটার গেজ।

গেজ পরিবর্ত্তনের কথা জানাজানি হইবা মাত্র চারিদিকে ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইল,—গেজ ভঙ্গের অসুবিধার জন্যও বটে এবং সামরিক প্রয়োজনের দিক হইতেও বটে বাধ্য হইয়া ভারত সরকারকে গেজ সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা করিতে হইল। প্রধান প্রধান লোকের মতামত চাহিয়া পাঠান হইল। সামরিক কর্ত্তারা পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়া দিলেন যে চওড়া লাইনের সুবিধা এইরূপে বদলান হয়। তাহাতে সরকারের অনেক টাকা বৃথা খরচ হইয়া যায়। তাই পর বৎসর কর্ণেল গর্ডন সরকারকে লিখিয়া পাঠান যে গেজ সম্বন্ধে তাঁহাদের নীতি তাঁহারা যেন ব্যক্ত করেন। সরকার অনেক বিবেচনার পর লিখিয়া পাঠাইলেন যে, গেজ সম্বন্ধে কোন আইনের প্রয়োজন নাই। ছোট লাইন বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং প্রয়োজন ও সুবিধামত সেগুলিকেও বড় লাইনে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। সাধারণতঃ ব্রড গেজই হইবে সরকারের আদর্শ। ভারত-সচিবও ভারত সরকারের মত সমর্থন করেন।

বর্ত্তমান সময়ে এত মাল ও যাত্রী চলাচলের জন্য রেল কোম্পানীর নিকট আসে যে মিটার গেজের

কথা কেহ কল্পনাও করেন না। উপস্থিত যে সকল ছোট লাইন আছে—যথা বি, এন, ডব্লু; এ, বি, সা, ই স্থান বিশেষে ঈ, বি, আর প্রভৃতি—তাহারা ঠিক মত বহনের কাজ আঁটিয়া উঠিতে পারে না। এই হারে মাল ও যাত্রীর পরিমাণ বাড়ীতে থাকিলে, ভবিষ্যতে বোধ হয় পুনরায় মিটার গেজ বদলাইয়া ব্রড গেজ করিবার কথা উঠিবে।

ব্রড ও মিটার গেজ ছাড়া স্থানীয় প্রয়োজনে আরও ছোট ছোট গেজ ভারতবর্ষে সৃষ্টি হইয়াছে। যে সব লাইন পাহাড়ে উঠিয়াছে তাহারা চওড়ায়

মাঠ ও নির্জ্জন বন জঙ্গলের মধ্য দিয়া রেলপথ চলিয়াছে

দু' ফুট আড়াই ফুট মাত্র—যেমন দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে, কালকা সিমলা রেলওয়ে প্রভৃতি। এ সকল ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বাধার জন্য বড় লাইন পাতা অসম্ভব। সুতরাং বাধ্য হইয়াই প্রচলিত গেজ ভাঙ্গিতে হইয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর রেলের ইতিহাস

বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে রেলের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। রেলপথ এই সময় খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করিতে থাকে। ১৯০০ খৃঃ লাইনের মোট দৈর্ঘ্য ২৪৭৫ মাইল ছিল, ১৯১৩ খৃঃ তাহা বাড়িয়া ৩৪৬৫৬ মাইলে দাঁড়ায়। রেলের ব্যবহার এতই বাড়ীতে থাকে যে রেল কোন মতেই সমস্ত প্রয়োজন মিটাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সুতরাং ১৯০৮ খৃঃ ভারতীয় রেলের আর্থিক অবস্থা, শাসন ও পরিচালনা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য ম্যাকে-কমিটি নিয়োগ করা হয়। ইহার সভাপতি ছিলেন মিঃ ম্যাকে (পরে লর্ড ইঞ্চকেপ)। কমিটি বলিল যে প্রতি বৎসর রেলের জন্য সরকারের ১৭ কোটি টাকা ব্যয় করা উচিত। সরকার অবশ্য এত খরচ কোন কালেই করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশী ব্যয় করিতে লাগিলেন। কাজেই রেলপথেরও দ্রুত বিস্তার হইল।

এই সময়কার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, রেল কোম্পানীগুলির লাভ হইতে লাগিল। এতদিন ধরিয়া রেল ক্ষতি দিয়া আসিয়াছে এবং সে ক্ষতি সরকারকে পূরণ করিতে হইয়াছে। এখন সরকারের রেলের জন্য আয় হইতে লাগিল। এই আয়ের পরিমাণও ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে কোম্পানীগুলির অযথা ব্যয়বাহুল্য ও অদক্ষ পরিচালনার জন্য এবং সামরিক প্রয়োজনে আয়-হীন রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য ক্ষতি হইত। কিন্তু দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রেলের আয়ও বাড়ীতে লাগিল। যে নর্থ ওয়েষ্টার্ন রেলে সবচেয়ে বেশী

ক্ষতি হইত, খাল কাটার দরুণ সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশ উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। রেলের আরম্ভ হইতে ১৯০০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত সরকারের প্রায় ৭৬ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে তাঁহারা প্রায় ১৩১ কোটি টাকা লাভ করিয়া হইলেন। অবশ্য প্রতি বৎসরের লাভের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন স্থিরতা নাই—সমস্তই মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভর করে। জল ভাল হইলে শস্য ভাল হয়, রেলেরও লাভ বেশী হয়। জল না হইলে অজন্মা হয়, এবং রেলেরও আয় কমে।

পাহাড়ের বুকে গাড়ী চলিয়াছে

১৯১৪ খৃঃ পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ বাধে এবং ভারতবর্ষ ও তাহাতে জড়িত হইয়া পড়ে। যুদ্ধের চাপে ভারতীয় রেলগুলি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। যুদ্ধের চার বৎসর এবং তাহার পরেও কয়েক বৎসর রেলের অবস্থা ক্রমাগত হীন হইয়া পড়িতে থাকে। হাজার হাজার সৈন্য ও যুদ্ধের সমস্ত রসদ বহিবার জন্য লোক-জন ও এঞ্জিন বা গাড়ী জোগাইতে পারা যাইতেছিল না। তাহার উপর আবার মেসোপোটেমিয়ার সামরিক রেলের জন্য অনেক জিনিষই ভারতবর্ষ হইতে পাঠাইতে হইয়াছিল। রাশি রাশি মালপত্র জমিয়া উঠিতেছিল, যাত্রীর ভিড়ও অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল—সকলের স্থান রেলে সংকুলান হইতেছিল না। সরকার কলিকাতায় এক কর্ম্মচারী নিয়োগ করেন, তাঁহার নাম কনট্রোলার অফ ট্রেনস। তিনি প্রয়োজন বুঝিয়া প্রার্থীদের ও মালপত্রের জন্য রেলে জায়গা করিয়া দিতেন। সরকার অর্থাভাবের জন্য রেলের অবস্থার কোন উন্নতি করিতে পারিতেছিলেন না। তা'ছাড়া ইংল্যাণ্ড বা অন্যান্য দেশে রেল-সংক্রান্ত জিনিষ পত্র পাওয়াও যেমন দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছিল, সেখান হইতে তাহা আনাও তেমনি দুষ্কর হইয়াছিল। রেলের এ অবস্থায় সকলের ভীষণ মুস্কিল হইল। সাধারণে ইহার প্রতিকারের দাবী করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল যে বিদেশী কোম্পানীগুলির পরিচালনার অক্ষমতার ও ভারতীয়দের সুখ সুবিধার প্রতি তাহাদের ঔদাসীন্যের জন্যই এ অবস্থার সৃষ্টি

হইয়াছে। তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কোন রকম গ্রাহ্যই করে না। সকলে রেলগুলি কোম্পানীর বদলে সরকারের কর্ত্তৃত্বে আনিতে চাহিল।

অবস্থা সত্যই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তদন্তের ও প্রয়োজন হইয়াছিল। সুতরাং ১৯২০ খৃঃ স্যার উইলিয়াম ম্যাকওয়ার্থের অধিনায়কত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করা হইল। স্বর্গত স্যার রাজেন্দ্রনাথ এবং হাতেই থাকা উচিৎ। লঘিষ্ঠ দল—এই দলে স্যার রাজেন্দ্রনাথ ছিলেন—তিনি বলেন যে রেল পরিচালনার ভার ভারতের গঠিত একটি কোম্পানীর হাতে দেওয়া উচিৎ। সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মানিয়া লইয়াছেন এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত রেলের ভার নিজেদের উপর লইতেছেন। ইষ্ট বেঙ্গল, আউধ রোহিলখণ্ড, নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে ত সরকার পরিচালনা করিতেছিলেনই—১৯২৭ খৃঃ

ঈস্টর্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের দার্জ্জিলিং যাইবার রেলপথ—দূরে হিমালয়

স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস ও এই কমিটির সদস্য ছিলেন। ম্যাকওয়ার্থ কমিটি সে সময়ের যে চিত্র দিয়াছেন তাহাতেই বুঝা যাইবে রেলের অবস্থা কতই খারাপ হইয়াছিল। তাঁহারা বলেন যে, জনসাধারণের অভিযোগ অনেকাংশেই সত্য এবং এত দিনেও তাহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। অনেক সেতুর এমন অবস্থা যে তাহার উপর দিয়া গাড়ী যাওয়া বিপজ্জনক; শত শত এঞ্জিন, হাজার হাজার গাড়ী এবং বহু মাইল ব্যাপী লাইনের পরিবর্ত্তনের ন্যায্য সময় বহুকাল অতীত হইয়াছে।

তদন্তের ফলে এই কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মত দেন যে রেল পরিচালনার ভার সরকারের ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, ১৯২৫ খৃঃ গ্রেট ইণ্ডিয়ান এবং ১৯২৯ খৃঃ বর্ম্মণ রেলওয়ে সরকার পরিচালনার জন্য হাতে লন। বম্বে বরোদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া, মাদ্রাজ সাউথ মারাঠা, আসাম বেঙ্গল, বেঙ্গল নাগপুর এবং সাউথ ইণ্ডিয়ান, এই ছ'টি রেল সরকারের সম্পত্তি, কিন্তু কোম্পানীরদ্বারা পরিচালিত হয়। ইহাদের সহিত চুক্তির মেয়াদ ফুরাইলেই খাস সরকারী পরিচালনার অধিনে আনার কথা চলিতেছে। ইহা ছাড়া বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ, রোহিলখণ্ড কুমায়ুন এবং সাদার্ণ পঞ্জাব রেলওয়ে এখনও সম্পূর্ণ বে-সরকারী সম্পত্তি।

দেশের সাধারণ রাজস্ব হইতে রেলের রাজস্ব

আলাদা করিবার প্রস্তাবও ম্যাকওয়ার্থ কমিটি করেন। সরকার এ পর্যন্ত নানা উপায়ে রেলের জন্য মূলধন জোগাইতেন—(১) সাধারণ রাজস্বের উদ্বৃত্ত হইতে, (২) ভারতে বা ইংল্যাণ্ডে টাকা ধার করিয়া, (৩) পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কের আমানত হইতে, (৪) দুর্ভিক্ষ বীমা তহবীল হইতে এবং (৫) টাকা প্রভৃতির লাভের অর্দ্ধেক হইতে। খুব নির্দ্দিষ্টভাবে চলিত না। যতদিন না রেল লাভ করিতে পারিতেছিল, ততদিন এ ব্যবস্থা ছাড়া অন্য গতি ছিল না। কিন্তু রেলের যখন লাভ হইতে লাগিল তখন এ ব্যবস্থা রেলের উন্নতির ও বিস্তৃতির পথে বাধাস্বরূপ হইল। কারণ রেল ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান। প্রতি দিনের লাভ ক্ষতির দিকে দৃষ্টি না দিয়া ভবিষ্যতের আশায়ই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চলে।

ডাকগাড়ী—ঝড় ও হার মানে দ্রুতগতির নিকট

রেলপথ নির্ম্মাণের ও উন্নতির জন্য এই প্রকারে টাকা জোগাড় করা হইত। রেলের যা আয় হইত তাহা হইতে রেল পরিচালনার ব্যয় সর্ব্ব প্রথমে মিটান হইত। তারপর মূলধনের উপর সুদ দিয়া কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহা সরকারের সাধারণ রাজস্বে জমা হইত। কিন্তু সাধারণ ও রেল রাজস্ব এইরূপ একজোটে জমা ও খরচ করার একটি মস্ত দোষ এই ছিল এই যে, রেলপথের বিস্তৃতি নির্ভর করিত সাধারণ রাজস্বের পরিমাণের উপর। এই পরিমাণ খুবই অনির্দ্দিষ্ট। সেজন্য রেলের কাজও রেলপথ নির্ম্মাণ ও অন্যান্য অনেক ব্যাপারে কয়েক বৎসর ধরিয়া খরচ করিয়া যাইতে হয়। সাধারণ রাজস্বের অবস্থা যে বৎসর ভাল, সে বৎসর এরূপ ব্যয়বহুল একটি পরিকল্পনার জন্য টাকা মঞ্জুর করা হইল। কাজও কিছুদূর অগ্রসর হইল। পর বৎসর আশামত রাজস্ব পাওয়া গেল না, টাকাও মঞ্জুর হইল না। অর্দ্ধ সমাপ্ত কাজ পড়িয়া রহিল—ঝড়-বৃষ্টিতে নষ্ট হইতে লাগিল। যে অর্থ ব্যয় হইয়াছিল তাহাও অপচয় হইল। তারপর সাধারণ রাজস্ব সম্বন্ধে একটি নিয়ম আছে যে, টাকা মঞ্জুর হইলে

বৎসরের মধ্যে তাহা নিঃশেষ করিতে হইবে, না হইলে বাকী টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। তাহাতে বৎসরের শেষ দিকে টাকা যথেচ্ছ ব্যয় করার ঝোঁক দেখা যাইত।

এ সমস্ত অসুবিধার কথা ভাবিয়াই ম্যাকওয়ার্থ কমিটি রেল-রাজস্ব আলাদা করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন। সরকার কমিটির মত মানিয়া লন, এবং ১৯২৫ খৃঃ হইতে এই ব্যবস্থা হয়। ঠিক হয় যে, রেলের আয় হইতে রেলের জন্য ব্যয় প্রথমে দিতে হইবে। পরে উদ্বৃত্ত থাকিলে রেলের সম্পত্তির অপচয়ের জন্য একটি তহবীল সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহাতে টাকা দিবার পরও যদি কিছু বাঁচে ত নির্দ্দিষ্ট হারে সাধারণ রাজস্বে সাহায্য করিতে হইবে। তারপর কিছু বাঁচিলে তাহা সরকার ও রেলের মধ্যে সমান সমান ভাগ হইবে। রেলের ভাগ হইতে একটি রিজার্ভ ফণ্ড গঠিত হইবে। ভাড়া হ্রাসের এবং রেলের উন্নতির জন্য তাহা ব্যয়িত হইবে। এ ব্যবস্থায় বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছিল। রেলের দেয় সমস্ত টাকা মিটাইয়া বেশ মোটা রিজার্ভ ফণ্ড গড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু বিশ্বব্যাপী মন্দার দরুণ রেলের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। সাধারণ রাজস্বে কোন প্রকার সাহায্য করা দূরের কথা, আয় এতই কম হইতেছে যে, সমস্ত রিজার্ভ ফণ্ড ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এমন কি রক্ষিত তহবিল হইতে ক্রমাগত ধার লইতে হইতেছে। ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে রেলের এ দুর্গতি হইয়াছে, আজও কোন উন্নতি হইল না।

বিখ্যাত হাওড়ার পুল—এই সেতু পার হইয়া যাত্রীগণ বৃহৎ ষ্টেসন হইতে নানা দেশ-বিদেশে যাতায়াত করে

রেলের এ হীন অবস্থা শুধু মন্দার জন্য হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ বলেন এ ক্ষতির জন্য মোটরের প্রতিযোগিতাই দায়ী। প্রত্যেক দেশেই মোটরও রাস্তা সমূহের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই রেলের সহিত তাহার প্রতিযোগিতা হইতে থাকে—সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে এই প্রতিযোগিতা অধিক হয়।

বালক ওয়াট কেট্‌লি চাপা দিয়া রাখিতেছেন বাষ্প বাহির হইতে দিবেন না—মা ঘড়ি ধরিয়া দেখাইতেছেন কতটা সময় বৃথা নষ্ট হইল !

জেমস্ ওয়াট্

আমরা সকলেই একটি ছবির সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত। সে ছবিটি হইতেছে একটি প্রায় পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক ক্ষীণকায় কিশোর বালকের। বালক একটি কেট্‌লীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া গভীর মনোযোগ দিয়া দেখিতেছে যে বাষ্পের কি ভয়ঙ্কর শক্তি। কি প্রকারে অবলীলাক্রমে তাহার হাতের চাপা অগ্রাহ্য করিয়া বাষ্প কেট্‌লীর ঢাক্‌নী ঠেলিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে।

এই ছবিটি যে কাহার সে কথা বোধ হয় আর তোমাদের কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবেনা কেননা তোমরা সবাই জান যে বাষ্পীয় যন্ত্র আবিষ্কারক জেমস্ ওয়াটের জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা এই ছবিটিতে ব্যক্ত হইয়াছে।

স্কটল্যাণ্ডের এক দরিদ্র-পরিবারে ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ছেলেবেলা হইতেই ওয়াট্ এত ভীরু প্রকৃতির ছিলেন যে মুখ তুলিয়া সামনাসামনি কাহারো সহিত একটি কথাও বলিতে পারিতেন না। তাঁহার অমূল্য আবিষ্কারের মূল্য স্বরূপ যখন তাঁহাকে করা হইত 'আপনি পারিশ্রমিক কত নিবেন'? তখন তাঁহার কপালে ঘাম দেখা দিত। এসমস্ত আবার তিনি কি করিয়া ঠিক করিবেন আর কি করিয়াই বা প্রশ্নকর্ত্তার কথার উত্তর দিবেন তাহা ভাবিয়া তিনি দিশাহারা হইয়া পড়িতেন।

এক এক বার এমন হইত যে এই দামদস্তুর ঠিক করার হাঙ্গামা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তিনি স্থির করিতেন যে এই সমস্ত আবিষ্কারের কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিবেন। এমনি অদ্ভুত ছিল তাঁহার প্রকৃতি। বড় হইলেও তাঁহার এই স্বভাব যায় নাই। ইহার জন্য তাঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে, অনেক সময় বিফল মনোরথ হইতে হইয়াছে তথাপি তাঁহার এই রকম ভীরু-স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? এই ভীরু প্রকৃতি নম্র স্বভাবের ছেলেটির মধ্যে যাহা ছিল, তাহাই একদিন জগৎকে বিস্মিত করিয়া তুলিল এবং জগতের ইতিহাসে তাঁহার নাম অমর করিয়া দিল।

এই ছেলেটির স্বভাব যেমন ছিল অদ্ভুত রকমের খেলা ধুলা ও ছিল তেমনি। ছেলেবেলা হইতেই

যন্ত্রপাতি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে তিনি তন্ময় হইয়া পড়িতেন। কিন্তু সব চাইতে তাঁহাকে আকৃষ্ট করিত এই বাষ্পের ব্যাপারটা। ওয়াট্ কেট্লী হইতে কিছুতেই বাষ্প বাহির হইতে দিবেন না এবং তাঁহার সকল বাধা অতিক্রম করিয়া বাষ্প বাহির হইয়া যাইবেই এই খেলা খেলিতে খেলিতে তিনি এমন আত্মহারা হইয়া পড়িতেন যে তাঁহার আর অন্য কোন কিছুর দিকেই খেয়াল থাকিত না। অবশেষে মা ঘড়ি দেখাইয়া বলিতেন—কতটা সময় সে এইভাবে নষ্ট করিয়াছে। মা, কি তখন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিতেন যে এই সময় নষ্ট করিয়া এই ছেলেখেলার দ্বারাই এই বালক ভবিষ্যতে যুগান্তর আনয়ন করিবে।

জেমসের বয়স যখন মাত্র ১৯ বৎসর সে সময়ে জীবিকা-অর্জ্জন করিবার জন্য তিনি লণ্ডনে আসেন কিন্তু সেখানে তাঁহার বিশেষ কোনই সুবিধা হইল না। জেমস্ তখন স্কটল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া গ্লাসগোতে একটি কারখানা বা ওয়াকসপের প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং বেশ গুছাইয়া বসিলেন। এই সময় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তরুণ উৎসাহী বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যসেবকদের উৎসাহ দান করা হইত তাই গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে ওয়ার্কসপ বা একটি কারখানা স্থাপন করিবার অনুমতি পাইলেন।

ক্রমে ক্রমে সকলেরই তাঁহার গুণের দিকে দৃষ্টি পড়িতে লাগিল এবং নানা ছোটখাট যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ করিতেও মেরামত ইত্যাদি কাজে তাঁহার হাক-ডাক পড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে একদিন একজন অধ্যাপক তাঁহাকে নিউকমেন্ (Newcomen) নামক তখনকার দিনের একজন বৈজ্ঞানিকের তৈয়ারী ষ্টীম্ এঞ্জিন মেরামত করিতে দিলেন। সেই সময়ে যে সকল ষ্টীম এঞ্জিন চল্‌তি ছিল তাহার মধ্যে এই নিউকমনের তৈয়ারী মডেলটাই সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় ছিল। এতদিন জেমস্ ওয়াট সাধারণ খুঁটিনাটি বস্তু মেরামত ও নির্ম্মাণ করিতেন এখন সেই সময়কার চল্‌তি সব চাইতে ভাল মডেলের ষ্টীম এঞ্জিনের মেরামতের ভার পাইয়া তাঁহার সেই ছেলেবেলাকার বাষ্পীয়-যন্ত্রের উপর আসক্তিটা আবার ভাল করিয়া মাথা-ঝাড়া দিয়া উঠিল। তিনি খুব মনোযোগ সহকারে এঞ্জিনের নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়া লইলেন এবং এমন আশ্চর্য্যরূপে মেরামত করিয়া দিলেন যে যন্ত্রটা যে শুধু মেরামত হইল তাহা নহে— অনেকটা উন্নত প্রণালীর হইয়া উঠিল।

জেমস্ ওয়াটের প্রস্তর মূর্ত্তি—ওয়েষ্ট মিনষ্টার এবিতে রক্ষিত

এই ঘটনা হইতে জেমসের জীবনের মহা পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। তিনি এখন হইতে তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ করিবার সুযোগ পাইলেন।

যে সকল ষ্টিম এঞ্জিন সেই সময়ে বাজারে চল্‌তি ছিল, তাহার অধিকাংশই ছিল কয়লার খনি হইতে জল পাম্প করিবার এঞ্জিন।

কয়লার খনিতে জল জমিয়া অনেক সময় খনির কাজ বন্ধ করিয়া দেয় এ আমরা সবাই জানি তাই সে সময়ে খনির মধ্য হইতে জল পাম্প করিবার জন্য

এই সকল ষ্টীম এঞ্জিনের ব্যবহার হইত। কিন্তু এই Steam Engine এর মডেল গুলোর কোনটাই তখন নিখুঁত ছিল না—জেমসের নিকট মেরামত করিবার জন্য যে নিউকমনের বাষ্পীয়যন্ত্র পাঠানো হইয়াছিল তাহাই ছিল এই জাতীয় এঞ্জিন-গুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই মডেলের মধ্যেও নানা রকম দোষ ছিল এবং জেমসের চোখে তাহা সহজেই ধরা পড়িল। জেমস্ তখন সমস্ত ত্রুটি সারিয়া লইয়া এক নূতন মডেলের বাষ্পীয় যন্ত্র প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু আবিষ্কার করিলেই ত হইল না—কি করিয়া তাহা সকলের নিকট প্রচার করিবেন এবং কাজে খাটাইবেন? পূর্ব্বেই আমরা রেণীও ক্রমে আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন।

রেণীর সহায়তায় ওয়াট্ চার বৎসরের মধ্যে সেকালের বিখ্যাত এলবিয়ন মিলের যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। আমরা আজকাল কত রকম মিল চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি এবং এই সকল মিলে কত আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মিত যন্ত্রপাতি দেখিয়াও আজ আমরা একটুও বিস্মিত হই না—কিন্তু ওয়াটের যুগে কোথায় বা ছিল এই সব যন্ত্রপাতি? কোথায় বা ছিল বর্ত্তমান যুগের মত সুবৃহৎ কলকারখানা? তখনকার দিনে কাঠের চাকার পরিবর্ত্তে কোন যন্ত্রপাতিতে যে লোহার চাকা বসানো যাইতে পারে

বার্মিংহামের নিকটবর্ত্তী হিথ্ফিল্ড হল নামক স্থানে ওয়াটের কারখানা। ওয়াটের শত বার্ষিকী স্মৃতি-উৎসবে জনসাধারণকে এই কারখানাটি দেখান হইয়াছিল

বলিয়াছি তিনি এসব বিষয়ে একেবারেই অপারগ ছিলেন। কাজেই ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি ম্যাথু বোলটন (Matthew Boulton) নামে একজন কর্ম্মদক্ষ ধাতুতত্ত্ববিদ্কে তাঁহার অংশীদার নিযুক্ত করিলেন। ওয়াটের উদ্ভাবনীশক্তি এবং বোলটনের কর্ম্মদক্ষতার গুণে তাঁহাদের কারখানা দেখিতে দেখিতে বেশ বড় হইয়া উঠিল। উইলিয়ম মোরডক্ (William Murdock) নামক একজন নিপুণ যন্ত্রবিদ গ্যাসের আলো আবিষ্কারক এবং বিখ্যাত এঞ্জিনিয়ার জন তাহার কেহ ধারণা করিতে পারিত না। ওয়াট্ এবং রেণীর পরিকল্পিত এলবিয়ন মিলেই সর্ব্ব প্রথম এই সকল নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। কাজেই এই মিল তৈয়ারী হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই এলবিয়ন মিল তিন চারি বৎসর চলিবার পরে হঠাৎ আগুন লাগিয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়।

যাহা হউক এ সময় হইতেই ওয়াটের উদ্ভাবনী ক্ষমতা সকলেই বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহার প্রস্তুত ষ্টীম-

এঞ্জিন লোকে নানা কাজে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। প্রথম বাষ্পীয় পোত নির্ম্মাতা রবার্ট ফুলটন্ তাঁহার বাষ্পীয় পোতে চালাইবার নিমিত্ত ওয়াটের বাষ্পীয় কলই প্রথমে ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই ভাবে ওয়াটের যশঃ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল এবং তিনি শেষ বয়স অবধি নির্ব্বিঘ্নে এই যশও গৌরব ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

কেবল যে ষ্টীম এঞ্জিন তাহা নহে ওয়াট্ আরো অনেক দিকে তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির সুপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি ই সর্ব্ব প্রথম বাষ্পীয় পোতের জন্য স্ক্রু প্রপেলারের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, এবং বর্ত্তমান প্রচলিত স্ক্রু প্রপেলারের সহিত ইহার যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি দেখিতেন যে ষ্টীম-এঞ্জিনগুলি হইতে অনবরত ধোঁয়া উঠিয়া নানারকম কাজের ক্ষতি করে এবং আশে-পাশের লোকদের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ফেলে। তাই তিনি এমন ব্যবস্থা করিলেন যে এঞ্জিনের ফারনেস্ বা চুল্লী হইতে যে ধোঁয়া উঠিত তাহা আর কোন ক্রমেই বাহির হইতে পারিত না সেখানেই মিলাইয়া যাইত।

ওয়াটের এই আশ্চর্য্য কৌশল দেখিয়া তখনকার দিনের লোকেরা এত দূর বিস্মিত হইয়াছিল যে কিছুতে বিশ্বাস করিতে চাহিত না যে ধোঁয়া বাহির না হইয়া এঞ্জিন আপনার কাজ কেমন করিয়া করিতে পারে? সেই ১৭০ বৎসর পূর্ব্বে ওয়াট লোকের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখিয়া যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন—আজকাল-কার বহু মিল তাহা ভুলিয়া অনবরত ধোঁয়া বাহির করিয়া জন স্বাস্থ্যের প্রতিকূলাচরণ করিতেছে।

এইরূপে নানাদিকে আমরা ওয়াটের প্রতিভার পরিচয় পাই। বর্ত্তমানে যে বাষ্পীয়যান—বাষ্পীয় পোত এবং বাষ্পদ্বারা পরিচালিত নানা প্রকারের যন্ত্র-পাতি আমাদের নানা উপকার করিতেছে তাহার মূলে ছিলেন সেদিনকার এই ভীরু কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিটী। এই কথা আজ আমরা যখন স্মরণ করি তখন তাঁহাকে কিছুতেই শ্রদ্ধা নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারি না। ওয়াট্ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট ষ্ট্যাফোর্ড-শায়ারের (Stafford shire) অন্তর্গত হিথ্ফিল্ড নামক স্থানে পরলোক-গমন করেন। তাঁহাকে হ্যাণ্ডস্‌ৱার্থ (Handsworth) নামক স্থানে সমাহিত করা হয়। তিনি দুইবার বিবাহ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার পুত্র জেমস্ ওয়াট্ ও একজন প্রতিভাশালী এঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

গ্যাসের আলো

এই প্রসঙ্গে আমরা উইলিয়ম মোর্ডক (William Murdach) সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। উইলিয়ম মোর্ডক ওয়াটস্ এবং বোলটনের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি নানা স্থানে বেড়াইয়া, নানা কারখানায় যাইয়া যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের কাজ সংগ্রহ করিতেন। কর্ণওয়ালের (Cornwall) এক যায়গায় একটি মিল প্রতিষ্ঠার সময় তাঁহার গ্যাসের আলো আবিষ্কারের কল্পনা মাথায় আসে। এবিষয়ে তিনি নানা প্রকারের পরীক্ষা করিবার পর ঐ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেন এবং পৃথিবীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম নিজের বাড়ী গ্যাসের আলোর দ্বারা আলোকিত করিবার ব্যবস্থা করেন।

মোর্ডক বার্মিংহাম ফিরিয়া আসিয়া গ্যাসের সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করেন এবং ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বিশেষ এক উৎসব উপলক্ষে ওয়াট্ ও বোলটনের কারখানার সম্মুখ ভাগ গ্যাসের আলোকে আলোকিত করা হইয়াছিল। সে সময় হইতে মোর্ডোকের সহযোগিতায় ঐ কারখানায় গ্যাস প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ম্যানচেষ্টারের (Manchester) কারখানা গ্যাসের আলোক-সজ্জায় সজ্জিত হইল।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াটের পরিকল্পনানুযায়ী একটি বাষ্পীয় যন্ত্র পরিচালিত করিয়া চালাইবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু নানা কারণে তাহা সাফল্য মণ্ডিত হয় নাই। এদিকে পরীক্ষার দ্বারা যখন মোরডক্ সাহেব দেখিলেন যে কয়লা-গ্যাসের দ্বারা ঘর আলোকিত হইতে পারে, তখন সেই কথা তিনি যখন বন্ধু-বান্ধবের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা তাহাকে উপহাস করিয়াছিলেন। নিজে অর্থশালী ছিলেন না, পেটেণ্ট লইয়া নিজে এই নূতন বিষয় প্রচলিত করিবার ক্ষমতা তাহার ছিলনা, সে জন্য তিনি নিরুপায় হইয়া নিজেই যে ভাবে গ্যাসের আলো প্রচলন করেন সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আজ ইহার ঘর, কাল তাহার কারখানা, তিনি গ্যাস দ্বারা আলোকিত করিয়া পরে সফলতা লাভ করেন।
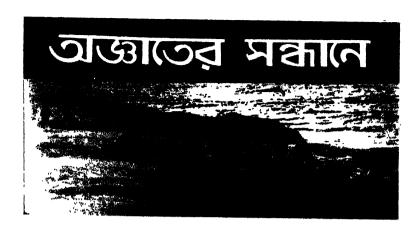
দক্ষিণমেরু অভিযান

আমেরিকার অভিযাত্রী

৩৪৮৪ পৃষ্ঠার পর

রেনল্ডস্ [J. N Reynolds] নামে আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক একবার পামারল্যাণ্ড নামক স্থানে পর্য্যন্ত যাইয়া সেখান হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া একবার দক্ষিণমেরু অভিযান প্রেরণের জন্য আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ১৮৩৬ সালে এরূপ এক অভিযান মঞ্জুর হইল কিন্তু নানা প্রকার বাদ-বিসম্বাদ এবং দলাদলি সৃষ্টি হওয়ার ফলে রেনল্ডস্ এই অভিযানে যাইবার অনুমতি পাইলেন না। একে একে কয়েক জন যাইতে অস্বীকার করিবার পর ল্যাফটেনাণ্ট চার্লস উইলকিস্ নামে একজন সাহসিক ব্যক্তি এই অভিযানের অধিনেতার পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তাঁহার প্রতি এইরূপ আদেশ রহিল যে টেরাডেলফিউগো (Terraadel Fuego) নামক স্থানে বড় জাহাজগুলি এবং বৈজ্ঞানিকদিগকে রাখিয়া তিনি মাত্র একখানা জাহাজ লইয়া মেরু প্রদেশের অভিমুখে যাত্রা করিবেন। উইলকিস্ যতদূর সম্ভব ওয়েডেল সাহেবের পথ অনুসরণ করিয়া মেরু অভিমুখে অগ্রসর হইবেন কিন্তু সাবধান যেন সেখানে শীত-ঋতু অতিবাহিত করিতে না হয়। তারপরে তিনি সমস্ত বাহিনী লইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম-অভিমুখে অভিযানকারী ক্যাপ্টেন কুকের শেষ সীমা পশ্চিম দ্রাঘিমা পর্য্যন্ত গিয়া ভ্যালপারিসো (Valpariso)তে ফিরিয়া আসিবেন। প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যটন করিয়া তাঁহারা সিড্‌নীতে যাইবেন, পরে দ্বিতীয় অভিযানে বাহির হইয়া দক্ষিণ মেরু প্রদেশে প্রবেশ করিবেন এবং পশ্চিম দিকে ৪৫°০ পশ্চিম দ্রাঘিমা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিবেন।

উইলকিসের প্রতি আর একটি অত্যন্ত কঠোর আদেশ ছিল যে অভিযানের কোন ব্যক্তি অন্য কাহাকেও অভিযান সম্পর্কীয় কোন প্রকার বিবরণ বা মানচিত্র বা অন্য কোনও কিছু দিতে পারিবেন না। অভিযানের জাহাজগুলি ভাল অবস্থায় ছিল না, জিনিষ-পত্র ছিল অপ্রচুর এবং অপকৃষ্ট। অভিযানের নাবিক এবং কয়েকজন উচ্চ কর্ম্মচারীরাও তাঁহাদের অধিনেতাকে পছন্দ করিতেন না, ফলে উইলকিসের পক্ষে ব্যাপারটা খুবই অস্বস্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহাদের ওয়েডেল সমুদ্রেতে যাওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। একখানা জাহাজ ৬৮° এবং আর একখানা ৭০° দক্ষিণ অক্ষরেখা পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিল কিন্তু

স্যার জন রস্—১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইনি দক্ষিণমেরু অভিযানে যাত্রা করেন

তাহারা বরফক্ষেত্র ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান নাই।

পৃথিবীতে এমন এক শ্রেণীর লোক দেখা যায় তাঁহাদের প্রতি কেন যেন অদৃষ্ট সদাই অপ্রসন্ন থাকেন উইলকিসের ও তাহাই হইল। সিড্‌নিতে অবস্থান কালে সেখানকার যত লোক তাঁহাদিগকে দেখিতে

জেমস্ ওয়েডেল্ (James Weddell) ১৭৮৭-১৮৩৪ ইঁহার নামানুসারে ওয়েডেল সমুদ্র, ওয়েডেল সীল প্রভৃতি নাম হইয়াছে। ইনি সাউথ সেটল্যাণ্ড দ্বীপের (South Shetland) জরিপ করেন

আসিলেন সকলেই তাঁহাদের জাহাজ এবং সাজ-সরঞ্জাম সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রতিকূল সমালোচনা করিতে
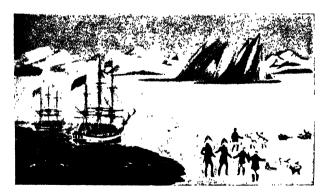
১৮১৮ খৃঃ অঃ ক্যাপ্টেন রসের দক্ষিণমেরুতে প্রথম অভিযান

লাগিলেন। ক্রমে উইলকিস্ এতই উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন যে তাঁহার বিবরণে আছে যে তিনি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে বাধ্য হইলেন যে তাঁহারা এইরূপভাবে অভিযানে বাহির হইয়া সত্যসত্যই অত্যন্ত অবিবেচকের কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু উইলকিস্ কি করিবেন? তিনি যখন আদেশ পাইয়াছেন তখন তাঁহাকে যাইতেই হইবে। যথা সময়ে তাহারা অভিযানে বাহির হইলেন।

১৮৪০ সালের ১৬ই জানুয়ারী তাঁহারা দূর হইতে প্রায় ১৫৮' পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় তীরভূমি দেখিতে পাইলেন--দক্ষিণ-মেরু বৃত্তের উপরে অথবা আর একটু দক্ষিণে ক্রমে তাহারা বরফ ঢাকা পাড়ের ধারে ধারে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই সশঙ্ক ছিলেন যে পাছে ফরাসীরা এই প্রদেশে আসিয়া তাঁহাদের পূর্ব্বেই কোন কিছু আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। ডুমোঁ ডারভিল যে পূর্ব্ব বৎসরই এসব স্থলে আসিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহাদের জানা ছিল না। ১৯শে জানুয়ারী দক্ষিণমেরুবৃত্তের দক্ষিণ-পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে তীরভূমি দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে—ইহার উচ্চতা অনুমান করা হইয়াছিল ৩০০০ ফুট। সময়টা ছিল অতি ভীষণ। ভাসমান বরফ, বরফ পর্ব্বত, ঝড়-তুফান এবং কুয়াসার দরুন জাহাজ চালান অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল। এক খানা জাহাজের হাল ভাঙ্গিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত বরফের মধ্যে আটকা পড়িয়া রহিল। তাঁহার নিজের জাহাজ এই সময় (২৩শে জানুয়ারী) দক্ষিণ মেরুবৃত্তের দক্ষিণ ভাগে যাইয়া পৌঁছিল, তিনি আশা করিতেছিলেন যে তীরভূমি পর্য্যন্ত যাইয়া পৌঁছিতে পারিবেন কিন্তু বরফে তাঁহার পথরোধ হইল। ২৮শে তারিখে ১৪১' পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় তীরভূমি

দক্ষিণ মেরুর আকাশ

ভিক্টোরিয়াল্যাণ্ডের নিকটবর্ত্তী স্থানের শোভন দৃশ্য। আকাশে পাখীর শাদা পালকের ন্যায় বিচিত্র বর্ণের মেঘমালা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এই মেঘমালার দৃশ্য অতি মনোরম। দক্ষিণমেরু এ স্থান হইতে ৬৫০ মাইল দূরে অবস্থিত।

রস্ বরফ প্রাকার

দক্ষিণমেরুর সুবিখ্যাত রস্ বরফ প্রাকার—পর্ব্বত শ্রেণীর মত ব্যাপক ভাবে বিরাজিত রহিয়াছে। ইহার নাম রস্ বরফের প্রাচীর, কেননা স্যার জেমস্ রস্ 'এরিবাস্' এবং 'টেরার' নামক জাহাজে ১৮৪০ এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণমেরু প্রদেশে যাইবার সময় ইহা আবিষ্কার করায় তাঁহার নাম হইতেই ইহার নামকরণ হইয়াছে

পরিষ্কার দেখা গেল কিন্তু উইলকিসের জাহাজ তীব্র বায়ু-প্রবাহের জন্য যথাস্থানে পৌছিতে পারিল না। দুই দিন পরে তাঁহারা তীরভূমির দক্ষিণ অক্ষরেখা ৬৬ ৪৫´, পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ১৪৮´´২ স্থলে আসিলেন। সাগরের গভীরতা এস্থলে ৩৮ ফ্যাদম (Fathom) মাত্র ছিল। জাহাজ হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে উন্মুক্ত প্রস্তরাকীর্ণ পর্ব্বত, পশ্চাতের পর্ব্বত সমূহ ৩৯০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ। আকাশ, বাতাস এবং সাগরের বিপর্য্যয় অবস্থার দরুন তাঁহারা নৌকা ভাসাইতে পারিলেন না কাজেই তীরেও যাইতে পারিলেন না। এই তীরভূমিই Adelie Land, মাত্র নয় দিন পূর্ব্বে D'urirlle এই স্থানে পদার্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। উইলকিসের অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ সকলেই আর অগ্রসর হইতে আপত্তি করিতে লাগিলেন। অভিযানের সঙ্গী ডাক্তারেরা লিখিত প্রতিবাদে প্রকাশ করিলেন যে এরূপ স্থানে এবং এরূপ দুর্য্যোগের অবস্থার মধ্যে আরও অধিক দিন কার্য্য করিতে থাকিলে হয়ত এত অধিক লোক অসুস্থ হইয়া পড়িবে যে তখন জাহাজগুলিই বিপন্ন হইয়া পড়িবে। কিন্তু দুঃসাহসিক উইলকিস্ কাহারও কথা মানিলেন না।

তিনি ক্রমাগত পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উইলকিস্ এ সময়ে প্রায় প্রতিদিনই দক্ষিণমেরু বৃত্তের সন্নিকটে তীরভূমির দর্শন লাভ করিতে লাগিলেন; অনেক স্থলে মৃত্তিকা-রঞ্জিত বরফের বড় বড় চাপ দেখিলেন এবং ভাসমান বরফ সমূহ হইতে প্রস্তরের নমুনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী বরফাবৃত তীরভূমি ঘুরিয়া উত্তরাভিমুখী হইলে দূরে এক স্থলে মৃত্তিকাময় তীরদেশ দেখা গেল বলিয়া বোধ হইল, উইলকিস্ ইহাকে শেষ-প্রান্ত-ভূমি বলিয়া আখ্যাত করিলেন। তিনি ৯৭° ৩৭' পূর্ব্ব-দ্রাঘিমায় ছিলেন, আর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে না পারায়

দক্ষিণ মেরুসাগর-বুকে বরফের পাহাড়

তাঁহার ২১শে তারিখে পুনরায় উত্তর দিকে যাইতে হইয়াছিল। এই অভিযানেরই 'Porpoise' নামক জাহাজ পূর্ব্বদিক হইয়া একটু ঘুরিয়া যাইবার সময় পথে ডুরিলের জাহাজের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করে।

উইলকিস্ যেরূপ অসুবিধা এবং নানা মত বিরোধিতার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার খুবই কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ অভিযান

স্যার এডওয়ার্ড স্যাবিন (Sir Edward Sabine) এবং বিলাতের অন্যান্য পদার্থ-বিদ্ বৈজ্ঞানিকেরা দক্ষিণ মেরু প্রদেশে পার্থিব চুম্বক শক্তি (Terrestrial Magnetism) সম্বন্ধে গবেষণার অভিপ্রায়ে বিলাত হইতে একটা অভিযান প্রেরণের জন্য ১৮২৫ খৃঃ অঃ হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহারা প্রথমে Royal Societyর সহায়তায় উক্ত কার্য্যে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরে ১৮৩৭ সালে রাজকীয় ভৌগোলিক সমিতির সহায়তা লাভেও ব্যর্থকাম হইলেন। পর বৎসর তৎকালে প্রতিষ্ঠিত British Association for the Advancement of Science সভা হইতে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে বিশেষ করিয়া দূরতর দক্ষিণ-মেরু-প্রদেশে একই সময়ে পর্য্যায়ক্রমে কতকগুলি Magnetic পরীক্ষা করিয়া তথ্য সংগ্রহের আবশ্যকতা সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করা হইল। প্রধান মন্ত্রী লর্ড মেলবোর্ণ (Lord Melbourne) ব্যাপারটার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া ইহার প্রতি রয়েল সোসাইটির দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, তখন রয়েল সোসাইটিও এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। এইরূপে এক অভিযান প্রেরণ করা স্থির হইল। এই অভিযানের অধিনেতা মনোনীত হইলেন ক্যাপ্টেন জেমস ক্লার্ক রস্ (Capt. James Clark Ross); ইনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ মেরু-পর্য্যটক এবং Magnetism সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন এবং গবেষণা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ১৮৩১ সালে North Magnetic Poleএ গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। রস্ সাহেব যে শুধু এই কার্য্যের জন্য বিশেষ ভাবে উপযুক্ত ছিলেন তাহা নয় তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব কর্ত্তৃপক্ষকে এই অভিযান প্রেরণে অনেকটা উৎসাহিতও করিয়াছিল। 'এরিবাস্' এবং 'টেরার' নামে দুই খানা জাহাজ বিশেষ ভাবে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদির দ্বারা যতদূর সম্ভব জতার সহিত সুসজ্জিত করিয়া দেওয়া হইল। এই দুই খানা জাহাজ যদি ও এরূপ কার্য্যের জন্য মোটেই উপযুক্ত ছিল না তথাপি মেরু অভিযানের

জেমস্ ক্লার্ক রস্ (১৮০০-১৮৬২ খৃঃ অঃ) ১৮৩১ খৃঃ অঃ North Magnetic Pole আবিষ্কার করেন এবং 'এরিবাস্ ও টেরার' নামক নিজের জাহাজের নাম অনুসারে দুইটি আগ্নেয় গিরির নামকরণ করেন

ইতিহাসে এই জাহাজ দুই খানার নাম অমর হইয়া রহিয়াছে। দ্বিতীয় জাহাজ 'টেরারের' নায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন ক্রোজিয়ার (Capt Crozier)। এই অভিযানে আর একজন এমন ব্যক্তি ছিলেন যিনি পরে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে জগৎ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন—ইনি স্যার জোশেফ হুকার। অভিযানের নেতা রস্এর প্রতি কর্ত্তাদের কোনরূপ নির্দেশ ছিল না তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনা এবং স্বাধীন মতের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। তাঁহার প্রতি আদেশ রহিল যে তিনি সেন্ট হেলেনা (St. Helena,) উত্তমাশা অন্তরীপ

(Cape of Good Hope) এবং (Van Damien's Land) ভ্যান ড্যামিয়ন ল্যাণ্ড এ magnetism সংক্রান্ত পরীক্ষার জন্য এক এক দল বৈজ্ঞানিককে নামাইয়া রাখিয়া যাইবেন। কারগুয়েলেন ল্যাণ্ড হইতে দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া যে যে স্থানে ভূভাগ দেখা গিয়াছে বলিয়া উল্লেখ আছে সে স্থানেও অনুসন্ধান করিবেন। তৎপরে গ্রীষ্ম ঋতুতে ট্যাসমেনিয়া হইতে দক্ষিণ দিকে রওনা হইয়া South Magnetic Pole এ গিয়া পৌঁছিতে চেষ্টা করিবেন এবং পরে ট্যাসমেনিয়াতে ফিরিয়া আসিবেন। পর বৎসর তিনি যতদূর পারেন দক্ষিণ-মেরু অভিমুখে অগ্রসর হইবেন এবং পরে পূর্ব্ব দিকে গিয়া থাকিবার মত স্থানের ব্যবস্থা করিয়া আসিবেন।

১৮৪০ সালের আগষ্ট মাসে জাহাজ দুইখানা আসিয়া হোবার্টএ উপনীত হইল। এই সময় ফ্র্যাঙ্কলিন ছিলেন ভ্যানড্যামিনিরিসের শাসনকর্ত্তা। ইনি একজন বিখ্যাত উত্তর মেরু পর্য্যটক।

ডেনিসন্ অন্তরীপ

এই স্থানে অনেকবার দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কারকের' শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এখান হইতে 'অরোরা' বা মেরুজ্যোতিঃর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়

হোবার্টএ আসিয়া রস্ যখন শুনিলেন যে ডুরভিল এবং উইলকিস্ তাঁহারই গন্তব্য পথে অভিযান করিয়া গিয়াছেন তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং স্থির করিলেন যে তাঁহারা আর উহাদের আবিষ্কারে ব্যাঘাত জন্মাইবেন না; ফলে এই হইল যে ভারতমহাসাগরের দক্ষিণের এই সকল স্থান সমূহ বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্তও অনাবিষ্কৃত রহিয়া গেল।

রস্ এইরূপে তাঁহার যাত্রাপথ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়া নূতন পথে অগ্রসর হইলেন। এই নূতন পথেই তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল। ক্যাপ্টেন রস্ ও তাঁহার সহযাত্রিগণ ১২ই নভেম্বর হোবার্ট হইতে রওনা হইয়া ৩১শে ডিসেম্বর দূর হইতে দক্ষিণ মেরুর বরফে ঢাকা তীর দেখিতে পাইলেন। এই বরফক্ষেত্রের মধ্যে স্থানে স্থানে নদী বা খালের মত জলপথ ছিল। তাঁহারা কয়েকদিন এদিক ওদিক ঘোরা ফেরা করিয়া চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, পরে ১৮৪১ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে সুবিধামত একটা প্রণালী-পথে প্রবেশ করিলেন। এ পর্য্যন্ত সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে এই বরফক্ষেত্র সুদূরে কোন দূর তীরভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত কাজেই কেহই সেই অজানা বরফক্ষেত্রের দেশে প্রবেশ করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু রস্ দমিবার বা কোন কিছুতেই নিরাশ হইবার মত লোক ছিলেন না। তিনি নির্ভীকতার সহিত সেই বিস্তৃত বরফক্ষেত্রের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন এবং চারিদিনের মধ্যে এই বরফক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া এক উন্মুক্ত সাগরে আসিয়া পড়িলেন। এই সাগরই যথাকালে তাঁহার নাম অনুসারে রস্‌সাগর নামে আখ্যাত হইল।

ঐ বরফক্ষেত্রের প্রশস্ততা ছিল মাত্র ১০০ এক শত মাইল। এই স্থান হইতে Magnetic pole পর্য্যন্ত পথ উন্মুক্ত বলিয়া বোধ হইয়াছিল কিন্তু দিকচক্রবালে এক পর্ব্বত রেখা দেখা গেল। রস্ এই

অভিযানের প্রধান উদ্যোক্তার নাম অনুসারে ইহাকে মাউন্ট স্যাব্রাইন বলিয়া আখ্যাত করিলেন। তিনি ১১ই জানুয়ারী দক্ষিণ ভিক্টোরিয়া ল্যাণ্ডএর পার্ব্বত্যভূমির কয়েক মাইলের মধ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার সম্মুখে এ্যাডারি অন্তরীপ ৭১° দক্ষিণ অক্ষরেখায় অবস্থিত দেখা যাইতেছিল। এই স্থান হইতে এক পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার নাম এড্‌মিরালিটি রেঞ্জ আর এক পর্ব্বত তীরের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাভিমুখে বিস্তৃত দেখা গেল। রস্ এই পর্ব্বত শ্রেণীর নামকরণ করিলেন Royal Society এবং রাজকীয় ভৌগোলিক সভার সভ্যদের নাম অনুসারে। তিনি ১২ই জানুয়ারী পজেসিয়ান দ্বীপে যাইয়া তীরভূমিতে পদার্পণ করিলেন এবং ইহার স্বত্বাধিকার গ্রহণ করিলেন—এই ভূভাগই ভিক্টোরিয়া রাজত্বে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এই স্থানে সাগর বক্ষে অসংখ্য তিমি মৎস্য দেখিয়া মনে করিলেন যে এখানে তিমি মৎস্যের প্রকাণ্ড একটা ব্যবসায় গড়িয়া উঠিতে পারে। ২২শে জানুয়ারী তারিখে তাঁহারা ৭৪ দক্ষিণ অক্ষরেখা ছাড়াইয়া গেলেন এবং দক্ষিণাভিমুখে এ পর্য্যন্ত যত অভিযান আসিয়াছে শীঘ্রই তাঁহাদের সকলকে অতিক্রম করিয়া কিছুদিন পরেই এই অভিযানকারীর দল ফ্রাঙ্কলিন দ্বীপে আসিয়া পৌছিলেন। এই দ্বীপে উদ্ভিদাদির কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। ২৮শে জানুয়ারী সকাল বেলা সম্মুখের দিকে একটি পর্ব্বত দেখা গেল—পর্ব্বতের শিখর হইতে ধোঁয়া বাহির হইতেছিল; অভিযানের প্রধান জাহাজের নাম অনুসারে এই আগ্নেয়গিরির নাম হইল মাউন্ট এরিবাস্ আর একটি—অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আগ্নেয়-গিরিও দেখা গেল এবং তৎকালে উহা নিষ্ক্রিয় ছিল। অভিযানের দ্বিতীয় জাহাজের নাম অনুসারে উহার নাম হইল (Mount Terror) আরও কিছুদূরে অগ্রসর হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন সম্মুখে এক বিশাল বরফের প্রাচীর পাহাড়ের মত মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। উহা ক্রোজিয়ার অন্তরীপের দিকে পূর্ব্বাভিমুখে বিস্তৃত। ইহাই দক্ষিণ মেরু যাত্রীদের নিকট Great Ice Barrier নামে পরিচিত—এই খানে আসিয়াই সকল অভিযানের পথ রোধ হইয়াছে। তাঁহারা ইহার সমান্তরালভাবে ১৫০ মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। সকলেই উহার উচ্চতা এবং উপরিভাগ সমতলক্ষেত্রের ন্যায় বিস্তৃত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সমুদ্রসমতা হইতে ইহার গড় উচ্চতা প্রায় ২০০ ফুট।

২রা ফেব্রুয়ারী তাঁহারা এই অভিযানের সর্ব্ব দক্ষিণ স্থানে আসিয়া পৌছিলেন। দুইদিন পরে ১৬৭° পশ্চিম দ্রাঘিমায় আসিবার পর বরফে তাঁহাদের পথ বন্ধ হইল। আরও পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইবার জন্য রস্ এক সপ্তাহ কাল চেষ্টা করিলেন কিন্তু ব্যর্থকাম হইয়া তিনি ভিক্টোরিয়া ল্যাণ্ড অভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন—। সেখানে শীত ঋতু অতিবাহিত করিবার জন্য সুবিধা মত কোনও স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না তাহাই ছিল তাঁহার দেখিবার উদ্দেশ্য। পথে মুর্ডো উপসাগর ছাড়িয়া গেলেন, সেখানে নামিয়া আর কোন প্রকার অনুসন্ধান

স্যার জন ফ্রাঙ্কলিনের দক্ষিণ মেরু-অভিযান—১৮১৯ ২২ খৃঃ অঃ
ছবিতে দেখিতে পাইবে কিরূপ অদ্ভুত আকারের নৌকার সাহায্যে জিনিষ পত্রাদি এক হইতে অন্য স্থানে নিতে হয়। এই স্থান অত্যন্ত সঙ্কটজনক ছিল

করিলেন না ; তাঁহার চেষ্টা ছিল Magnetic pole এর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অবতরণ করিবার চেষ্টা করা। রস্ ১৮৩১ সালে উত্তর ম্যাগনেটিক পোলে ব্রিটিশ-পতাকা উত্তোলন করিয়া আসিয়াছিলেন। এইবার ১৮৪১ সালে তিনি দক্ষিণ ম্যাগনেটিক পোলে ও পতাকা প্রোথিত করিবার জন্য যে একটা দুর্দ্ধর্ষ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তীর ভূমি হইতে কতকদূর পর্য্যন্ত সাগর জল কমিয়া যাওয়াতে তাঁহারা তীর হইতে ১২।১৪ মাইল তফাতে থাকিতে বাধ্য হইলেন এখানে মাউন্ট মেলবোর্ণের নিম্নভূমিতে যে অন্তরীপ দেখা গেল, উদ্যোগী কর্ম্মসচিবের নাম অনুসারে তাহার নাম করণ করিলেন (Cape Washington) এখান হইতে পুনরায় দক্ষিণ দিকে গিয়া কোন পোতাশ্রয়ের অনুসন্ধান করিবার আর সময় তাঁহার ছিল না বলিয়া রস্ ৬৩ দিন দক্ষিণ ভাগে অতিবাহিত করিয়া অগত্যা এই প্রদেশ ছাড়িয়া গেলেন এবং ১৮৪১ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখে হোবার্ট ফিরিয়া আসিলেন। তিন মাস পরে এই সংবাদ ইংল্যাণ্ডে পৌঁছিবামাত্রই রাজকীয় ভৌগোলিক সমিতি ক্যাপ্টেন রসকে আবিষ্কারকের গৌরবজনক স্বর্ণপদক (Founder's Gold Medal, নামক স্বর্ণ-পদক প্রদান করেন।

১৮৪১ সালের ২৩শে নভেম্বর 'এরিবাস' এবং 'টেরার' দ্বিতীয়বার অভিযানে বাহির হয়। এইবার তাঁহারা নিউজিল্যাণ্ড হইতে রওনা হইলেন যেন গতবার যে স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবার যেন Great Ice Barrier এর আরও পূর্ব্বাভিমুখে গিয়া পৌঁছিতে পারেন। ১৮ই ডিসেম্বর যাত্রীদল ৬০° দক্ষিণ অক্ষরেখা এবং ১৪৬০ পশ্চিম দ্রাঘিমায় বরফের রাজ্যে প্রবেশ করিলেন।

১৮৪২ সালের ১লা জানুয়ারী তাঁহারা দক্ষিণমেরু-বৃত্তে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহারা ক্রমাগত এদিক-ওদিক করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। ১৮ই জানুয়ারী ঝড়ের বেগে জাহাজ দুইখানা খুবই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ২৬শে জানুয়ারী তাঁহারা যে স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন সে স্থান ক্যাপ্টেন কুকের সীমা হইতে মাত্র ৩৯ মাইল দূরে অথচ তাঁহারা বিগত ৩৯ দিনে বরফের রাজ্যে ৮০০ মাইল পথ অতিবাহিত করিয়াছেন, আর কুক্ ৬৮ বৎসর পূর্ব্বে এই দ্রাঘিমাতেই বরফের রাজ্যে প্রবেশ মাত্রও করেন নাই। ২রা ফেব্রুয়ারী তাঁহারা ১৫৯° পূর্ব্ব দ্রাঘিমা এবং দক্ষিণমেরুবৃত্ত হইতে দক্ষিণ ভাগে বরফের রাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পূর্ব্বে সেই বিরাট বরফ প্রাকার দেখা যায় নাই। ২৮শে তারিখে তাঁহারা

কৃষ্ণবর্ণের বরফ শৈল

ঘন কালো রংএর বরফের চাপটি দক্ষিণ মেরুর এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। এইটি এণ্ডারবি ল্যাণ্ড হইতে প্রায় ৮০০ শত মাইল উত্তরে দেখা গিয়াছিল

বরফ প্রাচীর হইতে ১১ মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। এখানে জলের গভীরতা ২৯০ ফ্যাদম ছিল। পর্ব্বত প্রাকারের সর্ব্বোচ্চ অংশ ১০৭ ফুট উচ্চ। ইহাই রস্ এর দক্ষিণ সীমা—ওয়েডেলের সীমা হইতে ৩'৫৫ অথবা এই স্থান হইতে ৭১০ মাইল দূরে! এস্থান হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে দূরে রস্ দেখিতে পাইলেন যে বরফ প্রাকার ক্রমশঃই উচ্চ হইয়া পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়াছে কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ অভাবে তিনি ইহাকে ভূভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না; তাঁহার মানচিত্রে ইহাকে appearance of Land বা জমির চিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। রস্ ভিন্ন অন্য যে কোন ব্যক্তিই উহাকে ভূ ভাগ বলিয়া আখ্যাত করিয়া তাহা আবার কোন একটা নামে অভিহিত করিতেন। রস্ এখানকার সাগর-গর্ভ হইতে যে সকল প্রস্তরাদির নমুনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন

রস্ প্রাকারের সম্মুখে ক্যাপ্টেন স্কটের জাহাজ

তাহাদের যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে পারিলে তিনিও নিশ্চিন্ত মনে ইহাকে ভূ-ভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন।

এখন দক্ষিণ দেশ ছাড়িয়া যাইবার সময় হইল। এবারকার যাত্রা পূর্ব্ববারের অপেক্ষা খুবই বেশী কষ্টকর হইয়াছিল কিন্তু বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। এইবার ভিক্টোরিয়াল্যাণ্ড তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ৬ই মার্চ্চ তাঁহারা দক্ষিণমেরুবৃত্ত পার হইয়া উত্তরাভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা মোটের উপর ৬৪ দিন এই মেরুবৃত্তের ভিতরে ছিলেন। ইহার পরে অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে আর কেহ রস্ সাগরে আসেন নাই। উন্মুক্ত সাগরে আসিয়া তাঁহারা পূর্ব্ব দিকে মুখ করিয়া ফকল্যাণ্ড দ্বীপাভিমুখে

ব্যারণ নোদেনশিয়োল্ড ১৮৩২-১৯০১ খৃঃ অঃ
১৮৭৮-১৮৮০ খৃঃ অঃ মধ্যে উত্তর পূর্ব্ব পথে দক্ষিণমেরুর দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহার সেই অভিযান বিশেষ বিখ্যাত

রওনা হইলেন। এই সময় এ দ্বীপ ইংরাজদের অধিকারে আসিয়াছিল। এই যাত্রায় একদিন বিষম বিপদ উপস্থিত হইল, রাত্রিতে প্রবল বায়ু এবং তুষার ঝটিকার মধ্যে তাঁহাদের জাহাজ পড়ায় এবং একটা বরফ শৈলকে সামাল দিতে গিয়া দুই জাহাজ প্রবল বেগে প্রতিহত হইল। তাঁহারা সকলেই সলিল-সমাধি প্রাপ্তির আশঙ্কা করিতেছিলেন কিন্তু অবশেষে এই বিপদও কাটিয়া গেল এবং ১৮৪২ সালের ৫ই এপ্রিল তাঁহারা নিরাপদে লুই বন্দরে আসিয়া উপনীত হইলেন।

রস্ দক্ষিণ মেরু-অভিযানে তৃতীয় বার গ্রীষ্ম-ঋতু অতিবাহিত করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। তিনি ১৮৪২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ফকল্যাণ্ড দ্বীপ হইতে রওনা হইলেন; তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে

তিনি ডুরিলের আবিষ্কৃত তীরভূমি জরীপ করিয়া এবং তীরভূমি ধরিয়া ধরিয়া ওয়েডেল সাগরে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। কিন্তু কার্য্যকালে তিনি দক্ষিণে উন্মুক্ত পথ পাইলেন না এবং বরফের তীর ঘুরিয়া অগ্রসর হইয়া ১৮৪৩ সালের ১লা মার্চ্চের পূর্ব্বে মেরুবৃত্তে পৌছিতে পারিলেন না। তারপরে দক্ষিণ দিকে উন্মুক্ত সাগরে অগ্রসর ৭১°৪০' দক্ষিণ অক্ষরেখা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এই স্থান বেলিংসামসেন্ (Bellingshamsen) ১৮২০ সালে এবং ওয়েডেল (১৮২৩ সাল) যে যে স্থলে পৌছিয়াছিলেন সেই দুই স্থানের প্রায় মধ্যপথে অবস্থিত। এইখানেই রস্ এর দক্ষিণ মেরু অভিযান সমাপ্ত হইল। এই স্থান হইতে তিনি ক্যাপ টাউনে (Cape Town) ফিরিয়া আসিলেন।

স্যার জন ফ্রাঙ্কলিন্—১৭৮৬-১৮৫৭

রসের এই তৃতীয়বারের অভিযানে তাঁহার অসামান্য কষ্ট করিতে এবং দেহের ক্লেশ যে তাঁহার কতদূর হইয়াছিল তাহা বলিয়া বুঝান চলে না। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট রসের এই অসাধারণ আবিষ্কারের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি স্যার (Knight) উপাধিতে ভূষিত হন এবং বহু সংখ্যক স্বর্ণপদক পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হন। পরে তাঁহারই পূর্ব্ব-পরিচিত দুই জাহাজ লইয়া আবার, তাঁহাকে (Erebus এবং Terror) উত্তর পশ্চিম মেরুপথ আবিষ্কারে যাইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। তিনি স্বীকৃত না হওয়াতে অগত্যা স্যার জন ফ্রাঙ্কলিন (Sir John Franklin) কে ঐ কার্য্যের ভার দেওয়া হয়। ফ্রাঙ্কলিনের অভিযান-কাহিনীও সর্ব্বজনবিদিত—সে এক স্বতন্ত্র ইতিহাস।

রস্ এর প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরেই তাঁহারই একজন সহকারী ল্যাফটানেণ্ট মুর (Lt. Moore.) R N. কে পাঠান হয় Magnetic তথ্য সংগ্রহের জন্য। তিনি ১৮৪৫ সালের ৯ই জানুয়ারী রওনা হইয়া ৬৭°৫০' দক্ষিণ অক্ষরেখা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অভিযানেরও শেষ ফল ৬৪° অক্ষরেখা এবং প্রায় ৫০° পর্ব্ব দ্রাঘিমা পর্য্যন্ত।

১৮৫০ সালে এণ্ডারবি (Enderby) নামক একখানা জাহাজে ক্যাপ্টেন টেপসেল (Capt. Tapsell) সীল মৎস্যের অনুসন্ধানে দক্ষিণাভিমুখে উইলকিসের শেষ সীমা ছাড়াইয়া বহুদূর গিয়াও কোন ভূ ভাগ দেখিতে পান নাই।

স্যার জন্ ফ্র্যাঙ্কলিনের অভিযান

এইবার স্যার জন্ ফ্র্যাঙ্কলিনের অভিযানের কথা বলিতেছি। ফ্রাঙ্কলিনের এই অভিযানের সঙ্গী হইয়াছিলেন ক্রোজিয়ার (Crozier), ফিট্জ জেমস (Fitz James) এবং কয়েকজন তরুণ-নৌ কর্ম্মচারী। ১৮৪৫ খৃঃ অঃ গ্রীষ্ম ঋতুতে জাহাজ দুইখানি দক্ষিণমেরুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। তাঁহারা যাত্রা করিবার সময় মনের মধ্যে এই কথাটিই দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতেছিলেন যে তাঁহাদের এই অভিযান নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হইবে।

যাত্রার পর একবৎসর কাটিয়া গেল। ১৮৪৬ সালেও যখন অভিযাত্রীদলের নিকট হইতে কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, তখন তাঁহাদের সংবাদ লইবার জন্য নূতন একদল অভিযানকারীকে ব্যাফিন উপসাগরের (Baffin Bay) দিকে পাঠানো হইল। তাঁহারা সেই বৎসরই অভিযানকারীদের কোনও সংবাদ না লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এই সংবাদে ইংল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়া গেল। অভিযাত্রীদের সম্বন্ধে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইল।

মাদাম কুরী

পৃষ্ঠার পর

“রসায়ন শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠতম মৌলিক গবেষণার জন্য পিয়ের কুরী ও মাদাম কুরীর কন্যা মাদাম ইরেন কুরী জোলিও এবং তাঁহার স্বামী মাঁসিয়ে জাঁ ফ্রেডারিক জোলিও ১৯৩৫ খৃঃ অঃ নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ১৯০৩ সালে বিশ্ববিশ্রুত কুরী-দম্পতি হেনরি বেকারেলের সহিত এক যোগে এই পুরস্কার পাইয়াছিলেন। পুনরায় ১৯১১ সালে একক মাদাম কুরীকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। এক মাত্র মাদাম কুরী ব্যতীত দ্বিতীয় বার এই পুরস্কার লাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।” বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র মাদাম কুরী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। মাদাম কুরী ব্যতীত কেহই নোবেল পুরস্কার দুইবার লাভ করেন নাই। এই জন্যই মাদাম কুরীর নাম বিজ্ঞান-জগতে চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে।
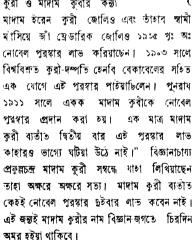
মাদাম কুরীকে তাঁহার ছাত্রেরা আদর করিয়া বলিত “Miss Professor !” তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ও বিদ্যার জন্যই তিনি এমন ভাবে ছাত্র ও ছাত্রীদের মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছিলেন।

মাদাম কুরীর জন্ম হইয়াছিল ওয়ারশ (War-saw) নামক সহরে। তাঁহার পিতা ডক্টর স্কোলদোয়াস্কি (Skoldowska) ওয়ার-শ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার ও গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। ম্যারি স্কোলদোয়াস্কা ১৮৬৭ খৃঃ অঃ ৭ই নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। অতি শৈশবেই ম্যারির মাতার মৃত্যু হয়। পিতা ডক্টর স্কোলদোয়াস্কি তাঁহাকে পরম স্নেহে পালন করিতে থাকেন। বাল্যকালে প্রতিনিয়ত তাঁহার পিতার গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও অনুসন্ধিৎসার মধ্যে প্রতিপালিত হওয়ায় তাঁহার মনে বাল্যকাল হইতেই বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ জন্মে।

সে সময়ে পোলদের উপর রুশের জারের ভীষণ অত্যাচার চলিত,—পোলেরা কি করিয়া জারের অত্যাচার হইতে দেশকে মুক্ত করিতে পারে, স্বাধীন হইতে পারে, তাহাই হইয়াছিল পোলদের একমাত্র চিন্তা। তখন পোলেরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, শিক্ষা ব্যতীত দেশের লোকেরা তাহাদের শোচনীয় দুর্দ্দশার কথা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। সেজন্য সে সময়ে পোল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সকলে

উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়াছিলেন। ম্যারি স্কোলদোয়াস্কা দেশের মুক্তিকামীদের সংস্রবে আসিলেন এবং এক বিদ্রোহী সঙ্ঘের সহিত যোগদান করিলেন। কথাটা গোপন রহিল না, তখন তিনি পুলিশের হাতে পড়িবার ভয়ে অতি তাড়াতাড়ি ওয়ারশ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ পোলাণ্ডের ব্র্যাকো (Bracow)

মাদাম কুরী

নামক সহরে আসিলেন। সেখান হইতে রুশ দেশে আসিয়া দেখিলেন যে রুশ-রাজসরকার পোলদের প্রতি বিরূপ, তখন তিনি রুশ ত্যাগ করিয়া আসিবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং এক রাত্রিতে এক বৃদ্ধার ছদ্মবেশে প্যারিসে আসেন।

প্যারিসে আসিয়া ম্যারি পড়িলেন মহা বিপদে, এখানে আপনার জন বলিতে কেহ ছিল না। এখানে একটি ক্ষুদ্র ঘর ভাড়া করিয়া অতি কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এ সময়ে তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত শুধু দুধ রুটী খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছেন। শিক্ষার দিকে তাঁহার এমনই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে প্যারিসে আসিয়া এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ গ্যাব্রিয়েল লিপ্‌ম্যান (Gabriel Lippman) এই তরুণী ছাত্রীর প্রতিভায় তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তাহার একটু কারণও হয়ত ছিল। কেন না তাহার পিতা ডক্টর স্কোলদোয়াস্কির সহিত লিপম্যানের ওয়ারশতে পরিচয় হইয়াছিল।

ম্যারির সহিত অধ্যাপক পিয়ের কুরীর (Piere Curie) মিলন একটা দৈব ঘটনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ম্যারি স্কোলদোয়াস্কার সহিত পিয়ের কুরীর উভয়ের এক বন্ধুর বাড়ীতে পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়ের ফলে উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরাগী হইলেন এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক পিয়ের কুরী ম্যারিকে বিবাহ করিলেন এবং সে দিন হইতেই উভয়ে এক সঙ্গে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন। অধ্যাপক সুৎজেন বার্জ্জার নামক একজন সহৃদয় অধ্যাপকের চেষ্টা ও যত্নে পিয়ের ও মাদাম কুরী এক গবেষণাগারে গবেষণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে রশ্মিবিকীরণের (Radio-activity) যেমন আবিষ্কার হইল, তেমনি বৈজ্ঞানিকগণ এই অদ্ভুত প্রাকৃতিক রহস্যটির কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের গবেষণার ফলে মানুষের পরমাণু সম্বন্ধে জ্ঞান স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে—ইহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা গিয়াছে যে পরমাণু একটি সরল পদার্থ নহে, পরন্তু বিশেষ জটিল।

রশ্মিবিকীরণের যখন আবিষ্কার হইল, তখন পিয়ের কুরী এবং মাদাম কুরীর দৃষ্টি এই দিকে বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ হইল। Radio Activityর আবিষ্কারের জন্য হেন্‌রি বেকারেলের (Henri Becquerel)এর নাম অমর হইয়া আছে। মাদাম কুরী রশ্মি-বিকীরণের আবিষ্কারের পর হইতে ঐ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য গবেষণা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহারা গবেষণার দ্বারা দেখিতে পাইলেন যে এমন অনেক খনিজ পদার্থ আছে যাহাদের মধ্যে উরনিয়াম (Uranium) ধাতু আছে। তাঁহারা উরনিয়াম হইতেও অত্যধিক পরিমাণে রশ্মি-বিকীরণ গুণ

বিশিষ্ট। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের পর হইতে কুরী-দম্পতি এই গবেষণা কার্য্যে নানা ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পিয়ের কুরী কখনও তাঁহার গবেষণার

পিয়েব কুরী-ও লর্ড কেলভিন বিখ্যাত রাসায়নিক হেলিয়াম (Helium) আবিষ্কারক স্যার উইলিয়ম র‍্যামজেকে আবিষ্কৃত রেডিয়াম প্রদর্শন করিতেছেন। স্যার উইলিয়াম কুরীদের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন।

গতি ভিন্ন দিকে পরিচালিত করিয়াছেন, কিন্তু মাদাম কুরী কখনও স্বীয় লক্ষ্যপথ হইতে বিচ্যুত হন নাই।

রেডিয়াম আবিষ্কার

অবশেষে সাধনার ফল ফলিল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কুরী দম্পতি রেডিয়াম আবিষ্কার করিলেন। তাঁহাদের এই আবিষ্কারের কথা চারিদিকে প্রচারিত হইল, কিন্তু তাহারা যে রেডিয়াম উৎপন্ন করিতে পারিয়াছিলেন তাহা অতি সামান্য মাত্র। রেডিয়াম উৎপন্ন করিতে যে পরিমাণ Pitchblende নামক খনিজ পদার্থের আবশ্যক তাহা অত্যন্ত দামী। গরীব কুরী-দম্পতি অত টাকা কোথায় পাইবেন? সৌভাগ্যবশতঃ ভিয়েনার বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান (Vienna Academy of Science) তাঁহাদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। ঐ প্রতিষ্ঠান হইতে কুরী-দম্পতি অনেক টন উক্ত খনিজ দ্রব্য উপহার পাইলেন। তাঁহারা ইহাতে অত্যন্ত উৎসাহিত হইলেন এবং ধন, মান, মর্য্যাদা এবং সংসারের সর্ব্বপ্রকার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া মাদাম দম্পতি দিনের পর দিন অক্লান্ত ভাবে গবেষণাগারে কার্য্য করিতে লাগিলেন, ঐ সময়ে পেতিট্ (Petite) নামে কুরীর গবেষণাগারের সহকারী ও বিশেষ ভাবে তাঁহাদিগকে সাহায্য করেন। দুই বৎসর অক্লান্ত শ্রম ও সাধনার বলে তাঁহারা আশানুরূপ ফল লাভে সমর্থ হইলেন।

উরেনিয়াম নামক (Uranium) পদার্থ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া মাদাম কুরী রেডিয়াম (Radium) বা "জ্যোতিষ্মান" আবিষ্কার করেন। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে পিয়ের কুরি রেডিয়ামের বোতলটি হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ফলে রেডিয়ামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি ঘরময় ছড়াইয়া পড়িল। এইরূপ ভাবে পড়িয়া গেলেও বিমর্ষ বা নিরাশ না হইয়া মাদাম কুরী ঘরময় ছড়ান সেই রেডিয়ামের কুচিগুলি ধূলিকণা হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া আবার রেডিয়াম আবিষ্কার করেন। এক টন বা ২৮ মণ উরেনিয়াম হইতে ১ গ্রেণ বা ১ রতি মাত্র রেডিয়াম পাওয়া গিয়াছিল।

এইরূপে কঠিন শ্রম ও গবেষণার দ্বারা রেডিয়াম্ আবিষ্কার করিয়াও কুরী-দম্পতির আর্থিক অবস্থার কোনও রূপ উন্নতি হয় নাই। প্যারিসে কোথাও অধ্যাপক হইবার সম্ভাবনা পিয়ের কুরির পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, কেন না গবেষণাগারের বাহিরে যে একটা জগৎ আছে, সেই জগতের সহিত তাঁহার পরিচয় অতি অল্পই ছিল।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে সুইট্‌জ্যারল্যাণ্ডের জেনেভা (Geneva) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পিয়ের কুরিকে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয় এবং মাদাম কুরিও তাঁহার সহযোগীরূপে নিযুক্ত হন—কিন্তু শেষবার তাঁহারা প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপকের পদলাভ করিয়া প্যারিসেই রহিয়া গেলেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে মাদাম কুরী অসাধারণ শ্রমের ফলে $\frac{1}{4}$ হইতে $\frac{1}{2}$ আউন্স পরিমিত রেডিয়াম প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিলেন।
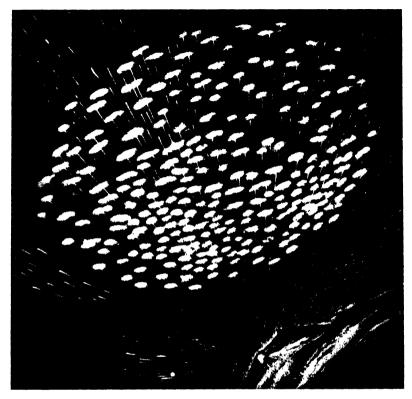
রেডিয়াম-রশ্মি

রেডিয়াম হইতে তিন প্রকার রশ্মি নির্গত হইয়া থাকে। প্রথমটি বিদ্যুৎ-শক্তিবিশিষ্ট আলফারশ্মি, (Alpha rays) দ্বিতীয়টি ঋণাত্মক বিদ্যুতকণা (Beta rays) এবং তৃতীয়টী সূক্ষ্ম তরঙ্গবার (Gamma rays) প্রকাশ পায়।

রেডিয়াম এমন অদ্ভুত তেজঃসম্পন্ন পদার্থ যে কাচের নলের ভিতর উহা রক্ষিত হয়, তাহার কাছে কিছু আনিলেই তাহা ধ্বংস হইয়া যায়। পিয়ের কুরী একবার সামান্য কয়েক মিনিটের জন্য তাঁহার বাহু রেডিয়ামের কাছে খোলা রাখায় তাহার বাহুর যে অংশ পুড়িয়াছিল তাহা শুকাইতে কয়েক মাস সময় লাগিয়াছিল। পিয়ের কুরী একবার কথা—প্রসঙ্গে বলেন যে যদি কোনও বড় ঘরের মধ্যেও এক কিলো-গ্র্যাম (Kilogramme) বা ২½ কিলোগ্র্যাম পর্য্যন্ত ওজনের রেডিয়াম থাকে তাহা হইলে সে ঘরের কাহারও জীবন রক্ষা পাইবেনা। মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলের মৃত্যু হইবে।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কুরী-দম্পতির পরিশ্রমের ও সাধনার পুরস্কার মিলিল। তাঁহারা নোবেল পুরস্কার লাভ করিলেন—৮,০০০ পাউণ্ড মুদ্রা বেকারেল ও কুরী দম্পতির মধ্যে সমভাগে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইল। এই পুরস্কার পাওয়ায় তাঁহাদের সাংসারিক অভাব বা দারিদ্র্য দূর হইয়া গেল।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের Royal Institution হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া কুরি-দম্পতি লণ্ডনে আসেন।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন্ (Lord Kelvin) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ কুরী-দম্পতিকে বিশেষ সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন। পিয়ের কুরী তাঁহাদের আবিষ্কার সম্পর্কে বক্তৃতা দেন, সেই সভায় ক্রুকস্ (Crookes), র‍্যামজে (Ramsay) ডিওয়ার (Dewar) অলিভার লজ (Oliver Lodge) জে, জে, টমসন (J. J. Thomson) রাদারফোর্ড (Rutherford) প্রমুখ ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ উপস্থিত ছিলেন। ইহার কয়েক মাস পরে Royal Society কুরী-দম্পতিকে ডেভিপদক দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৯০৪ খৃঃ French Chamber of Deputies—পিয়ের

রেডিয়াম ইন্‌ষ্টিটিউট লণ্ডন

কুরীর জন্য বার্ষিক ১৮,৭০০ ফ্রাঙ্ক পারিশ্রমিকে পদার্থ-বিদ্যার জন্য এক নূতন অধ্যাপক পদের সৃষ্টি করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে পিয়ের কুরী নির্ব্বিবাদে Academy of Science এর সদস্য পদ লাভ করেন। ফরাসীগণতন্ত্র এই ভাবে তাঁহাদের দেশের দুইজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিককে গবেষণার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজের ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। কুরী-দম্পতি সম্পূর্ণ আর্থিক চিন্তার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা আরও অনেক কিছু নূতন তথ্য আবিষ্কার করিবেন বলিয়া সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিলেন—সে সময়ে এক অতি শোচনীয় দুর্ঘটনায় পিয়ের কুরীর মৃত্যু হইল।

১৯০৬ সালের ১৯এ এপ্রিল বৈজ্ঞানিকগণের এক ভোজ সভা হইতে ফিরিবার সময় মোটর-দুর্ঘটনায় পিয়ের কুরীর মৃত্যু হইল।

পিস্ ব্লেণ্ড

এইরূপ শোচনীয় দুর্ঘটনায় স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় মাদাম কুরী কিছু দিনের জন্য একেবারে মৃত প্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার জীবন ও সংশয়াপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিছু কাল পরে তিনি মন স্থির করিয়া স্বামীর পদানুসরণ করিয়া আবার গবেষণাগারে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। ফরাসী গণতন্ত্র তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর পদে নিযুক্ত করিলেন—M Debierne নামে তাঁহার এক ছাত্র মাদাম কুরীর সহকারী রূপে নিযুক্ত হইলেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে—তাঁহার লিখিত, Treatise on Radioactivity নামক ১০০০

রেডিও-রশ্মি

পৃষ্ঠার এক বহি প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে কুরী-দম্পতির রেডিয়াম আবিষ্কারের সবিস্তার ইতিহাস লিখিত রহিয়াছে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় Radium Institute নামে একটি স্বতন্ত্র গবেষণাগার প্রস্তুত করিয়া তাহার সর্ব্ববিধ পরিচালন-ভার মাদাম কুরীর উপর ন্যস্ত করেন। তাঁহার জন্মভূমি ওয়ার-শ নগরেও

একটি Radium Institute প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পিয়ের কুরীর মৃত্যুর পর মাদাম কুরী তাঁহার দুইটি শিশু কন্যা ইরেন ও ইভকে লইয়া বাস করিতেছিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ মাদাম কুরীর কন্যা মাদাম ইরেন কুরী জোলিও এবং তাঁহার স্বামী মঁসিয়ে জঁ। ফ্রেডারিকজোলিও ১৯৩৫ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

মাদাম কুরী, পিয়ের কুরীর মৃত্যুর পর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে এককই নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। মাদাম কুরী ব্যতীত এ পর্যান্ত কেহই নোবেল পুরস্কার দুইবার লাভ করেন নাই। মাদাম কুরীর স্বামী পিয়ের কুরী ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে প্যারিসের এক সম্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Dr. ES.S.C. উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের অন্যান্য কথা যথা স্থানে বলা হইয়াছে।

মাদামকুরী ও তাঁহার কন্যা ইরেন ও ইভ আমেরিকা যাইবার পথে

রেডিয়াম ইনষ্টিটিউট

মাদাম কুরী মহিলা হইয়াও বৈজ্ঞানিক জগতে যে অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা চিরদিন পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

আমরা এখানে রেডিয়াম সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলিতেছি। রেডিও শব্দটি ল্যাটিন Radius অর্থাৎ রশ্মি এই শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রায় ত্রিশ প্রকারের জ্যোতিষ্মান পদার্থের পরিচয় পাই। যেমন উরেনিয়াম (Uranium) থোরিয়াম

রেডিয়াম চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত সুচ

(Thorium), পোলোনিয়াম (Polonium) এবং এ্যাক্টিনিয়াম (Actinium) প্রভৃতি।

রেডিয়াম এমন তেজঃপূর্ণ জ্যোতিষ্মান পদার্থ যে ইহা রক্ষা করা অতি কঠিন। রেডিয়াম অত্যন্ত মূল্যবান্ পদার্থ, এক রতি বা গ্রেণ রেডিয়ামের মূল্য হইতেছে ১,০০০ পাউণ্ড। রেডিয়াম ব্যবহার

রেডিয়াম রক্ষার ব্যবস্থা
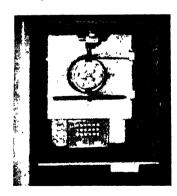
করিতে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। কিরূপ যত্ন ও সতর্কতার সহিত রেডিয়াম রক্ষিত হয়, এখানে তাহার চিত্র দেওয়া হইল, তাহা

হইতেই বুঝিতে পারিবে, কিরূপ সতর্কতার সহিত ইহা রাখা হয়।

কিরূপ ভাবে রেডিয়াম লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয়, কিরূপ পোষাক পরিতে হয় এবং যন্ত্র-পাতির ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও ছবিতে দেখ। রেডিয়ামের দ্বারা আজকাল দুরারোগ্য ক্ষত রোগের চিকিৎসা হইয়া থাকে। রেডিয়ামের গুণ সম্বন্ধে এখনও নানারূপ গবেষণা চলিতেছে। রেডিয়াম আবিষ্কারের পর হইতেই কতকগুলি দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য ইহার ব্যবহারের দ্বারা আশাতিরিক্ত ফললাভ হইতেছে। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের বড় বড় হাসপাতালে রেডিয়াম দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে।

রেডিয়াম ব্যবহারের পোষাক

রেডিয়াম ব্যবহার করিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। যাঁহারা রেডিয়াম লইয়া নাড়াচাড়া করেন তাঁহারা সীসক-আচ্ছাদিত রবারের দস্তানা হাতে পরিয়া রেডিয়াম লইয়া নাড়াচাড়া করেন। চশমার আবরণী ও সীসায় ঢাকা থাকে, নতুবা দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

রেডিয়াম পর্যবেক্ষণ
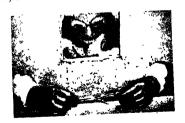
রেডিয়াম রশ্মির তেজের শক্তির পরিমাপ এক প্রকার পরিমাপক যন্ত্র দ্বারা হইয়া থাকে।
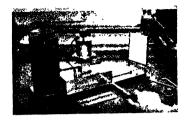
রেডিও রশ্মির পরিমাপ যন্ত্র

সীসকের বাক্সের মধ্যে ভরিয়া ও সতর্কতার সহিত রেডিয়ামটিউব আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। সীসকাচ্ছাদিত রবারের দস্তানা পরিয়া রেডিয়াম টিউব অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ব্যবহার-করা হইয়া থাকে।

রেডিয়াম টিউব রাখিবার বাক্স

আমাদের দেশেও বর্তমান সময়ে চিকিৎসকগণ রেডিয়াম চিকিৎসার দ্বারা দুরারোগ্য ক্ষত রোগের চিকিৎসা করিতেছেন।

রেডিয়াম আচ্ছাদনী

এখানে রেডিয়াম আচ্ছাদনীর একটি চিত্র প্রদর্শিত হইল।

বীরবরের বীরত্ব

[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম তোমরা জান। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার কথা বলা হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনেকে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের জন্মদাতা বলেন, তাহার কারণ এই যে তিনি বালক-বালিকাদের পড়িবার মত বইয়ের অভাব দেখিয়া সেই প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে 'কথামালা', 'চরিতাবলী' 'আখ্যান-মঞ্জরী, 'বোধোদয়' প্রভৃতি অনেক বই লিখিয়াছিলেন। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি সুলিখিত, সুখপাঠ্য কথা-গ্রন্থ। ইহার গল্পগুলি পড়িলে সেই প্রাচীন কালের সামাজিক ইতিহাস-সম্পর্কে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ১২৫৩ সালে হিন্দী "বৈতাল পচিশি" নামক গ্রন্থের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' নাম দিয়া ১২৫২-১২৫৪ সালে প্রকাশ করেন। সে প্রায় ৮৪ বৎসর আগে বাঙ্গালা গদ্যের ভাষা কিরূপ ছিল তাহা তোমরা এই গল্প দুইটি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবে। আমরা এখানে 'বীরবরের বীরত্ব'ও ভোজন বিলাসী ও শয্যা বিলাসী নামক দুইটি গল্প প্রকাশ করিলাম। ভাষার কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৭ খানি সংস্কৃত, ৫ খানি ইংরাজী এবং ৩০ খানি বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা পুস্তক ৩০ খানির মধ্যে, ১৩ খানি বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক রচনা ও অনুবাদ এবং বাকী ১৬ খানির মধ্যে, ৩ খানি পুরাতন গ্রন্থ অন্নদামঙ্গল প্রভৃতির বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্ম ১২২৭ সাল ১২ই আশ্বিন, মঙ্গলবার দিবা দুই প্রহরের সময় মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রাম ১৮২০ খৃ. অঃ। মৃত্যু ১২৯৮ সাল, ১৩ই শ্রাবণ মঙ্গলবার রাত্রি ২-১৮ মিনিটের সময়]

৩৪৯০ পৃষ্ঠার পর

বর্দ্ধমান নগরে, রূপসেন নামে, অতি বিজ্ঞ, গুণগ্রাহী, দয়াশীল, পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। এক দিন, দক্ষিণদেশনিবাসী বীরবর নামে রাজপুত কর্ম্মপ্রাপ্তির বাসনায়, রাজদ্বারে উপস্থিত হইল। দ্বারবান, তাহার প্রমুখাৎ সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, রাজ-সমীপে বিজ্ঞাপন করিল, মহারাজ, বীরবর নামে এক অস্ত্রধারী পুরুষ, কর্ম্মের প্রার্থনায় আসিয়া, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে; সাক্ষাৎকারে আসিয়া, স্বীয় অভিপ্রায় আপনকার গোচর করিতে চায়; কি আজ্ঞা হয়। রাজা আজ্ঞা করিলেন, অবিলম্বে উহাকে লইয়া আইস।

অনন্তর, দ্বারী বীরবরকে নরপতিগোচরে উপস্থিত করিলে, রাজা তদীয় আকারপ্রকার দর্শনে, তাহাকে বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষ স্থির করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, বীরবর, কত বেতন পাইলে, তোমার স্বচ্ছন্দে দিন- পাত হইতে পারে। বীরবর নিবেদন করিল, মহারাজ, প্রত্যহ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার আদেশ হইলে, আমার চলিতে পারে। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, তোমার পরিবার কত। সে কহিল, মহারাজ, এক স্ত্রী, এক

পুত্র, এক কন্যা, আর স্বয়ং, এই চারি ; এতদ্ব্যতিরিক্ত আর আমার পরিবার নাই। রাজা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, ইহার পরিবার অত অল্প, তথাপি কি নিমিত্ত এত অধিক প্রার্থনা করে। যাহা হউক, এক ভৃত্যের নিমিত্ত, নিত্য নিত্য, এবংবিধ ব্যয় যুক্তিসঙ্গত নহে। অথবা, এ অর্থব্যয় ব্যর্থ হইবে না ; অবশ্যই ইহার অসাধারণ গুণ ও ক্ষমতা থাকিবে। অতএব, কিছু দিনের নিমিত্ত রাখিয়া, ইহার গুণের ও ক্ষমতার পরীক্ষা করা উচিত। অনন্তর, কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া, রাজা আজ্ঞা দিলেন, তুমি প্রতিদিন, প্রাতঃকালে, বীরবরকে সহস্র সুবর্ণ দিবে, কোনও মতে অন্যথা না হয়।

বীরবর, রাজকীয় আজ্ঞা শ্রবণে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল, এবং কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে, সে দিবসের প্রাপ্য নির্দ্ধারিত সুবর্ণ গ্রহণপূর্ব্বক নৃপনির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে গমন করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া, সে, প্রথমতঃ, সেই সুবর্ণকে ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগ বিপ্রসাৎ করিল ; অবশিষ্ট ভাগ পুনর্বার দ্বিভাগ করিয়া এক ভাগ বৈষ্ণব, বৈরাগী, সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে দিল ; অপর ভাগ দ্বারা, নানাবিধ খাদ্য আয়োজন করিয়া, শত শত দীন, দুঃখী, অনাথ প্রভৃতিকে পর্য্যাপ্ত ভোজন করাইল। অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ স্বয়ং, পুত্র কলত্র ও দুহিতার সহিত, আহার করিল।

প্রতিদিন, এইরূপে দিনপাত করিয়া, সায়ংকালে বর্ম্ম, খড়্গ, ও চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক, বীরবর সমস্ত রজনী, রাজদ্বারে উপস্থিত থাকে। রাজা, তাহার শক্তির ও প্রভুভক্তির পরীক্ষার্থে, কি দ্বিতীয় প্রহর, কি তৃতীয় প্রহর, যখন যে আদেশ করেন, অতি দুঃসাধ্য হইলেও সে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিয়া আইসে।

এক দিন, নিশীথ সময়ে, অকস্মাৎ স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণগোচর করিয়া, রাজা বীরবরকে আহ্বান করিলে, সে তৎক্ষণাৎ সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিল, মহারাজ, কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন, দক্ষিণদিকে স্ত্রীলোকের ক্রন্দনশব্দ শুনা যাইতেছে ; ত্বরায় ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়া, আমায় সংবাদ দাও। বীরবর, যে আজ্ঞা মহারাজ, বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। রাজা বীরবরকে, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও, আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ না দেখিয়া, সাতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন ; এক্ষণে তাহার সাহস ও ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত, স্বয়ং গুপ্ত ভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

বীরবর, সেই ক্রন্দনশব্দ লক্ষ্য করিয়া, অতি প্রসিদ্ধ এক ভয়ঙ্কর শ্মশানে উপস্থিত হইল, দেখিল, এক সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী, শিরে করাঘাত ও হাহাকার করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। বীরবর দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল, এবং তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসিল, তুমি কে, কি দুঃখে এই ঘোর রজনীতে, একাকিনী শ্মশানবাসিনী হইয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছ ? সে কোনও উত্তর দিল না ; বরং, পূর্ব্ব অপেক্ষায়, অধিকতর রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর, বীরবর সবিশেষ ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক, বারংবার জিজ্ঞাসা করাতে, সে কহিল, আমি রাজলক্ষ্মী, রাজা রূপসেনের গৃহে নানা অন্যায়াচরণ হইতেছে, তৎপ্রযুক্ত তদীয় আবাসে অচিরাৎ অলক্ষ্মীর প্রবেশ হইবে, সুতরাং আমি রাজার অধিকার পরিত্যাগ করিয়া যাইব। আমি প্রস্থান করিলে, অল্প দিনের মধ্যেই রাজার প্রাণাত্যয় ঘটিবে। সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছি।

প্রভুর এবম্ভূত অসম্ভাবিত ভাবী অমঙ্গল শ্রবণে বিষাদসাগরে মগ্ন হইয়া বীরবর কহিল, দেবি, আপনি যে আজ্ঞা করিলেন, তাহাতে, কোনও মতে, সন্দেহ করিতে পারি না। কিন্তু, যদি এই হৃদয়বিদারণ অমঙ্গল ঘটনার নিবারণের কোনও উপায় থাকে, বলুন ; আমি রাজার মঙ্গলের নিমিত্ত, প্রাণান্ত পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, পূর্ব্ব দিকে, অর্দ্ধযোজনান্তে, এক দেবী আছেন। যদি কেহ, ঐ দেবীর নিকটে আপন পুত্রকে স্বহস্তে বলিদান দেয়, তবে তিনি প্রসন্ন হইয়া রাজার সমস্ত অমঙ্গলের সম্পূর্ণ নিবারণ করিতে পারেন।

রাজলক্ষ্মীর এই বাক্য শুনিয়া, বীরবর, অতি সত্বর, ভবনাভিমুখে ধাবমান হইল। রাজাও, কৌতুকাবিষ্ট হইয়া, পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বীরবর গৃহে উপস্থিত হইয়া, আপন পত্নীকে জাগরিত করিয়া, সবিশেষ সমস্ত জ্ঞাত করিলে, সে তৎক্ষণাৎ পুত্রের

নিদ্রাভঙ্গ করিয়া ব… বৎস, তোমার মস্তক দিলে, রাজার দীর্ঘ আয়ুঃ ও অচল রাজ্য হয়। তখন পুত্র কহিল, মাতঃ, প্রথমতঃ আপনার আজ্ঞা, দ্বিতীয়তঃ, স্বামিকার্য্য; তৃতীয়তঃ, ক্ষণবিনশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ দেবসেবায় নিয়োজিত হইবে; ইহা অপেক্ষা, আমার পক্ষে, প্রাণত্যাগের উত্তম সময় আর ঘটিবে না। অতএব শুভকর্ম্মে বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। আপনারা সত্বর হইয়া, কার্য্য সম্পাদন করুন।

বীরবর, পুত্রের পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে সহধর্ম্মিণীকে কহিল, যদি তুমি স্বচ্ছন্দমনে পুত্র প্রদান কর, তবেই আমি দেবীর নিকটে বলিদান দিয়া, রাজকার্য্য নিষ্পন্ন করি। স্বামিবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, বীরবরের পত্নী নিবেদন করিল, নাথ, ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, স্বামী মূক, বধির, পঙ্গু, অন্ধ, কুব্জ, কুষ্ঠী, যেরূপ হউন, তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে, যেরূপ চরিতার্থতা লাভ হয়, শাস্ত্রবিহিত দান, ধ্যান, ব্রত, তপস্যা দ্বারা তদ্রূপ হয় না; আর, যদি, স্বামীর প্রতি অযত্ন ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া, পারলৌকিক সুখসম্ভোগের লোভে, নিরন্তর শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে সকল সর্ব্বতোভাবে বিফল ও অন্তে অবধারিত অধোগতির কারণ হয়। অতএব আমার পুত্র পৌত্রে প্রয়োজন কি, তোমার চিত্তরঞ্জন ও চরণশুশ্রূষা করিলেই, উভয় লোকে নিস্তার পাইব। তাহার পুত্র কহিল, পিতঃ, যে ব্যক্তি স্বামিকার্য্য সম্পাদনে সমর্থ, তাহারই জন্ম সার্থক, এবং সেই স্বর্গলোকে অনন্তকাল সুখসম্ভোগ করে। অতএব, আর কি জন্য, সংশয়ে কালহরণ করিতেছেন, কার্য্য সাধনে তৎপর হউন। বিলম্বে কার্য্যহানির সম্ভাবনা।

ইত্যাকার নানাপ্রকার কথোপকথনের পর, বীরবর, সপরিবারে দেবীর মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিল। রাজা, এইরূপে বীরবরের সপরিবারে প্রভুভক্তির প্রবলতা ও অচলতা দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইলেন, এবং মনে মনে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক, গুপ্তভাবে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বীরবর দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইল, এবং গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ নৈবেদ্য আদি নানা উপচারে, যথাবিধি পূজা করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক, দেবীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, জগদীশ্বরি, তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত, আমি প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে স্বহস্তে বলিদান দিতেছি। কৃপা কর, যেন প্রভুর দীর্ঘ আয়ুঃ ও অচল রাজ্য হয়।

এই বলিয়া খড়্গ লইয়া, বীরবর, অকাতরে পুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিল। বীরবরের কন্যা, এইরূপে জীবিতাধিক সহোদরের প্রাণবিনাশ দেখিয়া, খড়্গপ্রহার দ্বারা প্রাণত্যাগ করিল। তাহার পত্নীও, শোকে একান্ত বিকলচিত্তা হইয়া, তৎক্ষণাৎ তনয়-তনয়ার অনুগামিনী হইল। তখন বীরবর বিবেচনা করিল, প্রভুকার্য্য সম্পন্ন করিলাম, এক্ষণে, আর কি নিমিত্ত দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকি; আর কি সুখেই বা জীবন ধারণ করি, এই বলিয়া, সেই বিষম খড়্গ দ্বারা স্বীয় শিরশ্ছেদন করিল।

এই রূপে অল্পক্ষণ মধ্যে, চারিজনের অদ্ভুত মরণ প্রত্যক্ষ করিয়া রাজার অন্তঃকরণে নিরতিশয় নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তখন তিনি কহিতে লাগিলেন, যে রাজ্যের নিমিত্ত, এতাদৃশ প্রভুভক্ত সেবকের সর্ব্বনাশ হইল, আর আমি সেই বিষম রাজ্যের ভোগে প্রবৃত্ত হইব না। আমি অতিশয় স্বার্থপর ও নিরতিশয় নির্ব্বিবেক; নতুবা কি নিমিত্ত, বীরবরকে পুত্রহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিলাম না; কি নিমিত্তই বা তাহাকে আত্মঘাতী হইতে দিলাম; উপক্রমেই, এই ঘোরতর অধ্যবসায় হইতে, বীরবরকে বিরত করা, সর্ব্বতোভাবে আমার উচিত ছিল। সর্ব্বদা, আমি অতি অসৎ কর্ম্ম করিয়াছি। এক্ষণে, আত্মহত্যারূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত চিত্তসন্তোষ জন্মিবে না।

এই বলিয়া, খড়্গ লইয়া, রাজা আত্মশিরশ্ছেদনে উদ্যত হইবামাত্র ভগবতী কাত্যায়নী, তৎক্ষণাৎ আবির্ভূতা হইয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক, রাজাকে মরণ-ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিলেন; কহিলেন, বৎস, তোমার সাহস ও সদ্বিবেচনা দর্শনে, যার পর নাই, প্রীত হইয়াছি; অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন, মাতঃ, যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, এই চারি জনের জীবনদান কর; এক্ষণে, ইহা অপেক্ষা আমার আর গুরুতর প্রার্থয়িতব্য নাই। দেবী, তথাস্তু বলিয়া, অবিলম্বে পাতাল হইতে অমৃত আনয়ন পূর্ব্বক, তাহাদের গাত্রে সেচন করিবামাত্র, চারিজনেই তৎক্ষণাৎ সুপ্তোত্থিতের ন্যায়, গাত্রোত্থান করিল।

রাজা, যথার্থ প্রভুভক্ত বীরবরকে, অপত্য কলত্র সহিত, পুনর্জীবিত দেখিয়া, অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং নিরতিশয় ভক্তিযোগ সহকারে দেবীর চরণারবিন্দে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, গদ্গদ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। রাজার ভক্তিদর্শনে ও স্তবশ্রবণে পরম প্রীত প্রাপ্ত হইয়া, দেবী, প্রার্থনাধিক বরপ্রদান দ্বারা রাজাকে চরিতার্থ করিয়া, অন্তর্হিতা হইলেন।

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র, রাজা রূপসেন, সভাভবনে সিংহাসনে আসীন হইয়া, রাত্রিবৃত্তান্ত কীর্তন পূর্ব্বক, সর্ব্বসভাজন সমক্ষে, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, অদ্ভুত প্রভুপরায়ণ বীরবরকে অর্দ্ধরাজ্যেশ্বর করিলেন।

ভোজনবিলাসী ও শয্যাবিলাসী

ধর্ম্মপুরে গোবিন্দ নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র। তন্মধ্যে এক জন ভোজনবিলাসী অর্থাৎ অন্নে ও ব্যঞ্জনে যদি কোনও দোষ থাকিত তাহা দুজ্ঞেয় হইলেও, ঐ অন্নের ও ঐ ব্যঞ্জনের ভক্ষণে তাহার প্রবৃত্তি হইত না; দ্বিতীয় শয্যাবিলাসী; অর্থাৎ, শয্যায় কোনও দুর্লক্ষ্য বিঘ্ন ঘটিলেও, সে তাহাতে শয়ন করিতে পারিত না। ফলতঃ, এই এক এক বিষয়ে তাহাদের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তদীয় ঈদৃশ বিস্ময়জনক ক্ষমতার বিষয় ভূভর্ত্তা নরপতির কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাহাদের ঐ ক্ষমতার পরীক্ষার্থে, সাতিশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন, এবং উভয়কে রাজধানীতে আনাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা কে কোন্ বিষয়ে বিলাসী।

অনন্তর, তাহারা স্ব স্ব পরিচয় দিলে, রাজা, প্রথমতঃ ভোজনবিলাসীর পরীক্ষার্থে, পাচক ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া, নানাবিধ সুরস অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। পাচক, রাজকীয় আজ্ঞানুসারে, সাতিশয় যত্ন সহকারে, চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্বিধ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া, ভূপতি সমীপে সংবাদ দিল। রাজা ভোজনবিলাসীকে আহার করিবার আদেশ করিলে, সে আহারস্থানে উপস্থিত হইল; এবং আসনে উপবেশন মাত্র, গাত্রোত্থান করিয়া নৃপতিসমীপে প্রতিগমন করিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, তৃপ্তি-পূর্ব্বক ভোজন করিয়াছ? সে কহিল, না মহারাজ, আমার ভোজন করা হয় নাই। রাজা জিজ্ঞাসিলেন কেন! সে কহিল, মহারাজ, অন্নে শবগন্ধ নির্গত হইতেছে; বোধ করি, শ্মশানসন্নিহিতক্ষেত্রজাত ধান্যের তণ্ডুল পাক করিয়াছিল। রাজা শুনিয়া তদীয় বাক্য উন্মত্তপ্রলাপবৎ অসঙ্গত বোধ করিয়া, কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন; এবং এই ব্যাপার গোপনে রাখিয়া, ভাণ্ডারীকে ডাকাইয়া, সেই তণ্ডুলের বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে ভাণ্ডারী, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, নরপতিগোচরে আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ, অমুক গ্রামের শ্মশানসন্নিহিতক্ষেত্রজাত ধান্যে ঐ তণ্ডুল প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজা শুনিয়া নিরতিশয় চমৎকৃত হইলেন, এবং ভোজনবিলাসীর সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, তুমি যথার্থ ভোজনবিলাসী।

তদনন্তর, রাজা, এক সুসজ্জিত শয়নাগারে দুগ্ধফেননিভ পরম রমণীয় শয্যা প্রস্তুত করাইয়া, শয্যাবিলাসীকে শয়ন করিতে আদেশ দিলেন। সে, কিয়ৎক্ষণ শয়ন করিয়া, নৃপতিসমীপে আসিয়া, নিবেদন করিল, মহারাজ, ঐ শয্যার সপ্তম তলে এক ক্ষুদ্র কেশ পতিত আছে, তাহা আমার সাতিশয় ক্লেশকর হইতে লাগিল; এজন্য শয়ন করিতে পারিলাম না। রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক, অন্বেষণ করিয়া দেখিতে পাইলেন, শয্যার সপ্তম তলে যথার্থই এক ক্ষুদ্র কেশ পতিত রহিয়াছে। তখন, তিনি, যৎপরোনাস্তি সন্তোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক, বারংবার তাহার প্রশংসা করিয়া কহিলেন, তুমি যথার্থ শয্যাবিলাসী। অনন্তর, তাহাদের দুই সহোদরকে, যথোচিত পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক, পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

তোমরা বল দেখি বীরবরের বীরত্ব গল্পে রাজা রূপসেন ও বীরবরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এবং ভোজনবিলাসী এবং শয্যাবিলাসী উভয়ের মধ্যে কোন্ জন অধিক প্রশংসনীয়। তোমরা বেতালপঞ্চবিংশতি পড়িলে এইরূপ অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প জানিতে পারিবে। প্রত্যেকটি গল্পের শেষে বেতাল রাজাকে এইরূপ প্রশ্ন করিতেন। বেতালের এই গল্পগুলি পৃথিবীর প্রায় সমুদয় ভাষায়ই অনূদিত হইয়াছে। প্রত্যেক দেশের লোকেরাই বেতালের গল্পগুলির অত্যন্ত সমাদর করিয়া আসিতেছেন।

দেশ-বিদেশের জাতীয় সঙ্গীত

[৩১৮৯ পৃষ্ঠার পর]

[মহা সমরের সময় ফরাসীদেশের মুটে মজুর, চাষা-ব্যবসায়ী প্রভৃতি সাধারণ লোকেরা যে সকল জাতীয় সঙ্গীত গান করিয়া পথে পথে টহল দিয়া বেড়াইত এখানে তাহার একটি গান প্রকাশ করা হইল। এই গানটি এবং স্বদেশ প্রীতি কবিতাটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক অনূদিত।]

ন্যায় ধর্ম্মের যুদ্ধে

পড়ল পাশা—চলরে ছুটে সমুখ পানে!
পবিত্র এ হুকুম এল ফ্রান্সে।
যুদ্ধ-দানব ছাড় পেয়েছে শিকল ছিঁড়ে,
খাচ্চে শুষে দেশের ধন ও প্রাণ সে!
কৈজারটা পাগলা হয়ে দেয় লেলিয়ে;
জল্লাদরা নিচ্ছেরে তার সঙ্গ;
সকল আশার বাঁধন ছিঁড়ে দানব ছেড়ে
পাগল এখন দেখছে তারই রঙ্গ!
আয় কে কোথায় আছিস্ বলী ধর হাতিয়ার,
শত্রু আসে বুকের পরে চড়াও হতে!
ছেড়ে ছুড়ে কায় কারবার স্ত্রী-পরিবার
ঝাঁপ দিয়ে পড় সমর স্রোতে!

সমবেত কণ্ঠে

মুক্ত স্বাধীন জাত কি কখনো সমরে ডরে,
ন্যায় স্বত্বের বলে যে তাহার হৃদয় বলী;
নির্ভয়ে আর অটল হয়ে আগ বাড়িবে
বীর তোমরা, কাঁপবে ভয়ে রণস্থলী!

দেশের জাগরণ

"আস্ দেখি তুই, আসছিস কে?"
সকল য়ুরোপ
তন্দ্রা হতে জেগে উঠে বল্‌ছে হেঁকে।
কে আছ গো, কোথায়, এস, এই সীমানায়
যে যার নিজের ঘাঁটি আগলে বোসরে জেঁকে
প্রাণে দেহে আমরা সবাই এক-কাঠ্ঠা—
শপথ নিয়ে শত্রু রোধে হওরে খাড়া,
মাটির পরে ফেলবে পেড়ে টুঁটি চেপে
পড়পড়িয়ে সরীসৃপের ছালটা ছাড়া!

সমবেত কণ্ঠে

অজেয় অমর আত্মা মোদের মরণ-পরে,
যশোমণ্ডিত দেশ নিশানের পাহারাদার।

ফরাসী রাষ্ট্র-সঙ্গীত

লা মার্সেইয়েজের বঙ্গানুবাদ

[মহাসমরের সময় এই মার্সেইয়েজ গান গাহিয়া ও বাজাইয়া ফরাসী ও ইংরাজ সৈন্য জার্মানদের সহিত যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছে, ভারতের পাঠান সৈন্যেরা বাদ্য বাজাইয়া ফরাসী জাতির সহিত সমপ্রাণতা দেখাইয়াছিল, তাহাদিগকে উৎফুল্ল ও উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই মার্সেইয়েজ গানের মূল সুরের বঙ্গানুবাদ ও তাহার স্বরলিপি স্বর্গত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩২২ সালের 'প্রবাসী' পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা এখানে তাহা প্রকাশ করিলাম, পূর্ব্বে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক "লা-মার্সেইয়েজের" বঙ্গানুবাদও 'শিশু-ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে।]

আয়রে আয় দেশের সন্তান
গৌরবের দিন এসেছে ;
অত্যাচার ঐ ছাখ্—গগনে
রক্ত-ধ্বজা তুলেছে।
শুনিছ না ক্ষেত্র-মাঝে
ভীষণ সৈন্যের হুঙ্কার ?
ওরা আসে বুকের পরে
করিতে স্ত্রীপুত্র সংহার।
ধর অস্ত্র পৌরজন
কর ব্যূহ সংগঠন ;
চলো—চলো—যোদের ক্ষেত্রে
শত্রু রক্ত হোক্ সিঞ্চন।

স্বদেশ-প্রীতি

[স্কট]

এই ছুনিয়ায় এমন অপদার্থ
কি কেউ আছে,—
"আমার স্বদেশ" বল্‌তে যাহার
হৃদয় নাহি নাচে।
দূর প্রবাসে বিজন-বাসে
কাটিয়ে বছর মাস,—
দেশের পানে ফির্‌তে যাহার
হয়নাকো উল্লাস,—
এমন অসাড় এমন অসার
সত্যি কি কেউ হয় ?
লোক মহলে মানুষ বলে
ছায় সে পরিচয় ?
ছায় যদি, যাও, রাখো চিনে,
শব সে জীবন্তেই ;
তার সমাচার চারণ-গানে
কবির গাথায় নেই।
যতই খেতাব থাকুক না তার,
যতই থাকুক ধন,—
হোক্ না কেন বংশ
আভিজাত্যে অতুলন,—
ক্ষমতা তার যতই থাকুক,
যতই থাকুক মান,—
দুর্ভাগা সে, মানুষ পোকা,
ক্ষুদ্র তাহার প্রাণ।
চিত্ত সদাই ঘুরছে তাহার
আপনাকে ঘিরে,
যশের ঘরে শূন্য,
জীবন মগন তিমিরে।
মরবে যখন জ্যান্তে মরা,
সকল অন্ধকার,
যে ধূলাতে জন্মেছিল তাই
হবে তার সার।
কাঁদবে না কেউ তাহার তরে,
করবে না কেউ নাম,
গাইবে না যশ শ্রদ্ধা ভরে
শ্রবণ অভিরাম।

পোল্যাণ্ডের জাতীয় সঙ্গীত

['শিশু-ভারতীর' পঞ্চম খণ্ডে পোল্যাণ্ডের একটি জাতীয় সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছিল। এইবার একটি নূতন গান দেওয়া হইল। এই গানটির ইতিহাস এই যে জেনারেল হেন্‌রি দবরোস্কি নেপোলিয়নের সময় একটি পোলিস্ সৈন্যদল সংগঠন করিয়া ফরাসীদের পক্ষে ইটালিতে যুদ্ধ করেন। ঐ সময়ে "Poland is not lost yet" এই জাতীয় সঙ্গীতটি বিরচিত হইয়া গীত হয়। Joseph Wybicki (1747-1822) নামক একজন যোদ্ধা ও রাষ্ট্রবিদ্ এই গানটি রচনা করেন বলিয়া কথিত আছে।]

পোল্যাণ্ড কি হারিয়েছে
তার স্বাধীনতা ধন ?
নহেরে নহেরে তাহা নহেরে—কখন !
যতদিন তাদের ধমনীতে,
বইবে জানিস্ জীবন-স্রোতে,
ততদিন সে রইবে বিশ্বে
স্বাধীন সজীব দেশ,
যতদিন তার একটিও জীবন
না হবে নিঃশেষ।
বিদেশী বর্ব্বর যারা লুণ্ঠন
করেছে এসে,
ধরি তরবার সংহারি তাদেরি
স্বাধীন করিব দেশে !
চল্ চল্ চল্ দলে দলে দলে
তোল্ জয় রব ভরি নভঃতলে,
চল্‌রে চল্‌রে সবে "দব্‌রোস্কি"
চল বীরবেশে,
ইটালি হইতে চল্‌বে পোল্যাণ্ড
দলে দলে এসে !
আমরা ঐক্যের বাঁধন বলে,
মিলিব একই পতাকা তলে,
করিব স্বাধীন স্বদেশে মোদের
এই পণ সবাকার !
আমরা 'ভিস্তুলা' হব পার,
আমরা ওয়ার্তা হব পার,
আমরা হইব আবার স্বাধীন ভুবনে,
স্মর বীর, অতীত-গৌরব তার !
চল্ চল্ চল্ দলে দলে দলে,
জয় রব তোল গগনতলে,

শিখেছি আমরা কেমন করিয়া
রাখিব দেশের মান,
এস এস স্বদেশ-সেবক ! হও আগুয়ান !
হও আগুয়ান ! হও আগুয়ান !
হও আগুয়ান !
দবরোস্কি চল তুমি আগে,
আমরা চলিব নব অনুরাগে !
ইটালি হইতে চলবে পোল্যাণ্ডে,—
স্বদেশ ডাকিছে ভাই !
আমরা স্বাধীন ছিঁড়িতে শৃঙ্খল
সবলে আজিকে চাই !
চল চল চল হে দবরোস্কি
একতার নব বলে,
শত্রুরে আমরা চাহিযে দলিতে
সবলে চরণ তলে !
সমুদ্র-তরঙ্গে হেলায় ঠেলিয়া,
আমরা ছুটিব দেশের লাগিয়া,
চল চল চল হে দবরোস্কি
পিতৃভূমি করিতে উদ্ধার,
আমরা নাশিব দেশ-শত্রুদলে
খোল খোল তরবার !
আনন্দের অশ্রু-মুকুতা ঝরিবে
মোদের নয়নে নয়নে !
বাজাও ভেরী তুমুল-আনন্দে রণ-
দামামার রব সঘনে !
চল্ চল্ চল্ দলে দলে দলে
জয় রব তোল ঘন ঘোর রোলে।
স্বাধীন আমরা রহিব জগতে,
একই পতাকাতলে !

বরাহমিহির

৩১১৮ পৃষ্ঠার পর

ভারতবর্ষে এক সময় অনেক বড় বড় জ্যোতির্বিদ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে বরাহমিহির ও খনার নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। বরাহমিহির জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে যে সকল বই লিখিয়া গিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থ আজিও পণ্ডিতেরা সমাদর করিয়া থাকেন।

বরাহমিহির কে ছিলেন, কোন্‌দেশে তাঁর বাড়ী ছিল এ সকল বিষয়ে নানারূপ কাহিনী চলিয়া আসিতেছে। তবে সাধারণতঃ সকলে মনে করেন যে বরাহমিহির উজ্জয়িনী নগরীতে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার এক রত্ন ছিলেন। তোমরা হয়ত অনেকে এই সংস্কৃত শ্লোকটি জান :—

ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোঽমরসিংহ শঙ্কু-
বেতালভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

এই শ্লোকটি "জ্যোতির্বিদাভরণম্" নামক একখানি সংস্কৃত পুঁথিতে পাওয়া যায়।

সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই উজ্জয়িনীর সুপ্রসিদ্ধ শকারি-বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত। এই বিক্রমাদিত্যের সভায়ই কালিদাস প্রভৃতি নবরত্নের পণ্ডিতেরা বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা বলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সভায় একই সময়ে কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ন বিদ্যমান ছিল কিনা তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে একথা সত্য যে নবরত্ন সভা নামে কোন সভা নিশ্চয়ই একটা ছিল, নতুবা এত কথাইবা লোকে বলিবে কেন? আর এইরূপ একটা জনশ্রুতি শত শত বর্ষের পর চলিয়া আসিবেই বা কেন?

সেকালের পণ্ডিতেরা কেহই আপনাদের জীবন-চরিত লিখিতেন না। বরাহমিহিরও যে লেখেন নাই কিংবা তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত লিখিত নাই তাহা তোমরা বুঝিতে পার। তাঁহার একখানি গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে,—"আদিত্যদাসের পুত্র বরাহমিহির শৈশবে পিতার নিকট পড়া-শুনা করেন। তাহার পর কাপিথক নামক একটি স্থানে যাইয়া সূর্য্যদেবের কৃপায় বর লাভ করেন। এবং প্রাচীন ঋষিদের মত সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া হোরা-শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। গ্রন্থকারের নিবাস অবন্তী নগর।" হোরা গ্রীক্ শব্দ hora হইতে উৎপন্ন। লগ্ন বা (ঘণ্টা) বুঝাইয়া থাকে।

বরাহমিহিরের জীবন-চরিত সম্বন্ধে দেশী ও বিদেশী বড় বড় পণ্ডিতেরা নানা ভাবে পুরাণো পুঁথি পত্র ঘাটিয়া যে একটি তাহার জীবন-পরিচয় আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাই আমাদের অনুসরণ করিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিকগণের মতে বরাহমিহির ৫০৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ৮২ বৎসর কাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

বরাহমিহির শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তোমরা যদি শাকদ্বীপ ব্রাহ্মণদের বিষয় জানিতে চাও, তাহা হইলে মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্ব, বিষ্ণুপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ ও সাম্বপুরাণ পড়িলে তাঁহাদের বিষয় অনেক কথা জানিতে পারিবে। এই সম্প্রদায়ের ইতিহাস সংক্ষেপে তোমাদের কাছে বলিতেছি।

পুরাণ-মতে আর্য্যগণ অতি প্রাচীনকালে উত্তর কুরুবর্ষে বাস করিতেন। সেখান হইতে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি-বিস্তার করিতে থাকেন। অনেকে কাশ্মীর ও পঞ্জাবের মধ্যবর্ত্তী শাকদ্বীপ নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। ঐ স্থানটি এখন "শাকল" নামে পরিচিত। শাকল দ্বীপে যাঁহারা বাস করিতে থাকেন, তাঁহারা বিশেষ ভাবে সূর্য্যের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে থাকেন। সেই ঋষিরা সূর্য্যকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিতেন। গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থও সূর্য্যরূপী ব্রহ্মের ধ্যান মাত্র। শাকদ্বীপবাসী এই ঋষিরা চারি-বেদেই পারদর্শী ছিলেন। সর্ব্বদা যাগযজ্ঞ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র সাম্ব পিতার আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক শাকদ্বীপ হইতে অনেক শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণকে পঞ্জাবের চন্দ্রভাগা নদীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন তীর্থ মিত্রবনে আনয়ন করিয়া সূর্য্য-মন্দিরের পূজক নিযুক্ত করেন। পুরাণ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে সূর্য্যদেব প্রথমে এই চন্দ্রভাগা-তীরে তপস্যা করেন, এজন্য ঐ স্থানের নাম 'মিত্রবন' হইয়াছে। বেদে 'মিত্র' শব্দের অর্থ সূর্য্য। সূর্য্যের তপোবন বলিয়া পুরাকাল হইতে মিত্রবন তীর্থক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধ ছিল। কৃষ্ণের পুত্র সাম্ব সেখানে সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই মন্দিরে সুবর্ণ নির্ম্মিত সূর্য্য মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন 'মিত্রস্থান' হইতে ঐ স্থানের নাম হইয়াছে মূলতান। এক সময়ে মূলতানের সূর্য্য-মন্দিরের খ্যাতি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়ে, সে সময়ে ভারতের নানা স্থানের রাজারা মূলতানের সূর্য্য-মন্দিরে পূজা ও অর্চ্চনা করিতে আসিতেন। মিত্রবনের সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, তাহা খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বের কথা। সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক ইউ-য়ান-চাঙ ঐ মন্দির দর্শন করেন। "ঐ মন্দিরে সুবর্ণময় রথে সুবর্ণময় সূর্য্য প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং রথে সাতটী অশ্ব যোজিত ছিল। রথের চতুর্দ্দিকে

সূর্য্য প্রতিমা

ও মন্দির গাত্রে বহুমূল্য মণি-মাণিক্য শোভা পাইত। উড়িষ্যার কোর্ণাকের (কণারকের) সূর্য্য মন্দির মূলতানের সূর্য্য মন্দিরের আদর্শে নির্ম্মিত।" এক সময়ে ভারতের সমস্ত রাজপুতজাতির পুরোহিত ছিলেন শাকদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণেরা। এখনও ইঁহারা ভারতের নানাস্থানে বাস করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালাদেশে ও অনেকে বাস করিয়া আসিতেছেন এবং ইঁহাদের মধ্যে বহু শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত রহিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহারা

বিশেষ ভাবে যশঃলাভ করিয়া আসিতেছেন। যে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের কথা বলিলাম, বরাহমিহির এই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বরাহমিহির জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কিছু কাজ করিয়া গিয়াছেন। এই শাস্ত্রের উন্নতির জন্য তিনি বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে জ্যোতিষশাস্ত্র গণিতবিদ্যা, হোরাবিদ্যা এবং শাখা-বিদ্যা এই তিন ভাগে বিভক্ত। বরাহমিহির গণিতবিদ্যা সম্বন্ধে একখানি পুঁথি লিখিয়া গিয়াছেন তাহার নাম 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'। এই "পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা" একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহাতে ভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিরা জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল মতামত এবং বিদেশীয়দের মত ও উদ্ধৃত করিয়াছেন। পৌলিশ, রোমক, প্রভৃতি বৈদেশিক জ্যোতির্বিদগণের মতামত সম্বন্ধে ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা জানিতে পারা যাইতেছে যে সেকালে ভারতের নবরত্ন সভায় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতামত আলোচিত হইত।

বরাহমিহির "বৃহজ্জাতক," 'লঘুজাতক,' 'বৃহৎ-সংহিতা' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার 'বৃহৎ-সংহিতা' একখানি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। ইহাতে না আছে এমন বিষয় নাই। ১০৭টি বিষয় উক্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এমন কি গাছপালার কথা বৃষ্টি-পরিচয়, উল্কাপাত, ভূমিকম্প, প্রতিসূর্য্য, ধূমকেতু বাস্তুবিদ্যা, পুরুষ-লক্ষণ, স্ত্রী-প্রশংসা ইত্যাদি সকল বিষয়ই রহিয়াছে। বরাহমিহিরের সময় যে সকল দেবমূর্ত্তির পূজা প্রচলিত ছিল, তাহার নির্ম্মাণ-প্রণালীও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ সময় বোধ হয় বিষ্ণু, সূর্য্য, কার্ত্তিকেয়, শিব, বুদ্ধ এবং জিন প্রভৃতির পূজাই অধিক প্রচলিত ছিল। তিনি ঐ সকল দেবতার আকৃতি, পরিমাণ বর্ণ, ভূষণ, বাহন প্রভৃতির বিষয় ও বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

বরাহমিহির সূর্য্যদেবের উপাসক ছিলেন। তাহ তাঁহার রচিত শ্লোকে সূর্য্যদেবের অতি সুন্দর ভক্তি-প্রকাশক ধ্যানমন্ত্র পাই। তিনি লিখিয়াছেন—"যিনি বিশ্বের প্রাণ-দাতা পৃথিবীর যিনি স্রষ্টা, প্রকৃতির অপূর্ব্ব বিরাট শোভন অলঙ্কার যিনি, যাঁহার কিরণ-মালা গলিত সুবর্ণের ন্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশিত,-- সেই সূর্য্যদেবকে আমরা প্রণাম করি।"

সূর্য্যের মূর্ত্তি গঠন সম্পর্কে তিনি অনেক কথা েন। 'সূর্য্যের নাসা, ললাট, জঙ্ঘা এবং উরু হইবে কিঞ্চিৎ উন্নত। তাঁহার পোষাকপরিচ্ছদ হইবে পঞ্জাব ও কাশ্মীর দেশবাসীর মত বক্ষঃস্থল হইতে পাদ পর্য্যন্ত তাহা আচ্ছাদিত থাকিবে। উভয় হস্তে থাকিবে বিকশিত শতদল। মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে হার, আর তাঁহাকে ঘিরিয়া গ্রহগণ বিদ্যমান থাকিবে। সূর্য্যদেবতার মুখের ভাব থাকিবে প্রসন্ন বিকশিত পদ্মের মধ্যভাগের ন্যায় লোহিত আভাযুক্ত ও সর্ব্বাঙ্গ উজ্জ্বল রত্নের ন্যায় প্রদীপ্তশালী।

সূর্য্যমূর্ত্তির দুই দিকে যে দুইজন নারীমূর্ত্তি তাঁহারা সূর্য্যের দুই রাণী। দক্ষিণ দিকে নিক্ষুভা বা ছায়া আর বামদিকে প্রভা বা রাজ্ঞী। এই নারীমূর্ত্তিদ্বয়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান পুরুষমূর্ত্তি পিঙ্গল বা কুণ্ডি, হস্তে তরবারি কিংবা মস্যাধার ও লেখনি থাকিতে পারে এবং বামের পুরুষমূর্ত্তি হইতেছেন দণ্ড। হস্তে শূল। তোমারা ছবিতে যে দুইটি সূর্য্যের মূর্ত্তি দেখিতেছ তাহা হইতেই সূর্য্য মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারিবে।

বরাহমিহির সেকালেও নারীজাতির শিক্ষার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। নারী-জাতির প্রতি তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—পৃথিবী জয়ের সার নগরী, নগরীর সার অট্টালিকা, আর সকলের শ্রেষ্ঠ হইতেছে নারী। যাঁহারা গৃহলক্ষ্মী, যাঁহাদের নিকট হইতে ধর্ম্ম, পুত্র সম্পদ, সুখ লাভ হয়, সেই নারীজাতিকে মানুষ মাত্রেরই শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

বরাহমিহির সংস্কৃত ভাষায় জ্যোতির্বিদ্যার ন্যায় কঠিন শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ ও অতি সহজ সরল কবিত্ব পূর্ণ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের পণ্ডিতসমাজে তিনি বিশেষ সমাদর লাভ করিয়া গিয়াছেন, তিনি যে নবরত্ন সভার যোগ্য রত্ন ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ এইরূপ মহাপণ্ডিতদের জন্যই পৃথিবীর মধ্যে জ্ঞানেও বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ আসনখানি লাভ করিয়া আছে।

দিনের দৈর্ঘ্য কি বাড়িতেছে?

৩৫২০ পৃষ্ঠার পর

বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে দিন দিনই দিবস একটু একটু করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার কারণ এই যে জোয়ার ভাঁটার দরুন পৃথিবীর আবর্ত্তনবেগ অনেকটা হ্রাস পাইতেছে। তাহারই ফলে দিনের দৈর্ঘ্যও বৃদ্ধি পাইতেছে। উল্কাপাতের দরুন ও বাধা প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীর গতিবেগ হ্রাস পায় বলিয়া দিনের সময় বাড়িয়া যায়।

তবে দিনের সময়কাল হ্রাস পাওয়ার দিক্ দিয়াও অনেকটা সম্ভাবনা রহিয়াছে। পৃথিবীর ক্রমশঃ সঙ্কোচন হইতেছে। সঙ্কোচনের ফলে আকারও ক্ষুদ্র হইতেছে। আকার ক্ষুদ্র হইলে আবর্ত্তন বেগ আপনা হইতেই বৃদ্ধি পাইবে। সেজন্য দিনের স্থায়িত্ব কাল কমিয়া আসিবে। ঝড়ে-তুফানে, দৈব দুর্ব্বিপাকে পাহাড়ের চূড়া ভাঙ্গিয়া যায়, ভূমিকম্পে নানারূপ প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটে, কাজেই প্রকৃতি অতি আশ্চর্য্য ভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতেছে বলিয়া দিবাকালের হ্রাস ও বৃদ্ধির মধ্যে কোনরূপ অসামঞ্জস্য অনুভূত হইবে না।

মৌমাছির কতগুলি চক্ষু আছে?

একটি মৌমাছির পাঁচটি করিয়া চক্ষু আছে। মাথার দুই দিকে একটি একটি করিয়া দুইটি এ মাথার উপর রহিয়াছে তিনটি। উপরের তিনটি চক্ষুতে তেমন কোন বিশেষত্ব নাই, কিন্তু পাশের চক্ষু দুইটি হইতেছে বহু চক্ষুর সমষ্টি। ঐ দুইটি চক্ষুর মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু রহিয়াছে অসংখ্য। শ্রমিক মৌ-মাছির চক্ষুর সংখ্যা ৬,০০০, পুরুষদের ১৩,০০০ আর রাণী মৌমাছির চক্ষুর সংখ্যা হইতেছে ৫০০০। সম্মুখের চোখ দিয়া মৌমাছিরা শুধু কাছের জিনিষ দেখে আর সংযুক্ত চক্ষু সমূহ দ্বারা দেখিতে পায় দূরের জিনিষ।

আলেক্জান্দ্রিয়ার বৃহত্তম লাইব্রেরী কে স্থাপন করেন?

প্রাচীন কালে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী পৃথিবীর মধ্যে একটি বিখ্যাত পাঠাগার বলিয়া পরিচিত ছিল। ঐ লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ছিল ৭০,০০০। নানা ভাষার পুথি সংগ্রহের জন্য এই পাঠাগারের নাম সেকালে দেশবিদেশে বিখ্যাত ছিল। টোলেমি সোটোর (Ptolemy Sotor) ৮১ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে এই লাইব্রেরী স্থাপন করেন। ৩৯১ খৃষ্টাব্দে থিয়োফিলাস্ (Theophilus) এই লাইব্রেরী একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আবার এই লাইব্রেরী